(ওঁ)

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি

নিতান্ত অকিঞ্চন, তথাপিও অভিন্ন বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতার
অসীম ও অযাচিত কৃপাভাজন,

যতীন্দ্রনাথ ঘোষ

কর্তৃক সরল প্রবন্ধাবলী আকারে লিখিত।

(১)

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥"

যাঁহার কৃপায় সরে মূকের বচন,
পঙ্গু যাঁর কৃপাবলে,
†
*পর্বত লঙ্ঘিয়া চলে,
করি সে পরমানন্দ মাধবে বন্দন।

(২)

"প্রসীদ ভগবত্যম্ব, প্রসীদ ভক্ত-বৎসলে।
*প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবী নমোহস্তু তে ॥"

কৃপা মাগি, জগদম্বে!
কৃপা মাগি, ভকত বৎসলে! †
কৃপা মাগি, দুর্গে দেবী!
নমো, নমঃ তব পদাম্বুজে!

(৩)

"বাঞ্ছা ত্বং সর্ব্ব জগতাং,
মায়া চ ত্বং তথা হরেঃ।"

(৪)

"বিশ্বে গাছের পাতাটি অবধি জগদম্বার ইচ্ছার বাহিরে স্পন্দিত হয় না"

উপরে * ও † চিহ্নদ্বয়ের তাৎপর্য পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে ও এই চতুর্থ খণ্ডের নিবেদনের ১০ অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। উহারা এই পুস্তক প্রণেতাকে বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতার আশীর্বাদ নির্দেশক। রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরী উভয়ে একত্রে, বা ভিন্নভাবে, ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি, বা কৃষ্ণ ও দুর্গা (রঙ্গিণী), বা কৃষ্ণরঙ্গিণী। বিশ্বে যাহা কিছু সবই অচল, অটল, নিরাকার ও নির্গুণ একমাত্র বস্তু ব্রহ্মের অদ্বিতীয় ভিত্তিতে অনন্ত, কল্পিত স্বপ্নবৎ মিথ্যা, অহং-ভাবে সগুণ আদ্যাশক্তি—যেমন স্থির বায়ু ও সাগর এবং তৎস্পন্দন।

(শেষ প্রুফে, এই পৃষ্ঠার নিম্নের কিনারার মধ্য ভাগে একটি বড় কালির দাগ অবশেষে প্রকাশ হইল)।

প্রকাশক—
গ্রন্থকার শ্রীযতীন্দ্রনাথঘোষ।
"সুরেশ স্মৃতি-মন্দির"।
৬, তারিণীচরণঘোষ লেন।
পাইকপাড়া। কলিকাতা (২)।

মুদ্রাকর—
শ্রীকিঙ্করবন্দ্যোপাধ্যায়।
(Banerjee Printers)।
১১, মোহনচাঁদ রোড।
খিদিরপুর, কলিকাতা (২৩)।

প্রথম সংস্করণ—
প্রকাশ—সন ১৩৫৬, ৫ই ফাল্গুন, পূর্ণিমা তিথি

প্রাপ্তিস্থান—

(১) ৫।১ ডি, ও ৬, তারিণীচরণঘোষ লেন, কলিকাতা।
[গ্রন্থকার ও প্রকাশকের বাড়ী ও পুস্তকের প্রধান গুদাম]

(২) মহেশ লাইব্রেরী।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা।

(৩) সংস্কৃত বুক ডিপো।
২৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[দক্ষিণা—সাড়ে চারি টাকা]

দ্বিতীয় ভাগ—চতুর্থ খণ্ড

(প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা)

বা

কৃপামৃত

(জাগ্রৎ, তন্দ্রা ও স্বপ্ন অবস্থায় জগন্মাতার অষ্টোত্তরশত অভূতপূর্ব ও অনির্বচনীয় প্রেম ও কৃপা কাহিনী)

[চতুর্থ-সংখ্যক পুস্তক]

[৪]

পুস্তকের তিনটি গৌণ নাম—

(১) শ্রীরাম

(২) কৃষ্ণরঙ্গিণী

(৩) প্রিয়ংবদা
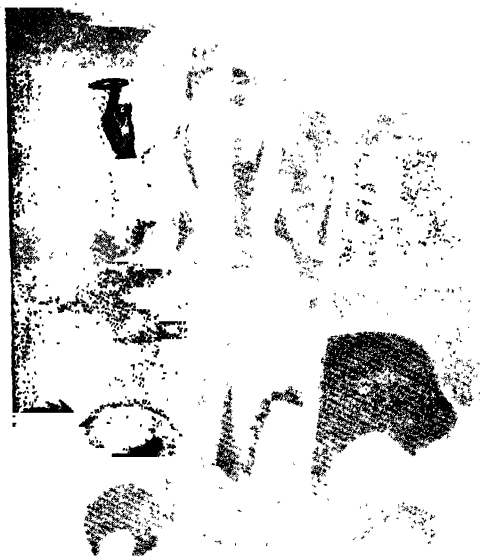
শ্রীহরিহরায় নমঃ

হরিহর বন্দনা

একাত্মক হরি-হর। (বংশীদাস)

প্রণমহ হরিহর　　অদ্ভুত কলেবর
　　শ্যাম শ্বেত একই মুরতি।
অভেদ ভাবিয়া লোকে　দেখিছে অতি কৌতুকে
　　মরকতে রজতের জ্যোতি॥
দক্ষিণ শরীরে হরি　　বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি
　　আধ আধ একই সংযোগে।
ধন্য লোকে দেখে হেন　গঙ্গা যমুনা যেন
　　মিলিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে॥
দক্ষিণাঙ্গ অনুপম　　সুন্দর জলদ শ্যাম
　　বাম তনু নিরমল শশী।
দেখি মুনি মন ভোলে　দুই পর্ব এক কালে
　　অমাবস্যা আর পৌর্ণমাসী॥

বাম শিরে উভা জটা　লম্বিত পিঙ্গল কটা
　　দক্ষিণাঙ্গে কিরীট উজ্জ্বল।
বাম কর্ণে বিভূষণ　　অদ্ভুত ফণিফণ
　　দক্ষিণেতে মকর কুণ্ডল॥
অর্ধ ভালেতে নয়ন　　প্রকাশিত হুতাশন
　　কস্তুরী শোভিছে আনপাশে।
কেশর অগুরু সঙ্গে　　লেপিত দক্ষিণ অঙ্গে
　　বাম অঙ্গে বিভূতি প্রকাশে॥
ত্রিশূল ডম্বরু বরে　　শোভিয়াছে বাম করে
　　শঙ্খচক্র দক্ষিণে বিরাজে।
কটির দক্ষিণ পাশে　　পরিধান পীতবাসে
　　বামপার্শ্বে ব্যাঘ্রচর্ম সাজে।

দ্বিজ বংশীদাস গায়　　মঞ্জির দক্ষিণ পায়,
　　ফণী বাম চরণ পঙ্কজে॥

শ্রীগণেশায় নমঃ

গণপতি-বন্দনা

হরি অংশে জাত দেব, পার্বতী-নন্দন,
হরি সম তুমি, নাথ! বিশ্বের কারণ।
কৃষ্ণরূপে গোলোকের তুমি আভরণ,
শঙ্কর কৈলাসে তুমি জানে ভক্তজন।
গজানন, একদন্ত, দেব গণপতি,
শিব সম তেঁই তব নাম পশুপতি।
তব গুণ বুঝিবারে নাহি কোন জন,
সব দেবশ্রেষ্ঠ তেঁই অগ্রেতে পূজন।
সর্ববিশ্বে আত্মরূপী, সমাধি গোচর,
কে বর্ণিবে তত্ত্ব তব, ওহে যোগিবর?

নবারুণ জিনি দেহ সিন্দুর বরণ,
সিদ্ধিদাতা, মোক্ষদাতা, ভক্ত প্রাণ-মন।
যেই জন করে তব অর্চনা-বন্দনা,
থাকে না, থাকে না, তার ভবে আনাগোনা।
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য করহ ভোজন,
নাম লম্বোদর তাহে হ'ল প্রচলন।
শূর্পকর্ণ, গুহাগ্রজ, হেরম্ব, গণেশ,
স্বর্ণবর্ণ, বিঘ্ননাশ, দেব পরমেশ।
মহাষষ্ঠী, নবদুর্গা, পত্নী তব ধন্যা,
তুষ্টি তাঁর অন্য নাম, সারা বিশ্ব গণ্যা।
ধর্মাধর্ম সাক্ষি তুমি, ওহে বিশ্বাত্মক!
অহেতুক কৃপাসিন্ধু, দেব বিনায়ক।
লহ গো চুম্বন মোর, 'ছোট্টো' নন্দন,*
'টুক্‌টুকে' পদে তব অনন্ত চুম্বন। (২৪)

[* ২ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]

ওঁ তৎসৎ।

চতুর্থ নিবেদন (দ্বিতীয় ভাগ, বা চতুর্থ খণ্ড)

ওঁ শক্তিঃ, ওঁ শক্তিঃ, ওঁ শক্তিঃ, ওম্।
ব্রহ্মশক্তিঃ, বিষ্ণুশক্তিঃ, শিবশক্তিঃ, ওম্।
আদিশক্তিঃ, মহাশক্তিঃ, পরাশক্তিঃ, ওম্॥
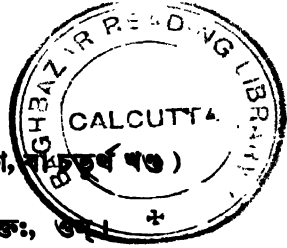
'ব্রহ্ম ও আগ্যাশক্তি' নাম্নী পুস্তকের তৃতীয় সংখ্যা, বা প্রথম ভাগের উত্তরার্ধ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৯ সন, শুভ ফুলদোলের (বা বুদ্ধ পূর্ণিমার) দিবস প্রকাশ হইয়াছিল। ইহার প্রায় সপ্তাহ পরে, এই চতুর্থ খণ্ডের (দ্বিতীয় ভাগের) লিখন আরম্ভ করিয়া ১০ই পৌষ শুভ বড়দিনে একমেটে শেষ করিয়াছিলাম। পূর্বের ছাপাখানা বন্ধ থাকাতে, খিদিরপুরের এক ক্ষুদ্র ছাপাখানায়, কেবল বিশেষ অনুরোধ ও সাহায্য ভিক্ষাদান কল্পে, ছাপাকার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ২৩শে পৌষ, (৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৩, বুধবার) উপলক্ষ্য করিয়া সুরু হইয়াছিল। কার্য ১৩৬০ সনের বৈশাখের শেষে সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত লিখিত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, নানা অকারণ অজুহাতে ক্ষুদ্র ছাপাখানা আমার বিশেষ বিরাগ ভাজন হইয়াও, ছাপা কার্যে বিলম্ব করিল। চেষ্টা সত্ত্বেও, উহাতে স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য বর্ণাশুদ্ধি দোষ রহিয়া গিয়াছে।

২। এই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য 'অবতরণিকা' (প্রথম) খণ্ডের ১-৫ অনুচ্ছেদে বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। বিশ্বে যাহা কিছু অন্তরে ও বাহিরে, সমস্তই ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে, ব্রহ্মের জীবশক্তি অবিদ্যারূপিণী মূলপ্রকৃতিদেবী আদ্যার অভিব্যক্তি এবং তিনি ভিন্ন বিশ্বে অন্য কিছু নহে—অর্থাৎ, বিশ্বের সর্ববিধ অবস্থায় অবিদ্যাই মাত্র প্রতিভাত হইতেছে (যেমন ঘটপটাদির ব্যবহারে মৃত্তিকাই বাস্তবিক ব্যবহৃত হইতেছে)। সবই মহামায়ার লীলা—অর্থাৎ, নানা ঈশ্বর, দেব, দানব, মানব, পশু, বস্তু, ইত্যাদিবিধ অহং-রূপে কালী এখানে একাকিনী এবং তাঁহার তুষ্টিতেই সকল দেবতা তুষ্টি লাভ করেন। আমরা পূজাদি যাহা কিছু করি, সবই কালীর শক্তিতে কালীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিকেই করি। তাঁহার নির্দিষ্ট কোন রূপ বাস্তবিক নাই এবং তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বাকার-রূপিণী! অতএব, এই পুস্তকগুলিও তাঁহার মূর্তি ও শক্তি বিশেষ, বা তিনি (•কাগজের দাগে চিহ্নিত স্থান 'ক')—প্রথম ভাগ, তৃতীয় (•কাগজের দুইটি দাগে চিহ্নিত স্থান 'খ') অধ্যায়, ২১-২২ অনুচ্ছেদ। শিবাগম বলিতেছেন—

শক্তিঃ শিবঃ, শিবঃ শক্তিঃ, শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো, রবিঃ শক্তিঃ, শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥

এই শক্তি বা প্রকৃতি দেবীর জ্ঞান বিনা মানবের নির্বাণ মুক্তি লাভ হয় না। কোন কোন নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও জানে যে এই বিশ্ব প্রকৃতিদেবীর মূর্তি ও অভিব্যক্তি, এখানে বিনা কারণে কোন কার্য প্রকাশিত হয় না এবং সেই সকল কারণ-কার্যাদি শৃঙ্খল পরস্পর সুন্দর প্রাকৃতিক নিয়মে ও রূপে প্রতিভাত। অতএব এই প্রাকৃতিক বিশ্ব যে কালীময় তাহা স্বতঃ সিদ্ধ—আমি কালী, তুমি কালী, সবই কালীর রূপ। প্রকৃতি বিশ্বরূপিণী, বা অনন্ত শক্তি ও প্রতিমারূপিণী। মহামায়ার এক প্রতিমার স্বরূপ এই পুস্তকখানির প্রথম খণ্ড, তাঁহার ঐ রূপে **উৎপত্তি**-বিষয়ক এবং তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার মোটামুটি স্বরূপ উহাতে কিছু আলোচনা হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত প্রথম ভাগ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডগুলি) ঐ প্রতিমার **নির্মাণ-বিষয়ক**, বা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার বিশদ স্বরূপের সার তত্ত্ব উহাতে আলোচনা হইয়াছে। সেই **তত্ত্বামৃতসার—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'**, বা '**ওঁ শ্রীরাম**'—বা বিশ্ব নানাত্বহীন এবং অভিন্ন প্রকৃতি-পুরুষ, ও/বা মূলপ্রকৃতি, ও/বা ব্রহ্ম স্বরূপ। অষ্টোত্তর শত পর্বে বিভক্ত দ্বিতীয় ভাগ (চতুর্থ খণ্ড) ঐ প্রতিমার **প্রাণপ্রতিষ্ঠা**-বিষয়ক, বা সর্ব দেবদেবীর স্বরূপ ও শক্তি (* কাগজের দাগে চিহ্নিত স্থান 'গ') আদ্যা যে নানামূর্তিতে এক প্রেমঘন বিগ্রহ (* কাগজের দুইটি দাগে চিহ্নিত স্থান 'ঘ') এবং তাঁহার নির্বাচিত ভক্তদিগকে অযাচিত ভাবে অনন্ত কৃপা প্রদর্শন করত তাহাদিগকে এই ঘোর দুঃখময় মায়িক সংসার হইতে চিরমুক্ত করেন, তাহা অষ্টোত্তরশত **কৃপামৃত** ধারা রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই **কৃপামৃত** বর্ষণে, তাঁহার ভিন্নরূপ দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, কৃষ্ণ, রাধা, রাম, সীতা, হনুমান, বিশ্বনাথ ও তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ, শিব, ভবতারিণী, নারায়ণ, ইত্যাদি দেবদেবী আমার জাগ্রত বা তন্দ্রা, বা স্বাপ্ন দশায় নানাভাবে অল্লাধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। মহানির্বাণ তন্ত্রে, সদাশিব মূলপ্রকৃতির অংশ-রূপিণী দুর্গাদেবীর স্তুতিতে বলিতেছেন—

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তিকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥

নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি।
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী॥

অনন্ত কৃপাময়ী তাঁহার এই পুস্তকে প্রকাশিত কতকগুলি কৃপার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ট ও ৪৭ পর্বে দুইটি বন্দনায় লিখিত হইয়াছে। উহাদের ভিতর কতকগুলি অসাধারণ (যেমন – ৪, ট, ১১, ২১, ২২, ২৬, ৩২, ৪৫, ৪৭, ইত্যাদি পর্বস্থ কাহিনীগুলি)। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—'যে-কোন মূর্তিতে ঈশ্বর (জগদম্বার ভিন্ন মূর্তি) প্রত্যক্ষ হইলে, মানবজীবনের পারলৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।' বিশ্বে প্রাণশক্তির সহ মিলিত সর্বশক্তির ও সর্বরূপের আধার জগদম্বা যে সর্বময়ী ও সবদেবদেবীই যে তাঁহার শক্তি বা বিভূতি (**সর্ব্ব দেবময়ীং দেবীং সর্ব্ব বেদময়ীং পরাম্**) তাহা পুস্তকের চারিখণ্ডে নানাস্থানে নানাভাবে আলোচনা হইয়াছে। অবতরণিকা খণ্ডের প্রথম পটটি তাঁহার এই স্বরূপের প্রতীক। উক্ত পটটি তিনিই আমাকে অঘটন-ঘটন নৈপুণ্যে দান করিয়াছিলেন (প্রথম খণ্ড, ২৮ অনুচ্ছেদ)। শক্তিদেবীর অর্চনায় সকল দেবদেবীর পূজা ও বিশ্বের তুষ্টি সম্পাদন হয়, কারণ তিনি ব্রহ্ম সহ অভেদ জ্যোতির্ময়ী চিদাকাশ রূপে সকলেরই আত্মা, বা শক্তি স্বরূপা। জপ, পূজা, ধ্যান, সমাধি, জীবনধারণ, প্রসাদভক্ষণ, ঈশ্বরনাম কীর্তন, ইত্যাদি সর্বরূপ বিশ্বের অভিব্যক্তি তাঁহার শক্তি বিনা সম্পন্ন হয় না। অতএব, কোন দেবদেবীর অর্চনায় তাঁহাকে অগ্রাহ্য করা চলে না—যদিও, মানব অজ্ঞতা ও ভেদবুদ্ধি বশতঃ তাহা উপলব্ধি করে না (৬২ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। আত্মার এই সকল স্বরূপ ও সর্বময়ীত্ব বিক্ষিপ্তভাবে, কেবল যেন সূত্রাকারে, নানা পুরাতন ধর্মগ্রন্থে ও সাধকদিগের সঙ্গীতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু একত্রে নহে। রামকৃষ্ণই বিশ্বগুরুরূপে জগদম্বার স্বরূপকে উক্ত রূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং অল্প কথায়, তাঁহার শিক্ষাকেই ভিত্তি করত আত্মজ্ঞান ও নানা শাস্ত্রগ্রন্থের সার দ্বারা বিশদীকরণ এই পুস্তকগুলির মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। চারিখণ্ডেই জগদম্বার স্বরূপের আলোচনা আছে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে তাঁহার সার স্বরূপ ও সর্বময়ীত্ব বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের কৃপা কাহিনীগুলি যেন প্রথম তিন খণ্ডে বর্ণিত তত্ত্বামৃতের প্রমাণ স্বরূপ !

প্রথম খণ্ড—৪ ; ৬ (২) (৭), (৯), (১০) ও (১৪); ৭ ; ৮ ও ২৪ (২) অনুচ্ছেদ [যশগীতা]।

দ্বিতীয় খণ্ড—১ অধ্যায় : ৬-১১, ১৫-১৬, ১৯-২২ ও ২৪ অনুচ্ছেদ ; ২ অধ্যায় : ৩৯-৪২ অনুচ্ছেদ ; ৩ অধ্যায় : ৩-৪ ও ২১-২৭ অনুচ্ছেদ ; ৪ অধ্যায় : ২৯ অনুচ্ছেদ ;

৫ অধ্যায়: ১১ অনুচ্ছেদ; ৮ অধ্যায়: ৩ ও ১৭ অনুচ্ছেদ এবং ৯ অধ্যায়: ১, ৬ ও ১৮ অনুচ্ছেদ।

তৃতীয় খণ্ড—১০ অধ্যায়: ৩-৮, ১০, ১১ ও ২৯-৩০ অনুচ্ছেদ; ১২ অধ্যায়: ২-৭ অনুচ্ছেদ এবং ১৬ অধ্যায়: ১৫ অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ খণ্ড—(* চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে চিহ্নিত স্থান 'ও')—অধিকাংশ পর্বই! আমার প্রতি নানা দেবদেবীর যে সকল কৃপালীলা, তাহা তাঁহারই শক্তি জাত, কারণ বিশ্বের অনন্তবিধ অভিব্যক্তিই নানাত্বহীন কালীময় এবং তিনি ভিন্ন অপর কেহ এখানে কোন বিষয়েই স্বাধীন নহেন। **ত্বয়ৈবোৎপাদিতং বিশ্বং ত্বদধীনমিদং জগৎ**)। তাঁহারই শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্ব দেবদেবীই সর্ববিধ বিশ্বকার্যে লিপ্ত (**সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ**)। পুস্তকখানি অবশেষে ১০৮ (জগদম্বার একটি অতি প্রিয় সংখ্যা) পর্বে বিভক্ত হইয়াছে (৩২ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩। আমার অল্পাবশিষ্ট জীবনের মহান্ কার্য যে জগদম্বাকে পুস্তকগুলির সার ভাবানুযায়ী যথাসম্ভব প্রচার করণ (তৃতীয় খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় নিবেদন ৩ ও ৪ অনুচ্ছেদ), তাহা চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে লিখিত হরিদাসজ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে জগদম্বার পঞ্চম স্বপ্ন হইতে বেশ বোধগম্য হইবে। আমার অবর্তমানে, ঐ কার্যভার বহনের জন্য যে রামকৃষ্ণের ভিন্নাধার আত্মা সারদার অশেষ আয়োজনে আমার দৌহিত্ররূপে বিবেকানন্দ অবতরণ করিয়াছেন, তাহা আমি উ পর্বে বর্ণিত ঘটনা ও উহাতে স্থিত (৯৪) চিহ্নিত স্থান হইতে বিশ্বাসবান। ত ও ৭৫ পর্বে বর্ণিত কাহিনীদ্বয় ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছে। মহেশ্বরোপম বিবেকানন্দের মহান্ স্বরূপ অতি অল্প ব্যক্তি অবগত। সেই জন্য, মহাভারতে লিখিত দেব-মুনি-ঋষিদিগের বাক্য হইতে বিষয়টি অতি সংক্ষেপে এইখানে লিখিতেছি। কৃষ্ণাবতারে যিনি অর্জুন, চৈতন্যাবতারে তিনিই রামানন্দ রায় এবং রামকৃষ্ণাবতারে বিবেকানন্দ—যদিও তিন দেহের মায়িক কার্যাদিতে বহু তারতম্য দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ পুরাতন নরঋষির অংশাবতার এবং নারায়ণের প্রধান সহায়ক, প্রাণসম প্রিয় ও অভেদ আত্মা, তাঁহার তপস্যাসম্ভূত ও তত্তুল্য প্রভাব সম্পন্ন। বেদে তাঁহারা 'কৃষ্ণদ্বয়' এবং উভয়েই দেবতাদিগের পরমবন্ধু ও বিপদত্রাতা এবং ধরাদেবীর মঙ্গলের নিমিত্ত প্রতিযুগেই অবতার। ইঁহারা চতুর্দশলোকের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা—এমন কি, লোকত্রয়, দেব, ঋষি ও সমুদয় ভূতগণ তাঁহাদের অনুগত ও প্রভাবে অবস্থিত। তবে নর ঋষি হইতে নারায়ণ, গরীয়ান। এই প্রসঙ্গে পুস্তকের প্রথম ভাগ, ৮-৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। নিম্নে

পাদটীকা * হইতে ভবিষ্যতে বিবেকানন্দের আরও তিনটি দেহে অবতরণের বিষয় জানা যায়। মানবরূপে দেখিয়া, বা তাঁহাদের কার্য্যাদি সমালোচনা করিয়া, তাঁহাদের পরিচয় লাভ অসম্ভব। বিশ্ব-মঙ্গলময় কার্যই তাঁহাদের পরিচয় দান করে। স্বামী বিবেকানন্দ নিতান্ত নিরীহ লোক ছিলেন না, কিন্তু সেই তেজের ভিতর দিয়াও অশেষ অসাধারণ নানা সৎ-গুণ প্রদর্শন করিতেন। মহা-পুরুষদিগের হৃদয় প্রায় বজ্রাপেক্ষা কঠিন ও কুসুমাপেক্ষা কোমল উপাদানে গঠিত হইতে দেখা যায়।

*পাদটীকা—এই নিবেদন লিখিবার কালে, আমি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ৺অন্নদা-ঠাকুরের 'স্বপ্ন জীবন' নামক পুস্তকের সন্ধান পাইয়া উহার একখণ্ড ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ সালে ক্রয় করিযাছিলাম। উহাতে রামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে স্বপ্নে যে আদ্যামন্দির (দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠ) স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিম্নলিখিতরূপ বলিয়াছিলেন। বর্তমান কালে, উক্ত মন্দিরের ইমারতি কায সমাপ্ত, কিন্তু আদেশানুযায়ী উহার বহির্ভাগে মর্মরের আচ্ছাদন কার্য সমাপনে বিলম্ব আছে। ঐ মন্দিরে, এখন কোন কোন পূজা অনুষ্ঠিত হয় শুনিয়াছি, কিন্তু বোধ হয় আদেশানুযায়ী সর্ব কায হয় না।

"আমার দেহরক্ষার বত্রিশ বছর পরে আমি আবার বাংলায় যাচ্ছি। সেই দেহরক্ষার সত্তর বছর পরে (* কাগজের দাগে চিহ্নিত স্থান 'চ') আমি আবার যাব; এইভাবে আমি আরও এগারবার অবতীর্ণ হব। যতদিন না বাংলায় জনসাধারণ আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন আমায় এইভাবে যেতে হবে। তুমি কিছু ভেবো না; আমার আটজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তোমার মন্দিরের কাজে জীবনপাত করবে; আর আমার গত বারের আঠার জন ভক্ত একশ আঠাশটি শরীর চালনা করে তোমার কাজের সহায়তা করতে আবার বাংলায় যাচ্ছে। বিবেকানন্দ একটি ব্রাহ্মণ, একটি কায়স্থ ও একটি বৈদ্য এই তিন জনের ভিতর দিয়ে কাজ করবে; এই ভাবে আঠারজন ভক্ত কাজ করবে। তোমার ভয় কি?...তুমি কখনও মনে স্থান দিও না যে এই কাজ জীবভাব প্রসূত। দেবতার ইচ্ছায় এই কাজ সম্পন্ন হবে; জীব নিমিত্ত মাত্র। বাংলাকে অবিশ্বাস করো না—বাংলা এখনও আধ্যাত্মিকতা হারায়নি—এখনও ভগবানকে বাদ দিয়ে নিজে ভগবান সাজবার দুর্বুদ্ধি বাংলায় হয় নি—এখনও বাংলার আকাশে বাতাসে ভক্তির বীজ ছড়ান রয়েছে—এই বাংলাই এখন এমন পবিত্র কাজে সাড়া দেবার মত একমাত্র দেশ—বাংলায় এখনও দাতা ভক্তের অভাব হয় নি। তবে তুমি নিমিত্ত কারণ বলে, তোমাকেও নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। তোমার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যাবে। তোমার তাতে স্থির ধীর অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

বুদ্ধ আমার বাকি জীবনের কায যে উক্ত বিশদ সমষ্টি পুঞ্জের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ, তাহা আমি মনে করি (৬১ পর্ব দ্রষ্টব্য)। রামকৃষ্ণের উক্ত স্বপ্ন-বাণী হইতে বেশ বুঝা যায় যে মাত্র বাংলা দেশের জনসাধারণকে কেবল আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে (মুক্তিদান বহুদূরের কথা!) কত রকম কূট আয়োজন প্রয়োজন (* কাগজের দাগে চিহ্নিত স্থান 'ছ')। অথচ, আজকাল দেশে এক বদ্ধমূল মিথ্যা ধারণা শুনা যায় যে—ঋষি ৺অরবিন্দ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন যে সমগ্র মানবজাতি অদূর ভবিষ্যতে মুক্তিলাভ করিবে এবং তিনি সুদীর্ঘকালব্যাপী নিজ সাধনার দ্বারা ঐ পথ মানবের নিমিত্ত খুলিয়া বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিষয়টি পাঠকদিগের বিচারসাপেক্ষ (প্রথম খণ্ডের প্রথম নিবেদন ও ২৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মানব তো কীটাদপি ছার—স্বয়ং হরি বা হর মানবজাতিকে বিনা উপযুক্ত সাধনা মুক্তিদানে অক্ষম! যতদিন বাহ্যবিশ্বে মায়িক অহং-ভাব ও নানাত্ববোধ ততদিন কর্মফল ও তৎ-প্রসূত দেহ অপরিহার্য! ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং অমোঘ!

৪। বিশ্বে সর্ব বাহ্য অভিব্যক্তির আধার 'বিন্দু' (আকার) রূপিণী সগুণ মহামায়া 'নাদ' (শব্দব্রহ্ম) রূপী হরি বা হর সহ অভেদ ও একাত্মক। নির্গুণ মূলপ্রকৃতি মহাকালী নিখিল বস্তুর মূলাধার হইলেও, বিশ্বপ্রপঞ্চে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ বিকাশ নাই, অর্থাৎ তিনি প্রপঞ্চাতীতা—অথচ, কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ নহেন এবং নিরাকারা, অবিদ্যারূপা, আনাদ্যনন্ত-রূপিণী পরব্রহ্ম রূপে সিদ্ধা (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৯ অনুচ্ছেদ)। পুরুষের কার্যই প্রকৃতির এবং প্রকৃতির কার্যই পুরুষের। 'নাদ' রূপী হর বা হরি, বোধ বা আত্মা রূপে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশক। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি 'বিন্দু'রূপে সেই চৈতন্যকে সর্ববিধ দৃশ্যাদৃশ্য আকার দিতেছেন—'পিণ্ড'রূপে তাহাদের স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন এবং 'নির্বাণ-কলা' ও 'নির্বাণ-শক্তি' রূপে তাহাদের মুক্তি দিতেছেন। শিব ভিন্ন আত্মা এবং আত্মা ভিন্ন শিব শবোপম এবং আত্মা কস্মিন্‌কালে (উক্ত চারি প্রকারে) শিব সহ বিযুক্ত নহেন—'রামের রমণ ছাড়া কিছু নাহি হয়।' সেই রমণ যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর (শিব) রূপে দ্বিবিধ, তাহা ৪৫ পর্বের ২ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতির অনন্তরূপে বাহ্য বিশ্বে প্রকাশ ও অভিব্যক্তি পুরুষের সাক্ষিস্বরূপতায় (বা শুদ্ধবোধের কর্তৃত্বে) সম্পাদিত হইতেছে। বোধ সর্বত্রই একরূপ (নির্বিকার আত্মময়) এবং অবিদ্যা বা বোধশক্তি সর্বত্রই অনিত্য ও বিভিন্নবিধ হইলেও, নিত্য আত্মা সম্পর্কে যেন একই! এই অসৎ ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে যাহা কিছু প্রতি মুহূর্তে অন্তরে ও বাহিরে অনন্তরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, সবই ব্রহ্মে মিথ্যা অহং-ভাবোত্থিত অনিত্য অবিদ্যা শক্তির বিভূতি! অতএব, ইহা কাল্পনিক বেতালপুরীবৎ—অথচ কালীময়, বা প্রকৃতির রূপ (৫৫ ও ৫৬ পর্ব)—'এ জগতে একাকিনী কালী মাত্র সার, কে দ্বিতীয়া আছে অন্যা কালী ভিন্না আর?' তিনিই নিয়ন্তৃরূপে বিশ্বে সব হইয়া রহিয়াছেন ও নিয়ন্ত্রারূপে সব করিতেছেন। তাঁহার কর্ত্রীত্ব সদাই 'গৌণ'—কখনও 'মুখ্য' নহে—এবং ইহা তিনি নিজ আত্মা ও শক্তি রূপী পুর্যষ্টকের (ভূত, ইন্দ্রিয়—*কাগজের দাগে চিহ্নিত স্থান 'জ'—মন, বুদ্ধি, প্রাণ, বাসনা, কর্ম ও অবিদ্যা) স্পন্দনের দ্বারা সম্পন্ন করেন। তিনিই সর্ববস্তুর সর্ব দেহোপকরণের নিত্য ও অনিত্য (নিমিত্ত) কারণ ও তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী লিঙ্গ দেহস্থ বাসনার তারতম্যে (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ) সর্ববিধ স্পন্দন (প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য) এবং এই ব্যাপারে আব্রহ্মস্তম্বাবধি বাহ্যান্তর বিশ্ব নিয়তিরূপিণী তাঁহার ইচ্ছা অবশে, কলের পুতুলের ন্যায়, সদা পালন করিতেছে এবং কেহ—এমন কি, অবতার-অবতারিণী (*কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান 'ঝ')

সকলও—অণুপরিমাণে স্বাধীন নহেন। সাধারণ দেহধারী জীবের এই জ্ঞান নাই। অহং-ভাব বা দেহাত্মবোধ ক্ষয় করিতে পারিলে (ভক্তি ও/বা জ্ঞানের পথাবলম্বনে) সে, প্রাক্তন বশে প্রাপ্ত প্রেরণাগুলি চরিতার্থ করিয়াও নিষ্ক্রিয় ও জীবন্মুক্ত অব্যয় আত্মা শিব। যে-ব্যক্তি প্রকৃতিরূপিণী নিজ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণাদির সর্ববিধ স্পন্দনকে—অতএব, বিশ্বের সর্ব অভিব্যক্তিকে—প্রকৃতিদেবীর স্পন্দন বুঝিয়া চলিতে পারে যাহার দ্বৈতবোধ নাই এবং সংসার ও ব্রহ্মে সমজ্ঞান, সে বাসনাহীন ও বিশ্বপ্রধান। প্রকৃতিদেবীই বিশ্বরূপী নানা জীবাদি হইয়া সৃষ্ট হন ও সৃষ্টি করেন, পালিত হন ও পালন করেন এবং সংহৃত হন ও সংহার করেন। প্রকৃতি-পুরুষরূপী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গই বিশ্বশক্তি ও বিশ্বাত্মা, যুগলরূপী শক্তি-শিব এবং এই লিঙ্গ মূর্তিই অন্যান্য প্রকৃতি-পুরুষরূপীও বটে (৫ ও ২৬ পর্ব)—রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, সারদারামকৃষ্ণ, ইত্যাদি (অবতরণিকার প্রথম পট)। শিব-শক্তিরূপী অভেদ তাঁহারা সকলেই সারা বিশ্ববস্তুরূপী, মূলপ্রকৃতি আত্মার শক্তি ও অভিব্যক্তি—যিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরে তাঁহাদের জন্মভূমি, জননী ও প্রাণশক্তি। যোগ বিনা মূলপ্রকৃতির সাধনা হয় না, কারণ তিনি পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধযুক্তা। শূন্যাকার চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, বিশ্বে এক-মাত্র বস্তু হইলেও, অবিদ্যা বা অহং-রূপিণী তাঁহার প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কোন বাহ্য অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতে পারেন না, যেমন মাটি বিনা ঘট হয় না। সুতরাং বিশ্বের যে রূপ সদা পরিদৃশ্যমান, তাহা যেন পরাশক্তিরই (পর-ব্রহ্মের নহে) এবং তিনি সর্বশক্তিযুক্তা পঞ্চরূপ ধারণ করত (অভেদ দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী সরস্বতী ও সাবিত্রী। বিশ্বকার্যে অভেদ মহেশ্বর, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও ব্রহ্মার পত্নী এবং সকলেরই সহজ সেব্যা বা অর্চনীয়া। ইঁহাদের সহিত পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। স্ব-স্বরূপতা প্রকাশ তাঁহাদের সাময়িক ইচ্ছা সাপেক্ষ (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৩০ অনুচ্ছেদ)। কিন্তু সাধারণতঃ নিজ বিষয়ে নিয়তির লিপি খণ্ডন তাঁহাদের ইচ্ছার পরপারে। সেই কারণে, দুর্গাদেবীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ, গণেশের মুণ্ডপাত, রাধাদেবীর বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সহিত শতবর্ষব্যাপী বিরহ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর ভারতে পদ্মা ও সরস্বতী নদীরূপে অবতরণ এবং সাবিত্রীদেবীর সত্যবান পত্নী সাবিত্রীরূপে জন্মগ্রহণ। শিব, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি সকলেই রামেচ্ছাময়ী পরাপ্রকৃতির সর্বতোভাবে অধীন এবং তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই বিশ্বকার্যে লিপ্ত। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'অবতারকে চিন্তা করিলেই, ঈশ্বর চিন্তা করা হয়—যেমন কোন ব্যক্তির একটি অঙ্গ স্পর্শনই সর্বাঙ্গ স্পর্শের সমান। আদ্যাশক্তির সাহায্যেই অবতার লীলা। চৈতন্যদেব

ও কৃষ্ণ শক্তি সাধনা করিয়াছিলেন। সমস্তই মা'এর শক্তি এবং সেই শক্তিবলেই অবতারলীলা। তিনি সরকারী লোক—জগদম্বার জমিদারীর যেখানেই যখন কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে, সেইখানেই তাঁহাকে ছুটিতে হইবে।' এই কারণেই, ভেদবুদ্ধিহীন মানব কেবল জগদম্বার (বা অন্য ঈশ্বর মূর্তির) অর্চনায়, সকল দেব ও দেবীর অর্চনার ফল লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মভূত ব্যক্তি বিশ্বকে নিরাকার অদ্বৈত ব্রহ্মময় (কারণ—দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব, মিথ্যা ও ভ্রান্তির পরিণাম—প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১৭ অনুচ্ছেদ ও দশম অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ) এই জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ও চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নাশ করিয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্ম ও আত্মা এতদুভয়ে অভেদ বুদ্ধিই সংসার মুক্তির উপায়।

৫। হরিহরাদি ও তৎপত্নীগণ যখন নির্গুণ (যেমন প্রলয়ে, বা ভক্তের সমাধি দশায়), তখন তাঁহারা মিলিত পরব্রহ্ম ও পরাশক্তি। যখন তাঁহারা সগুণ, তখন তাঁহারা পরাপ্রকৃতিরূপিণী নাদ-বিন্দু-কুণ্ডলিনীশক্তি সহ যুক্ত অখণ্ড অন্তর্যামী বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-প্রাণ ও বিশ্ব-রূপ। যুগলরূপে তাঁহারা বিশ্ব-নিয়ন্তৃ ও স্ব-স্বরূপ বিশ্বের সর্ব স্পন্দন নিয়ন্তা এবং তাঁহাদের নিয়োগ ক্রমেই বা নিয়তির বশে জীবগণ আপন আপন কার্য অবশে করিয়া থাকে—কেহ কখনও স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। নাম, রূপ ও নানা বৈকারিক উপাধি বিশিষ্ট যাহা, তাহাই সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সকলের বিপরীত যাহা, তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম জগদম্বা ও তৎস্বরূপ ঈশ্বর মূর্তি সকল উপাসনার নিমিত্ত উপদিষ্ট। নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম শববৎ নিশ্চল ও অনন্তকাল অক্ষর। তাঁহার উপাসনা নাই এবং তিনি কেবল বোধে অভেদ প্রকৃতি সহ আত্মরূপে যোগীর নিকট প্রতীয়মান হন। নির্গুণ ব্রহ্মের নিত্যানন্দময় অবস্থা হইতে স্বভাবতঃই একটি অবিদ্যা-সম্ভূত, সংসারোন্মেষক, বিকৃত বিকার বা স্পন্দন সমুত্থিত হয়। যাঁহারই উপাধি আছে, যিনি কোন না কোন নামে, বা রূপে, বা গুণে, অপর হইতে ভিন্ন, তিনিই সেই অবস্থা বিশেষের অভিব্যক্তি ও নিয়তিরূপিণী পরাপ্রকৃতির বিকাশ। তিনি নিজে অবিশেষ, অথচ বিশেষের আশ্রয়ীভূত—'প্রধান' নামে বিশ্রুত। এই মাপকাঠিতেই সাকার হরিহরাদি ও তৎপত্নীগণ, অন্য বিষয়ে সর্বময় ও সর্বময়ী হইয়াও, তাঁহার অধীন। শ্রীহরি নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকলেই আত্মার শক্তিবলে বিশ্বে স্ব-স্ব কার্য করেন এবং সর্বতোভাবে তাঁহার অধীন (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ)। মহানির্বাণতন্ত্রে সেই এক কথা, সদাশিব তাঁহার সহিত অভেদ ও মূলপ্রকৃতির অংশ দুর্গাদেবীকে নিম্নলিখিত ভাবে বলিতেছেন—

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু॥

যখন আদ্যাই 'ব্যাপ্তা ত্বং সর্ব্বজগতাং' বা 'প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্ব্বস্য', তখন কোন ঈশ্বর মূর্তির বা জীবের পৃথক বাসনার স্থান কোথা? সবই মাত্র শক্তিলীলা এবং একমাত্র পরাশক্তি চিতিই জীব ও ঈশ্বররূপে বিশ্বমূর্তিতে প্রতিভাত হইতেছেন। তাঁহারই সহিত তুরীয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। সংসারে দৃশ্য রূপ মাত্রেই নশ্বর ও ত্রিগুণময় এবং দৃশ্যগুণ বিশিষ্ট, অথচ নির্গুণ, এমন কোন পদার্থ কখনও হয় নাই, বা হইবে না। অতএব, সাকার হরিহরাদি সগুণ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এক ধারণা আছে যে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতা দেবতা সাকার শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ, নিরাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি এবং উহা হইতে সাকার কৃষ্ণ উৎপন্ন নহেন। উহা কেমন করিয়া সম্ভব? কৃষ্ণ নিজেই একদা অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে সচ্চিদানন্দ বৃক্ষে, কালজাম বৃক্ষে কালজামের ন্যায়, থোলো থোলো কৃষ্ণরূপ কালজাম ঝুলিতেছে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, যখন অনন্ত চিদাকাশে ত্রসরেণুর ন্যায় অনন্তকোটি সোপকরণ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান এবং সকল ব্রহ্মাণ্ড কিঞ্চিৎ তারতম্য যুক্ত হইলেও মোটামুটিভাবে একই নিয়মে প্রতিভাত (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২৭ অনুচ্ছেদ)। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন, কিন্তু এক মহেশ্বর পরব্রহ্ম চেতন সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার অহং-ভাবে সমষ্টি স্পন্দন শক্তিই পরাপ্রকৃতি মহাকালী এবং, অল্প কথায়, বিশ্বে যাহা কিছু, কল্পিত অবিদ্যার স্ফুরণ, বা বিশ্ববস্তু সমূহের অবিদ্যা বিনা অন্য কোন স্বভাব নাই। পবন ও পবনস্পন্দন যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ ব্রহ্ম ও মায়া সদা অভেদ, কদাচ পৃথক্ নহেন। ব্রহ্মেচ্ছার (মহাকালীর) স্পন্দন শক্তিই মিথ্যা মরীচিকাবৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত চিদাকাশে প্রকট করিতেছে। যোগবাশিষ্ঠে আছে—'যদি কল্পান্তাবধি উর্ধ্ব হইতে অতি বেগে শিলা পতিত হয়, পতগরাজ গরুড় অতি বেগে আকাশে একদিকে ধাবিত হয় এবং অতি বেগশালী ঝড় প্রবাহিত হয়, তথাপি ব্রহ্মাকাশের সীমা নির্ণয় হয় না।' এই সব নানা কারণে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সাকার কৃষ্ণ নিরাকার মহেশ্বর চিন্মাত্র হইতে স্বপ্রকৃতি মহাকালীর বশে উৎপন্ন এবং তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতা দেবতা নহেন—অর্থাৎ, নির্গুণ ব্রহ্মই সর্ব মূলাধার। এই জ্ঞান আদৌ নিষ্ঠায় হানিকারক নহে—কারণ, যিনি জ্ঞানীর চিন্মাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই যোগীর পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান হরি-হর-অবতারাদি। বস্তুতঃ, একটীও জীব বা ভগবান নাই—সবই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম এবং ব্যবহার দশাতেও সকলেই আত্ম-স্বরূপে পাষাণবৎ

নিশ্চেষ্ট—অর্থাৎ, এই বিশ্ব আকাশবৎ মূর্তিহীন (১৯ পর্ব)। হরি-হরাদির চিদাত্মা হইতে যে পৃথক্ প্রতীতি, তাহা মরীচিকার ন্যায় ভ্রম মাত্র। সারা বিশ্বই অনিত্য ও অবিদ্যার বিলাস এবং মায়াময়, কারণ উহা ব্রহ্মে মিথ্যা, বা কাল্পনিক অহং-ভাব হইতে উদ্ভুত। ব্রহ্মে অনন্ত বিশ্ব সৃজনোপযুক্ত কল্পনা থাকিলেও কোন ভাবাভাব বাস্তবিক নাই বলিয়া, ব্রহ্মাকাশ বস্তুতঃ মায়ার দ্বারা আবরিত হয় না, যেমন আকাশে ধূম থাকিলেও উহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না। বায়ুর স্পন্দন যেমন বায়ু-রূপেই অবস্থিত, তেমন চিদাকাশে স্পন্দনোদ্ভূত বিশ্ব অপরিণত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত। কিন্তু, অনদ্যানন্ত অবিদ্যা বা মায়া স্বভাবতঃ উহাতে আবির্ভূত হইয়া, উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্নাকার দান করে। যখন শূন্যাকার ব্রহ্মে অহং-ভাব মিথ্যা, তখন তদুদ্ভূত বিশ্ব যে মিথ্যা হইবে, ইহা সহজে অনুমেয়—কেননা, শূন্য ভিত্তিতে পর্বতাদির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু, যেমন স্বপ্নাবস্থায় প্রবল কল্পনায় স্বপ্নদৃষ্ট নগরাদি ও তৎ-সংশ্লিষ্ট সমস্তই পূর্ণ সত্য, তেমন যতদিন মানবে কাল্পনিক অহং-ভাব (বা বাসনা) বা দেহ ও বাহ্যবিশ্বের সত্যতা বোধ, ততদিন এই বিশ্বও ষোড়শ কলায় সত্য এবং সেই ভাবে জগৎ-সত্তাও পূর্ণ সত্য। এই কারণে, শাস্ত্রে আছে যে, বিশ্ব অসৎ, সদসৎ ও সদসৎ হইতে ভিন্ন। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বাস্তবিক না থাকিলেও, কাল্পনিক মন হইতে বাসনাকারে উৎপন্ন হইতেছে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম মিথ্যা বস্তু উৎপন্ন করিয়া ভয়োৎপাদক, সেইরূপ দেহাদি পদার্থ সমূহ অবস্তু হইয়াও মৃত্যু পর্যন্ত সকলেরই ভয় উৎপন্ন করে এবং দেহধারী অবতারেরও উহা হইতে অব্যাহতি নাই। যে-ব্যক্তি মায়াসাগরের মূল চিৎ-জড়ের ঐক্য স্থাপক মনকে কোন উপায়ে নাশ করিতে সক্ষম, সে নির্বাসনা ও নির্ভয় হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ মায়াসাগরের জল, কর্মেন্দ্রিয়গণ উহার তরঙ্গ এবং রূপ-রসাদি বিষয়পঞ্চক উহার আবর্ত। গর্ভবাস-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু, ইত্যাদি পঞ্চবিধ দুঃখে মায়াসাগর অতি বেগশালী এবং অবিদ্যা, দ্বেষ, অনুরাগ, লোভ ও মোহে পূর্ণ বলিয়া উহা বিশেষ দুঃখদায়িনী। অজ্ঞানোদ্ভূত বাসনাত্বই জীবব্রহ্মের কাল্পনিক দেহ, অন্য কিছুই নহে। জীব-বাসনাকে চরিতার্থ ও ফল দানের নিমিত্তই অনন্ত বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ চিদাকাশে প্রতিভাত। এই বিশ্বের ব্রহ্ম ও অজ্ঞান (মূলপ্রকৃতি) উভয় উপাদান। উপাধিস্বরূপ কারণ দেহ বা অজ্ঞান নাশে জীব শিবত্ব লাভ করে। হৃদয়স্থিত কামনা লোপও শিবত্ব।

৬। **মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।**
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মসাধকগণ 'জগৎ মিথ্যা' এই বেদান্তোক্ত-তত্ত্ব সঠিক অবলম্বন করত মনকে নির্বিষয় করিয়া সংসার-মুক্ত হন। 'ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপাত্মক জগৎ

মিথ্যা '—ইহাই তাঁহাদের বিচারের চরম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত তাঁহাদের পুরুষকার বলে কার্যে পরিণত করিয়া মনের নির্বিষয়ত্ব লাভ করিতে হয় এবং যখন প্রাক্তন বশে জগতে নানা কঠোর অবস্থায় তাঁহারা নিপতিত হন, তখন উহাদিগকে সত্য ভাবিয়া তাঁহারা নির্বিকার ভাবে আদৌ বিচলিত হন না। নিজ ব্রহ্মস্বরূপে যথেষ্ট অবস্থিতি, সর্ববিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে হেয়োপাদেয় ভাব বর্জন এবং কোন বৈধী ভোগ বিষয়ে নিরোধ (বা স্থৈর্য লাভে যত্ন) ত্যাগ—ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র। বৈধ কোন বিষয় নিরোধে চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি মূঢ় ও দেহাত্মবোধী (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৪ (২) অনুচ্ছেদ) এবং তন্নিমিত্ত তাঁহাদের নিরোধ সহজে সিদ্ধ হয় না। ধীর মহাত্মা সর্বদা আত্মজ্ঞানোদ্ভূত স্বাভাবিক নিরোধ প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি বাহ্য জগতের চিন্তাদি বিষয়ে সর্বদা ব্যাপারহীন হইয়া অবস্থিত এবং সর্ববিধ ইন্দ্রিয় কার্যাদিতে প্রাক্তন বশে রত থাকিলেও, তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের বলে সমভাবে বাসনা বিরহিত অবস্থায় রাখেন। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৪০ (২) অনুচ্ছেদ ও চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। বৈরাগ্যের শেষ সীমায় কোন ভোগ্য পদার্থে স্পৃহা থাকে না, সবই যেন মিথ্যা হইয়া যায় এবং চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া আর উদয় হয় না। নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার চরম অবস্থায় এইরূপ বৈরাগ্যই (বা জগৎকে মিথ্যা বোধই) প্রয়োজন, কারণ ভাব-রাজ্যে কোনরূপ ত্রুটি বা অসামঞ্জস্য ফল হানিকর। সারাবিশ্বই চিদাকাশ, ঈদৃশ ভাবনায় আর ভ্রান্তি থাকে না (৭০ পর্ব)। এই ভাব সঠিক লাভ হইলে, ভোগ্য বিষয়ে আর আস্থা থাকে না (* কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান 'এ') এবং বিতৃষ্ণা উদয় হইতে থাকে—ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্। বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য ও ব্রহ্মস্বরূপ বোধ পরস্পরের সহায়ক এবং ইহাদের চরম সীমাই মোক্ষ—বা চিন্মাত্রতায় বিশ্রাম। পাখীর বাসা পুড়ে গেলে, সে আকাশই আশ্রয় করে! কিন্তু, সাধারণ সংসারীর নানামুখী কার্যদশায় ও চির অভ্যাসবশে বৈরাগ্যময় দেহ হীনতা অবস্থা লাভ অতি কঠিন। এই প্রসঙ্গে, ট পর্বের ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। এই জন্যই বোধ হয় গীতায় (১২-২ ও ৫) শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্মসাধন অপেক্ষা সগুণ ব্রহ্মসাধনকে উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়াছেন। দেবী ভাগবতে ভগবতীও এক কথা বলিতেছেন। এই মার্গে, উক্তরূপ পুরুষকার বলে বৈরাগ্য না থাকিলেও, নিজেকে ও বিশ্বকে সদা কালীরূপে (বা অভেদ বুদ্ধিতে অন্য কোন ঈশ্বর মূর্তি-রূপে) চিন্তা করত তাঁহাকেই বিশ্বের সর্ববিধ সর্বকালীন স্পন্দন অর্পণ করণীয়। ইহাতে 'জগৎ মিথ্যা' বোধ না থাকিলেও, জ্ঞানের শেষ সীমায় উপগত হওয়া যায়—যাহার দ্বারা, দেহাদি জড় পদার্থে আর অহং-ভাব উদয় হয় না।

এইরূপ করিতে পারিলে, আত্মা ও দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণাদি ও তাহাদের সর্বৈব মায়িক বিকার ঈশ্বরার্পিত হয় (বা ঈশ্বরের কার্য) বলিয়া, আর ফল প্রসব করে না, মনের নির্বিষয়ত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদি গোচর সমস্ত বিষয়েই স্বেচ্ছাচারিতা লাভ হয় (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২২ অনুচ্ছেদ)। কারণ—

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং ত্বং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥

ইহাই প্রকৃতিদেবী কালীকে সর্বাত্মোপহার এবং তাঁহার সাধনার শেষ সীমা, বা প্রেমভক্তি লাভ। অহং-বুদ্ধিই মন, বা বাসনা, বা আসক্তি, বা নানাত্বজ্ঞান। যেমন আলোক ও অন্ধকারের তারতম্যে দিবারাত্র, সেইরূপ সুখ-দুঃখই মায়া স্বভাবে অন্বিত কর্মবৃক্ষ সকল দেহেরই অবস্থা। অজ্ঞের চিত্ত ও বাসনাই সার। এই জন্য তাহার ক্রিয়া বন্ধনের হেতু। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত ও বাসনা, জ্ঞান প্রভাবে ঈশ্বর-স্পন্দন রূপে গৃহীত বলিয়া, নাই। সুতরাং, ক্রিয়া তাঁহার নিকট বন্ধন হীন। এই বিষয়-রঞ্জন বা তাহার অভাব, বন্ধন বা মুক্তির হেতু। যেমন নদীতে সূর্য চঞ্চল হন না, প্রতিবিম্ব সূর্যই চঞ্চল হন এবং ইহা মিথ্যা, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী নিজে নিষ্ক্রিয় এবং তাঁহার দেহের পঞ্চকোষ-স্বরূপ দর্পণে পতিত আত্ম প্রতিবিম্বই চঞ্চল হয় যাহা বাস্তবিক মিথ্যা। পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানীর সকল প্রকার কার্যদশাতেও, আর সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে না— কারণ সে নিষ্ক্রিয় (৫৬ পর্ব)। যদিও প্রারব্ধ কর্ম ও কর্মের ফলভোগ দেহে অনিবার্য, তথাপিও সে নিজ সংসার-লিপ্ত নহে। এই ভোগের কালে, সে 'জীবন্মুক্ত' এবং কিয়ৎকাল পরে ভোগ ক্ষয় ও কর্মপাশ ছিন্ন হইলে, মুক্ত হয় (৬০ পর্ব)। যাহারা আত্মজ্ঞানহীন ও যাহাদের চিত্ত বিষয়াকৃষ্ট ও ভোগবাসনায় পূর্ণ, তাহারাও যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য সর্ব বস্তু (পান, আহার, বিহারাদি) ভক্তিবলে জগদম্বাকে নিবেদনান্তে ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদেরও মায়ের পূজা সম্পন্ন হয় এবং মন প্রবৃত্তির মার্গ হইতে নিবৃত্তির মার্গে ধায়। ২২শে চৈত্র, ১৩২১ সালের রামনবমীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠ প্রবর্তক ৺অন্নদাঠাকুরকে জগদম্বা স্বপ্নে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"আমি যে শাস্ত্রবিহিত মতেই পূজা পেতে চাই, তা নয়। 'মা খাও, মা পর,' ইত্যাদিরূপ প্রাণের ভাষায় সকল বস্তু আমায় নিবেদন করে ব্যবহার করলেও আমার পূজা হবে; সরল প্রাণের প্রার্থনাই আমার উপাসনা।" প্রেমভক্তি লাভ হইলে, বিশ্বে আত্মা বা ঈশ্বরই সদা ও সর্বত্র দর্শন, শ্রবণ ও চিন্তনাদির বিষয় হন—' যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা ইষ্ট স্ফুরে।' অতএব—প্রেমিক, প্রেম ও প্রেমময় বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ভগবান অভেদ

হইয়া যান ও সাধক একটি প্রেমের পিণ্ডে পরিণত হইয়া থাকেন। যাহার প্রেমলাভ হইয়াছে, তাহার ঈশ্বর লাভও হইয়াছে। অদ্বৈতভাব, সাধনার শেষ কথা এবং ঈশ্বর প্রেমের চরম সীমায় এই ভাব সাধকের জীবনে স্বতঃই সমাগত হয় এবং তাহাকে প্রেমোন্মাদ করে। তখন জগদম্বা বা ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অন্য কিছুই থাকে না এবং প্রেমিক তাঁহাকে সর্বভূতে ভাবনা করিয়া কায়মনোবাক্যে যথাসম্ভব তদ্রূপ আচরণের দ্বারা সর্বোচ্চ সাধনা (গীতা, ৭-১৯) সম্পন্ন করেন। অদ্বৈত জ্ঞানে সেই জন্মেই মুক্তি হয়। দ্বৈতজ্ঞানী সাধক যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগিকুলে ব্রাহ্মণরূপে পূর্বসংস্কার সহ জন্মগ্রহণ করেন। গুরু বা পরমাত্মীয় ভাবে ঈশ্বর সাধনাও সেই জন্মে মুক্তি দান করে (চ, ছ ও ন পর্ব)। মহানির্বাণতন্ত্রে শিব দুর্গাকে—' **ত্বমসি ব্রহ্মমহিষী** ', এই ভাবে—বলিতেছেন—

যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ ॥

ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে যে, অদ্বৈত জ্ঞানী বিশ্বকে মিথ্যা, বা দৃশ্যহীন চিদাকাশ ভাবে চিন্তা করিয়া যে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, প্রেমিক আদ্যা প্রকৃতিদেবীর সাধক উঁহাকে অখণ্ডাত্মভাবে তিনি, বা তাঁহার স্পন্দন বা লীলা ভাবে চিন্তা করিয়া একই ফল লাভ করেন। উক্ত ভাবদ্বয়কে সমন্বয় করিয়া আরও উচ্চ স্তরে হইতে গেলে (৭৫ পর্ব) বুঝিতে হইবে যে, অন্তরে যাহা নিরাকার নির্ব্যাপার বিশ্বব্যাপী চিদাকাশ, বাহিরে তাহাই অনন্ত শক্তিরূপিণী (শিব-সহ যুক্ত—প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ) কালীর স্পন্দন—যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের চরম সীমায় মরীচিকাবৎ মিথ্যাই হইয়া দাঁড়ায়। মায়াবঞ্চিত মানব বিশ্বে নানাত্ব দর্শন করে —' **মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।**' বর্তমান কালে আমার উক্ত জ্ঞানভাব অপেক্ষা প্রেমভাবকেই প্রাধান্য দিতে হইবে (৪, ১৯ ২৩, ২৪, ৫৮, ৬৫ ও ৭১ পর্ব) এবং ব্রহ্মজ্ঞান ' গৌণ'ভাবে থাকিবে (৭, ৩৭ ৭০ ও ৭৭ পর্ব)।

৭। স্থির সাগর ও চঞ্চল সাগর যথাক্রমে ব্রহ্ম ও আত্মার সহিত উপমেয়। যেমন স্পন্দিত সাগরে জল, সেইরূপ চিদাকাশরূপী এই বিশ্ব মূলপ্রকৃতি—স্পন্দবতী বাসনাত্মক, চেত্যোন্মুখী চিৎ, বা মহাচিতি (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ)। যেমন স্থির ও স্পন্দিত সাগরের জলে, সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে, কোন ভেদ নাই (সবই জল), সেইরূপ চিদাকাশরূপী নির্গুণ ব্রহ্ম (রাম), সগুণ মূলপ্রকৃতি (শ্রী) ও জীব অভেদ—অর্থাৎ, জীবই অভেদ (* **কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান ' ট '**) নির্গুণ ও/বা সগুণ ব্রহ্ম (ব্রহ্ম ও/বা কালী)। যেমন স্পন্দিত সাগরের অন্তরস্থ সমষ্টি শক্তিবলে, সাগরের নিত্য পরিবর্তনশীল

সর্ববিধ বাহ্য অভিব্যক্তি ও জলকণাগুলি সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সর্ববিধ নিজ শক্তিহীন. সেইরূপ চিদাকাশরূপিণী প্রপঞ্চাতীতা চিতির আভ্যন্তরিক অবিদ্যা শক্তিবলেই এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি বাহ্য বিশ্ব এবং বিশ্ব বস্তুসমূহ সর্ববিধ নিজ শক্তিহীন। যেমন স্পন্দিত সাগরের দ্বিবিধ সমষ্টি বাহ্য শক্তি (জলস্পন্দন ও তদোদ্ভূত নানাবিধ অনিত্য আকৃতি), সেইরূপ অবিদ্যারূপিণী মহাচিতির দ্বিবিধ সমষ্টি বাহ্য শক্তি—পুরুষ (হরি-হরাদি) ও প্রকৃতি (রাধা-দুর্গাদি)। যেমন স্পন্দিত সাগর এই দ্বিবিধ সমষ্টি বাহ্য শক্তির লীলা মাত্র, সেইরূপে এই বিশ্বও পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাভূমি এবং এখানে যাহা কিছু সবই পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যষ্টি রূপে বর্তমান (গীতা : ১৩-২৬)। বিশ্বে একমাত্র মহাচিতিই নানাবিধ অহং-ভাবের দ্বারা অনন্ত বস্তু রূপে অবশে রূপায়িত, বা সবই অবিদ্যারূপিণী কালীময়। যেমন স্পন্দিত সাগরের জলকণাগুলির অবশে অনন্তবিধ পরিণতি, সেইরূপ বিশ্ববস্তু সমূহেরও অবশে অনন্তবিধ নিয়তি। যেমন জল হইতে তরঙ্গকে পৃথক্ করা যায় না, সেইরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টি বিশ্বকে চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করা অসম্ভব। মহাচিতিই ঈশ্বর ও জীবের নিয়তির মূলে, অথচ নিজে পরব্রহ্মরূপেই সিদ্ধা। যেমন ব্যষ্টি তরঙ্গগুলির নানাবিধ বিকার সাময়িক কারণে বুদ্বুদ, ফেন, ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বিশ্বে পুরুষ-প্রকৃতিরূপী ব্যষ্টি মানবের সর্ব-বিধ দেহেন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি কর্মফলরূপেই পুরুষ ও প্রকৃতিভাবে উৎপন্ন হইতেছে। সাগরে জলস্পন্দের ন্যায়, মানব স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইতেছে. স্বভাবতঃ লক্ষ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে এবং স্বভাবতঃ মুক্তি লাভ করিতেছে। বিশ্বে সবই স্বভাব সিদ্ধ এবং অবিদ্যাবশে 'হরগৌরির রাসলীলা' হইতে জাত হইয়া হরগৌরিময়—'রামের রমণ ছাড়া কিছু নাহি হয়।' এই রাসলীলা হইতেই রসনামায় জীব তাহার নানাবিধ দেহোপকরণ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিতেছে। অতএব, প্রকৃতি ও পুরুষ তাহার প্রেমময়ী মাতা ও প্রেমময় পিতা। অনাসক্তি সহ বৈধ বাসনা ভোগ দোষের নয়, যদি অহঙ্কার ত্যাগ করত বিশ্বপিতা ও মাতাকে সর্বার্পণ বুদ্ধি সে অবলম্বন করে। এই বিশ্ব চিৎ হইতে অভিন্ন—কেননা, সমস্তই (আমিত্ব, তুমিত্ব. দেশ, কাল, দেহ, কর্ম, বাসনা, অবিদ্যা, ইত্যাদি) একমাত্র শূন্যাকার চিৎ। স্পন্দবতী চিৎ (চিতি) অনুভূতির দ্বারা বস্তুর প্রকাশ এবং জীবের উৎপত্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের বিষয়ভোগ শক্তি-দান করিতেছেন। বিশ্বে যাহা কিছু সবই শিব (বা হরি) ময়, ও/বা দুর্গা (বা রাধা) ময়। যুগলরূপী তাঁহারা দুই হইয়াও এক এবং এক হইয়াও দুই—কারণ, দুর্গায় (রাধায়) চৈতন্যাংশই শিব (হরি) এবং শিবের (হরির) শক্ত্যংশই দুর্গা

(রাধা)। জীবহৃদয়ে তাঁহারা দ্বিভাবে বর্তমান—নিয়ন্তৃ (ব্যষ্টিরূপে) এবং নিয়ন্তা (সমষ্টিরূপে)। তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ কার্য কখনও 'মুখ্য' নহে—সদাই 'গৌণ'—এবং পঞ্চবিংশতি 'তত্ত্ব' বা 'গণ' দ্বারা সাধিত হয়। ইহারা ত্রিগুণাত্মক ও নিখিল কারণ-কার্যাদি স্বরূপ—ভূম্যাদি পাঁচটি ভূত, রসাদি পাঁচটি বিষয়, কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, মনাদি চারিটি অন্তরেন্দ্রিয় ও কাল (ব্রহ্মবিক্রম)। ইহারাই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। যে-ব্যক্তি হৃদয়দেশে কোন ঈশ্বর বা ঈশ্বরী মূর্তিকে নিজ আত্মায় যে সম্পূর্ণ অভেদ ভাবে স্থিত চিন্তা করে (৭৮ পর্ব) এবং (অহং-কার ত্যাগ করত) তিনিই যে মহাকালী বা ব্রহ্ম এই ভাবে ভাবুক হয়. তাহার সর্ববিধ দেহ-মনাদির স্পন্দন তাঁহা-দিগকেই অর্পিত হয়, কোন কর্মে ফল উৎপন্ন হয় না এবং সে পরমেশ্বরত্ব লাভ করে (গীতা, ১৮-৫৫)। 'আমি নিখিল পদার্থ হইতেই ভিন্ন,' এই ভাবই নির্গুণ ব্রহ্মভাব এবং 'আমি এই অখিল বিশ্ব ও আমি ভিন্ন আর কিছু নাই', এই ভাবই সগুণ ব্রহ্ম (কালী) ভাব। (জ্ঞান ও জ্ঞানমিশ্রা প্রেম) এই দুইয়ের এক ভাবকে দৃঢ় অবলম্বনে, 'জীবন্মুক্তি' লাভ হয় এবং ইহারাই সঠিক মুক্তির সাধন—যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থসেবা ও ব্রত বেদাধ্যয়ন যাহা নহে। জ্ঞান, ভক্তির মুখাপেক্ষা এবং গুরুভক্ত প্রত্যহ আত্মবিচার পরায়ণ ব্যক্তি অশীতি প্রাজাপত্য ব্রতের ফলভাগী।

৮। শিবলিঙ্গই যে সমস্ত পুরুষ ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ অভেদ যুগলমূর্তির (শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ-রাধা, রাম-সীতা, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, ইত্যাদি) প্রতীক, তাহা ৫ ও ২৬ পর্বে আলোচিত হইয়াছে (অবতরণিকার প্রথম পটও দ্রষ্টব্য)। পুস্তকের প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়ের ১২-১৪ অনুচ্ছেদেও ঐ বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সারদেশ্বরী যে দুর্গা ও রাধা সহ অভেদ, তাহা এই পুস্তকের ট ও ণ পর্ব বেশ প্রকটিত করিয়াছে। অতএব, রামকৃষ্ণেই হরিহরের সমন্বয়। জ্ঞানের দ্বারা এই তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণোক্ত একটি কাহিনী হরি-হরের একত্বকে বিশেষ গূঢ় ও ঘনিষ্ঠাকার দান করিয়াছে। কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য বলিয়া নিম্নে লিখিত হইল—

হরি-হর স্বরূপ (এই নিবেদনের পূর্বে স্থাপিত পট দ্রষ্টব্য) গণেশ জন্মের পর, একদা শ্রীহরি তাঁহাকে দেখিতে অন্যান্য দেবতার সহিত কৈলাসে আসিয়া-ছিলেন। সেই সময় দুর্গাদেবী দেখিলেন যে, সেই পীতবাস চতুর্ভুজরূপ হইতে ক্ষণে ক্ষণে পঞ্চমুখ ত্রিলোচন হররূপ প্রকাশ হইতেছে। উহাতে তিনি বিমোহিতা হইয়া বিষ্ণুকে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন শঙ্কর দুর্গাকে বলিলেন—

সর্বব্যাপী বিশ্ব আত্মা দেব নারায়ণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপী নিত্য নিরঞ্জন॥
তাঁহা হ'তে তিন দেহ হয়েছে সৃজন।
বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥
আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু এই তিনে এক হয়।
মূর্তি মাত্র ভিন্ন দেবি জানিবে নিশ্চয়॥
আদ্যাশক্তি প্রকৃতি যে তুমি হৈমবতী।
তোমা হ'তে জন্মিয়াছে সে পঞ্চ প্রকৃতি॥
রাধা আদি করি পঞ্চ প্রধানা রমণী॥
তুমিই তাহার মূল ওগো স্বরূপিণী॥
আমার জীবন তুমি মম প্রিয়ধন।
বিষ্ণুকে আমার বাক্যে কর আলিঙ্গন॥
বিষ্ণুতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাই।
অন্যথা না কর ইথে কহি তব ঠাঁই॥
শিবানী কহিল প্রভু তোমার বচনে।
বিষ্ণুকে রতি দিব অন্য এক জনমে॥ ...

প্রতিজ্ঞা রক্ষণ হেতু দেবী হৈমবতী।
জন্মেছিলেন দ্বাপরে হয়ে জাম্বুবতী॥

জাম্বুবতী রামবরে চিরজীবি ভল্লুক জাম্বুবানের কন্যা। জাম্বুবান হিমালয় অংশে জাত বলিয়া, দুর্গাদেবী দ্বাপরে তাঁহার কন্যারূপেই জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের এক প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বেশ প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এমন অভেদ যে একজনের অপরকে পত্নীদানও দোষণীয় নহে। সর্বাত্মা ও সর্বদেহরূপী ইঁহারা কোন কোন কল্পে নিজ নিজ সৃষ্টি-স্থিতি লয় কার্যের বিনিময় করেন (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ)। এক কল্পে যিনি বিষ্ণু, অন্য কল্পে তিনি ব্রহ্মা, বা মহেশ্বর। অতএব ইঁহাদের ভিতর ভেদ কোথা? সাধারণ মানব নিজ অজ্ঞতায় বা গোঁড়ামির বশে এই তত্ত্ব বুঝে না, বা উড়াইয়া দেয় ও জগতে ঘোর অনিষ্টাচরণ করে। নিজ ইষ্টদেবে একনিষ্ঠা সিদ্ধিদায়ক বটে, কিন্তু তৎসম অন্য দেবতাতে হেয় ভাব বিশেষ অনিষ্টকর। ভেদজ্ঞান অপেক্ষা অধিক মূঢ়ত নাই। অখিল ব্রহ্মাণ্ডে অণু-পরমাণু হইতে হরিহরাদি অবধি সবই কালী বা ব্রহ্মময়। ইহাই সমজ্ঞান ও বাসনাহীনত্ব এবং সমজ্ঞানী অপেক্ষা প্রধান জীব বিশ্বে নাই। মানব যখন দ্বন্দ্বহীন ও স্বর্ণ-লৌহ সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, জয়-পরাজয়, শত্রু-মিত্র, প্রিয়-অপ্রিয়, ইত্যাদি সমভাবে গ্রহণ করে, তখন মনোনাশে দেহ সম্বন্ধহীন হইয়া ব্রহ্মৈকত্য লাভে সমর্থ হয়। নানাত্ব বোধই সংসার তরুর মূল। সাময়িক স্বভাব বশে যে ভেদ নানা জীবে দৃষ্ট হয় তাহাও মিথ্যা, বা প্রকৃতি-পুরুষরূপী বলিয়া হেয়োপাদেয় ভাবে চিন্তনীয় নহে। অবশ্য, ব্যবহার দশায় এই সংসারে দুর্জন ও সর্প ব্যাঘ্রাদি বর্জনীয়, কারণ চিত্ত লইয়াই এই বিরাট সংসার। শিব ব্যাসকে বলিতেছেন—

হরি-হর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

তন্ত্রমতই কলির প্রধান মত। সেই তন্ত্রে আছে—

> যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ।
> এতত্ত্রয়মেকমেব ন পৃথক্ ভাবয়েৎ সুধীঃ॥
> যঃ পৃথক্ ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ।
> স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপুরুষঃ॥

এই প্রসঙ্গে, এই পুস্তকের মুখপত্রগুলির পরে জগৎ-গুরু অভেদ হরি-হরের পট দ্রষ্টব্য। ঈশ্বর সকলেই অভেদ হইলেও, সদ্‌গুরূপদিষ্ট ইষ্টকে ভজনই ভগবান লাভের উপায়—কেননা, যে ক্ষেত্রে যে বীজ সুফল দিবে, গুরু সেই ক্ষেত্রে সেই বীজই দিয়া থাকেন (চ ও ৬ পর্ব)। মাতার মহাগুরু পিতা। অথচ, মাতা, পিতার পরিচয় দান করেন বলিয়া, তিনি পিতার অগ্রে প্রণম্য। একই কারণে, গুরু ইষ্টের পরিচয় দাতা বলিয়া, তাঁহার পূজা অগ্রে না করিয়া ইষ্টপূজা বিফল। বাস্তবিক, মানুষ হইলেও, সদ্‌গুরুই ইষ্ট এবং ইষ্টই গুরুরূপে ভক্তের পরিত্রাতা। শাস্ত্রমতে, গুরু-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার কৃপায় লব্ধ ঐশ্বর্য্য (ইন্দ্রিয়গণের ও মনের সংযম) লাভ করত, হৃদয়ে ইষ্ট দর্শনে সমর্থ হন (৭৮ পর্ব)।

৯। উপরে ২ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, পুস্তকের এই দ্বিতীয় ভাগখানি (চতুর্থ খণ্ডটি) ১০৮ পর্ব সমন্বিত জগদম্বার কৃপা-কাহিনী। সেই কৃপার পাত্র ও পাত্রী আমি, পত্নী শরদিন্দু ও আমাদের কন্যা গীতা। সূচিপত্রের পরে আমাদের পট স্থাপিত হইয়াছে। কাহিনীগুলির ভিতর ৮৩টি নিজ, ২০টি শরদিন্দু ও ৫টি গীতা সংক্রান্ত। পার্থক্য নির্দেশের জন্য, সংখ্যানুক্রমিক পর্বগুলি নিজ, ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমিক পর্বগুলি শরদিন্দু ও স্বরবর্ণানুক্রমিক পর্বগুলি গীতা সম্বন্ধীয় এবং সকল পর্বগুলিই ক্রমিক সূত্রে গ্রথিত। মোটামুটি গণনায়, কাহিনীগুলির ৩৫টি জাগ্রতাবস্থার, ৬টি তন্দ্রাবস্থার এবং অবশিষ্টগুলি (কয়টি মিশ্রিত) স্বপ্নাবস্থার ঘটনা। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় উপলব্ধিই 'জাগৎ' অবস্থা। যখন শ্রমবশতঃ তাহারা স্বকীয় কর্মে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়, তখন 'সুষুপ্তি' অবস্থা। ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলেও, মন যদি বিষয় সেবন করে, তখন 'স্বপ্ন' অবস্থা। সুষুপ্তিতে মনের বিলয়ে জগৎ-জ্ঞান থাকে না—অতএব, মনের নাশই জগতের নাশ। অপুনরাবৃত্তি স্বভাব নিত্য সুষুপ্তিই 'মুক্তি।' জীবের শ্রবণাদি বিশেষ জ্ঞান সমূহ ইন্দ্রিয়োদ্ভূত—অর্থাৎ, উহারা স্বকীয় কর্ম পৃথক্‌রূপেই সম্পাদন করিতেছে। অবিদ্যা প্রভাবে এই কর্ম জীবাত্মায় আরোপ হয় এবং এই ভ্রান্তিই জীবত্ব এবং উহার নাশই 'সন্ন্যাস' বা মুক্তি মার্গ। সারা বিশ্বের সার্বকালীন সর্ববিধ অভিব্যক্তিই যে শিব-শক্তিময়, তাহা বুঝিয়া চলিতে পারিলে, আর জীবত্ব থাকে না। স্বপ্ন অবস্থায় অনুভূত আত্মরূপী গুরু, দেবতা

ও ঈশ্বরাদি সংক্রান্ত ঘটনাগুলি যে মানবের কর্মফলের বীজরূপে প্রকাশ হয়, তাহা প্রথম খণ্ডের ৯-১২ অনুচ্ছেদে, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২-৪৩ অনুচ্ছেদে ও চতুর্থ খণ্ডের ১ পর্বের ২ অনুচ্ছেদে, ১৮ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদে ও অন্যান্য নানাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় দশাতে চিতিই স্ব-ভাবানুযায়ী নানা দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, ইত্যাদিবিধ পদার্থরূপে প্রতিভাত হন। আমাদের জীবাত্মাই সর্বময়, সর্ব বিশ্বোপকরণ সম্পন্ন এবং ঈশ্বর, ও/বা মহাকালী, ও/বা পরব্রহ্ম ও উহার ভিতরেই সারা বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। স্বপ্নানুভূত পদার্থাদি চিদাকাশ মাত্র এবং উহাতে ছায়ারূপে আকারাদি থাকিলেও ভৌতিক কিছুই থাকে না, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় অনুভূত পদার্থ সমূহ চিদাকাশ সত্তায় ভৌতিক। পূর্ব জন্মের ঘনীভূত বাসনার ফলে যেমন আত্মা চিদাকাশে ভৌতিক দেহ নির্মাণ করত তাহা অনুভব করেন, তেমন আত্মাই (কোন কোন ব্যক্তির নিকট কৃপাবশতঃ) কর্মফলরূপে চিদাকাশে ঘটনাদি প্রকাশ করত স্বপ্ন অনুভব করেন। এই প্রকৃতি পুরুষময় বিশ্বে, সবই বোধের ভিত্তিতে অহং-ভাবে বোধ শক্তির লীলা। অতএব, স্বপ্ন সকলও দ্রষ্টার আত্মস্থ শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনির মিলনে শিব-শক্তিরূপেই প্রকটিত হয়। প্রতীতির স্থিরত্ব ও অস্থিরত্ব ব্যতীত স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশার বিশেষ ভেদ নাই—অর্থাৎ, যাহাতে ইহা স্থির তাহা জাগ্রৎ, আর যাহাতে ইহা অস্থির তাহা স্বপ্ন। স্বপ্নে চিদাকাশের প্রকাশ যে প্রকার, ঈশ্বর দর্শনাদিও তদনুরূপ—কেননা, সমস্ত ঈশ্বর মূর্তিই আমাদের আত্মার সহিত অভেদ চিদাকাশ এবং আমাদের আত্মস্থ। কিন্তু, স্বপ্ন অপেক্ষা ঈশ্বরাদি দর্শনে প্রভেদ এই যে স্বপ্নে যে সকল স্বার্থসিদ্ধি ও লাভালাভাদি ঘটে, তাহাদের অধিকাংশ অলীক। কিন্তু ঈশ্বরাদি দর্শনের ফলে যে-সকল সংবাদ, বরপ্রাপ্তি, ইত্যাদি ঘটে, তাহা পূর্ণ সত্তারূপে অনুভূত হইয়া যথার্থ অঙ্কুরাকার ধারণ করে এবং বাহ্য প্রকৃতিকে তদ্‌ভাবেই অল্পাধিক অণুপ্রাণিত করত যথাকালে ফল প্রসব করে (১৮ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। অনেক স্বপ্ন কাল্পনিক চিন্তা মাত্র এবং ফলপ্রদ নহে। বায়ু-পিত্ত-কফাক্রান্ত এবং মল-মূত্রের বেগ থাকিতেও নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্বপ্ন সকল নিষ্ফল। এই সব ক্ষেত্রে, দিবাভাগের কোন কোন চিন্তা নিদ্রায় স্বপ্নরূপে প্রকাশ হয় মাত্র। যখন স্বপ্নে আমাদের আত্মস্থ কোন ঈশ্বর বা গুরু মূর্তি প্রকটিত হইয়া কিছু বলেন, বা উপদেশ দেন, বা মন্ত্র দান ও কোনরূপ কৃপা প্রকাশ করেন, তাহারা আমাদের কর্মফলেই অঙ্কুররূপে প্রাপ্তি হইল বুঝিতে হইবে—কারণ, আত্মা (ঈশ্বর) আমাদের কর্ম, কর্মফল ও কর্মফল দাতা। এই

পুস্তকে আলোচিত বহু স্বপ্নই কর্মফলরূপে ছোট-বড় অঙ্কুরশ্রেণীর এবং অমোঘ (৫৩ পর্ব)। পরে তাহাদের বৃক্ষরূপ ধারণ অনিবার্য। শিবাবতার শ্রীহনুমান আমার স্বাপ্ন (৭ পর্ব) ব্রহ্মমন্ত্রদাতা গুরুদেব (এই নিবেদনের পরে তাঁহার পট দ্রষ্টব্য)। তাঁহার প্রদত্ত বীজরূপী মন্ত্রই এই বৃক্ষরূপী পুস্তক—যেমন রামকৃষ্ণ দেবের ভাব (উপরে ২ অনুচ্ছেদ)। সেই জন্যই বোধ হয় রামকৃষ্ণের ভিন্নাধার সারদাদেবী আমার স্বাপ্ন শিক্ষাদাতৃ গুরুদেবী (৬ পর্ব)। বিদ্যা, বুদ্ধি, বেদাধ্যয়ন, ইত্যাদির দ্বারা আত্মা (ঈশ্বর) লভ্য নহেন। যাঁহাকে আত্মা বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন, বা নিজ স্বরূপ তাঁহাকে নানাভাবে প্রকাশ করেন। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই ভালবাসিবেন এবং সেই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে তাঁহাকে লাভ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। শাস্ত্রার্থের বা গুরুবাক্যের দ্বারা আত্মবোধ লাভ হয় না। নিজ বোধই আত্মার স্বভাব। বিষয়টি এই স্থলে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কারণ, যাঁহারা পর্বগুলি বিশেষ বিচার বুদ্ধিসহ পাঠ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিষয়ক নানা গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া যে ধন্য হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। 'আমার মা' সারদেশ্বরী বলিয়াছেন—'ঈশ্বরের ভালবাসা না পেলে, তাঁর জন্য প্রাণ কেন ব্যাকুল হবে—এ কথা সত্য বটে! তবে সে ভালবাসা লাভ তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। হাওয়ার সঙ্গে কে ভাব করতে পারে—একথাও ঠিক!' পুস্তকে আলোচিত ঘটনাগুলিতে ত্রিপুরাদেবী তিনি আমাদিগকে যে ভালবাসা দেখাইয়াছেন, তাহা দেবতাদিগেরও অতি দুর্লভ! ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—'কেবল মাত্র ভগবানে অসূয়াশূন্য, তপস্বী, ভক্ত ও শুশ্রূষু ব্যক্তিই ব্রহ্মবিষয়ক (গীতা) শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী। মানবদিগের ভিতর গীতা ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা, ভগবানের অধিক প্রিয় এই জগতে কেহ নাই বা হইবেও না।' ব্রহ্মশাস্ত্র এত দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য যে, সাধারণের সুবিধার্থে অনেক তত্ত্ব এই পুস্তকের নানা পর্বে দ্বিরুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছি ও এইরূপে মোটামুটিভাবে প্রতি পর্বকে সম্পূর্ণ আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে ঈশ্বরের কার্যই আমার গুরুসেবা এবং শাস্ত্রমতে কোন তপস্যাই ইহার অধিক ফলদায়ী নহে।

১০। পূর্ববর্তী তিন খণ্ডের ন্যায়, এই চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপির নানা প্রয়োজনীয় স্থান অবশে নানারূপে চিহ্নিত হইয়াছে। সেই সকল স্থানগুলি (*) চিহ্ন ও ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকে সেইরূপ ১৩৭টি চিহ্ন আছে। কোন কোন স্থানে একাধিক চিহ্নও দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন চিহ্ন যে গণনায় বাদ যায় নাই এমন নহে। এই নিবেদনে আরও ১৬টি চিহ্ন প্রকাশিত

হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মুদ্রিত প্রুফগুলির নানাস্থান অবশে নানারূপে চিহ্নিত হইয়াছে। সেই স্থানগুলি বিনা সংখ্যায় মাত্র (+) চিহ্নের দ্বারা পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সব চিহ্নগুলির তাৎপর্য প্রথম দুই খণ্ডের নিবেদনে ও প্রথম তিন খণ্ডের পাদটীকাগুলিতে আলোচনা হইয়াছে। বিষয়টি এই চতুর্থ খণ্ডের (৩) পাদটীকায় ও ২১ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। তৎপ্রসঙ্গে, চিহ্নিত স্থান (৪৬), (৫০), (৫১) ও (৯৪) দ্রষ্টব্য। অল্পকথায়—চিহ্নগুলিতে, জগদম্বার আমার লিখন যে সত্য তাহার প্রকাশন এবং তিনিই যে পুস্তকগুলির যথার্থ কর্ত্রী তাহার প্রদর্শন [চিহ্নিত স্থান। (৫১)]। স্থূলদেহহীন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও স্থূলদেহী ব্যষ্টি জীবের যন্ত্র ও ব্যাপার বিনা বিশ্বে কোন কার্যই হয় না। বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত এবং বাক্য ব্রহ্মময় এই পুস্তকগুলি তাঁহার যথার্থ প্রতিমা রূপেই প্রকটিত হইয়াছে (উপরে ২ অনুচ্ছেদ) এবং সেই প্রতিমা অবতরণিকার প্রথম পট—কারণ, উহাতে প্রকাশিত সব ঈশ্বর মূর্তির বিষয় এই চারিখানি পুস্তকে যেন অবশেই আমি আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারাই জ্যোতির্ময় চিদাকাশরূপে (৪ পর্ব) বিশ্বে প্রতি অণু পরমাণুর চিৎ-স্বরূপ। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মুখপত্রের চিহ্নগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেই অবশে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং উহারা প্রথমোক্ত দুইটি খণ্ডের নূতন চিহ্ন নহে। ঐ সকল চিহ্নে অভিন্ন কৃষ্ণ ও দুর্গা আমাকে আশীষ ও কৃপা বর্ষণ করিয়া পুস্তকের সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্বে কোন ধর্ম পুস্তক লিখন ব্যাপারে এইরূপ অত্যাদ্ভুত ঘটনা যে হইয়াছিল তাহা আমি শুনি নাই। এই প্রসঙ্গে, এই পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিত হরিদাসবাবুকে জগদম্বার প্রথম স্বপ্নে প্রকাশিত তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে মত দ্রষ্টব্য। অল্পকথায়, তিনি এই পুস্তকগুলিকে উচ্চাসন দান করিয়াছেন [পরিশিষ্ট, পাদটীকা (১৩)]। এই নিবেদনের পরে পুস্তকগুলির বিষয়ে একটি স্বেচ্ছায় প্রদত্ত মন্তব্য সন্নিবেশিত হইল। সমালোচক মহাশয় খ্যাতনামা জ্যোতির্বিৎ ও তান্ত্রিক আচার্য। তাঁহার সহিত আমি প্রায় তিন বৎসর পরিচিত। তিনি আগন্তুকের হস্তরেখাদি বা জন্মলগ্নাদি বিচার না করিয়াই সঠিক গণনায় সক্ষম এবং, প্রতিবেশী হইলেও তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অদ্ভুতভাবে ঘটিয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনেই তিনি আমাকে যে সব আধ্যাত্মিক উপাধি-মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও পরপারে।

১১। প্রথম খণ্ডের ২৪ (১) অনুচ্ছেদে ও চতুর্থ খণ্ডের স্থানে স্থানে (আ, ১২, ১৪, ১৫, ২১, ৬৪, ৬৮, ৭২, ইত্যাদি পর্ব), আমার সাংসারিক কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্ভোগের বিষয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সামান্য আভাস দিয়াছি।

না দিবার উপায় ছিল না—কারণ, জগদম্বা সেই সব বৈষয়িক স্বপ্ন প্রকটিত করিয়া ও হরিদাসবাবুকে পাঁচটি স্বপ্ন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) দিয়া আমাকে উঁহাদের বিষয় কিছু লিখাইতে বাধ্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, ৫৬ পর্ব দ্রষ্টব্য, যেখানে সারদা আমাকে বলিয়াছেন—'আমি সব করিতেছি, তুমি কিছু কর না'—অর্থাৎ, তিনি আমার নিষ্ক্রিয়, বা ভয়হীন জীবন্মুক্ত, স্বরূপতা প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। আমার স্বোপার্জিত ধনে নির্মিত বাড়ীতে ও তৎ-দ্বারা অভেদভাবে অতি সুখে ও সম্ভ্রমে প্রতিপালিত কোন কোন নিকট আত্মীয় যে আমার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে ও সম্পত্তির অযথা লোভে তান্ত্রিকদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া প্রবল তান্ত্রিক ক্রিয়া করিয়াছিল (তান্ত্রিকগণ যাহা হরিদাসবাবুর নিকট স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহাদের ঐ সম্বন্ধীয় একখানি পত্র আমি তাঁহার নিকট দেখিয়াছি) ও আমার ভবন প্রবেশদ্বারে তান্ত্রিক 'শল্য' স্থাপন করিয়াছিল (যাহা আমি জগদম্বার পরম কৃপায় প্রদর্শিত, গোময়পাতের চিহ্ন দেখিয়া স্বহস্তে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম) এবং যে সকল ব্যাপার আমার সর্বজ্ঞ, 'ব্রহ্মজ্ঞ,' 'বাড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ও ধার্মিক', পিতার বিদেশে বহু কষ্টার্জিত অযুত অযুত টাকা টেলিগ্রামে আদায় করিয়া নানা অমার্জনীয় মিথ্যা অজুহাতে অপব্যয়ে বিলাতফেরতা (কিন্তু অর্থোপার্জনে সম্পূর্ণ বিমুখ) ও 'জন্মদাতা' নানা দায়গ্রস্ত পিতার পেনশনার্জিত এই ঘোর দুর্দিনের অর্থে পুত্র সকলের সারা জীবন অতি সুখে অতিবাহিত করিবার নূতন বিশ্বরীতি প্রবর্তক ও ভ্রাতাদিগের নিকট গুরুরূপে প্রচারক, জ্যেষ্ঠপুত্র (তাহার নিরীহ, ক্রীতদাস অপেক্ষাও অধীন—এবং তাহার সহিত কুসঙ্গ-ফলের জলন্ত প্রতীক—কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সবলে দলে টানিয়া) অবিশ্বাস করত, নিজ সম্পূর্ণ অধিকারের বাহিরে ও আমার উপরন্তু গৃহকর্তা সাজিয়া অযথা কর্তৃত্বাভিমানে (ব্রহ্মজ্ঞের স্বধর্ম !) সংসারে ঘোর অশান্তি বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল (৬৪ পর্ব)—তাহা জগদম্বার ইচ্ছা-প্রসূত সকলের কর্মফল বটে। কিন্তু, শাস্ত্রমতে মাতা-পিতার প্রতিকূলাচারী পুত্র, পুত্রের মধ্যে গণ্য নহে এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী, হিতকারী, বিনীত পুত্রই যথার্থ পুত্র। তান্ত্রিক ক্রিয়াকারী আত্মীয়গণ (কুমতলবে ও কুপরামর্শে বড় তান্ত্রিকগুরুর শিষ্য ও শিষ্যা) যথাকালে যে উহার বিষময় কুফল ভোগ করিবে তাহা পরিশিষ্টে লিখিত জগদম্বার তৃতীয় স্বপ্নটি প্রকাশ করিয়াছে। জগতে সব ঘটনাই এইরূপ। দেহাত্মবোধযুক্ত কাহারও কোন কর্মফল হইতে অব্যাহতি নাই এবং তাহার অনুমোদনকারী ব্যক্তিও সেই কর্মের অল্পাধিক ফলভাগী। কর্মফলদাত্রী জগদম্বা মানবকে সাপ হইয়া কাটেন, রোজা হইয়া ঝাড়েন, হাকিম হইয়া ফাঁসির হুকুম দেন, আর

পেয়াদা হইয়া যারেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এই সব কার্য তিনি 'গৌণ' রূপে তাঁহার পূর্যষ্টকের বা পঞ্চবিংশতিগণের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। তাঁহাকে যে সর্বময়ীরূপে সর্বার্পণ করিতে সক্ষম, তাহাকে বেতালে পা ফেলিতে হয় না এবং সে ধন্য হইয়া যায়। ভক্তকে অজানিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ও তাহার রোগশয্যায় সান্ত্বনা দানের নিমিত্ত জগদম্বার ব্যাকুলতার আভাস পুস্তকের পরিশিষ্টে এবং গ, ৪৬ ও ৪৮ পর্বে বেশ বুঝা যাইবে। কালী ও দুর্গা নামের মাহাত্ম্য গ ও ৮২ পর্ব প্রকট করিয়াছে। আমার সহিত নানা মূর্তিতে জগদম্বার প্রেম-সম্বন্ধের বিষয় নানা পর্বে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিশিষ্টের চতুর্থ ও পঞ্চম স্বপ্নগুলি উহা সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রকাশ করিয়াছে। পঞ্চম স্বপ্নে, হরিদাসবাবু যে দুইটি রমণীকে দুর্গাদেবীর সঙ্গিনীরূপে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার দুইটি পরলোকগতা পত্নী (প্রিয়ংবদা ও মনোরমা) ভিন্ন অন্যা কে হইবেন? এই প্রসঙ্গে, ২ পর্বে চিহ্নিত স্থান (১) ও ৩ পর্বে ১ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। আমি যখন জীবদ্দশায় মায়ের চিরসঙ্গী, তখন আমার পত্নীগণ দেহান্তে কেন তাঁহার চরণ কমলে স্থান না পাইবেন? আমাদের শাস্ত্রীয় বিশেষ বিধি এই যে, স্ত্রী স্বামীর পুণ্যকর্মের অর্ধেক ফলভাগী এবং স্বামী স্ত্রীর পাপকর্মের অর্ধেক ফলভাগী, কিন্তু পরস্পরের অনুমোদনে কৃত শুভাশুভ কর্মের উভয়েই ফলভাগী। আমার মাতা-পিতা ও অন্যান্য কোন কোন আত্মীয়ের পারলৌকিক অবস্থা নানা পর্বে উক্ত হইয়াছে (৫৪, ৫৯, ইত্যাদি পর্ব)। প্রেমভক্ত, বৈষ্ণব ও ব্রহ্মজ্ঞ স্বকুল-উদ্ধারক (অ ও ১১ পর্ব)। স্বয়ং ধাতা ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, অন্য দেবের উপাসনায় অভিলষিত ফললাভ হয় বটে, কিন্তু আত্মার আরাধনায় উহা ইচ্ছাতিরিক্ত প্রাপ্তি হয়। শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী'তে (২৫ অনুচ্ছেদ) আছে যে, ত্রিগুণময়ী দুর্গাদেবীর অর্চনায় ত্রিগুণজনিত দেবত্রয়ও (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র) পূজিত হন এবং তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র পূজার প্রয়োজন হয় না। আত্মরূপে দেবী-পূজক (৪৯ পর্ব) দেবী-সারূপ্য বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি-ভাগী। যথার্থ দেবী-পূজকের সকল কার্যই অর্চনা **যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্**—বাক্য, জপ; অঙ্গুলি-চালন মুদ্রা; গমন, প্রদক্ষিণ; শয়ন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং নিখিল শক্তি-সংযোগে পান-ভোজনাদি নানা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ও লৌকিক-পারমার্থিক কর্মসমূহ সর্বাত্মোপহার। দেবীর কৃপায়, যোগক্রিয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও পরম যোগ-বিভূতি লাভ হয় (৫৫ পর্ব)—কারণ, শাস্ত্রে আছে (যথা; 'আনন্দলহরী,' ২১ অনুচ্ছেদ) যে যখন সর্ব সম্প্রদায়েরই ইষ্টদেবী ও চন্দ্রসূর্যাগ্নিরূপিণী তড়িল্লেখাবৎ কামকলা [কাম=কামনীয়; কলা=চন্দ্র ও অগ্নিস্বরূপা] কুলকুণ্ডলিনী (পরব্রহ্ম-

স্বরূপা ত্রিপুরাদেবী) ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রারে বিষয় চিন্তাহীন যোগাবস্থায় দৃষ্টা হন. তখন অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ সুখানুভব হয় এবং সেই অবস্থায় যে তথায় শিব-শক্তির মিলনদর্শী, সে যোগী, কৌল (তান্ত্রিক বা বামাচারী) ও সেব্য।

১২। পিতা ও মাতার নামে উৎসর্গ করিয়া, আমি যে নিজ বর্তমান শারীরিক ও আর্থিক অবস্থায় সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রেমভক্তিপ্রদ বিগ্রহগুলি মন্দিরে বহু অর্থব্যয়ে স্থাপন করিতে পারিব, তাহা এক্ষণে অসম্ভব মনে হইলেও, উহারা যে যথাকালে জগদম্বার অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তির বলে এবং যথোপযুক্ত বাহ্য সহায্যে স্থাপিত হইবে, তাহা এই পুস্তকের ৬৩ ও ৪ পর্ব এবং কতকগুলি স্থান বেশ (* কালির দাগে চিহ্নিত স্থান 'ঠ') নির্দেশ করিতেছে (ছ, জ, ই, ২১, ২৫ পর্ব, ৮০ ও ৯৪ চিহ্নিত স্থান এবং চতুর্থ স্বপ্ন, পরিশিষ্ট)। উক্ত বাসনা বা আশা আমি বহু কালাবধি (* কালির দাগে দুইটি চিহ্নিত স্থান 'ড') পোষণ করিয়াছি এবং উহাকে জগদম্বার প্রেরণা মনে করিয়া ব্রহ্মভাবে বুঝি। অতএব (* কালির দাগে চিহ্নিত স্থান 'ঢ'), উহা নিষ্ফল হইবার কথা নহে (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২২ অনুচ্ছেদ)। তাহা ছাড়া, ভগবান বিশেষ ভাবে (* কালির দাগে চিহ্নিত স্থান 'ণ') ভক্তের শুভ বাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম (*কালির দাগে চিহ্নিত স্থান 'ত') 'ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু'। মন্দির নির্মাণোদ্দেশ্যে, আমি বেলুড় মঠ পার্শ্বস্থ গঙ্গার পূর্বতটের সন্নিকটে, (প্রিমিসেস নং ৩৪৫ ও ৩৪৫।১) বরাহনগরের মহারাজা নন্দকুমার রোডের দক্ষিণ দিকে, সাড়ে দশ কাঠার কিঞ্চিদধিক জমি ক্রয় করিয়াছি। জমিটির দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন দুই খণ্ড সাড়ে আট কাঠার কিঞ্চিদধিক জমি ক্রয়ের চেষ্টাও চলিতেছে। এইরূপে শরদিন্দুকে সারদার স্বপ্ন (জ পর্ব) সামান্য বাহ্য আকার ধারণ করিয়াছে। উপস্থিত এই চতুর্থ খণ্ডটি আমার শেষ পুস্তক মনে করিতেছি বটে, কিন্তু 'মন্দির নির্মাণ ও অর্চনা প্রতিষ্ঠা' বিষয়ক অন্ততঃ আরও একখানি পুস্তক আমাকে যে পরে লিখিতে হইবে তাহা যেন এই পুস্তক-খানির ৮০ পর্ব ছায়ারূপে প্রকাশ করিতেছে। এই বৃদ্ধ ও বাতরোগগ্রস্ত অবস্থায় মন্দির নির্মাণ ও আর একখানি পুস্তক লিখন আমার পক্ষে 'পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন!' জানিনা কতদিনে আমার এই ঘোর কর্মময় জীবনের শেষ হইবে। এই প্রসঙ্গে, ৭৫ ও ৭৭ পর্ব—বিবেকানন্দ ও গুরুদেব প্রকটিত স্বপ্নদ্বয়—দ্রষ্টব্য। তাঁহাদের দ্বারা প্রকটিত এই স্বপ্নগুলি (প্রেমভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ!) এখন আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বল। ১৯০৯ সালে আমার মাতার মৃত্যুর কিছু পূর্বে অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট জগদম্বার একটি স্বপ্ন (অবতরণিকা ২৪ (৪) অনুচ্ছেদ) আমার সিদ্ধিলাভের

আভাস দিয়াছিল। জানিনা, উহা লাভে আর কতদিন বাকি!

১৩। উপরে ১ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, এই পুস্তকের মুদ্রণ পূর্ববর্ষের বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে সুরু হইয়াছিল। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়া ছাপাখানাটি উহার শেষ মুদ্রণের কার্যগুলি মঙ্গলবার, ১৯শে মাঘ ১৩৬০, (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪)—রটন্তী ৺কালীপূজার দিন—অবশেষে আরম্ভ করিল এবং উহা বুধবার, ৫ই ফাল্গুন, পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

১৯শে মাঘ, ১৩৬০;
৬, তারিণীচরণঘোষলেন, কলিকাতা (২)

বিনীত গ্রন্থকার,
যতীন্দ্রনাথঘোষ।

ব্রহ্মার্পণমস্তু।

পুস্তকগুলির বিষয় একটি স্বেচ্ছায়-প্রদত্ত মন্তব্য

(নিবেদনের ১০ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীঠাকুর নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ, অধ্যাপক ও তান্ত্রিকাচার্য মহাশয় কৃত (ডিসেম্বর, ১৯৫৩)।

[মহাকালী আশ্রম; ১।৪ বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন; পাইকপাড়া; কলিকাতা (২)]

'ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি' গ্রন্থখানির প্রণেতা শ্রীযতীন্দ্রনাথঘোষ এম, এ, তিন বৎসর যাবৎ আমার পরিচিত। তিনি একজন সাধক ও উচ্চস্তরের লোক। চারিখণ্ডে রচিত এই তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেমভক্তিপ্রদ পুস্তকখানির প্রকাশে আমি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু সমস্তই মহামায়া অবিদ্যা-শক্তির অভিব্যক্তি। যে-ব্যক্তি অহং-ভাব ত্যাগ করত ঐ তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া কায়মনোবাক্যে মহামায়াকে অর্চনা করিতে পারেন, মহামায়ার প্রসাদে তিনি পরমভক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহাই এই গ্রন্থটীর শিক্ষার বিষয়। জগদম্বার কৃপায় যতীনবাবু এই ভাবকে নূতনরূপে সাজাইয়াছেন। গ্রন্থখানি ধর্মপ্রাণ নরনারীর নিকট সাদরে গৃহীত হইবে আশা করি। চতুর্থ খণ্ডখানি আমি এখনও ভালরূপ পাঠ করিবার অবসর পাই নাই।

সীতা-রাম।

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।
মঙ্গলপরশন রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম॥
শুভ-শান্তিবিধায়ক রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।
বরাভয়দানরত রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম॥

নির্ভয়কর প্রভু রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।
দীনদয়াল প্রভু রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম॥
সো-ই আল্লা সো-ই রাম, পতিতপাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান॥

রাজারাম জয় সীতারাম, পতিতপাবন সীতারাম॥

রাম-হনুমান।

ইতর এক রাম বড়, কি বড় হনুমান,
যিনি রুদ্রাবতার হন, তিনিই প্রভু রাম।

যে যা ব'লে ডাকে, সেই ডাক শুনে একজন,
ধন্য সে, যে ভেদ-জ্ঞান শূন্য, প্রেমে পূর্ণ মন।

সূচিপত্র

ব্রহ্ম ও আত্মাশক্তি—দ্বিতীয় ভাগ—চতুর্থ খণ্ড—বিষয়।

[৫।১ ডি, তারিণীচরণ ঘোষ লেনস্থ বাড়ীর ছাদে গৃহীত

যতীন শরদিন্দু গীতা

ওঁ তৎসৎ

(ওঁ)

ব্রহ্ম ও আদ্যা-শক্তি

দ্বিতীয় ভাগ

(কৃপামৃত)

[চতুর্থ—সংখ্যক পুস্তক]

কৃপামৃত প্রারম্ভ **১ পর্ব**

যতীন—নিবৃত্তি

মোহমুদ্গরাংশ (শঙ্করাচার্য)

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

গান [পাদটীকা (১)]

মন মিছে কেন ভেবে মর!
যেমন ঘটে, তেমনি ঘটুক, তুমি শ্যামা মাকে সদা স্মর।
যাঁর বিধানে বদ্ধ রে মন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
সেই শ্যামা যাহা করবেন বিধান তুমি কি এড়াতে পার?
তুমি জান না মন চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা তাঁর কিঙ্কর,
তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে জীবের জনম মরণ নিরন্তর।
যাহাতে মঙ্গল রবে অনাদি এই চরাচর,
সেই বিধান কি তোমার লাগি ভাঙ্গবেন বসি চিন্তা কর?
বিত্ত-বন্ধু বিয়োগে মন, ভবে কে বিমুক্ত হয়,
যদি মা'র বিধি অমান্য কর, তবে তুমি কাঁদতে পার।
পরের মরার কান্না ছাড়ি, ভাব এখন কখন মর,
এবার তোমার দিন যায় বিফলে, জয় মা বলি সুপথ ধর॥

(১)—এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট সমস্ত গানগুলিই আমার ভাবানুযায়ী সংগৃহীত। সকল গানের রচয়িতার নাম জানা নাই বলিয়া উহা কোথাও লিখিত হইবে না।

বিষয়—প্রথমা পত্নী প্রিয়ংবদার একটি মহিষমুখী, কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণ দানবের দ্বারা বক্ষোপরি আক্রান্ত হইবার স্বপন।

স্থান—শ্বশ্রূমাতার দর্জীপাড়াস্থ বাসা-বাড়ী।

কাল—১৯১৫ সালের শেষ, বা ১৯১৬ সালের প্রথম, ভাগ।

রাত্রে আমার পার্শ্বে প্রথমা পত্নী প্রিয়ংবদা (স্বনামধন্য ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক "Algebra Made Easy" নামক বীজগণিত ও অন্যান্য গণিত পুস্তক প্রণেতা ৺কালীপদবসুর দ্বিতীয়া কন্যা) তিনটি শিশু সন্তান লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যুষে নিদ্রোত্থিত হইবার কালে স্বপনে দেখিলাম যে একটি ভীষণাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, মহিষমুখী দানব প্রিয়ংবদার বক্ষদেশে আরূঢ় হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে উন্মুখ। তখন আমি তাহাকে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম এবং তাহাতে উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাওয়াতে দানব অদৃশ্য হইল। সে পলায়ন করিল, না প্রিয়ংবদার বক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, এই বিষয় কিন্তু আমি সন্দিহান ছিলাম। প্রথমে, জয়ী হইয়াছি এই ভাবটিই প্রবল ছিল। কিন্তু তাহার কিছুদিন পর হইতেই প্রিয়ংবদার স্বাস্থ্য বিশেষ ভঙ্গ হওয়াতে, ঐ ধারণা শিথিল হইয়া মনে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা সজাগ রাখিয়াছিল। অনুভূতিটির সুপক্কতা বশতঃ, এই স্বপ্নটি যেন ঠিক একটি জাগ্রতকালীন্ ঘটনার ন্যায় আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছিল। না স্বপ্ন, না জাগ্রৎ, যেন উহাদের একটা মধ্যবর্ত্তী অবস্থা আমার তখন লাভ হইয়াছিল। ইহার প্রায় দেড় বৎসরান্তে (অগষ্ট ১৯১৭) প্রিয়ংবদা ক্ষয়কাশ রোগে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে আমার স্বপ্নদৃষ্ট উক্ত দানবটি তাঁহার দেহ মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই মহিষাকার দানব কালপুত্র ব্যাধি, বা তাহার দূত (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৬ (১) অনুচ্ছেদ)। স্বপ্নটি প্রত্যুষকালে নিদ্রোত্থিত হইবার পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, উহা শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী অল্পকাল মধ্যেই ফলদায়ী হইয়াছিল (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪৫ অনুচ্ছেদ)। শাস্ত্র বাক্য অভ্রান্ত! নিম্নে তিনটি অনুচ্ছেদে ব্রহ্মতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বপ্নতত্ত্ব মোটামুটিভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবে। উহা আয়ত্ত না করিতে পারিলে, এই পুস্তকখানি সঠিক বোধগম্য হইবে না।

২। এই স্থলে, অবতরণিকা, ৯-১২ অনুচ্ছেদ ও প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪২-৪৩ অনুচ্ছেদ, বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাদের ভিতর স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা আছে। তত্ত্বতঃ, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাদ্বয় পার্থক্যহীন, কারণ উভয়েই একমাত্র নির্ম্মল চিদাকাশ, যাহা হইতে নিখিল বিচিত্র পদার্থের অনুভূতি উদিত হইয়া

যাহাতে বিলীন হয়। উভয় দশাতেই জীবচৈতন্য দৃষ্ট, শ্রুত, স্পৃষ্ট, অনুভূত, ইত্যাদি সকল পদার্থরূপে প্রকাশ হয়, কারণ আত্মজ্যোতিঃ সর্ব্বময় ও সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন এবং জীবাত্মাই ঈশ্বর এবং ইহার ভিতর সারা বিশ্ব অবস্থিত। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থাদি চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। স্বপ্নে আত্মচৈতন্যই নানা রূপ ও ভাবে অন্তরে প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু উহাতে জাগ্রদাবস্থার ন্যায় ভৌতিক ঐ সকল পদার্থ থাকে না। স্বপ্নদশায় ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার অভাবে এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক আদিত্যাদির বাহ্যালোকাভাব বশতঃ আত্মা শুদ্ধাবস্থায় অবস্থিত থাকে। পূর্বজন্মের ঘনীভূত চিত্ত বা বাসনার ফলে যেমন আত্মা চিদাকাশে চিত্রস্বরূপ জড়দেহ নির্মাণ করত তাহা অনুভব করে, তেমন আত্মাই কর্ম ও সংস্কারের ফলস্বরূপ, চিদাকাশে বাসনাময় বিষয়াদি নির্মাণ করিয়া চিত্তে স্বপ্ন অনুভব করে। তৎকালে আত্মজ্যোতিঃ সুখ, দুঃখ, ভয় আনন্দ, প্রভৃতি সবই সৃষ্টি করিয়া চিত্তে অনুভব করে। যে-সকল কাম্যবিষয় জাগ্রদাবস্থায় চিত্তকে উদ্বেলিত করে, সেই সকল বিষয়েই আত্মা গমন করিয়া স্বপ্নে নানারূপে তাহাদের চিত্তাকাশে প্রকট করে। জীবাত্মা ইহ ও পরলোকগামী এবং স্বপ্ন ইহার 'সন্ধ্য' স্থান, যাহা হইতে ইহা কোন কোন ব্যক্তির নিকট উভয়লোক অবলোকন, বা শুভাশুভ কর্মফল প্রকাশ করে। এইরূপে, অনেক স্বপ্ন যথার্থ অবস্থা বা কর্মফল প্রকাশক এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দাতা। যাহাতে অনুভূতি স্থির, তাহাই জাগ্রৎ এবং যাহাতে উহা অস্থির, তাহাই স্বপ্ন অবস্থা। যে-জাগৎদৃষ্ট বস্তুতে অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী, তাহা স্বপ্ন ; আর যে-স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে উহা বহুকালস্থায়ী, তাহাই জাগ্রৎ। অনুভূতির স্থিরত্ব ও অস্থিরত্ব ব্যতীত স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশার বিশেষ ভেদ নাই—অর্থাৎ, যাহাতে ইহা স্থির তাহা জাগ্রৎ, আর যাহাতে ইহা অস্থির তাহা স্বপ্ন। স্বপ্ন দর্শন যে প্রকার, ঈশ্বরাদি দর্শনও তদনুরূপ—কেননা, সমস্ত ঈশ্বর মূর্ত্তিই আমাদের আত্মার সহিত অভেদ এবং আমাদের আত্মস্থ। কিন্তু স্বপ্ন অপেক্ষা ঈশ্বরাদি দর্শনে বিশেষত্ব এই যে, স্বপ্নে যে সকল স্বার্থসিদ্ধি ও লাভালাভাদি ঘটে, তাহার অধিকাংশই অলীক, কিন্তু ঈশ্বরাদি দর্শনে যে সকল সংবাদ, বরপ্রাপ্তি, ইত্যাদি ঘটে, তাহা পূর্ণ সত্যরূপে অনুভূত হইয়া যথার্থ ফলে পরিণত হয়। এইরূপে, সকল স্বপ্ন অর্থহীন নহে এবং অনেক স্বপ্ন যেন একটা অপরিচিত ভাবঘন সমূর্ত ভাষায় ঐহিক বা পারত্রিক ঘটনার বা অবস্থার প্রকৃত জ্ঞাপক, বা প্রকাশক। এই সকল স্বপ্ন মানবের কর্মাকর্ম ও ধর্মাধর্মের ফলস্বরূপে জীবাত্মার দ্বারা চিত্তাকাশে প্রকাশিত হয়—কারণ,

জীবাত্মা সর্বময় অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ এবং উঁহার ভিতরেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে। এই সকল কারণে, আমার আত্মাই উল্লিখিত স্বপ্নদৃষ্ট ভাবঘন মৃত্যুরূপী কালদূত দানবটিকে অন্তরে প্রকাশ করিয়া প্রিয়ংবদার আসন্ন মৃত্যুরূপ আমাদের কর্মফলের সূচনা করিয়াছিল। যেমন মানবের স্বীয় আত্মাই তাহার পিতা, মাতা, পুত্র, পত্নী, মিত্র, শত্রু, ইত্যাদি নানারূপে দুইপক্ষের কর্মফলরূপে নানা শুভাশুভ ভাবে ব্যবহারবান্ হয়, সেইরূপ আমার আত্মস্থ ও আত্মরূপী ঐ দানবটি আমার ও প্রিয়ংবদার উক্ত আসন্ন কর্মফল প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহাই ছিল আমাদের অখণ্ডনীয় নিয়তির লিপি! এই পুস্তকে আলোচিত সব স্বপ্নই এই এক শ্রেণীর। এই প্রসঙ্গে, ১৮ পর্ব্ব, ৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

৩। জীবের ত্রিবিধ (কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল) দেহ, পঞ্চকোষে (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) গঠিত। কারণ দেহ, অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা আনন্দময় কোষ; সূক্ষ্মদেহ, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ এবং স্থূলদেহ অন্নময় কোষ। মৃত্যুতে কেবল স্থূলদেহই ভগ্ন হয়। ত্রিবিধ দেহই সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে দ্বিভাগে বিভক্ত। সমষ্টি কারণ দেহাভিমানী চৈতন্য (বা ব্রহ্ম) ‘ঈশ্বর’ এবং ব্যষ্টি কারণ দেহাভিমানী চৈতন্য ‘প্রাজ্ঞ’ (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৮ অনুচ্ছেদ)। ইহাঁদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি সম্ভূত নয় বলিয়া, ইহাঁরা ‘জ্ঞাতা’—‘দ্রষ্টা’ নহেন। সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহাভিমানী চৈতন্য ‘হিরণ্যগর্ভ’ (বা ‘সূত্রাত্মা’) এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্ম দেহাভিমানী চৈতন্য ‘তৈজস’। ইহাঁদের ইন্দ্রিয়াদি সম্ভূত জ্ঞান আছে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়-সাধ্য বচন, গমন, গ্রহণ, ইত্যাদির সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া, ইহাঁরা ‘দ্রষ্টা’—‘কর্ত্তা’ নহেন। সমষ্টি স্থূল দেহাভিমানী চৈতন্য ‘বিরাট’ এবং ব্যষ্টি স্থূল দেহাভিমানী চৈতন্য ‘বিশ্ব’। ইহাদের কর্মেন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ইহাঁরা ‘কর্ত্তা’। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের কারণ দেহ বা অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন উপাধি থাকে না। তখন, ‘আমি কিছু জানিতে পারি নাই’, এই অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে, যে-জ্ঞান অজ্ঞানেরই ফল। স্বপ্নাবস্থায়, জীবের কারণ ও সূক্ষ্ম দেহ থাকে। তখন, মনের দ্বারা স্বাপ্ন বিষয়ানুভব হয়, যাহা ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অধীন নহে—মানস ব্যাপার, বা মনোবৃত্তিবিশেষ মাত্র। জাগ্রদাবস্থায়, জীবের ত্রিবিধ দেহই থাকে। তখন, বিষয়ানুভব, কর্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি, সমস্তই ইন্দ্রিয় ব্যাপারাধীন। স্বাপ্ন ও জাগ্রদাবস্থায় আত্মাই সব প্রকটিত করেন। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া যথাক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের ধর্ম (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ)। উপাধিভেদে ভিন্নবৎ বোধ হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়—অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ চিদাকাশ।

কোন বস্তুই বিশ্বে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে —'তত্ত্বমসি'। তিনি সর্বময়, এবং তাঁহার অর্চনা সর্বদেবতার অর্চন সম। সেই জন্যই, ব্রহ্মবিৎ **'ওঁ তৎসৎ'** এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম মন্ত্রের বা নামের দ্বারা সর্ব কার্য আরম্ভ করত ইষ্টফল লাভ করেন। এই মন্ত্রমালা নিগম, আগম ও মন্ত্রসমূহের সার এবং ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু, মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১৮ অনুচ্ছেদ)।

৪। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে নানাস্থানে—বিশেষতঃ, দশম অধ্যায়ের ২৬ অনুচ্ছেদে ও দ্বাদশ অধ্যায়ের ২-৩ অনুচ্ছেদে—উক্ত হইয়াছে যে, এই বিশ্বে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কোন বিষয়ে স্বাধীন নহেন এবং তৃণাদিরও সর্ববিধ অভিব্যক্তি ব্রহ্মেচ্ছা নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কালই ব্রহ্ম-বিক্রম নিয়তি ও কর্মফলদাতা পরমাত্মা—যাঁহার ভয়ে বায়ু স্পন্দনশীল, সূর্য উত্তাপদাতা, মেঘ বারিবর্ষী, মৃত্যু সর্বসংহারক ও নদী গতিশীল এবং যাঁহার নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। যেমন দেশ-কাল-পাত্রাদির সদ্ভাব থাকিলেও, কুম্ভকারের ইচ্ছা বিনা প্রতিমা গঠন হয় না, সেইরূপ কল্পান্তকালে ব্রহ্মের ইচ্ছা বিনা বিশ্বের সৃষ্টি ও তৎপরে কোন অভিব্যক্তি হয় না। ব্রহ্মবিক্রমই কাল এবং ব্রহ্মেচ্ছাই কালী! শাস্ত্র বলিতেছেন—

> **না কালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।**
> **কুশাগ্রেনৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালে ন জীবতি॥**
> **যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।**
> **তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥**

(১) যতীন-নিয়তি

সৃষ্টির কল্পনা ব্রহ্মে হইলে বিকাশ,
বিশ্বরূপ লভে সেই চৈত্য চিদাকাশ।
অনন্ত সে ভাব মূলে চিতি আদ্যাশক্তি,
বিশ্বে ব্রহ্মলীলা সব তাঁর অভিব্যক্তি।
সকল ব্যবস্থা যাহে হয় সুসম্পন্ন,
তদ্রূপ ব্রহ্ম-ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন।

ব্রহ্ম কাল, ব্রহ্ম ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,
নানারূপে তাঁরা কিন্তু কালী দেহান্তর।
কালীর শকতি বলে হয়ে বলবান্,
বিশ্বের সমষ্টি কাজে তাঁরা ক্রিয়মাণ।
সচ্চিন্ময় ব্রহ্ম তাঁরা নাহিক মূরতি,
কালীর ইচ্ছায় রূপ, সমষ্টি শকতি।
ব্যষ্টি জীব-ব্রহ্ম নিজে সর্ব শক্তিহীন,
বুঝিতে নারে সে তাহা, মায়ার অধীন।
অহংকারে চিন্তি তারা নিজেকে স্বাধীন,
কর্মফলে হয় বদ্ধ, মৃত্যুর অধীন।
কালবশে ভ্রমে জীব ত্রিলোক মাঝারে,
কালের মহিমা বড় জটিল সংসারে।
কাল বশীভূত হয়ে বিশ্ববাসী জন,
পুণ্যাপুণ্য জ্ঞান সদা হয় বিস্মরণ।
শুভাশুভ ধর্মাধর্ম সব ভুলে যায়,
শাস্ত্রবাক্যে ধর্মপথে কভু নাহি ধায়।
পাতকে মগন হয় নরগণ যবে,
ধর্মভ্রষ্ট মতিভ্রষ্ট হয় তারা তবে।
চারিযুগে বিশ্বে ধর্ম ক্রমে হয় ক্ষয়,
কাল মহিমা এসব নাহিক সংশয়।
জন্মলাভ করে জীব নিজ কর্মফলে,
ভিন্ন যোনি লভে তাহে কালের কৌশলে!
কেহ লভে স্বর্গগতি, কেহ প্রেত হয়,
কেহ যায় কর্মফলে ভীষণ নিরয়।

রোগ-শোক লভে সবে স্বীয় কর্মফলে,
কেহ বা মৃত্যুর মুখে প্রবেশে অকালে।
কালের বিচিত্র গতি বুঝা অতি ভার,
কালের হাতে কাহার নাহিক নিস্তার।
কালবশে শৃগালেতে সিংহ-ব্যাঘ্র মারে,
হয় ক্ষম মূষিকাদি করী মারিবারে।
মক্ষিকা দংশনে মরে বড় জীবগণ,
বায়স ঈগলে মারে কে করে বারণ।
কাল বশে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন,
কালের গতিতে আজ ইংরাজ-পতন।
কালবশে সারা বিশ্ব ক্রমে হবে লয়,
চন্দ্র-সূর্য-ব্রহ্মা আদি দেবতা নিচয়।
নিরাকার ব্রহ্ম মূলে এ বিশ্ব অসার,
সকলি অলীক ইথে, ব্রহ্ম সারাৎসার।
শিব-শক্তিময় ব্রহ্ম বিশ্ব উপাদান,
অটুট বিশ্বাসে বুঝ নাহি কিছু আন।
সব ভাব মূলে ইথে বোধ বিশ্বপিতা,
বাহ্যে স্বপ্নসম হেথা শক্তি বিশ্বমাতা।
পুত্তলিকা নাচে সুখে বাজীকর কলে,
বুঝিতে নারে সে তাহা অহংকার বলে।
ঈশ্বর কৃপায় হ'লে অহংকার নাশ,
জীবের হয় না পুনঃ সংসার বিকাশ।
লভে সে তখন তাঁর রাজীব চরণ,
দেহ-মন-প্রাণ করি তাঁরে সমর্পণ।

না থাকে বুঝিতে বাকি সর্ববিধ জীব,
আদ্যার শকতি বলে সক্রিয় সজীব।
বুঝি বিশ্ব আত্মা আর শক্তির রমণ,
হীন ভেদবুদ্ধি তার না থাকে তখন।
এই ভাবে জ্ঞান-প্রেম বিগলিত নর,
সুদুর্লভ গতি লভে সংসার ভিতর।
মহাজীব ঈশ্বরের ইচ্ছা স্ফূর্তি বিনা,
ব্যষ্টি জীব কোন কাজে সক্ষম হয় না।
চলে কল চালকের সুপক্ক বুদ্ধিতে,
নাহি তার নিজ শক্তি সকাজ সাধিতে।
ব্যষ্টি জীবে ভাল-মন্দ যা কিছু উদয়,
কালের মহিমা উহা নাহিক সংশয়।
উহাই নিয়তি তার, নানা পরিণতি,
যাবৎ না সংসার ক্ষয়ে হয় অব্যাহতি।
তাই প্রয়োজন সব ঈশ্বরে অর্পণ,
কিম্বা 'জগৎ মিথ্যা' বুঝি ব্রহ্মেতে অর্পণ।
নিয়তির বিধি পালে বিশ্বে সব জীব,
নিয়তির বশ কর্ম ফলদাতা শিব।
কৃষ্ণের কারা-জনম, গোকুলে নিবাস,
সীতার হরণ, আর শেষে বনবাস।
এই সব নিয়তির বিধির পূরণ,
হরি-হর নহে ক্ষম করিতে বারণ।
কালের শকতি কালী ব্রহ্মের প্রভাব,
অধীন তাঁহার সব বস্তুর স্বভাব।

দ্বিপরার্ধকাল তাঁর এইরূপে স্থিতি,
ব্রহ্ম ইচ্ছা নিয়মন করণে নিয়তি।
আব্রহ্মস্তম্ব অবধি বিশ্বের স্পন্দন,
নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই রামেচ্ছা পূরণ।
সকল বিষয়ে জীব অধীন আদ্যার,
কিসের গরব তার—কেন অহংকার?
কালীর নিয়মে তুমি সাধু সদাচার,
কালীর নিয়মে আমি চোর কদাচার
জীব যাহা লভে বিশ্বে তাঁরই বিধান,
রামেচ্ছার ফলে ঘটে নাহি হয় আন।

[পাদটীকা (২)]

(২)—সৃষ্টির সর্ব ব্যাপারে ব্রহ্মেচ্ছা বা কালীর ইচ্ছা এক ও অভেদ; তবে কালী (অভেদ ব্রহ্ম) ব্রহ্মেচ্ছা প্রকটন করিয়া নিয়মন করেন। এই ইচ্ছা ব্রহ্মের মনোধর্ম নহে, কারণ তিনি প্রকৃতির বশ নহেন ও নির্লিপ্ত। মহাপ্রলয়ের পরে যখন সমষ্টি জীবের কর্মফলসমূহ পুনরায় জীবসৃষ্টি উন্মুখী হয়, তখন সেই সমষ্টি জীবের অনন্ত প্রাক্তন কর্মের প্রেরণানুসারেই ব্রহ্মের ভিতর জীবসৃষ্টির স্বতঃ স্পন্দন, বা প্রেরণা উদয় হয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কর্মসহ জীব সমূহকে বিশ্বরূপে প্রকট করেন এবং ইহাই সৃষ্টি। এইরূপ ব্যবস্থাই অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এই প্রেরণাকেই বেদে 'এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা' বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ইহা আন্তর ধর্মোৎপন্ন প্রাকৃত ইচ্ছা নহে, কিন্তু সমষ্টি কর্মফলানুসারে স্বতঃ উদ্ভূত প্রেরণা মাত্র। এই প্রেরণা (বা রামেচ্ছা) ব্যতীত কালী বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইত্যাদি সকলেই কিছু করিতে সক্ষম হন না (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২৫ (৩) অনুচ্ছেদ ও দশম অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। এই বহু হইবার ইচ্ছা বা ব্রহ্ম প্রেরণাই কর্মফলরূপে উদ্ভূত হইয়া অনিবার্যরূপে নানাবিধ প্রাকৃত অভিব্যক্তি লাভ করে। সৃষ্টি বিষয়ে পরমাত্মার নির্লিপ্ততা ও নিমিত্ত-কারণতা বাধিত হয় না। বায়ুর আভ্যন্তরিক স্পন্দন যেমন বায়ুরূপেই অবস্থিত, তেমন ব্রহ্মে স্বতঃ প্রেরণোদ্ভূত স্পন্দনের ফল এই বিশ্ব ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত। নিখিল দৃশ্য প্রপঞ্চ সেই পূর্ণ ব্রহ্মে পূর্ণ স্বরূপেই চির-অবস্থিত রহিয়াছে। অতএব, তাহাদের পরস্পরের ভিতর যে সকল অনন্ত সম্বন্ধ কল্পিত হয়, তাহা অসম্ভব। চিন্মাত্রের কেমন করিয়া গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব থাকিবে? চিদাকাশ ব্রহ্মের স্বভাবই এই যে, ইহা বিনা কারণে স্বঃ-কল্পনা বা প্রেরণা বশে বিশ্বরূপে প্রকটিত হয়, যেমন জীবের কেশ, লোম, নখ, ইত্যাদি স্বতঃই উৎপন্ন হয়। সাগরে যেমন একমাত্র জলই স্বভাবতঃ বিবিধরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানময় পরব্রহ্মে একমাত্র জ্ঞানই স্বভাবতঃ কল্পিত অহং-ভাবে অনন্তরূপে স্ফূর্তি পাইতেছে। এই বিশ্ব প্রপঞ্চ মিথ্যা—কারণ জ্ঞানময় ব্রহ্মে কোন ভাবাভাব নাই। কেবল 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানই সত্য। জীবদেহ গন্ধর্বনগরের ন্যায় নিরাকার আকাশ স্বরূপ এবং থাকিয়াও নাই। সৃষ্টির আদি হইতে দৃশ্য কিছু নাই এবং জগত, ভ্রান্তির পরিণাম, বা কল্পনা মাত্র। ইহা ছিল না, এখনও নাই এবং পরেও থাকিবে না। জীব দেহসমষ্টি সারাবিশ্বই পূর্ণ নিরাকার ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং এই ভাবে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ হইতে পারে! বাহ্য দৃশ্যবিশ্ব, ব্রহ্মে মিথ্যা কল্পনা বা বাসনার ফলে, মরুভূমে মরীচিকাবৎ মিথ্যা

নানা যোনি ভ্রমে জীব রামের ইচ্ছায়,
শেষে পায় পরিত্রাণ তাঁহার কৃপায়।
অজানিত নিয়তির বিধান যখন,
যথাবিধি পৌরুষের আছে প্রয়োজন।
দৈব ও পুরুষাকারে সদা দ্বন্দ্ব হয়,
বলবান্ লভে জয় নাহিক সংশয়।
কিন্তু প্রতি পদে হেথা নিয়তি প্রবল,
তাঁহার বিধানে এক পক্ষ হীনবল।
রামের ইচ্ছায় ফিরে চরাচরে সব,
তৃণ আদি স্পন্দে তাহে বুঝে না মানব।
রামেচ্ছা অনন্তরূপে বিশ্ব অভিনেত্রী,
'আমি-তুমি' নাই ইথে রামেচ্ছাই কর্ত্রী।
জীব-জগৎ-চতুর্বিংশতত্ত্ব কালীরূপ,
কালীর শকতি সব বিশ্বের স্বরূপ।
সাধনায় কালিকার এই সব মন্ত্রে,
পরিণত হয় নর তাঁর এক যন্ত্রে।
থাকে না তখন তার পাপ-তাপ ভয়,
তাঁরে করি সর্বার্পণ হয় সে নির্ভয়।
প্রেম ভকতির বলে অধম-যতীন,
জন্ম-মৃত্যু পারে গত—নহে যমাধীন। (১০৮)

অভিব্যক্তি মাত্র—যেমন আকাশে নীলিমা বিভিন্ন কল্পে বিশ্ব মোটামুটি ভাবে একই নিয়মে গঠিত হয় (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১৩, ১৪ ও ২৭ অনুচ্ছেদ)। ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মে সর্ববিধ কল্পনা কৌশলই বর্ত্তমান। তাহা না থাকিলে, বিশ্বের উক্তবিধ সুকৌশলে উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি ও পরিণতি অসম্ভব হইত। সত্য সংকল্পরূপী তিনি যাহা কল্পনা করেন, তাহাই সফল হয় (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ)। অনাদিকাল হইতে ত্রসরেণুর ন্যায় অনন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চসমূহ নিরাকার চিদাকাশে কল্পনার ফল রূপেই গন্ধর্বনগরের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে ও রহিবে। ইহার কারণ নির্ণয় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। বিশ্বের সমস্ত অভিব্যক্তিই কল্পনার ফল মাত্র।

ম্বতীন—তারকেশ্বর

মোহমুদ্গরাংশ (শঙ্করাচার্য)

নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥

চাণক্যশ্লোক

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্ ॥

বিষয়—প্রিয়ংবদার মৃত্যুকালে আমার তারকেশ্বর মন্দিরে ধন্না দিবার সময় শিবঠাকুরের নানাবিধ অলৌকিক এবং অদ্ভুত আচরণ ও কৃপার কাহিনী।

স্থান—তারকেশ্বরের মন্দির।

কাল—১৩ই হইতে ১৭ই অগষ্ট, ১৯১৭।

[প্রিয়ংবদার জন্মদিন, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪;
মৃত্যুদিন, ১৬ই অগষ্ট, ১৯১৭]।

১৯১৫ সালের এপ্রেল মাসে তৃতীয় সন্তান (জ্যেষ্ঠাকন্যা) মায়ারাণীর জন্মের পর, প্রিয়ংবদার একটি পুত্র-সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যাওয়াতে, তিনি বিশেষ রুগ্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। কয়মাস পালামৌ (আমার সহিত) ও সিমলাশৈলে (শ্বশ্রূমাতার সহিত) বায়ু-পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার না হওয়াতে, তাঁহাকে কলিকাতায় সিমলা পল্লীতে শ্বশ্রূমাতার নবনির্মিত ভবনে ('কালীপদ-নিকেতন'—১১, মহেন্দ্রগোস্বামী লেন) রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রোগ ক্রমশঃ ক্ষয়কাশে পরিণত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের অগষ্ট মাসে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে, আমি কর্মস্থান দিল্লী হইতে কয়দিন অবসর লইয়া কলিকাতায় ১১ই তারিখে (শনিবার) প্রাতে পৌঁছিয়া বুঝিলাম যে জীবনের আশা নাই ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। একটা শেষ চেষ্টা করিতে হইবে ভাবিয়া তারকেশ্বর মন্দিরে ধন্না দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম এবং এই প্রস্তাবে প্রিয়ংবদা প্রথমে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াও উৎসাহের সহিত আমাকে শেষে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। শ্বশ্রূমাতার

অনুমতি সহজে পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি সোমবার, ১৩ই অগষ্ট, বেলা আন্দাজ নয় বা দশ ঘটিকায় তারকেশ্বর মন্দিরে পৌঁছিয়াছিলাম। পরলোকগত শ্বশুর মহাশয়ের পুস্তক ব্যবসায়ের এক কর্মচারী আমাকে ঐ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তথায়, শুদ্ধাচারে ও নিরম্বু উপবাসে নাটমন্দিরে অপরাপর ধন্নাদাতাদিগের সহিত একত্রে ঐ লিঙ্গমূর্তির ধ্যানে প্রিয়ংবদার রোগমুক্তির উদ্দেশে কম্বলাসনে চারিদিন (শুক্রবার বেলা নয় বা দশ ঘটিকা পর্যন্ত) অতিবাহিত করিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে শৌচাদি ও তৎপরে স্নানাদির জন্য গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য হইতাম। খাদ্য বা পানীয়ের কোন বালাই না থাকাতে, দ্বিতীয় দিবস হইতে শৌচাদির আবশ্যক হয় নাই—এইরূপ মনে হয়। কেবল সামান্য দুর্বলতা ভিন্ন কোন কষ্ট অনুভব হয় নাই—বরং, দেহ যেন বিশেষ সুস্থ ও লঘু মনে হইত। রবিবার রাত্রভোজনের পর, প্রথম সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় শুক্রবার রাত্র নয় বা দশ ঘটিকায় (প্রায় ১২০ ঘণ্টা পরে) কলিকাতায় প্রিয়ংবদার মৃতদেহের সৎকারান্তে উদরস্থ হইয়াছিল। পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরান্তে, স্মরণ করিয়া যাহা লিখিতেছি তাহা মূলতঃ নির্ভুল হইলেও, সামান্য সামান্য কোন বিষয়ের বিবরণে যে ভুল থাকিবে না তাহা আমি বলিতে অক্ষম।

২। মোটের উপর, সোমবার তারকেশ্বরের কোনও নিদর্শন পাই নাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যা অবধি তিনি কয়বার ছায়া শিবমূর্তিতে যেন আকাশ দেহে (যদিও লিঙ্গমূর্তি আমার ধ্যেয় ছিলেন!) দর্শন দান করিয়া আমায় অনির্বচনীয় ভাবে ও আনন্দে পরিপ্লুত করিতেছিলেন। মূর্তি দণ্ডায়মান, বাঘছাল পরিহিত, একহস্তে লম্বা ত্রিশূলাগ্রে কৃষ্ণবর্ণ একটি পদার্থ গ্রথিত ও মুখে অলৌকিক ও অনির্বচনীয় প্রেম, করুণা এবং সহানুভূতিপূর্ণ ও লজ্জামিশ্রিত ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু ঐদিন রাত্রে (নিদ্রার পূর্বকালাবধি) উক্তরূপ প্রকাশ অধিক ঘন ঘন হইতেছিল। তখন, দুই হস্ত অর্ধজোড় ও কতকগুলি ফুল ও বিল্বপত্র তাহাতে ধারণ করিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইতে ছিলেন এবং ত্রিশূলাগ্রে গ্রথিত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে দেখাইয়া আমায় যেন অন্তরে (বাহিরে থাকিলেও, তিনি অন্তর্যামী) জানাইতেছিলেন যে প্রিয়ংবদা রোগমুক্ত। আমি উক্তরূপ দর্শনাদি লাভে আনন্দাপ্লুতভাবে বিশেষ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে ছিলাম, 'হে দয়াল ঠাকুর! যদি এতই কৃপা করিলে, তাহা হইলে আরও একটু অগ্রসর হইয়া যে ফুল ও বিল্বপত্র আমাকে লইয়া যাইতে হইবে তাহা হস্তে সমর্পণ করুন।' বুঝিতে প্রারি নাই যে তিনি ফুল ও বিল্বপত্রের দ্বারা আমাকে বার বার আশীর্বাদ

করিতেছেন বটে, কিন্তু ঔষধরূপে উহাদিগকে লইয়া যাইতে বলিতেছেন না। এইরূপে মঙ্গলবার রাত্রের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হইলে, আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু মনে এই আশা ছিল যে, হয় তো নিদ্রিতাবস্থায় হস্তে বা শয্যায় শিব-প্রদর্শিত ফুল বিল্বপত্রাদি পাইব। বুধবার প্রাতে যখন ঐ আশা ভগ্ন হইয়াছিল, তখন পুনরায় তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলাম। ঐদিন পূর্বরাত্রের ন্যায় উভয়ের মধ্যে একই ভাবে অভিনয় চলিয়াছিল—তবে, পার্থক্য এই যে, উহা আরও অধিক ঘন। তিনি ফুল-বিল্বপত্রাদি হস্তে দিবেন না, আর আমি উহা হস্তে না পাইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিব না – এই ভাব! আমার আশা হস্তে পাইবই, আর তিনি উহা না করিতে পারিয়া, অধিক প্রেমপূর্ণ, অধিক কাতর, অধিক লজ্জিত ও তাঁহার মুখে অধিক কাঁচুমাচু ভাব প্রকটিত! বার বার যেন অন্তরে ও ইঙ্গিতে বাহিরে বলিতে লাগিলেন, 'তুই ফুল ও বিল্বপত্ররূপী আমার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়া যা। তোর স্ত্রী রোগমুক্ত। ঐ দেখ! আমার ত্রিশূলাগ্রে গ্রথিত পদার্থই তোর স্ত্রীর রোগ।' দক্ষিণ তর্জনী বাম তর্জনীর উপর ন্যস্ত করিয়া ঐ বাক্যগুলির সত্যতা শপথ করিয়া বার বার জানাইতেছিলেন! তথাপি গণ্ডমূর্খ আমি তাঁহাকে এবং তাঁহার আশীর্বাদ যে কি মুনি-ঋষি-দেব দুর্লভ সম্পদ তাহা না বুঝিয়া, একই আবদার ও আশা ধরিয়া বৃহস্পতিবার প্রায় বেলা নয়টা অবধি নিজ গণ্ডমূর্খতায় পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলাম। একবারও মনে উদয় হয় নাই যে আমি তাঁহাকে অবমাননা করিতেছি। সেই সময়, শাশুড়ীমাতার কর্মচারীটি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আপনি বাড়ী চলুন। দিদিমণি (প্রিয়ংবদা) আপনার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।' আমি তাঁহাকে এই বলিয়া বিদায় দিলাম, 'আপনি মা'কে বলিবেন যে আমি ঔষধ পাইব আশা করিতেছি। এখন যাইব না, ঔষধ পাইলেই ফিরিব।' তাহার পর, পূর্বদিবসের ন্যায় আমার সহিত শিবঠাকুরের ঘন ঘন অভিনয় সারা দিন চলিল, তবে এই অভিনয়ে তিনি আর ঠাকুর রহিলেন না—হইলেন, চোরেরও অধম! অদ্ভুত, অলৌকিক, প্রেম ও সহানুভূতিপূর্ণ মুখে যেন চোরের লজ্জা প্রকটিত হইল! যেন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লজ্জায় জড়সড়—অথচ, উপায় করিয়া আমায় তুষ্ট করিতে অক্ষম! বার বার পূর্বোক্তরূপে আশীর্বাদ ও শপথ করিয়া জানাইতে লাগিলেন যে, প্রিয়ংবদা রোগমুক্ত ও ত্রিশূলাগ্রে গ্রথিত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিই তাঁহার রোগ। এই প্রকারে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকাল সমাগত হইল। তখন তিনি অবিশ্রান্তভাবে আমার চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন ও তাঁহার বক্তব্য একই প্রকারে ইঙ্গিতে বুঝাইতে লাগিলেন। ঐরূপ দেখিয়া আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধভাবে ভাবিতে লাগিলাম, 'কর্‌ছেন কি! তিন চার দিন মাত্র তাঁহাকে সামান্য চিন্তা

করিয়া যদি জাগ্রতাবস্থায় তাঁহার ছায়ামূর্তি এইরূপে প্রায় অবারিতভাবে সর্বক্ষণ দর্শন সম্ভব হয়, তখন আমার অন্য কিছুর প্রয়োজন কি? যাহা ঘটে ঘটুক! কেন এখন হইতে সর্বত্যাগী হইয়া সারা জীবন তাঁহার চিন্তা ও ধ্যানে অতিবাহিত করি না? প্রিয়ংবদার, বা সংসারের, বা চাকরীর প্রয়োজন কি? ইহাই তো শাস্ত্রোপদেশ! এই ভাব ও তত্ত্ব মনে উদয় হওয়াতে, আর প্রিয়ংবদার রোগমুক্তির কামনা রহিল না (তিনিই দিয়াছিলেন, তিনিই লইলেন!) এবং তন্ময় হইয়া একাগ্রমনে, কেবল শিবঠাকুরের চিন্তায় এবং তাঁহার কৃপা, প্রেম, সমবেদনা, অলৌকিক মাহাত্ম্য ও ভক্তবাৎসল্য অনুভব করিতে করিতে, যেন আত্মহারা হইয়া অনবরত ভক্তি-বিগলিত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থা অনেক ক্ষণ ছিল এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিয়াছিলাম। পরে জানিয়াছিলাম যে, সেই সময় নাগাত প্রিয়ংবদা কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর, মনের এইরূপ ঔদাস্য ও পরিবর্তন আসিয়াছিল যে, ট্রেন পাওয়া যাইলে তখনই কলিকাতায় ফিরিতে পারিতাম। রাত্রে, প্রিয়ংবদা যে শয্যায় শয়ন করিতেন তাহা স্বপ্নে স্পষ্ট দর্শন হইল, কিন্তু তথায় তাঁহাকে দেখিলাম না এবং শয্যার চারিদিকে শিবঠাকুরকে প্রহরীবেশে ত্রিশূলহস্তে পাহারা দিতে দেখিলাম। এই স্বপ্নে, কলিকাতার ঘটনা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু গণ্ডমূর্খ আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। এইরূপে রাত্র অতিবাহিত করিয়া আমি ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় শাশুড়ীমাতার কর্মচারী সেখানে উপস্থিত হইয়া, আমাকে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু প্রিয়ংবদার মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিলেন। তখন লিঙ্গমূর্তির সন্নিকটস্থ কতকগুলি ফুল ও বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত ট্রেনে যাত্রা করিলাম। সারাপথ জাগ্রতাবস্থায় দিবার আলোকের মধ্যে, শিবঠাকুরের আকাশ বা ছায়ামূর্তি যেন অবারিত ভাবে আমার নয়নপথে রহিয়া সহযাত্রী হইলেন—দণ্ডায়মান, বগলে লম্বা ত্রিশূল ও তৎফলকে কৃষ্ণবর্ণ একটি বস্ত্র গ্রথিত, দুই হস্ত অর্ধজোড় এবং তন্মধ্যে ফুল ও বিল্বপত্র। তখনও মাঝে মাঝে অন্তরে (ভাবে) ও বাহিরে (ইঙ্গিতে) আমায় জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন যে, প্রিয়ংবদা রোগমুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রটিই তাঁহার রোগ এবং তাঁহার করস্থ ফুল ও বিল্বপত্র আমার প্রাপ্য। এইরূপে প্রায় সাড়ে বারোটায় কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম যে প্রিয়ংবদা পূর্বরাত্রে (সাড়ে আটটা নাগাত) দেহত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার দেহ সৎকার হয় নাই। তখন তারকেশ্বরে চারি দিনব্যাপী ঘটনাবলী যেন কুহেলিকার ন্যায় বোধ হইল—কোন বিষয় যেন বুঝিলাম এবং অন্যান্য

বিষয় আদৌ বোধগম্য হইল না। যাহা হউক, শীঘ্র মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা হইল এবং ঐ দিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাকূলে শব ভস্মীভূত হইল। কলিকাতায় ফিরিবার পরও শিবঠাকুরের উপরোক্তরূপ দর্শন হইতেছিল, কিন্তু সৎকারান্তে যখন গঙ্গাস্নানের পর বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিলাম, তখন হইতে আর তাঁহার দর্শন হইল না। কয়দিন যে জাগ্রতাবস্থায় প্রায় বিরামহীন ভাবে তাঁহার প্রকটন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ, আমার সাধনসাপেক্ষ নহে—কেননা, সারাজীবনব্যাপী তপস্যা ও সাধনায় দ্বারাও যোগীগণ তাঁহার ঐরূপ দর্শন ল'তে সমর্থ হন না। পরে শাশুড়ীমাতার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, প্রিয়ংবদা মঙ্গলবার রাত্রে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন যে, শিবঠাকুর ঔষধ লইয়া আসিয়াও দিতে পারেন নাই এবং মাঝে মাঝে ঐ কয়দিন তাঁহার শিবদর্শন লাভ ঘটিতেছিল। নিয়তির বিধান শিবেরও খণ্ডন-শক্তির অতীত। কিন্তু, মৃত্যুর পূর্বে মাঝে মাঝে শিবদর্শন লাভ বড় সাধারণ পারলৌকিক গতি সূচনা করে না—*অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান (১) [পাদটীকা (৩)]। —*উহা শিবলোক প্রাপ্তির পূর্ব-নিদর্শন। এই খণ্ডের পরিশিষ্টে পঞ্চম স্বপ্ন উহার প্রমাণ। ঐ কয়দিনে প্রিয়ংবদা একবার তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন, 'মা! দেখ কেমন ছোট্টো গণেশ ঠাকুরটি আসিয়াছেন, আর তাঁর পা দু'খানি কেমন লাল টুকটুকে।' মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সিদ্ধিদাতা গণেশ দর্শন লাভ মৃত্যুকেই উল্লিখিত 'সিদ্ধি'রূপে পরিণত করিয়াছিল! এই কারণেই, একটা প্রবাদ আছে— 'কো জানে কোন্ ভেকসে মিলে হরি।' শাস্ত্রমতে, স্বপ্নে ঈশ্বর বা ঈশ্বরী কোন মূর্তি দর্শন 'স্বপ্নসিদ্ধির' লক্ষণ। তাদৃশ ব্যক্তি জীবদ্দশায় বিপুল পুণ্যসঞ্চয় ও নানাবিধ শুভফল বা অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া দেহান্তে মুক্তি বা স্বর্গগতি লাভ করেন।

---

(৩)—এই পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে, এইরূপে অনেক বাক্য অবশে চিহ্নিত হইয়াছে। ঐ খণ্ডগুলির পাদটীকার সূচিপত্রে যে পাদটীকাগুলি * চিহ্নিত, সেইগুলিতে উহাদের বিবরণ পাঠক অবগত হইবেন। উহাদের নির্দিষ্ট বাক্যগুলি যে জগদম্বার অনুমোদন প্রকাশক, তাহা আমি যুক্তিসহ পূর্বে স্থানে স্থানে বুঝাইয়াছি (বিশেষতঃ, প্রথম খণ্ড, প্রথম নিবেদন—৩, ৪ ও ৭ অনুচ্ছেদ ও দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় নিবেদন—৩ ও ৪ অনুচ্ছেদ)। এই চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপিতে লিখিত নানা বিশেষ প্রয়োজনীয় বাক্য, একই রূপ চিহ্ন ভিন্ন প্রকারে বহন করিতেছে ও জগদম্বার অনুমোদন প্রকাশ করিতেছে। এই অদ্ভুত ঘটনাটি ধর্মপুস্তক প্রণয়নের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এইরূপ কৃপা প্রদর্শন করিয়া, জগদম্বা আমাকে কৃতার্থ ও বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে, পরে ২১ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ ও ট পর্ব ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৩। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করিলে, তাঁহাকে লাভ করা যায়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন যে, ঈশ্বরের বালক-স্বভাব, যজ্জন্য অনেকে অল্প বা বিনা আয়াসে ক্ষণিক কোন ঘটনার অজুহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহারা 'কৃপাসিদ্ধ' নামে অভিহিত। প্রিয়ংবদাও সেই শ্রেণীগত সিদ্ধির অধিকারিণী। শিবগীতায়, শিবঠাকুর রামচন্দ্রকে এই ভাবে বলিয়াছেন—

'কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা, ভয়, শোক, ক্ষুৎপিপাসা, অগ্নিদাহের বা জলমগ্নের আশঙ্কা, ইত্যাদির কালে যদি মানব ছলক্রমেও আমার স্মরণ বা নাম করে, তাহা হইলে সে পরমগতি লাভ করিয়া থাকে। যে-ব্যক্তি মহাপাতক-যুক্ত হইয়াও দেহান্ত সময়ে আমাকে স্মরণ করে, অথবা আমার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র ('**নমঃ শিবায়**') উচ্চারণ করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিভাগী হয়।'

শাস্ত্রমতে, যে-ঈশ্বরমূর্তি দর্শন বা স্মরণ করিতে করিতে মৃত্যু হয়, পরকালে সেই দেবের লোকে গতি হইয়া পঞ্চবিধ মুক্তির (সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, ও সার্ষ্টি) কোন এক মুক্তি হয়। মহাপ্রলয়ান্তে, সেই ঈশ্বরের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয় (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদের শেষাংশ।) ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের চরম গতি। পরম প্রেমিকা গোপিকাদিগের প্রথমে সুদুর্লভ গোলোক-গতি লাভের পর, শেষে ব্রহ্মসাযুজ্যই হইয়াছিল (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)। দুঃখের বিষয়, এই ভাগবত-বাণীও অনেক বৈষ্ণব বিশ্বাস করেন না, এবং নিজ মনকে বৃথা প্রবোধ দান করেন! তবে, যাঁহার স্বর্ণপাত্র নাই, তিনি রৌপ্যপাত্রে যে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা স্বাভাবিক!

৪। উল্লিখিত ঈশ্বর বাণী সমূহের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মহাপাতকী অজামিল মৃত্যুকালে পুত্র নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া যমদূতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত বিষ্ণুদূত কর্তৃক বৈকুণ্ঠধামে নীত হইয়া পরমপদের —*অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান (২)—*অধিকারী হইয়াছিলেন। প্রিয়ংবদাও মৃত্যুকালে শিবচিন্তা করিতে বাধ্য হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। আমার তারকেশ্বরে গমনই তাঁহার ঈশ্বরলাভের এবং তাঁহার মৃত্যুই আমার ঈশ্বরকৃপা লাভের উপলক্ষ্য হইয়াছিল। ইহা শিবেচ্ছামূলক, উভয়ের নিয়তি! ইহার কারণ আবিষ্কার আমাদের বুদ্ধির অতীত। তবে সামান্য যাহা আমার অনুমানে উদয় হয় তাহা এইরূপ। আমি ইহজনমে শিবকৃপার অধিকারী ইহা আমাকে জানাইতে হইবে এবং মৃত্যুর পর, প্রিয়ংবদাকে পরম গতি দান করিতে হইবে—এই শিবেচ্ছা! উপায়—তাঁহার মরণকালে উভয়ের শিব স্মরণ, মনন, ইত্যাদ! সেই সময়ে

আমাকে যদি বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত করত কিছু দেহকষ্ট দেওয়া হয় এবং সেই দেহকষ্ট দানের সহিত যদি শিব জড়ীভূত থাকেন, তাহা হইলে প্রিয়ংবদা নিশ্চয় পতির দেহকষ্ট চিন্তা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যদি আমি তখন কর্মস্থলে থাকিতাম, তাহা হইলে দেহকষ্ট প্রিয়ংবদা মরণকালে শিবচিন্তা করিতে নিশ্চয় অক্ষম হইতেন এবং আমারও সেই দশা হইতে পারিত। শাস্ত্রবাক্য এই যে, যদি অপর বিশেষ কোন দোষ না থাকে, বা সঞ্চিত কুকর্মফল না থাকে, তাহা হইলে পতিপ্রাণা সতীদিগের মরণান্তে, মুক্তি না হইলেও, উচ্চগতি লাভ হইয়া থাকে—"পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং।" হিন্দু বালিকাগণ অল্প বয়স হইতেই শিখিয়া থাকে যে, পতি পরম গুরু ও পরম দেবতা। যদি রমণীগণ জীবনে এইভাবে সঠিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহা হইলে কেবল তাহার দ্বারাই তাঁহারা উৎকৃষ্ট পারলৌকিক গতি লাভ করিতে পারেন। হিন্দু স্ত্রীগণের—স্বামী-পূজাই ঈশ্বর পূজা, স্বামী-সেবাই ঈশ্বর সেবা, স্বামী-সন্তোষই মহাকর্মযোগ, স্বামী-ভক্তিই মহাভক্তিযোগ, স্বামী-প্রেমই মহাপ্রেমযোগ এবং স্বামীর-স্বরূপ দর্শনই পরমাত্মার দর্শন (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৬ (১৩) ও (১৪) অনুচ্ছেদ)। প্রিয়ংবদা পতিপ্রাণা পত্নী ছিলেন। এইক্ষেত্রে, তাঁহার পতিপ্রেম ও (যে কারণেই হউক) মৃত্যুকালে তদোদ্ভূত শিবচিন্তা নিমিত্ত হইয়া, তাঁহাকে দুর্লভ পরম গতির অধিকারিণী করিয়াছিল। অবশ্য, সর্ব মূলে তাঁহার নিয়তি। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, কোন ব্যক্তির শুভ বা অশুভ কর্মের যে ফল, তাহার সহকারী বা অনুমোদনকারী অংশী হইয়া তাহার ভাগী হয় এবং সমভাবাপন্ন স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়েরই সর্ব কর্মফলভাগী। আমার তারকেশ্বর গমনে প্রিয়ংবদা সামান্য বিচলিত হইয়াও শেষে উৎসাহের সহিত সম্মতি দান করিয়াছিলেন। তাৎকালিক দৈহিক অবস্থায়, নিজে বিশেষ শিবচিন্তা না করিতে পারিলেও, তাঁহার এই ভাব আমার তারকেশ্বরে শিবচিন্তার ফলের অংশী যে তাঁহাকে করিয়াছিল তাহা সহজে অনুমেয়। তাঁহার পূর্ব পূর্ব জন্মের ধর্ম ও কর্ম ফল তাঁহাকে কতটা ঈশ্বরকৃপা লাভে সাহায্য করিয়াছিল তাহা আমার অবিদিত। তবে, উহা যে বড় সামান্য নহে তাহা বুঝা সহজ। এইস্থলে, অবতরণিকার পাদটীকা (৬) বিশেষ দ্রষ্টব্য। উহাতে যে প্রিয়ংবদার প্ল্যানচেট্ যন্ত্রে লিখিত কবিতাটি আছে, তাহা তাঁহার দুর্লভ পারলৌকিক গতির নির্দেশক। আমার আত্মাই প্রিয়ংবদা ভাবে কবিতাটি প্রকট করিয়াছিল—কারণ, তিনিও সারা বিশ্বের ন্যায় আমার আত্মাই

বটে! তবে, ঐরূপ ঘটনা জাগ্রতাবস্থায় বড় অসাধারণ এবং আমার বিশেষ একাগ্রতার—বা প্রকারান্তরে, স্বাপ্নদশার—ফল!

৫। বৃহস্পতিবার রাত্রে স্বপনে যখন প্রিয়ংবদাকে শয্যায় দেখিতে পাইলাম না এবং উহার চারিদিকে শিবঠাকুরকে অনবরত প্রহরীবেশে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম, তখন আমার বুঝা উচিত ছিল যে, তিনি দেহত্যাগ করিয়া শিব চরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন [পূর্বে * চিহ্নিত স্থান (১) ও পাদটীকা (৩)]। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই! স্বয়ং শিব প্রহরীবেশে ত্রিশূলহস্তে যাঁহার শবরক্ষী, তিনি যে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, কে তাহা অস্বীকার করিবেন? যখন তাঁহার আত্মা দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে শয্যায় দর্শন কেমন করিয়া সম্ভব? শাস্ত্রমতে, ঐ রাত্রেই তাঁহার শব-সৎকার উচিত ছিল, কিন্তু মুখাগ্নির অধিকারী (পুত্র দুইটি শিশু ছিল) আমার অনুপস্থিতিতে, তাহা সম্ভব হয় নাই। দেহ যখন সৎকার হইল না, তখন শিবঠাকুর বাধ্য হইয়াই স্বয়ং প্রহরীবেশে উহা রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য প্রহরী নিযুক্ত করা তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন কার্য ছিল না। হায়! হায়! এইরূপ আচরণ তাঁহাতেই সাজে—অপর কাহাতে নহে! অনেকে বোধ হয় অবগত আছেন যে, শবকে অধিকক্ষণ কোন কারণে দাহ না করিলে, উহাকে রীতিমত বন্দোবস্তের সহিত রক্ষা না করিলে, উহাতে প্রেতযোনির কোন দুষ্ট জীব আশ্রয় করে এবং পরে দাহকার্যের সময় সে ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করত বিভীষিকাদি উৎপাদন করে। আমার এক আত্মীয়ের সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পরে মারা গিয়াছিল এবং বন্দোবস্তের অভাবে তাহার শব কাপড়ে আবৃত হইয়া দুই এক দিন গোসলখানায় রক্ষিত হইয়াছিল। সেই সময় দুইজন ব্যক্তি বিভিন্ন কালে রাত্রে গোসলখানায় কার্যোপলক্ষে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, একটি প্রেতিনী সেই শবের অতি নিকটবর্তী হইয়া বিশেষ আগ্রহে তাহার উপর লোলুপদৃষ্টি দান করিতেছে। যদি সেই শব উক্ত প্রেতিনীর কোন বড় বাসনা চরিতার্থের উপযোগী হইত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই উহা আশ্রয় করিত। ঐ শবের দ্বারা তাহার ঐরূপ বাসনা চরিতার্থ হইবে না বলিয়া, সে বোধ হয় উহার নিকটবর্তী হইয়া গন্ধগ্রহণের দ্বারা নিজ একটি ক্ষুদ্র বাসনা (ক্ষুন্নিবৃত্তি) চরিতার্থ করিতেছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে আছে (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৬ (১) অনুচ্ছেদ) যে, মানবের পরমায়ুর শেষে কালপত্নী (মৃত্যুকন্যা) ও যমরাজ এক কালেই তাহার দেহ ও আত্মা গ্রহণ করেন। প্রিয়ংবদার দেহ যখন শিব নিজে অধিকার করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দেহ ও আত্মা যে উঁহাদের অধিকার

বহির্ভূত ও শিবের কবলগত (বা শিবধাম প্রাপ্ত) ইহা স্বতঃসিদ্ধ। হায়! হায়! উহা কি মৃত্যু, না মৃত্যুঞ্জয়? চাহিলাম, প্রিয়ংবদার সাময়িক রোগমুক্তি—বিনিময়ে হইল তাঁহার চির ভবরোগমুক্তি! কে এই কৃপার পারাবার ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সক্ষম? সেই জন্যই, গন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্ত বলিয়াছিলেন যে নীলগিরির তুল্য যদি মসি হয়, সাগর যদি মস্যাধার হয়, কল্পতরুর শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি কাগজ হয়, এবং সরস্বতীদেবী যদি এই সকল লইয়া সর্বকাল লিখিতে থাকেন, তথাপিও মহাদেবের মহিমা ও গুণ কীর্তন সমাপ্ত হয় না (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ৮ অনুচ্ছেদ)। যে কৃষ্ণবর্ণ, ত্রিশূলবিদ্ধ পদার্থটি আমাকে অগণ্যবার দেখাইয়া শপথ করত তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে, প্রিয়ংবদা রোগমুক্ত, তাহা তাঁহার 'অজ্ঞান' বা 'দেহাত্মবোধ' রোগ ভিন্ন অন্য কিছু নহে—কেননা, অজ্ঞান নাশেই ভবব্যাধি দূরীভূত হয়। কাশীমৃত্যুতে যে-জীব মুক্তির অধিকারী—সকলে নহে—তাঁহাকে তিনি কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দান করিয়া প্রথমে অজ্ঞান-রোগ মুক্ত করত পরে নিজ চরণে স্থান দান করেন (প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)। আমার সাময়িক কামনা তিনি পূর্ণ করিলেন না, কারণ আমাদের নিয়তি অন্যবিধ। কিন্তু তৎ-পরিবর্তে যাহা করিলেন, তাহা অতুলনীয়! এই ঘটনা তাঁহার 'তারকেশ্বর' (উদ্ধারকর্তা) নামের সার্থকতা সম্পাদন-কারক! যতকাল তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ বর্তমান থাকিবে ও প্রকৃত ভক্ত হিন্দু একজনও থাকিবে, ততকাল এই কাহিনীর মর্যাদা থাকিবে এবং তারকেশ্বর শিব লিঙ্গের মাহাত্ম্য তার-স্বরে ভারতে বিঘোষিত হইবে! এক পয়সার ভিখারী দাতার নিকট হইতে পয়সাটি না পাইয়া দুইটা রাজ্য লাভ করিল! আর দাতা পয়সাটির পরিবর্তে দুইটি রাজ্য দান করিয়া ভিখারীর নিকট মহাচোরের ন্যায় লজ্জায় জড়সড় ও মুখ কাঁচুমাচু করিয়া যেন শত অপরাধে অপরাধী! অবাক্ কাণ্ড! জগতে কে, কোথায়, কখন, কাহার নিকট এইরূপ ব্যবহার পাইয়াছে? এ যেন আমাদের উভয়ের পক্ষেই কড়ির বিনিময়ে রাজত্ব লাভ, বা টেঁসকেল দিয়া সাগর তরণ! কত মুনি-ঋষি কঠিন দেহকষ্ট ভোগ করতঃ জীবনব্যাপী দুষ্কর সাধন-ভজন আচরণ করিয়া যে পারলৌকিক গতি ও ঈশ্বর-কৃপা লাভে অক্ষম হন, তাহা প্রিয়ংবদা ও আমি অনায়াসে লাভ করিলেন ও করিলাম!

৬। কর্মফলদাতা শিবঠাকুরের নিকট হইতেই লব্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস বলে (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ), ও তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রিয়ংবদার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় আর্তি আমি তাঁহার নিকট ধন্না দিতে গিয়াছিলাম। সেখানে যে আচরণ করিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা-প্রসূত—

কেমনা, বিশ্বে সকল ঘটনাই রামের ইচ্ছা—লোকে অন্য যাহা ভাবে ভাবুক! বেশ স্মরণ হয়, যদিও প্রিয়তমা পত্নীকে মৃত্যু শয্যায় শায়িতা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সেই কালের সঙ্গত্যাগ করিয়া বহুদূরে তারকেশ্বরের মন্দিরে চলিয়া যাইতে মন বিশেষ বিচলিত হয় নাই। মনে কাতরতা ছিল না এমন নহে, তবে তাহার সহিত ছিল মিশ্রিত একটা অদম্য মহোৎসাহ—'মন্ত্রের সাধন বা শরীর পাতন', এই ভাব—আর অটুট ভক্তি বলে এই বিশ্বাস যে, একটা উপায় তাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই করাইতে পারিব এবং তাঁহার সাধ্য নাই উহা না করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দেন! মনের কোণে আরও একটি অল্প বয়সের সুপ্ত ভাব তখন যেন জাগরিত হইয়া আমায় উক্ত কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। কিশোর কালে, আমার কিছুদিন ধ্রুবের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া বনে ঈশ্বরান্বেষণে তপস্যার্থে যাইবার প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্যত হয় নাই। মনে হইয়াছিল যে, সেই কার্যের উপযুক্ত সময় তখন আগত হইয়াছে। তারকেশ্বরে যাইবার পূর্ব হইতেই আমার মনে যেন এইরূপ একটা ছায়াপাত হইয়াছিল যে, সেখানে একটা অভূতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হইব! আর তাহাই ঘটিয়াছিল। সাময়িক রোগমুক্ত হইয়াও, দুদিন পরে অপর কোন রোগে প্রিয়ংবদা দেহত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ভবে আনাগোনার অন্ত হয় তো শীঘ্র হইত না! তৎ-পরিবর্তে, তিনি কালচক্রের বহির্ভূত হইয়া চিরতরে সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

৭। আর সাধারণ লোকচক্ষে—তত্ত্বজ্ঞানের মাপে নহে—শিবপদে লক্ষ অপরাধে অপরাধী ও তাঁহার অগণিত অবমাননাকারী মূর্খ আমার কি শাস্তি হইল! শাস্তি তো নহেই, বরং তাহার ঠিক উল্টা—অগণ্যবার তাঁহার অর্ধ-জোড় হস্তের (এমন কি, শব সংকার কালাবধি!) অপ্রাকৃত ও অমূল্য ফুল ও বিল্বপত্ররূপী আশীর্বাদ ও কৃপা লাভ! সাধনার উদ্দেশ্যই মহৎ সঙ্গ ও বিন্দুমাত্র ঈশ্বর-কৃপা লাভ। উক্ত ঘটনা অতি সহজে আমার উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিল—শিবসঙ্গ ও শিবকৃপা লাভ! বাস্তবিক আমি মনে করি যে, যদিও ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাত আমার মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পূর্বে আমি স্বপ্নে কালিকা দেবীর কৃপা অস্পষ্টভাবে একবার অনুভব করিয়াছিলাম, তথাপি তারকেশ্বরে শিবসঙ্গ ও কৃপা আমার যথার্থ আধ্যাত্মিক জীবন সূচনা করিয়াছিল। সেই স্থলে, তাঁহার কৃপার অনুভূতি এবং প্রেম, লজ্জা ও সহানুভূতিপূর্ণ মুখের আরতি যখন এখনও মাঝে মাঝে স্মৃতিপটে উদয় হয়, তখন তাঁহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যাই! অত প্রেম ও সহানুভূতি এই বিশ্বে কোথা? তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, মিথ্যা পার্থিব

বস্তুর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া, আমরা কাঁচমূল্যে কাঞ্চন বিকাইতেছি! যাঁহার কৃপায়—নিজে পূর্ণমাত্রায় নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন হইয়া—এই চতুর্বিংশ তত্ত্বের আধার ভোগ-দেহ লাভ করিয়া উহার সর্ববিধ সঞ্চালন হইতেছে ও মনের সর্ব বাসনা পূরণ করিতেছি, তাঁহাকে একবার দিনে ভুলেও আমরা স্মরণ করি না—ভালবাসা তো বহু দূরের কথা! এই বিশ্বে যাহা কিছু সবই শিব ও শক্তিময়! মহাপাতকীও যদি এই সব তত্ত্ব বুঝিয়া অখণ্ডভাবে এই বিশ্বের ও নিজের সর্ববিধ অভিব্যক্তি তাঁহাদের অর্পণ করত নিরহঙ্কারী হয়, সে নিষ্পাপ হইয়া অচিরে প্রেমভক্তি লাভে কৃতার্থ হয় ও জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করে (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় নিবেদন, ৪ অনুচ্ছেদ)। শিবঠাকুর আমার নিকট কেন কাঁচুমাচু ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। মাত্র বুঝি যে তিনি এইরূপই সদা মহানুভব! সে মুখখানি যেন বিশ্বের সমষ্টি লজ্জা ও প্রেমের ঘনীভূত জমাট মূর্তি! লজ্জার তো কোন কারণই ছিল না, ঠাকুর! আমি না বুঝিলেও, যাহা চাহিয়াছিলাম তাহার তো কোটীগুণ অধিক দিয়াছিলে! তবে, কেন তুমি লজ্জিত হইয়াছিলে? আরে প্রেম—, বুঝেছি! বুঝেছি! আত্মভাবে, আমার দুঃখ নিজ দুঃখ মনে করিয়া, আমার ভোলানাথ কয়দিন আপন ভোলা হইয়া গিয়াছিলেন—কারণ প্রিয়তমা পত্নীবিয়োগ দুঃখে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা ছিল। যদিও তিনি সর্বভাবাতীত নিরঞ্জন পুরুষোত্তম, তথাপি দক্ষযজ্ঞে সতীদেবীর দেহ-ত্যাগের পর, তিনি শোকাবেগে আকুল হইয়া অজস্রের ন্যায় যে নয়ন-জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা—শনিগ্রহ, জলধারগিরি ও জলসমুদ্র ধারণে অসমর্থ হওয়াতে—অদ্যাবধি যমপুরদ্বার বেষ্টন পূর্বক দুই যোজন বিস্তৃত বৈতরণী নদীরূপে বর্তমান আছে (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ১৬ (১৪) অনুচ্ছেদ)। সর্ব সুখদুঃখাতীত পুরুষশ্রেষ্ঠ শিবের পত্নীবিয়োগ, তজ্জন্য দুঃখ, অজস্র ক্রন্দন ও বৈতরণী নদীর উৎপত্তি—এই সবই ব্রহ্ম-বিক্রমরূপী কালের লিপি ও সর্ববিষয়ে অখণ্ডনীয়!

৮। প্রায় তিনদিন জাগ্রতাবস্থায় আমার তারকেশ্বরে কেমন করিয়া চিদাকাশ-মূর্তি শিব দর্শন লাভ সম্ভব হইয়াছিল, তাহা একটু আলোচ্য—কেননা, ব্যাপারটি অসাধারণ। ইহার মুখ্য কারণ অসীম শিবকৃপা হইলেও, গৌণ কারণ যে ছিল না তাহা নহে। উক্ত কালে যে আমার একটি কামনা-উদ্ভূত শিবচিন্তাপূর্ণ তন্ময় অবস্থা লাভ হইয়াছিল, তাহাতে বাহ্যদৃশ্যের বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুভূতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সেইজন্য, আমি যেন একটি সকাম অন্তর্মুখী বাহ্যসমাধি (বা প্রকারান্তরে, স্বাপ্ন) দশায় তখন অবস্থিত ছিলাম। সেইরূপ অবস্থা ঈশ্বরদর্শন লাভের অনুকূল (১ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ এবং উপরে ৪ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)।

৯। তারকেশ্বরে যাঁহারা নিজ বা কোন আত্মীয়ের রোগমুক্তির অভিপ্রায়ে ধন্না দিতে যান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নানারূপ অলৌকিক ও আশ্চর্য ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। অনেকে তাঁহার নিকট হইতে নিজ কুকর্মফল পরিজ্ঞাত ও যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধি অবগত হইয়া, তদ্রূপ আচরণ করত রোগ-মুক্ত হন। অনেকে, নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ এমন ঔষধ লাভ করেন, যাহা অচিরে ভঙ্গ অনিবার্য। রামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পূর্বে সারদেশ্বরীদেবী তাঁহার রোগবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারকেশ্বরে ধন্না দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ ভাষায় নিয়ে বর্ণিত হইল—

"আহা! তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম, তাতেও কিছু হ'ল না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি—রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলা হাঁড়ি সাজানো থাকলে তার উপর ঘা মেরে যদি কেহ একটা হাঁড়ি ভেঙ্গে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এলো, 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি? একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে!' তার পর দিনই চলে আসি। আসতেই ঠাকুর বল্লেন, 'কিগো! কিছু হ'ল—কিছুই না?'"

অন্য এক সময়ে, সারদেশ্বরীদেবী রামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পূর্বে স্বপ্নে নিম্নলিখিতরূপ কালী-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—

"মা কালী—ঘাড় কাৎ করে রয়েছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—'ও'র ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে) আমারও হয়েছে,"

রামকৃষ্ণদেব নিজে ঐ সময়ে নিম্নলিখিত স্বপ্ন দর্শন করেছিলেন—

"ঔষধ আনিতে হাতী গেল। হাতী মাটি খুঁড়ছে। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে।"

রামকৃষ্ণদেব ও সারদেশ্বরীদেবীই যে নিজেরাই শিব ও দুর্গা (বা কৃষ্ণ ও রাধা), তাহা পাঠক পরে নানা কাহিনী হইতে অকাট্যরূপে অবগত হইবেন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহারাও ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সামান্য নর-নারীর ভাবাধীন! দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত, অবতার-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। কৃপা বশতঃ, যাহাদিগকে তাঁহার স্ব-স্বরূপ বুঝান, তাহারাই মাত্র তাঁহাদের বুঝিতে পারেন! ধরার এমনি ধর্ম যে, অবতারগণও সব সময়ে নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না—করিলে, দেহ ভঙ্গ হইয়া জগন্মাতার কার্যে বিঘ্ন উদয় হয়। এই ধরায়, 'ব্রহ্মা-বিষ্ণুও খাবি খান'—মানব তো ছার! সাধারণতঃ, সবই কর্ম-

ফল বটে, কিন্তু সেই ফল কোন্ ক্ষেত্রে, কিরূপে ও কখন অভিব্যক্ত হইবে, তাহা বুঝা দেববুদ্ধিরও অতীত! কর্মফলদাত্রী জগদম্বাকে সঠিক বুঝা অসম্ভব! রামকৃষ্ণদেবের অবতারলীলা শেষ ও তাঁহার স্বধামে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হওয়াতে, উল্লিখিত স্বপ্ন দুইটি তাঁহার নিয়তির লিপি উক্তরূপে উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। কাল বা নিয়তির প্রিয়াপ্রিয়ত্ব, বা গুরু-লঘুত্ব জ্ঞান নাই। অবিচ্ছিন্নভাবে আব্রহ্মতৃণাবধি সারা বিশ্ব অবশে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় ব্রহ্মবিক্রম কালের মার্গে ধাবিত রহিয়াছে এবং এইখানে কেহ (এমন কি, ঈশ্বর ও অবতারগণ পর্যন্তও) কোন সময়ে কোন বিষয়ে স্বাধীন নহেন! সাগর-স্পন্দনে, জলকণায় স্বাতন্ত্র্য কোথা? বিশ্বে এমন কিছু ছিল না, বা নাই, বা হইবে না, যাহা বিশুদ্ধ বোধ-স্বরূপ আত্মার ভিত্তিহীন, বা ব্রহ্মেচ্ছা নিয়তির কবল-মুক্ত—অর্থাৎ, সমস্তই চৈতন্য ও তৎশক্তির অভিব্যক্তি, বা লীলা। যাহা কিছু সবই যেন সাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যের জ্ঞাতসারে বা ভিত্তিতে, তাঁহার শক্তির (প্রকৃতির) দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২-৩ অনুচ্ছেদ ও দশম অধ্যায়, ১২-১৩ অনুচ্ছেদ)। যাহা কিছু দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, বা অন্য প্রকারে অনুভূত হয়, সেই সবই হেয় বা উপাদেয় ভাববর্জিত আত্মা বা ঈশ্বর, এই প্রকার বুদ্ধি ভিন্ন প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। এই সব কারণেই, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ও প্রেমভক্ত পুরুষ অদ্বৈতভাব অবলম্বনে ও দেহাত্মবোধ ত্যাগে সমস্তই ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে অর্পণ করত নির্ভয়ে কর্মফল, পাপ, পুণ্য ও সংসার অতিক্রম করেন। তাঁহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির সর্ববিধ স্পন্দনেই তিনি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব জ্ঞানহীন এবং তাহাদের দ্বারা প্রাক্তন কর্মফল খণ্ডন হয় মাত্র—নূতন কর্মফল সৃজন হয় না। মানব যখন বলে, 'আমি কর্তা নহি তুমি কর্তা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—তখন সে 'জীবন্মুক্ত' এবং তাহার আর বেতালে পা পড়ে না (প্রথম ভাগ, দ্বাদশ অধ্যায়, ৪ (২) অনুচ্ছেদ)। যেমন একমাত্র সূর্য সারা বিশ্বকে নির্লিপ্তভাবে আলোকিত করিতেছেন, সেইরূপ এক পরমাত্মা সমগ্র জগতকে সেইভাবেই বোধরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।

(২) যতীন-তারকেশ্বর

তারক-ঈশ্বর জয়, যতীন-ঈশ্বর,
চিদানন্দ রূপ তব, মূর্খ ভাবে জড়।

আর্ত ভকতের তুমি, শোক-তাপ ত্রাতা,
কিম্বা প্রেমে গুরুরূপে, তত্ত্বজ্ঞান দাতা।
শুভেচ্ছায় মানবের, ওহে ত্রিলোচন!
দিয়া কর্মফল কর, পাপ প্রক্ষালন।
বাঘছালাম্বর, শম্ভু, শশাঙ্কশেখর,
পিনাকধর, শঙ্কর, কাল ভয় হর।
আশুতোষ, ভোলানাথ, হর, পঞ্চানন,
অহেতুক কৃপাসিন্ধু, বৃষভ-বাহন।
গলে হাড়মালা, কণ্ঠে বিষ কালকূট,
দেহে ভস্ম, করে শূল, শিরে জটাজুট।
সুরধুনী সেথা প্রেমে গান কুলু কুলু,
ভাঙ-ধুতুরায় তব আঁখি ঢুলু ঢুলু।
রজত-বরণ, বিশ্ব-আত্মা, বিশ্বপিতা,
রাজে বামে প্রেমময়ী গৌরী বিশ্বমাতা।
ডুগডুগি তত্ত্বজ্ঞান ঘোষিছে 'সোহহং,'
শতপাকে নাগরাজ গান 'ওম্—ওম্'।
ভূতপ্রেত বলি 'বম্' দেয় তালে তাল,
রামনামে মাতি ভোলা বাজাইছ গাল।
গুণাতীত, গুণময়, দেব যজ্ঞেশ্বর,
দেবদেব, মহাদেব, তুমি মহেশ্বর।
সত্ত্ব-রজো-তমো গুণ করিয়া ধারণ,
স্থিতি-সৃষ্টি-লয় প্রভু করিছ সাধন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে পালিছ সবায়,
রজোগুণে ব্রহ্মারূপে সৃজিছ ধরায়।

তমোগুণে রুদ্ররূপে করিছ সংহার,
সবার বরেণ্য তুমি, ওহে গুণাধার।
সত্য-সনাতন দেব, বিশ্বের আধার,
সব অভিনয়ে ইথে তুমি কর্ণধার।
বেদবেদ্য তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন,
সাধ্য কার করে তব মহিমা কীর্ত্তন ?
বাণীদেবী তব গুণ গাহিতে শঙ্কিত,
শতমুখে নাগরাজ বর্ণিতে কুণ্ঠিত।
শত শত অপমান করিয়া তোমায়,
বুঝায়েছ ক্ষমা প্রভু করেছ আমায়।
জোড় হস্তে প্রেমে দত্ত আশীষ তোমার,
রহিয়াছে আজীবন পাথেয় আমার।
দুস্তর সংসার এই করিতে তরণ,
সে পাথেয় আছে মোর অমূল্য রতন।
সাধু ব্যক্তিগণে তুমি, ওহে ভগবান !
সর্বদা করিছ সব অভীষ্ট প্রদান।
হনুমান রূপে তুমি মোর স্বাপ্ন-গুরু,
কি ভয় কি ভয় যার হৃদে কল্পতরু ?
কৃপায় তোমার প্রভু লভি কিছু জ্ঞান,
বুঝি বিশ্ব শিবময়—নাহি কিছু আন।
যাহা কিছু আছে বিশ্বে তোমার আকার,
এই বিশ্ব মাঝে তুমি সকল বিকার।
কি পুংচিহ্ন, কি স্ত্রীচিহ্ন, কিবা রিপুচয়,
সব তব রূপ-ভাব, ওহে সর্বময়।

যা কিছু আব্রহ্মরেণু অবধিতে ভাব,
তৃণসম পালিতেছে তোমার প্রভাব।
দুর্গা-কালী-রাধা-কৃষ্ণ, তব নামান্তর,
একা তুমি এই বিশ্বে, ওহে সর্বেশ্বর!
কভু বা সাকার তুমি, কভু নিরাকার,
বুঝিতে জটিল তত্ত্ব—কে পারে তোমার?
কিবা বেদ, কিবা তন্ত্র, সকলি অসার,
জগত-মাঝারে নাথ! তুমি সারাৎসার।
যারে তুমি কর নিজ, ওহে দয়াময়!
মুকতি লভে সে নর, কে করে সংশয়?
যারে তুমি কৃপাকণ কর বিতরণ,
ভবভয় হয় তার নিমেষে বারণ।
আচরি কঠোর তপ কত যোগিজন,
বহুদিন অনাহারে করেন যাপন।
তবু তাঁরা নাহি পান তব দরশন,
তব দরশনে মোর সার্থক জীবন!
লহ গো প্রণাম, নাথ! লহ গো প্রণাম,
কোকনদ সম পদে, অনন্ত প্রণাম।
হনুমান রূপে তুমি মোর স্বাপ্ন-সখা,
অনন্ত চুম্বন লহ, ওহে প্রাণসখা!
তারক-ঈশ্বর জয়, জ্যোতিঃ-পরাৎপর,
অরূপের রূপ, কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর! (৭২)

যতীন-দুর্গা

গান

সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন পাবো তব পদ-রেণুকণা ॥
তব আহ্বান আসিবে যখন, সে-কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্মে প্রকাশিবে তব আরাধনা।

সুধাকর-গ্রন্থাবলী

'অহং'-ত্যাগে সর্ব পাই. আর কেন মুক্তি, ভাই !
'অহং'-ত্যাগ সর্বত্যাগ—মহা চিন্তামণি।
সেই চিন্তামণি হন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
মুনি-ঋষি সর্বত্যাগী এই তত্ত্ব জানি।

বিষয়—দ্বিতীয়া পত্নী মনোরমার মৃত্যুর পরে, এক দিন দুর্গাদেবীকে চিন্তা কালে তাঁহার আবির্ভাব, আমার দক্ষিণহস্তের মণিবন্ধে বিবাহ-সূত্র বন্ধন ও দেহমধ্যে তিরোধানের কাহিনী।

স্থান— মিরাঠ ছাউনির বাসা-বাড়ী (২০২-সি, ওয়েষ্টএণ্ড রোড)।

কাল— এপ্রেল বা মে, ১৯২৮।

[মনোরমার জন্মদিন, ৩১শে অক্টোবর, ১৯০৪ ;
মৃত্যুদিন, ২রা (বা ৩রা) জানুয়ারী, ১৯২৮]।

প্রিয়ংবদার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসরান্তে (অগষ্ট ১৯১৮), আমার দিল্লীর হিন্দু কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ৺চারুচন্দ্রমিত্রের দ্বিতীয়া কন্যা মনোরমার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। ১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমে তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে একটি পুত্র-সন্তান প্রসবের পর রুগ্না হইয়া সেপ্টিসিমিয়া রোগে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছিলেন। মনোরমার মৃত্যুর কয়দিন পূর্বে আমি প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে ঠিক চক্ষু উন্মীলনকালে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি সূক্ষ্মশরীরে গৃহের বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন। এই ঘটনাটি যেন জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার

মধ্যবর্তী দশায় ঘটিয়াছিল এবং আমার আত্মার দ্বারা কর্মফল রূপেই প্রকটিত হইয়াছিল। উহাতে আমি তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এই ঘটনার দুই এক দিন পূর্বে (বা পরে), আমি রাত্রে এক স্বপ্নে অনুভব করিয়াছিলাম যে, প্রথমা পত্নী প্রিয়ংবদা আমার পার্শ্বে, গাত্র-সংলগ্ন শায়িতাবস্থায় বলিতেছেন, 'ওলট্-পালট্।' : 'ওলট্-পালট্!' আমার আত্মাই তৎকালে প্রিয়ংবদার ভাবে আমার সেই কালের কর্মফল যে মনোরমার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৯১৭ হইতে ১৯২৮ সালের এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে, আরও তিনবার আমার আত্মা প্রিয়ংবদাকে স্বপ্নে প্রকট করিয়াছিল। একটি স্বপ্ন বিশেষ অস্পষ্ট। দ্বিতীয়টিতে, 'অপেক্ষায় আছি', এই বাক্যটি ঠিক নিদ্রোত্থিত হইবার পূর্বে অতি স্পষ্টভাবে প্রিয়ংবদার স্বরে দুইবার কর্ণকুহরে শ্রুত হইয়াছিল। তৃতীয়টিতে (সম্ভবত, ১৯২২ বা ১৯২৩ সালে) দেখিয়াছিলাম যে, প্রিয়ংবদা একটি জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোকে অনেকগুলি সখী বেষ্টিতা হইয়া উচ্চাসনে আসীনা (চিহ্নিত স্থান (১) দ্রষ্টব্য)। মনোরমার দেহত্যাগের আন্দাজ একমাস কাল পরে, যে-কবিতাটী অবতরণিকার (৬) পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, তাহা আমার আত্মরূপী প্রিয়ংবদা আশ্চর্যভাবে প্ল্যান্‌চেটের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি যে, উহাতে তাঁহার দুর্লভ পারলৌকিক গতির বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা চিহ্নিত স্থান (১) ও পুস্তকের পরিশিষ্টে হরিদাসবাবুর পঞ্চম স্বপ্নটি প্রমাণিত করে। ঐ স্বপ্নটি, মনোরমার (প্রিয়ংবদার ও দুর্গাদেবীর সহচরী রূপে), একই প্রকার পারলৌকিক-গতি নির্দেশক।

২। মনোরমার দেহত্যাগের প্রায় সাড়ে তিন বা চারি মাস পরে, কোন অবকাশ দিবসের দুপুরবেলায়, এক অর্ধ-অন্ধকার নির্জন কক্ষে উপবিষ্টাবস্থায়, দুর্গাদেবীকে প্রায় দেড় হাত অন্তরে মানস চক্ষে স্থাপন করত তাঁহার চিন্তামগ্ন হওয়াতে দেখিলাম যে, তিনি সেইস্থানে আকাশ বা ছায়া মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া নিকটে আগমন করিলেন এবং একটা দুর্বাতৃণ-সংবদ্ধ হলুদবর্ণ সুতা আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে বন্ধন করত দেহ-মধ্যেই প্রবিষ্টা হইলেন। আমি ঐ ঘটনাকে যেন সখ্যভাবে 'রাখি-বন্ধন' মনে করত, বিস্ময়ে আনন্দাপ্লুত ও হতভম্ব হইয়া উহার অন্য কোন অর্থ-ই প্রথমে খুঁজিয়া পাইলাম না। এই প্রসঙ্গে, পরে ট পর্ব দ্রষ্টব্য। এই আনন্দ যেন 'মূকের অমৃতাস্বাদনবৎ।' সেই সময় নাগাত, কলিকাতার কোন ঘটক আফিস হইতে, আমার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতার নিকট হাওড়া জেলাস্থ মাজু গ্রামের জমিদার রাজেন্দ্রনাথসরকারের কন্যা শরদিন্দুর সহিত সম্বন্ধ এক পত্রে আসিয়াছিল। কিন্তু, তাহাতে কোন কাজই হয় নাই। ইহার প্রায়

দুই-আড়াই মাস পরে (অর্থাৎ, আষাঢ় মাসের শেষ নাগাত), আমার কলিকাতাবাসী আত্মীয়দিগের প্রচেষ্টায়, অভাবনীয় যোগাযোগে শরদিন্দুর সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। অল্পদিনের অবসরে সফরস্থান ঝান্সী হইতে কলিকাতায় গিয়া, যে-কন্যার সহিত বিবাহ প্রায় স্থির হইয়াছিল, তাহার সহিত বিবাহ না হইয়া শরদিন্দুর সহিত শেষে অপ্রত্যাশিত ঘটনারাজির সমাবেশে ৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৫, উহা ঘটিয়াছিল। বিবাহের দিবস যখন গাত্রহরিদ্রার সুতা দক্ষিণ-মণিবন্ধে বদ্ধ হইল, তখনই মনে পড়িল যে, ঠিক ঐরূপ সুতাই দুর্গাদেবী স্বয়ং আমার ঐ স্থানে বদ্ধ করিয়া আমার দেহে মিলিতা হইয়া গিয়াছিলেন। তখন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি নিজেই ঐ বিবাহদাত্রী। রেলযোগে ঝান্সী হইতে কলিকাতার পথে, শ্বেতকায় দয়ালু শিবঠাকুর কয়বার দর্শন দান দিয়া, কৃপায় আমার অন্ত কর্মহীন তাঁহাকে চিন্তার সাফল্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু, ঐ কালে আমি তাঁহাকে, শঙ্করাচার্যের 'নির্বাণ-ষটকের' শিক্ষানুযায়ী (প্রথম ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়), নিরাকার আত্মভাবে **'চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্'** এই মহাবাক্য অবলম্বনে চিন্তাতেই বিশেষ অভ্যস্ত থাকিতাম। শরদিন্দুর সহিত বিবাহের প্রায় দুই মাস পরে (অর্থাৎ, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮), পিতৃদেব মারা গিয়াছিলেন। আমি তখন সফরে ছিলাম। ইহার প্রায় এক মাস পূর্বে মনোরমার নবজাত কনিষ্ঠ পুত্রটি মারা গিয়াছিল। যাহা ঘটিল, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়তির অমোঘ লিপি—অর্থাৎ, নানাবিধ সাংসারিক ঝড-ঝাপটার মধ্যে, আমার আত্মরূপী শিবশক্তির অযাচিত, অহেতুক কৃপা বিতরণ!

৩। এই স্থলে, প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান বা প্রেমভক্তিতে সাধনপ্রথা দ্রষ্টব্য। নিজেকে কোন এক ঈশ্বর মূর্তির সহিত মিলাইয়া চিন্তার ফলে, দেহের সর্ব যন্ত্র ও তাহাদের বিকার স্বতঃই ঈশ্বরার্পিত হয়। নারায়ণাবতার কপিলদেব বলিতেছেন—'যিনি স্বীয় আত্মা, মন, দেহ ও সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ করত তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত, তিনি বিশ্বপ্রধান। দেহাত্ম-বোধত্যাগী যিনি নিজেকে এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করত সকলকেই সমজ্ঞান করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই'—প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ। উপরে ১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনায়, দুর্গাদেবী আমার দেহে মিলিতা হইয়া ও তিনিই—***অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান** (৩)—*যে আমার পুনর্বিবাহ দিতেছেন ইহা জানাইয়া, আমার ভিতরে উক্ত তত্ত্বজ্ঞান বা প্রেমভক্তি মার্গে সাধনার বীজ বপন করিলেন ও প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চারণ করিলেন। কাশীর বিষয় পঠন ও

শ্রবণ এবং কালী-দর্শন—এক কথা নহে। সেই জন্য পুস্তকপাঠে বা শ্রবণে জানা যে, আমি ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর এক মূর্তি বিশেষ, আর স্বচক্ষে দেখা যে, কোন ঈশ্বরী মূর্তি আমার দেহে মিলিত—এক কথা নহে। চক্ষে দেখার ফলে যে অনুভূতি উদয় হয়, তাহা অটুট ও দুরপনেয়। অহৈতুকী কৃপাময়ী ও অভেদ শিবময়ী জগদম্বা আমাকে সেইরূপ অনুভূতি দান করিলেন! অল্প কথায়, আত্মরূপিণী তিনি স্বয়ং আমাকে নিজ জন রূপে বরণ করিয়া উহা দেখাইলেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'আপনাকে (আত্মা বা ঈশ্বরকে) আপনার ভিতর দেখিতে পাইলে তো সবই হইয়া গেল—এই জন্যই তো সাধনা!' এই স্থলে, অবতরণিকার ১৫ অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে আলোচ্য। স্বামী বিবেকানন্দ মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন—'বহু শাস্ত্রাভ্যাস, বা মেধা, বা শ্রবণের দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন। যাঁহাকে আত্মা বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট আত্মা স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়কেই বরণ করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসিবেন এবং সেই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মলাভ করেন, তদ্বিষয়ে আত্মা স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন।' এই পুস্তকের সকল পর্বই আমাদের—**অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৪)**—উপর আত্মার ভালবাসা প্রকাশক! জগদম্বা আরও বুঝাইলেন—যদিও নির্বাণ-ষটকের ভাবে তুমি বুঝিয়াছ যে তুমি শিব (বা তৎসহ অভেদ শিবা) স্বরূপ এবং তোমার দেহের নানা যন্ত্র ও তাহাদের বিকারের সহিত তুমি বাস্তবিক সংশ্লিষ্ট নহ, তথাপি তোমাকে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সকলই হেয়োপাদেয় ভাবহীন শিব-শক্তির স্বরূপ এবং উহাদের সর্ববিধ অভিব্যক্তিই আমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—কেননা, এই বিশ্বে একমাত্র শিবই 'অহং'-ভাবের দ্বারা অনন্ত শক্তি-রূপে পরিণত এবং ইহাতে যাহা কিছু সবই অখণ্ডভাবে শিব-শক্তি, বা আমাদের কাম-গন্ধহীন রমণোদ্ভূত'। উক্তরূপ সাধন পথ অবলম্বনের জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন ছিল, তাহাও যে তিনি আমাকে প্রয়োজন মত দিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কেননা, সত্যরূপিণী, মহামহিমান্বিতা বিশ্বকর্ত্রী দেবীর অযাচিত, অহৈতুকী, কৃপার দান কখনও মিথ্যা বা কার্পণ্য দোষদুষ্ট হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে, 'শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ' নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের (চতুর্থ সংস্করণ), ১৬৭ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য। একদা কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ছোটদাদা স্বপ্নে ভগবতীদেবীকে তাঁহার দেহে প্রবিষ্টা ও মিলিতা হইয়া যাইবার কথা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—'ওহে বাপু, এ সব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বা'র হ'তে চেষ্টা করে,

তিনিও আর পারছেন না, এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাচ্ছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে···আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।' এই সকল ঘটনার হেতু কালশক্তি নিয়তিদেবীর অমোঘ লিপি। বিশ্বে ভাল-মন্দ যাহা কিছু অভিব্যক্ত, সবই 'রামের (ব্রহ্মের) ইচ্ছা' এবং ইহাতে কাহারও কোন 'অহং'-ভাবের স্থান নাই। সেই 'অহং'-ভাবের ফল বিষময় হইলেও, তাহা 'রামের লীলা'—*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৫)—*ভিন্ন অন্য কিছু নহে। রামের ইচ্ছাতেই দেহাত্মবোধ ত্যাগী দরিদ্র ব্যক্তি সাংসারিক নানা দুঃখ-জ্বালায় প্রপীড়িত হইয়াও, কর্মফলহীন ও মুক্ত এবং রামের ইচ্ছাতেই দেহাত্মবোধী ব্যক্তি, রাজপ্রাসাদে শায়িত এবং আকাশ ও মোটর যানে বাহিত হইয়াও, কর্মফলযুক্ত এবং তদনুযায়ী মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকাদি গতি লাভ করত পুনরায় বার বার সংসার-কারাগারে দলিত হইতে উন্মুখী। যখন সবই রাম বা শ্রীদেবী, তখন তাঁহাদিগকে সর্বার্পণ করিয়া অবস্থানই সু-বুদ্ধি! পাশ্চাত্য ভাব-ধারার আকর্ষণে, নানাবিধ জড়বিদ্যার কারণ-কর্মাদির অনন্ত বাহ্য নিগড়ের জীবনব্যাপী অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া, অতি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও যদি কেবল নিজেকে এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে যে, 'সারা বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমবায়-ক্ষেত্র একমাত্র ঈশ্বর' তাহা হইলে সে অচিরে তাঁহাকে সর্বার্পণ-সিদ্ধ হইতে পারে। জড়বিদ্যাও ব্রহ্মময়ী ভিন্ন অন্য কিছু নহে (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২১ অনুচ্ছেদ) এবং সেই ভাবেই উপাস্য। বিশ্বে যাহা কিছু অখণ্ডভাবে সবই জগদম্বার লীলা—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আর ভয় কি? এখানে তিনিই রামেচ্ছা উপলক্ষ করিয়া সব হইয়া রহিয়াছেন এবং সবই করিতেছেন! তিনিই সাপ হ'য়ে কাটেন, রোজা হ'য়ে ঝাড়েন, হাকিম হ'য়ে ফাঁসির হুকুম দেন, আর পেয়াদা হ'য়ে মারেন। ব্রহ্মের প্রথম সংকল্পই নিয়তি। জীবকে যে পরমাত্মার অংশ বলা হয়, তাহা কেবল বুঝাইবার নিমিত্ত। বাস্তবিক, তাঁহার অংশ নাই এবং 'জীব' বলিয়া কোন বস্তু নাই—ব্রহ্ম অখণ্ড এবং সবই তিনি।

যতীন-দুর্গা

নিগূঢ়া প্রকৃতি শিবে! বিশ্বের জননী,
*সর্বময়ী তুমি মাগো! দেবী নারায়ণী।

[*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৬)]

মূলপ্রকৃতি তুমি মা, ব্রহ্ম-স্বরূপিণী,
অদ্বিতীয়া সারা বিশ্বে, রামেচ্ছা-ভাবিনী
নিরাকারা তুমি কালী, বিশ্ব মূলাধার,
তোমা হতে হতেছে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার।
রাধিকা, সাবিত্রী, লক্ষ্মী, আর হৈমবতী,
ভেদহীন সবে সহ দেবী সরস্বতী।
দুর্গতি-নাশিনী মাতঃ! শিব-সোহাগিনী,
জগদ্ধাত্রী তুমি দুর্গে! বিশ্ব বিনোদিনী।
হরি-হর না জানেন মহিমা তোমার,
তাঁহাদের মাতা তুমি সার হ'তে সার।
তব মায়া বশে সবে মুগ্ধ ত্রিভুবনে,
নাহি সাধ্য কার তব তত্ত্ব নিরূপণে।
তুমি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়-শকতি,
তুমি সিদ্ধি-ঋদ্ধি-যোগ, ভকতি-মুকতি।
তব কৃপা হলে নর লভে ব্রহ্মজ্ঞান,
তোমার ইচ্ছা বিনা, না উদে তত্ত্বজ্ঞান।
ভোগ ও যোগ তখন হয় তব ভাব,
দেহের স্পন্দনে নাহি থাকে মম-ভাব।
বরিয়াছ আত্মরূপে, তুমি মা তুরীণী,
প্রণাম সহ চুম্বন, লহ নিস্তারিণী!
শিব-শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম, তুমি মা হৃদয়ে,
নাহি ভয় যতীনের বিশ্বের প্রলয়ে! (২৪)

যতীন-পরমাত্মা

বিষয়—তৃতীয়া পত্নী শরদিন্দুর সহিত বিবাহ-রাত্রের বরসভায়, মিলিত অত্যুজ্জ্বল সূর্য-চন্দ্রোপম একটি মণ্ডলাকার স্নিগ্ধ দিব্যজ্যোতিঃর ললাটের কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে দর্শনে, আমার বাহ্য-চৈতন্য হারাইবার উপক্রমের, কাহিনী।

স্থান—আপার সারকিউলার রোডে শরদিন্দুর ছোট মেসোমহাশয়ের নিজ বাড়ী পেয়ারাবাগান।

কাল—জুলাই মাসের মধ্য ভাগ, ১৯২৮ সাল—আন্দাজ রাত্র ৮-৯টায়।

[শরদিন্দুর জন্মদিন, ১১ই মার্চ, ১৯০৭]।

তৃতীয় পর্বের ১-২ অনুচ্ছেদে, প্রিয়ংবদার মৃত্যুর পর হইতে শরদিন্দুর সহিত বিবাহের পূর্ববর্তী এই পুস্তকে বর্ণনোপযোগী ঘটনারাজি অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। বিবাহ রাত্রে, অতি নিকট আত্মীয় ও অপরাপর কন্যাযাত্রীদিগের সহিত উপরোক্ত বাড়ীর বৈঠকখানায় উপবিষ্ট থাকিয়া, যখন আমি সাধারণভাবে আত্মরূপে শিব চিন্তা করিতেছিলাম, তখন ললাটের (আন্দাজ, এক বিঘত) উর্ধ্বে একটি অত্যুজ্জ্বল সূর্য-চন্দ্রোপম মণ্ডলাকার স্নিগ্ধ দিব্যজ্যোতিঃ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া, ভাব-বিভোর অবস্থায় অন্যের অগোচরে প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া (বুক গুর্-গুর্ করিতে করিতে) যেন মূর্ছিত হইয়া যাইতেছিলাম। সেই স্থান ও কাল যে ঐরূপ সমাধিপ্রায় অবস্থার বিশেষ অনুপযোগী এই জ্ঞান ছিল বলিয়া, আন্দাজ দুই তিন মিনিটের মধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইবার পর, উক্ত দিব্য আত্মজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়াছিল। নাসিকামূলের উর্ধ্বে, ভ্রূযুগলের মধ্যে ললাটের যে অংশ অবস্থিত, উহা 'অমৃতস্থান' বা 'অবিমুক্তক্ষেত্র', বা 'চন্দ্রমণ্ডল'। উহা ব্রহ্মাণ্ডের মহান্ আধার স্বরূপ এবং পরমাত্মার উপাসনার স্থল। জ্যোতিঃটি উহার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে দর্শন হইয়াছিল। পরে, বিবাহ রাত্রে যতটুকু অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে ঐ জ্যোতিঃর পুনঃ দর্শনলাভের সব চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। যাহা ঈশ্বর ইচ্ছায়—*অবশেষে কাগজের ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান (৭)—*কৃপায় মাত্র লাভ হইয়াছিল, তাহা

নিজ চেষ্টায় পাইব কেমন করিয়া? শিব-সংহিতায় আছে যে, ক্ষণকাল জ্যোতির্ময় আত্ম-দর্শন লাভ হইলে, সমস্ত পাপমুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ হয় (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ৯ অনুচ্ছেদ)।

২। উক্ত জ্যোতিঃ, সগুণ ব্রহ্মজ্যোতিঃর, বা কুলকুণ্ডলিনীশক্তির সহিত মিলিত কূটস্থ চৈতন্য জ্যোতিঃর, প্রতিবিম্ব (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২১) অনুচ্ছেদ ও ষোড়শ অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)। কুলকুণ্ডলিনী অখণ্ড জ্যোতিঃরূপিণী (**'সূর্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্'**)। যখন পরমাত্মায় গুণের কোন অভি-ব্যক্তি থাকে না, তখন তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। যখন তাঁহাতে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বিকশিত ও জগৎ আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য প্রকাশিত হয়, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম। ঐ জ্যোতিঃই বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ (৫ পর্ব, ৫ অনুচ্ছেদ)। অভেদ শিব ও শক্তির অপার করুণায়, শরদিন্দুর সহিত বিবাহ রাত্রে, আমার উক্ত-রূপে বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ জ্যোতিঃ বা সগুণ পরমাত্মজ্যোতিঃ দর্শন হইল। ঐ জ্যোতিঃ আত্মার ভিতরেই সারা বিশ্বে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান এবং উহাই অর্দ্ধনারীশ্বর শিব-শক্তি, বা অর্দ্ধার্দ্ধ অঙ্গে মিলিত কৃষ্ণ-রাধা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-সাবিত্রী, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, ইত্যাদি। উক্ত দর্শনের দ্বারা কৃপাময়ী, আমার আত্মা জগদম্বা আমায় এইরূপই বুঝাইয়াছিলেন—'তোমার কর্মফলে এই বিবাহ—কেননা, বিনা কারণে কিছু হয় না। কিন্তু তোমার আর সাধনভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিল না। নির্বাণ-ষটকের ভাব অনুযায়ী তোমার অত্যল্প সাধনার ফলস্বরূপ, এই সুদুর্লভ ও যোগিজন বাঞ্ছিত দর্শন! বাস্তবিক, তুমি স্বরূপে এই চিদানন্দরূপী শিবজ্যোতিঃ, যাহা কোন দেহবিকারে বা ভোগে কখনও লিপ্ত হইতে পারে না—যেমন সূর্য জগৎ প্রকাশ ও উহাতে নানাবিধ কর্ম সম্পাদনের সহায়ক হইলেও, নিজে তাহাতে লিপ্ত নহেন—***অবশে কাগজের ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান** (৮)। *একাগ্রভাবে আত্মবোধ দ্বারাতে ঐ অখণ্ড চৈতন্য-রূপী পরমাত্মা বা শিব জ্যোতিঃ তোমার অর্চনীয় এবং এই অর্চনায় অন্য কোন উপকরণ অনাবশ্যক।' রামকৃষ্ণদেব একবার তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকে এইভাবে বলিয়াছিলেন—'বিবাহ করিয়াছিস; তাহার জন্য ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে, একশতটা বিবাহ করিলেও, কোন ভয়ের কারণ থাকে না।'

৩। জাগ্রতাবস্থায়—সামান্য ঈশ্বর চিন্তায় তারকেশ্বরদেবের প্রায় অবাধ তিন দিনব্যাপী দর্শন; মিরাঠে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব, হস্তে বিবাহ সূত্র বন্ধন ও দেহে তিরোধান এবং কলিকাতায় তৃতীয় বিবাহ রাত্রে কূটস্থ সগুণ ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ দর্শন—ইহারা বড় সামান্য ও সাধারণ ঈশ্বরকৃপা নির্দেশক ঘটনা নহে।

শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে—সাধারণতঃ, পুরুষকারের দ্বারা যখন মন, বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি, আত্মাতে লোপ করিয়া মানব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, তখনই তাহার ঈশ্বর বা পরমাত্মা দর্শন হইতে পারে এবং অহঙ্কার অপহৃত হইলে, চিৎসূর্য দৃষ্ট হন ও সেই চিৎসূর্যরূপে পরিণত হইতে পারিলেই, তৎপদ প্রাপ্তি হয়। অতি কদাচিৎ, কৃপাবশে এই পরমাত্মা দর্শন শুদ্ধ মন ও বুদ্ধি যুক্ত ভক্তের দ্বারাও লাভ হয়। শ্রীমদ্ভগবতী গীতায় (১-৬৬), দুর্গাদেবী হিমালয়কে বলিতেছেন যে, বিদ্যার দ্বারা বা তত্ত্বজ্ঞান বলে আত্মা প্রত্যক্ষ হন এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয়—

তয়ৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষমনুভূয়তে,
তদৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবীমি তে।

যখন দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিলনভূমি বা মূলে, মাত্র শিব ও শক্তি (বা বিশুদ্ধ বোধ ও বোধ শক্তি), তখন আমার দুর্গারূপিণী দেহযন্ত্রের সর্ববিধ, সার্বকালীন ও লোকচক্ষে ভাল-মন্দ যাহা কিছু বিকার বা স্পন্দন, সবই অটুটভাবে তাঁহার ইচ্ছা (বা তিনি) এবং পরমাত্মরূপী আমি থাকিয়াও যেন নাই! অতি অল্প কথায়, ইহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র এবং এই মন্ত্রবলে আমি সর্ববিষয়ে পূর্ণ স্বাধীন ও শিব-শক্তির একটি যন্ত্রবিশেষ মাত্র—যেমন চালান, তেমনি চলি ; যেমন বলান, তেমনি বলি ; যেমন করান, তেমনি করি এবং এই সব বিষয়ে অনিবার্যরূপে সংসারের নিয়মে কাহার প্রিয় বা অপ্রিয় হইয়াও, প্রায় কোনরূপ চাঞ্চল্য থাকে না। যদি কিছু থাকে, উহা ঈশ্বরার্পিত বা অহঙ্কারবিহীন বলিয়া কোন কর্ম-ফল সৃজনে অসমর্থ! ঈশ্বরে সর্বার্পণ বুদ্ধিতে কার্য করিলে, পা বেতালে পড়ে না—কেননা, সকল কার্যেই ভগবৎ চিন্তা বা ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে এবং দয়া, তিতিক্ষা, সত্য, সংযম, ইত্যাদি উহাদিগকে পবিত্রতা দান করে। আরও একটি কথা এই যে, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তির দ্বারা যে সকল সদসৎ কর্ম অভিব্যক্ত হয়, তাহার দ্বারা তিনি স্তুত্য বা নিন্দনীয় হন না—যেমন যম (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৬ (২) অনুচ্ছেদ)। অন্তরে আমি শিব এবং বাহিরে দুর্গা, কিম্বা অন্তরে ও বাহিরে উভয়তঃ আমি একাধারে শিবও বটে এবং দুর্গাও বটে—কেননা, উভয়ে অভেদ! এই ভাবে, কোন ক্রিয়াযোগ বা তপশ্চরণ নিষ্প্রয়োজন—কেননা, **'অন্তর হিঃ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম'**—অবতরণিকা, ২৪ (৭) অনুচ্ছেদ ও প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ অনুচ্ছেদ। আরও, যখন সারা বিশ্বই চিন্মাত্রস্বরূপ পরমাত্মা, তখন অন্য কিছু নাই এবং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়, বা কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, ইত্যাদি, সবই চিন্মাত্র স্বরূপ, বা পরস্পর সম্বন্ধহীন, বা **'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'**।

৪। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে বর্ণিত ঘটনাদ্বয়ের দ্বারা শিবঠাকুর কৃপাবলে আমাকে

দুস্তর সংসারার্ণব পার হইবার জন্য সুদুর্লভ মোটামুটি যে-জ্ঞান প্রয়োজন (অর্থাৎ, বাহিরে দেহে আমি দুর্গা-স্বরূপ এবং অন্তরে আত্মায় আমি নিষ্ক্রিয় তেজোময় ব্রহ্মা-স্বরূপ) সবই দিলেন ; কিন্তু তাহাতেও আমার উপর নানা মূর্তিতে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৃপামৃত বর্ষণে বিরত হইলেন না। সেই সকল ঘটনা ক্রমে এই পুস্তকে বর্ণিত হইবে। তারকেশ্বরে যে ফুল-বিল্বপত্ররূপী অনন্ত আশীর্বাদ আমাকে দিতে আসিয়া নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তো আমাকে দিয়াই দিয়াছেন, আমার দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যাত হইলেও—কারণ, তিনি সত্যসঙ্কল্পরূপী এবং দত্তাপহারী নহেন! আর শুধু আমাকে দিলেই বা মহামহিম তাঁহার তৃপ্তি হইবে কেন? প্রিয়ংবদার স্থান যে এখন অধিকারিণী, তাঁহাকেও তো কিছু ধারণোপযোগী কৃপামৃত সিঞ্চন করিতে হইবে! পরে, এক স্বপ্নে (১৮ পর্ব) আমাকে বুঝাইলেন যে, দুর্গাদেবীর দানরূপে লব্ধ শরদিন্দু সামান্যা পত্নী নহেন। সেই জন্য, পরবর্তী পর্ব হইতে শরদিন্দুর তাঁহার কৃপামৃত পানের পালা আরম্ভ হইবে! ঐ প্রস্তর গঠিত লিঙ্গমূর্তি ঠাকুরের মাহাত্ম্য কে বর্ণনে সমর্থ? আমার প্রচেষ্টা, পৃথিবীকে একটি মানচিত্রের দ্বারা অঙ্কন করিয়া দেখাইবার চেষ্টার সহিত যৎসামান্য উপমেয়! তাঁহার কৃপালব্ধ শক্তি হইতেই এই মানচিত্র অঙ্কিত হইতেছে। বিশ্বে একমাত্র অভেদ পরমাত্মা শিব-শক্তিই খেলোয়াড এবং সেই খেলার বশে শিবশক্তিরূপী কেহ বা জীবন্মুক্ত, আর কেহ বা বদ্ধ! ইহাই তাহাদের নিয়তি, বা বিধিলিপি! তাঁহাদের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই। যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রদত্ত পুরুষকার ও বিবেক বলে সৎপথাবলম্বী, সে মুক্ত। প্রেমলক্ষণা জ্ঞানের দ্বারা শিব-শক্তিকে বা পরমাত্মাকে সর্বার্পণ করিতে পারিলে, আর পুনর্জন্ম হয় না।

৫। পূর্ব অনুচ্ছেদের শেষ প্রসঙ্গটি, মনোরমা ও শরদিন্দু সংক্রান্ত দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবলম্বনে, এই স্থলে আলোচনা করিব। শরদিন্দুকে বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, আমি মিরাঠে ফিরিয়াছিলাম। সেইদিন রাত্রে, শয়নকক্ষের মেঝে স্থিত শয্যা গ্রীষ্ম বশতঃ ত্যাগ করিয়া যখন শরদিন্দু ভূমে তন্দ্রাভিভূত, তখন তিনি সুস্পষ্ট বোধ করিয়াছিলেন যে, একটি তুষার-শীতল করতল তাঁহার ললাট কিছুক্ষণ স্পর্শ করিল। উহা আমার, কার্য কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অস্বীকার করত শরদিন্দুকে বলিয়াছিলাম—তুমি উহাকে, উপযুক্ত দিনে, মনোরমার আশীষরূপে গ্রহণ করত নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।' ইহার দু'এক মাস পরে, একদিন রাত্রে শরদিন্দু স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, গৌরবর্ণা ও সম্মুখের দাঁত ঈষৎ উচ্চ একটি স্ত্রীলোক শয়নকক্ষের বারাণ্ডায় উপবিষ্টা হইলে, তিনি তাঁহকে অনুমানে 'মেজদি'

বলিয়া সম্বোধন করত ভিতরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, স্ত্রীলোকটি অস্বীকৃতা হইয়া বলিলেন—'আমি যাইব না; তুমি আমার পুত্রকন্যাদিগকে দেখিও।' উহার পরে, শরদিন্দু বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, মনোরমার দাঁত উক্তরূপ ছিল। প্রথম (জাগ্রত) ঘটনাটি, পারলৌকিক দেহে মনোরমার শরদিন্দুকে, উপযুক্ত দিনে, আশীর্বাদ করিতে আগমন অসম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় (স্বাপ্ন) ঘটনাটি তাহা নহে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই শরদিন্দুর আত্মস্থ বা আত্মা (শিব ও শক্তি), এবং সেই আত্মা স্বপ্নে তাঁহার ভিন্নরূপী মনোরমাকে প্রকট করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের উক্ত কর্মফল জ্ঞাত করিয়াছিল (১ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। উভয় ঘটনাই যথাযথ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা বেশ যাইবে যে, উহারা (অল্প কথায়) বিশুদ্ধ বোধের (শিবের) ভিত্তিতে নানা বোধশক্তির (দুর্গার) বিকাশ মাত্র। এই রূপেই, সারা বিশ্ব শিব ও শক্তিময় এবং তাঁহারা এখানে অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। অতএব, শিব ও শক্তিরূপী আমাদের দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব দেহস্পন্দন অর্পণীয়। সাগরে, জল এবং উহার সমগ্র শক্তির নানাবিধ তরঙ্গ বিনা অন্য কি, আছে? বাহ্য বিশ্বই শিব-শক্তিরূপী এবং উহার সর্ববিধ স্পন্দন তাঁহাদিগেরই ইহাই প্রেমলক্ষণা যথার্থ জ্ঞান—অর্থাৎ, 'যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা ইষ্ট স্ফুরে!' বিশ্বে এমন কিছু নাই যাহা 'রামের-রমণ' হইতে উদ্ভূত নহে! ইহার যে নানাত্ব, সাগরে অনন্ত তরঙ্গের ন্যায়, শিব-শক্তিরূপী।

যতীন-পরমাত্মা

সকল তত্ত্বের সার হয় ব্রহ্মজ্ঞান,
দূর করে যাহা সব তিমির অজ্ঞান।
নির্গুণ পরব্রহ্মের নাহি অভিব্যক্তি,
সগুণ যখন তিনি, বিশ্বের উৎপত্তি।
সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম, পরমাত্মা রূপে,
ব্রহ্মা হতে তৃণাবধি স্থিত সাক্ষীরূপে।
মনরূপে দেহে বিধি, জ্ঞানরূপে হর,
প্রাণরূপে হরি, আর ঈশ সর্বেশ্বর।

মায়োপাধি আত্মা তাঁরা, ব্রহ্মাণ্ড আধার,
সর্বদেহ স্পন্দনের তাঁরা মূলাধার।
পরম-আত্মার কিন্তু সকলে অধীন,
তিনি যতদিন, তাঁরা দেহে ততদিন।
নাহি কোন বস্তু বিশ্বে, স্পন্দনে স্বাধীন,
ব্রহ্ম-বিক্রম কালের সকলে অধীন।
পরম আত্মায় রাখি মূলে কুণ্ডলিনী,
সর্ব প্রাকৃত-বস্তুর শকতি চালিনী।
মায়াবশে ক্রিয়াহীন জীব অহং-জ্ঞানে,
করে দেহে আত্মবোধ, বিভোর অজ্ঞানে
লভি কর্মফল ইথে নানা যোনি ভ্রমে,
নাহিক নিস্তার তার অজ্ঞান বিক্রমে।
নানা জলপূর্ণ পাত্রে করিলে দর্শন,
সূর্য প্রতিবিম্ব তাহে দেখায় যেমন।
বিশ্ব বস্তু সেইরূপে পরম-আত্মার,
নানা প্রতিবিম্ব মাত্র অন্য নহে আর।
পাত্র ভঙ্গে প্রতিবিম্ব যথা পায় লয়,
সেইরূপ মুকতিতে জীবের বিলয়।
হরি-হর আদি জীব সমষ্টি আকার,
পরম-আত্মার মাত্র বিভিন্ন প্রকার।
প্রতিবিম্ব জল-মধ্যে যেমন অভেদ,
সেইরূপে সর্বজীবে নাহি কিছু ভেদ।
একমাত্র পরমাত্মা বিশ্বে অবস্থিত,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি সব তাঁহাতে কল্পিত।

বস্তুতঃ বিশ্বের নাহি কোনই আকার,
যেমন নির্গুণ ব্রহ্ম সদা নিরাকার।
সগুণ তাঁহার রূপ, আর সব নাম,
ভ্রান্তির বিলাস মাত্র, ভ্রান্তি পরিণাম।
সৃজে স্বপন অলীক প্রাসাদ-বাগান,
সেইরূপ স্বপনে জীব, বিশ্বে ক্রিয়মান।
নাহি বিশ্বে নানা ক্রিয়া আর ইচ্ছা জ্ঞান,
চিদাকাশ রূপে ইহা চির বিদ্যমান।
আবির্ভূতা পরমাত্মা হতে সারা বিশ্ব,
পরমাত্মায় বিলীন হবে এই বিশ্ব।
সৎ-চিৎ-আনন্দে গঠন তাঁহার স্বরূপ,
গোলাকার জ্যোতি তাঁর গুণযুত রূপ।
সূর্য-কোটী সম জ্যোতিঃ অতি মনোহরা,
আহা কিম্বা স্নিগ্ধ, যেন কোটী চন্দ্রে গড়া
ব্যাপী বিশ্ব বিদ্যমান আকাশ যেমন,
জীবভাব চিদাকাশে জ্যোতিঃও তেমন।
ত্যাজি যোগী বাহ্যজ্ঞান, অন্তরে আপন,
সূর্যচন্দ্রোপম জ্যোতিঃ করে দরশন।
তেজোময় ব্রহ্মধ্যান করি যোগিগণ,
সার্থক করেন এই মানব জীবন।
নির্গুণ যখন তিনি, তিমির আকার,
সগুণ যখন, তাঁর জ্যোতিঃর আকার।
পুরুষ উত্তম তিনি পারে প্রকৃতির,
নির্গুণ যখন তাঁতে লয় প্রকৃতির।

সূর্য আর সূর্য-রশ্মি নহে যেন ভিন্ন,
পুরুষ আর প্রকৃতি তেমন অভিন্ন।
সৃষ্টিকালে সত্ত্ব-রজ-তম তিন গুণে,
প্রকৃতি প্রকাশ হন অশেষ যতনে।
কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে ব্রহ্মছায়া হন,
পুরুষ বিজয়ী নাম করেন ধারণ।
নির্গুণ নিজের গুণে গুণময় হন,
পুরুষ-প্রকৃতি রূপে প্রতি দেহে রন!
যেমন কল্পনা ব্রহ্মে হইবে বিকাশ,
প্রাকৃত-শকতি হবে তেমনে প্রকাশ
সে সব শকতি মূলে মহাকালী মাত্রে,
সাক্ষীরূপী পুরুষের ক্রিয়ারূপী মাত্র।
সারা বিশ্ববীজরূপী ব্রহ্মের প্রকৃতি,
কুণ্ডলিনী সহ ব্রহ্ম, জ্যোতিঃর আকৃতি।
ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা দেবী শাস্ত্রের বচন,
ব্রহ্ম সহ ভেদ তাঁর নাহি কদাচন।
ব্রহ্ম প্রেরণা বস্তুতঃ সবের কারণ,
সবার প্রধান তিনি, জানে জ্ঞানীগণ।
সর্বলোকাশ্রয় যিনি, তাঁহারে প্রণতি,
সর্বলোকাশ্রয়ী যিনি, তাঁরে করি নতি।
সর্বলোক-আত্মা যিনি, তাঁহারে বন্দন,
সর্বময়কে যতীন করে সর্বার্পণ।
অদ্বিতীয় বিজ্ঞাতার কে করে কীর্তন?
খদ্যোতের শক্তি কোথা সূর্য প্রকাশন! ৮০)

শরদিন্দু-কালিকা

[পাদটীকা (৪)]

শ্রীমদ্ভাগবত

(১) ভক্তিযোগাৎ মুক্তিঃ।

(২) ভক্তি-যোগে যে আমার (শ্রীকৃষ্ণ) ভজনাসক্ত, আমি তাহার হৃদয়ে অবস্থান করি, সুতরাং তাহার সমস্ত অভিলাষ নষ্ট হয়। ভক্তি-যোগে জীবাত্মা বাসনা ত্যাগ করিয়া মৎ-স্বরূপতা লাভ করে।

বিষয়—শরদিন্দুর এক নদীগর্ভোস্থিত কালী-মন্দিরে, তাঁহার অর্চনা দর্শনান্তে, তাঁহা হইতে অভয় প্রাপ্তির স্বপন।

স্থান— মিরাঠ ছাউনির বাসা-বাড়ী।

কাল— নভেম্বর বা ডিসেম্বর, ১৯২৯। তখন শরদিন্দুর প্রথম সন্তান, কন্যা গীতারাণীর বয়স চারি-পাঁচ মাস মাত্র।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"আমি যেন আমার এক আত্মীয়া ও দুই তিনটি (গীতা নহে) ছোট ছোট কন্যা ইত্যাদির সহিত কালীমাতার এক মন্দিরে নৌকারোহণে গিয়াছি। মন্দিরটি নদী গর্ভে ও চারিদিক জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দির মধ্যে শঙ্খ ও ঘণ্টার রবের সহিত মা জননীর আরতি হইতেছে এবং এত ভীড় যে, অতি কষ্টে কোন ক্রমে প্রতিমার পার্শ্বে সামান্য একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইয়া করজোড়ে তাঁহার চিন্তায় আরতি দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হইল যেন ঘরের মধ্যেই সকলের উর্দ্ধে আমি দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু কেমন করিয়া যে ইহা সম্ভব হইল তাহা বুঝিলাম না। তখন আত্মীয়াটি আমায় বলিলেন, 'তুমি কি করেছ? কালীমাতার খাঁড়ার উল্টাদিকে যে দাঁড়াইয়াছ!' তখন আমি বিশেষ ভয়ে মাকে ডাকিতে লাগিলাম এবং আরতি শেষে খাঁড়াটি স্বতঃ আমাকে লইয়া ভূমে নামিল। মন্দির গৃহ সম্পূর্ণ জনশূন্য

---

(৪)—অষ্টোত্তর শত পর্বে বিভক্ত এই পুস্তকে, সংখ্যানুক্রমিক পর্বগুলি (মোট ত্র্যশীতি—৮৩) নিজ, ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমিক পর্বগুলি (মোট বিংশতি—২০) পত্নী শরদিন্দু ও স্বরবর্ণানুক্রমিক পর্বগুলি (মোট পঞ্চ-(৫)) কন্যা গীতা, সংক্রান্ত এবং সকল পর্বগুলিই ক্রমিক সূত্রে গ্রথিত। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমিক পর্বগুলিতে যে সকল পদ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বন্দনা আছে, তাহারা আমার দ্বারা লিখিত।

হইলে, সকাতরে দেবীকে বলিলাম, 'মা! আমি না দেখিয়া তোমার খাঁড়ার উপরে দাঁড়াইয়াছিলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করুন,' এবং খুব কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তখন প্রতিমা সচৈতন্যা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার গাত্র হইতে বিদ্যুৎপ্রভা বিশিষ্ট নীলবর্ণের দিব্যজ্যোতিঃ বিনির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি আমাকে তাঁহার অভয় (দক্ষিণ দিকের উর্ধ্ব) হস্ত নাড়িয়া 'থাক্'-'থাক্' রবে অভয় দান করিলেন। তৎপরে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।"

২। এই সকল স্বপ্ন যে সাধারণ স্বপ্ন নহে, তাহা বার বার এই পুস্তকে আলোচনা হইয়াছে। ইহারা সত্য, কর্মফল প্রকাশক এবং ঈশ্বর কৃপার ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সূচক! বাস্তবিক, তাহাই ঘটিয়াছিল—পরবর্তী পর্বগুলি পাঠ করিলেই তাহা বেশ প্রতীয়মান হইবে। যেমন পূর্বে ২ পর্বে বর্ণিত জাগ্রৎ ঘটনাগুলি আমার ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়তির লিপি উন্মোচন করিয়াছিল, সেইরূপ এই স্বপনটি শরদিন্দুর ভবিষ্যৎ 'আধ্যাত্মিক' জীবনের নিয়তির লিপি উন্মোচক রূপেই তাঁহার আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রভেদ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে 'শিব' এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'কালী' উক্ত নিয়তির লিপি উন্মোচক!

৩। আমার সহিত বিবাহের কিছু পূর্বে শরদিন্দু স্বপ্নে শিবঠাকুরকে স্বীয় মস্তকদেশের নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন এবং উক্ত স্বপ্নটি তাঁহার বিবাহের পর প্রথম আধ্যাত্মিক স্বপ্ন। অধিকাংশ ভক্তিমতি স্ত্রীলোকের ন্যায়, তখন তাঁহার সাধন পদ্ধতিতে (বৈধী অর্চনায়) ভক্তিভাবই—বিশেষতঃ, লক্ষ্মীদেবী ও শিব-ঠাকুরের উপর—বলবতী ছিল এবং জ্ঞানভাবের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ ছিল না। খুব মোটামুটি জ্ঞানভাবগুলি কেবল নামে মাত্র জানিতেন: কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞানভাবগুলি শিখাইতে গেলে, তাহাদের উপর কোন বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে দেখিতাম না। এখনও দেখি যে, ভক্তিভাবগুলির উপর তাঁহার নিষ্ঠা এবং ইষ্ট চিন্তা, গুরুমন্ত্র জপ, নানা ঈশ্বর মূর্তির অর্চনা, নানাবিধ ব্রত আচরণ, ইত্যাদি তাঁহার সাধন পদ্ধতি। কালীমাতার খড়্গ তাঁহার বিদ্যাংশ-সম্ভূত জ্ঞান নির্দেশ করে। আমার অনুমান হয় যে, শরদিন্দুর মায়ের খড়্গের উল্টাদিকে অতর্কিতভাবে আরোহণ করিয়া অনেক ব্যক্তির উপর হইতে তাঁহার চিন্তা, জ্ঞানমার্গের বিশেষ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা ত্যাগ করত ভক্তি মার্গ কায়মনোবাক্যে অবলম্বন নির্দেশক। শরদিন্দুর ঐ ভাব, অভয় হস্ত সঞ্চালনে অভয় দান করিয়া, কালীমাতা অনুমোদন করিলেন এবং উহাতেই যে তিনি শরদিন্দুকে কৃপা করিবেন তাহা জানাইলেন। স্বপ্নটি উহার পূর্বাভাস, বা তাঁহার প্রতিশ্রুতি, বা শরদিন্দুর নিয়তি। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কৃপার কাহিনী, বা 'রামের রমণের' ফল, পরে বর্ণিত হইবে।

শরদিন্দু—কালিকা

লভি কালীর অভয়, চলি গেল ভব ভয়,
যম ডরে নাহি থাকি!
সংসার তরিয়া যাব, রাঙ্গা পদে স্থান পাব,
গণি কত দিন বাকি।
বেদ ও আগম পার, সার হতে তুমি সার,
মহিমা অজ্ঞাত বিধি ভব।
অবোধ তনয়া আমি, মহীয়সী মাতা তুমি,
কিবা জানি গুণ তব?
তুমি মাতা দিবে যাহা, পাবে মাত্র জীব তাহা,
কে আছে বিশ্বে স্বাধীন?
শয়নে বা পর্যটনে, স্বপনে বা জাগরণে,
সকলে তব অধীন।
সর্ববিশ্ব সর্বক্ষণ, কর মা পরিচালন,
বিশ্বাধারা দুর্গা তুমি!
তুমি ভক্ত রক্ষাকর্ত্রী, তাহাদের মুক্তিদাত্রী,
বিপদে সম্পদে তুমি।
তুমি ভক্তি, তুমি ধৃতি, তুমি কীর্তি, তুমি মুক্তি,
চুমি মুখে কোটীবার।
তুমি স্থূলা, ভূমি তুষ্টি, তুমি সুক্ষ্মা, তুমি পুষ্টি,
নমি পদে বার বার।
তুমি রণে, তুমি বনে, মোর পূজা সম্পাদনে,
লহ নতি দিবা-রাত্র।
তুমি জ্ঞান, তুমি ধ্যান, তুমিতো মাগো অজ্ঞান-
শরদিন্দু যন্ত্র মাত্র! (২৪)

শরদিন্দু-সারদা

বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী

নিশ্চয় জানিও যে, নরকে যাইলেও সেখানে বুকে করিয়া রাখিবার একজন আছেন—তিনি সদ্‌গুরু।

বিষয়—নরকে, পঙ্কিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এক দুর্গম সুড়ঙ্গপথে, শরদিন্দুর একটি বিধবা বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার সহিত অবশিষ্ট পথ সহজে অতিক্রমণ এবং তৎপরে দিবালোকপূর্ণ স্থানে একটী ছোট মন্দির ও তদভ্যন্তরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিগ্রহ দর্শনের স্বপন।

স্থান— মিরাঠ ছাউনীর বাসা-বাড়ী।

কাল—১৯৩০ সালের প্রথম ভাগ।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"আমি যেন এক পঙ্কিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ দিয়া কোথায় যাইতেছি। আলোক বা আকাশ সেখানে দেখা যাইতেছিল না ও ছাদ মাথা স্পর্শ করিতেছিল। সেইজন্য হেঁটমুণ্ডে চলিতে বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। এইরূপ অসহ্য কষ্ট অনুভব করিয়া বার বার বলিতে লাগিলাম, 'এ কি পথ গো! এখান দিয়া কেমন করিয়া যাই?' এমন সময়, হঠাৎ সেখানে একটি বিধবা বেশিনী বৃদ্ধা আবির্ভূতা হইয়া আমাকে বলিলেন, 'এ যে নরক, তুমি জান না?' বৃদ্ধা এই বলিয়া নীরবে আমার সঙ্গিনী হইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি ঐ পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি সুন্দর দিবালোকে উদ্ভাসিত স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে একটি ছোট মন্দির দর্শন করিয়া বৃদ্ধাকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করত শুনিলাম যে, উহা নরকের রাধাকৃষ্ণ মন্দির। আমি উহাতে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিলাম না। বিগ্রহের সম্মুখে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং কোশাকুশি, ফুল ও চন্দনাদি পূজোপকরণ ছিল। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া মন্দির হইতে বাহির আসিতেই, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইল।"

২। শরদিন্দুর আত্মার দ্বারা প্রকটিত উক্ত স্বপ্নে (বা ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যৎ ছায়া-পাত হইতে), বৃদ্ধাটির স্বরূপ বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইয়াছিল। ঘ পর্বে বর্ণিত ঘটনা হইতে, (বোধ হয়) আমরা সন্দেহের সহিত বুঝিয়াছিলাম যে, বিধবা বেশিনী কখন বৃদ্ধা (খ পর্ব) এবং কখনও বা প্রৌঢ়া (ঘ পর্ব), শরদিন্দুর স্বাপ্ন কৃপাদায়িকা, পথপ্রদর্শিকা ও সাহায্যকারিকা স্ত্রীলোকটি মা সারদেশ্বরী ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পরে, যখন ১৯৩৮ সালের প্রথমে তিনি শরদিন্দুকে গুরুরূপে মন্ত্রদান করিলেন (চ পর্ব), তখন আর তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে বাকি —অবশেষে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৯)—রহিল না। ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি অবধি আমি বা শরদিন্দু রামকৃষ্ণদেব ও সারদেশ্বরীদেবীকে অবতার বা অবতারিণী বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করিতাম না। যখন পুস্তকাদি ভাল করিয়া পাঠ ও সহকর্মী, রামকৃষ্ণভক্ত, দেবীনারায়ণচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিশেষ ভাবে চর্চাদি করিয়া তাঁহাদের স্বরূপের সামান্য জ্ঞান আমাদের হইয়া-ছিল, তখনই তাঁহারা নিজ স্বরূপ আমাদের নিকট স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিয়া (৫ ও চ পর্ব), সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে, মা সারদেশ্বরী কেবল অহৈতুকী কৃপাই ছদ্মবেশে শরদিন্দুকে করিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহাদের স্বরূপ, প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়ে ও অবতরণিকা খণ্ডের প্রথম নিবেদনে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে এবং পরবর্তী পর্বগুলিতেও এই বিষয়টি ক্রমে ক্রমে প্রকট হইবে। তাঁহাদের গুণ কীর্তন মানব বুদ্ধির অনেক দূরে! যিনি রাম, বা যিনি কৃষ্ণ তিনিই একাধারে রামকৃষ্ণ ; আর যিনি কালী, বা দুর্গা, বা রাধা, তিনিই একাধারে সারদেশ্বরী! স্বয়ং জগদম্বাই (তাঁহার ভিন্নরূপে ও ছদ্মবেশে) তাঁহার অভয়দান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (ক পর্ব) শরদিন্দুকে অজ্ঞান নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণের অর্চনার পথ অবলম্বন করিতে ইঙ্গিত করিলেন ও তাঁহার সূক্ষ্মদেহ পরিমার্জিত করিলেন। সারদেশ্বরীর ঈশ্বরী-স্বরূপের উপর বিশ্বাস না থাকিলেও, তিনি শরদিন্দুকে অহৈতুকী কৃপা হইতে বঞ্চিত করিলেন না। শরদিন্দুর নিয়তির লিপিই এইরূপ !

৩। উক্ত ঘটনার আট বৎসর পরে, সারদেশ্বরীদেবী শরদিন্দুর ত্রাণকর্ত্রী গুরু হইবেন, সেই জন্য ইহার দ্বারা তিনি শরদিন্দুকে তাঁহার গুরুশক্তির পূর্বাভাস দান করিলেন ও জানাইলেন তিনি অজ্ঞানবশে সূক্ষ্মদেহে কিরূপ নরক বাসের উপযুক্ত তখন হইতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ আলোচ্য। উহা পাঠে বুঝা যাইবে যে, সংসারে যাহারা জ্ঞান রহিত কর্মানুষ্ঠায়ী তাহারা দেহান্তে সংসারের কারণ-স্বরূপ অজ্ঞান (সাধারণতঃ, প্রেতলোক) আশ্রয়

করে [পাদটীকা—(৫)], আর যাহারা কর্ম-প্রতিপাদক বেদবিদ্যায় নিরত থাকিয়া উপনিষদের জ্ঞান উপলব্ধি করে না, তাহারা অধিকতর অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া, 'অনন্দ', (বা আনন্দহীন) নরক লাভ করে। জীবিতাবস্থায়, বাস্তবিক কোন নরক গতি লাভ না করিয়াও, অজ্ঞানতা নিবন্ধন শরদিন্দু দেহান্তে কিরূপ লোকে বাসোপযোগী কর্মফল সৃজন করিতেছিলেন, তাহা কৃপাবশে মা সারদেশ্বরী দেখাইয়া তাঁহাকে সদ্গুরুরূপে (যথার্থ মন্ত্র না দিয়াও) তথা হইতে উদ্ধার করত বাধ্য-

---

পরলোক গতি।

(৫)—প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়ে, পরলোকগতি ও মোক্ষ তত্ত্বের অনেক বিষয় নিহিত হইয়াছে। সারদেশ্বরী দেবী বলিয়াছেন (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১২ (১) অনুচ্ছেদ)—'উন্নত পুরুষ ভিন্ন আর সকলকেই এক বৎসর প্রেতযোনিতে থাকিতেই হয়। তাহার পর, গয়ায় পিণ্ডদান, মহোৎসব, ইত্যাদি ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করিলে, প্রেতযোনি মুক্ত হইয়া উপযুক্ত লোকে গতি হয়..মানুষ যে রোগে মরে, যদি প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তার পর জন্মেও সেই রোগ হয়'। প্রেতত্বের কারণ এই যে, অজ্ঞান উপাদানে সৃজিত এই বিশ্বে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞান বা দেহাত্মবোধী। যথার্থ জ্ঞানী বা ভক্তের এই বালাই নাই। বিষয়টি সাধারণ মানবের এত প্রয়োজনীয় যে, ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু দয়ানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'পরলোক-রহস্য' নামক পুস্তক হইতে নিয়ে লেখা আবশ্যক মনে করি—

"যে সকল মনুষ্য পুণ্যার্জন করে নাই এবং বিষয় বিলাসে পাপময় জীবন যাপন করিয়াছে, তাহাদের মৃত্যুকালে বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পরও প্রেতযোনিতে বা নরকে গতি হইয়া থাকে...যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে মানব শরীর ত্যাগ করে, মৃত্যুর পর সেই ভাবানুসারে তাহার গতি হইয়া থাকে (গীতা, ৮-৬)। যে সাধক ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বগতি হইয়া থাকে। কিন্তু আজীবন বিষয়মুগ্ধচিত্ত জীবের সে সৌভাগ্য কোথায়? তাহার মৃত্যুর সময়ে বিষয় বাসনার কুপরিণামহেতু চারিপ্রকার নিদারুণ দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে...মৃত্যুকালে, স্থূলশরীরের (অন্নময় কোষের) সহিত, সূক্ষ্মশরীর (প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানময় কোষ), কারণ শরীর (আনন্দময় কোষ) এবং জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয়। যে বস্তুর সহিত অনেকদিনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকে, তাহার সহিত বিচ্ছেদের সময় অবশ্যই অত্যধিক কষ্ট হইবে...এই গূঢ় আন্তরিক দুঃখকেই মৃত্যুযাতনা বলে এবং ইহারই সংস্কার অন্তঃকরণে অনেক জন্ম হইতে সঞ্চিত থাকায় মৃত্যুর নামমাত্রেই জীবকে মৃত্যুভয়ে ভীত করে। ইহাই মরণকালীন প্রথম ক্লেশ যাহা ধীর যোগী ভিন্ন বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ধীর ভক্তযোগীর সূক্ষ্মশরীর ও আত্মা বিষয় বাসনারূপ নির্যাসের দ্বারা স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া ভক্তি ও প্রেম নির্যাসের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, এজন্য মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না...মৃত্যুর সময়ে বিষয়ী পুরুষের দ্বিতীয় প্রকার ক্লেশের কারণ 'মোহ'—'হায়! আমি আমার প্রাণপ্রিয় শিশুগুলিকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব...আমার সহধর্মিণী অনাথিনী হইয়া চিরজীবন কষ্টে কালযাপন করিবেন, ইত্যাদি..' মোহমূলক দুঃখচিন্তায় মুমূর্ষুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। এ সকলই মৃত্যুকালীন দ্বিতীয় দুঃখ। কুটুম্বপোষণে ব্যাপৃতচিত্ত অসংযমী

কৃষ্ণের অর্চনার ইঙ্গিত করিলেন। প্রকারান্তরে, তিনি আরও বুঝাইলেন যে, উপনিষদ-বিদ্যা আত্মজ্ঞান না থাকিলেও, সদ্‌গুরুর কৃপায়, বা রাধাকৃষ্ণের ভক্তির দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব। স্বয়ং মহামায়া শরদিন্দুকে যখন পথ দেখাইলেন, তখন আর তাঁহার সংসার হইতে পরিত্রাণ না পাইবার কারণ কি? এই জন্যই তো কালীরূপে অভয় দান করিয়া, তিনি শরদিন্দুকে জানাইয়াছিলেন যে, জ্ঞান না থাকিলেও, তিনি ভক্তির দ্বারাই মুক্তি লাভ করিবেন (**ভক্তিযোগাৎ মুক্তিঃ**)।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কুটুম্বগণের দুঃখ দেখিয়া এইরূপে হতবুদ্ধি হইয়া থাকে…তৃতীয় প্রকার দুঃখ অনুতাপ নিবন্ধন—'হায়! আমি শাস্ত্র জানিয়াও বিষয়ের মোহে মত্ত হইয়া কিছুই ধর্মানুষ্ঠান করি নাই, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া উহাদের সুখে রাখিবার নিমিত্ত কতই চুরি, জুয়াচুরি, ইত্যাদি করিয়াছি… যৌবন মদোন্মত্ত হইয়া কতই ব্যাভিচার, সতীর সতীত্ব নাশ, ইত্যাদি ঘৃণিত পাপাচরণ করিয়াছি…কিন্তু এখন ঐ সকল পাপ মূর্তিমান হইয়া আমাকে দারুণ যমদণ্ডের ভয় দেখাইতেছে।' ইহাই মৃত্যুকালীন অনুতাপ জন্য তৃতীয় দুঃখ। মরণকালীন চতুর্থ দুঃখ এই যে, ঠিক মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মনুষ্যের প্রকৃতি মৃত্যুর পর তাহাকে স্বকর্মানুসারে যে লোকে যাইতে হইবে সেই লোকের প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন করে এবং সেই হেতু মৃত্যুর সময় জীব পরলোকের অনেক দৃশ্য দেখিতে পায়…স্বর্গগতিতে স্বর্গীয় দেবদেবী এবং যমলোক গতিতে ভীষণ যমদূতগণকে দেখিতে পাওয়া যায়… এই সকল দৃশ্য পুণ্য বা পাপের তারতম্যানুযায়ী নানা আকার ধারণ করে…অনেক মুমূর্ষু ভয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে…যমলোকবাসী জীব করাল মূর্তিতে পাপীকে নরকের বীভৎস দৃশ্য সমূহ দেখায়, কাল্পনিক নরকাগ্নি উৎপন্ন করত তাহার মধ্যে ফেলিল এইরূপ ভয় জন্মায় এবং বলপূর্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া কৃমিকীটাদিপূর্ণ বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে যায়…এই সব, বিষয়ী ব্যক্তির মৃত্যুকালীন চতুর্থ দুঃখ।

২। সূক্ষ্মদেহ উক্ত চতুর্বিধ ক্লেশে প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয় এবং এই মূর্চ্ছাবস্থাতেই তাহার সূক্ষ্ম-শরীর স্থূলদেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া থাকে…মৃত্যুর সময়ে সূক্ষ্মশরীরের এই মূর্চ্ছাবস্থার জন্য যে লোক প্রাপ্তি হয়, তাহাকে 'প্রেতলোক' বলে। কিন্তু এই মূর্চ্ছা সাধারণ সংজ্ঞাহীনতাযুক্ত মূর্চ্ছার মত নহে। ইহাতে কেবল মোহাদি জনিত প্রবল ভাবনা ও দুঃখের বশে অজ্ঞানতাময় একপ্রকার উন্মত্তদশা প্রাপ্তি হয়। জীব কর্মবশে পূর্ব দেহত্যাগ করত—তৎক্ষণাৎ অন্য শরীর প্রাপ্ত হয়। স্থূলশরীর ত্যাগ হইলেই উহাকে বহন করিয়া অন্যলোকে লইয়া যাইবার মত যে সাময়িক অদৃশ্য শরীর সকলের জন্মে তাহার নাম 'আতিবাহিক' + দেহ। এই দেহ নরক বা স্বর্গলোকাদি যাইবার মত বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন খামের ভিতর পত্র যায়, ঐরূপ আতিবাহিক দেহমধ্যে রাখিয়া দেবতারা জীবকে লোকান্তরে লইয়া যান। প্রেতলোক ও নরক লইয়া যাইবার জন্য যমদূতগণ; স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য দেবদূতগণ এবং অসুরলোক লইয়া যাইবার জন্য অসুরদূতগণ। জীব প্রেতলোক গেলে প্রেতদেহ ধারণ করে। প্রেতদেহ পূর্বকার দেহ মতই হয়, কিন্তু উহা বায়ুতত্ত্বপ্রধান ও সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। জীব নরকে গেলে, তাহাকে বার্ধক্যময় নারকীয় দেহ ধারণ করিতে হয় এবং স্বর্গে গেলে, যৌবনময় দেহ লাভ হয়।

অবতার ও মহাপুরুষগণ সকলে একবাক্যে বলিতেছেন যে, ভক্তিযোগে মুক্তির জন্য যাহা প্রয়োজন সবই পাওয়া যায় এবং ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিলে, কিছুরই অভাব থাকে না। সদ্‌গুরু যে নরকেও শিষ্যকে বুকে করিয়া রাখেন (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৪ (৪) অনুচ্ছেদ, সেই শাস্ত্রবাক্যের একটি প্রমাণ এই কাহিনীটি। তিনি কৃপা করিয়া না বুঝাইলে, ঈশ্বরের কার্যের যৎসামান্য 'হদিস' ও মানব খুঁজিয়া পায় না। এই কৃপা, সাধারণতঃ সূক্ষ্মজগতে বা স্বাপ্ন-দেহে 'রামের রমণের' ফলরূপে, অনুভূত হয়।

+[(টীকা)—সংসারী জীব সুদৃঢ আত্মবিস্মৃতির জন্য নিরাকার আতিবাহিক দেহ ভুলিয়া গিয়া আধিভৌতিক দেহ জ্ঞানে প্রতিভাত হইতে থাকে। জ্ঞানাভ্যাসে বাসনা ক্ষীণ হইলে, এই দেহেই অতিবাহিক শরীর লাভ হয়, কিন্তু উহাকে কেহ দেখিতে পায় না। এই বিশ্বে দৃশ্য মাত্রেই অসম্ভব ও মিথ্যা এবং উহাতে বাস্তবিক আতিবাহিক হইতে উৎপন্ন আধিভৌতিক কিছু নাই—সবই কল্পিত স্ব-স্বরূপ।]

৩। পূর্বশরীর ত্যাগের পরক্ষণেই মানবের দ্বিতীয় শরীর প্রাপ্তি তখনই হইতে পারে, যদি প্রেতযোনি প্রাপ্তি না হয়, অথবা অন্যলোক ভোগ্য কোন কর্মসংস্কার না থাকে...যতদিন প্রেতত্ব হইতে মুক্তি না হয়, অথবা স্বর্গ-নরকাদি ভোগ সমাপ্ত না হয়, ততদিন তাহার ইহলোকে পুনর্জন্ম হইতে পারে না...উপরোক্ত মূর্চ্ছাই প্রেতত্বের কারণ এবং যতদিন না ঐ মূর্চ্ছা কাটে, জীবকে ততদিন প্রেতযোনি ভোগ করিতে হয়। এইরূপ মূর্চ্ছা ব্যতীত অন্য প্রকারেও প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় (যেমন অর্থ ও পুত্রকলত্রাদির আসক্তি, ব্যভিচারাসক্তি, অপঘাত মৃত্যু, হঠাৎ যে কোন কারণে মৃত্যু, ইত্যাদি ...ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকার মৃত্যু, অত্যন্ত কষ্টের সহিত হয় বলিয়া, তাহাতে সূক্ষ্মশরীর মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেতত্ব লাভ হয়...পৃথিবীর নিকটস্থ তিনটি সূক্ষ্মলোকের মধ্যে পিতৃলোক পুণ্যভোগপ্রদ এবং প্রেত-লোক ও নরক পাপভোগপ্রদ। স্বকর্মানুসারে মানব ঐ সকল লোকে আতিবাহিক দেহে গমন করে... বাসনা-শূণ্য যোগী যোগসিদ্ধি-বলে নানারূপ দেহে ধারণে সমর্থ হন, কিন্তু প্রেত তাহা পারে না। সূক্ষ্ম শরীরের এত বল আছে যে, প্রেত বাসনার বেগে প্রকৃতি হইতে স্থূলশরীরের উপাদান সংগ্রহ করিয়া যদৃচ্ছা স্থূলশরীর প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের দেহোপাদান মানব শরীর মত নহে। সে কেবল নিজ বাসনানুসারেই শরীর ধারণে সমর্থ হয়। এমন কি, যদি কোন পুরুষ নিজ বা পর স্ত্রীতে অত্যাসক্ত হইয়া উহাকেই চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে ও প্রেত হয়, তবে সে পতি বা উপপতির দেহ ধারণ করত ঐ স্ত্রীর নিকট আসিয়া প্রবল বাসনার বেগে কামের স্থূল ক্রিয়াদিও করিতে পারে। কিন্তু উক্তবিধ কামুক পুরুষরূপ ধারণ ব্যতীত যদৃচ্ছা অন্য রূপ ধারণে অসমর্থ, কারণ তাহার বাসনার নৈসর্গিক বেগ মাত্র ঐ প্রকারই। প্রেতশরীর একরূপ হয় না। পঞ্চতত্ত্বের উপর অধিকার থাকায় সে কখন বায়ুতত্ত্ব আকর্ষণে বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া প্রবল ঝড়বেগে বহিতে পারে, কখন অগ্নিতত্ত্ব আকর্ষণে অগ্নিময়রূপে শ্মশানে বা নিভৃত স্থানে ভীতি উৎপাদন করিতে পারে এবং কখনও বা ছায়ারূপে দেখা দিয়া কথা কহিতে পারে। কথা বায়ুকম্পন দ্বারা কর্ণগোচর হয় না। প্রেত শ্রোতার হৃদয়ে এমন প্রেরণা সৃজন করে, যে সে নিজের ভিতরেই প্রেতের কথা

শরদিন্দু—সারদা

'থাক্'-'থাক্' রব করি, অভয়ের মুদ্রা ধরি,
দিয়াছিলে কালিকে অভয়।
সত্য করিতে রক্ষণ, নরকে করি গমন,
দূরিলে মোর অজ্ঞান ভয়।

শুনিতে পায় এবং তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে। সাধারণতঃ, কুকুরের প্রেতকে দেখিবার শক্তি অধিক। অন্যান্য জীবেরও এইপ্রকার দৃষ্টিশক্তি আছে। অনেক মনুষ্যেরও প্রেত দেখিবার বিশেষ দৃষ্টি থাকে। কর্ম ও স্বভাবানুসারে ভালমন্দ নানাপ্রকার প্রেত হয়। সচ্চরিত্র, নিরীহ, অথচ মোহাদিবশে প্রেতযোনি প্রাপ্ত পুরুষ বা স্ত্রী প্রেত, প্রায় কাহারও অনিষ্ট করে না। কিন্তু কুকর্মরত মনুষ্য প্রেত হইলে, তাহার স্বভাব যায় না। সে ভয় দেখায়, অত্যাচার করে এবং নানাবিধ উপদ্রব করিয়া থাকে। তাহারা দুর্বলচিত্ত মনুষ্যের উপরই উপদ্রব করিতে পারে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর প্রতিই তাহাদের আক্রমণ অধিক হয়। দুষ্ট প্রেতের স্বভাব এই যে, তাহারা প্রায়ই বিকৃতমনা ও বিকৃতমস্তিষ্ক স্ত্রীপুরুষগণকে আত্মহত্যা করিবার জন্য প্রেরিত করে এবং নিজের যোনিতে আনিতে চেষ্টা করে। আত্মহনন দ্বারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত জীবের এই অভ্যাস বড়ই প্রবল। যদি কেহ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে চেষ্টা করে, তবে ইতিপূর্বে উদ্বন্ধনে মৃত ও প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত জীব তাহাকে ঐ পাপকার্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। সে চারিদিকে ঐপ্রকার উদ্বন্ধনপ্রাপ্ত স্ত্রীপুরুষের দৃশ্য দেখিয়া উন্মত্ত প্রায় হইয়া আত্মঘাতী হয়।...মূর্চ্ছা ভঙ্গের দ্বারা প্রেতত্ব নাশ না হওয়া অবধি, প্রেতের নানাবিধ দুর্দশাভোগ করিতে হয়। এই মূর্চ্ছা ভঙ্গের জন্য যে সকল উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাকেই 'শ্রাদ্ধ' বলা হয়।...প্রেতগণ এই পৃথিবীর নানাস্থানে ও অন্তরীক্ষ লোকে কিছু দূর অবধি আশ্রয়হীন অবস্থায় বিচরণ করে। তাহাদের জীবন ভীষণ দুঃখময়; কারণ, যে বাসনার বশে তাহাদের প্রেতত্ব সে বাসনা ঐ যোনিতে নিবৃত্ত হয় না। এইজন্য প্রেতগণ পূর্ববাসনার আধার বস্তু সমূহের আশ্রয়ের উদ্দেশে সদা লালায়িত থাকে, কিন্তু যথেচ্ছ প্রাপ্ত হইতে পারে না। ফলে, নৈরাশ্যের তুষানলে তাহারা দিবানিশি দগ্ধ হয়ে থাকে এবং নানারূপ কু-অভিসন্ধি চরিতার্থের চেষ্টা করে।...পরলোকে পাপ কর্মফল ভোগের জন্য মানবের যে দেহ প্রাপ্তি হয়, তাহাকে 'যাতনাদেহ' বলে। পাপের ফলভোগের জন্য পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবেশ হইতে পরলোকে ঐ দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তুমি মা সারদেশ্বরী, সর্বময়ী বিশ্বেশ্বরী,
এই যুগে তুমি ত্রাণকর্ত্রী।
কালিকার ভিন্ন দেহ, অপ্রাকৃত তব দেহ,
আদিমা প্রকৃতি, মুক্তিদাত্রী।
কিবা জানি গুণ তব? বেদ সেথা পরাভব,
লহ গো প্রণাম শ্রীচরণে!

৪। মৃত্যুকালে, শিবভক্ত শিব-ভাবে তন্ময় হইয়া, শিবলোক প্রাপ্ত হন·· বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভাবে তন্ময় হইয়া, বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন· দেবীর উপাসক তদ্ভাবে তন্ময় হইয়া শক্তিলোক (মণিদ্বীপ) প্রাপ্ত হন··এই সকল লোকে, ভক্ত সামীপ্য, সাযুজ্যাদি (পঞ্চবিধ) মুক্তিলাভ করত মহাপ্রলয়কাল পর্যন্তও অবস্থান করিতে পারেন। মহাপ্রলয়ে যখন শিব, বিষ্ণু, ইত্যাদি পরব্রহ্মে লীন হন, তখন ভক্ত পরজ্ঞান লাভ করিয়া ইষ্টদেবতার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্বাণ মোক্ষ লাভ করেন। এই সকল ইষ্টলোক ষষ্ঠ বা তপোলোকের অন্তর্গত+। দেবী ভাগবত বলিতেছেন যে, ভক্তিপূর্বক সাধনা সত্ত্বেও অপূর্ণ প্রারব্ধ হেতু যে ভক্তের পরজ্ঞান লাভ না হয়, সে দেবীলোকে মণিদ্বীপে মরণান্তে গতিলাভ করে। তথায় ইচ্ছা না থাকিলেও, ভক্ত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হন এবং তদনন্তর পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করত মুক্তিলাভ করেন।' বেদান্ত জ্ঞানানুসারে লব্ধতত্ত্ব এবং সন্ন্যাস যোগদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যতিগণ ব্রহ্মলোকে বহুকাল বাস করিয়া মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার লয়ের সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন।'

+ [(টীকা)—এই সব বিষয়ে, শাস্ত্রে মতদ্বৈধ আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলিতেছেন যে গোলোক বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস এই তিনটি নিত্যধাম সংসারের বাহিরে, ব্রহ্মাণ্ডের বহু ঊর্ধ্বে ও ব্রহ্মার অধীনস্থ নহে। ইহারা আত্মা বা আকাশ সম। প্রলয়েতে বৈকুণ্ঠ ও কৈলাস লয় হয়, কিন্তু গোলোকধামে কৃষ্ণ ও রাধা চির-অবস্থিত। তিনটি লোকই মণ্ডলাকার—গোলোক (ত্রিকোটী যোজন বিস্তৃত) সর্ব ঊর্ধ্বে এবং তাহার পঞ্চাশৎ কোটী যোজন নিম্নে দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ ও বামে কৈলাস, উভয়ে এক কোটী যোজন, বিস্তৃত। কাশীখণ্ড বলিতেছেন যে, প্রলয় কালেও অপ্রাকৃত অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে শিব ও শিবা বিরাজ করেন এবং এই ধাম ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট, বা শমনের দ্বারা শাসিত, নহে (প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ)। যোগশাস্ত্র মতে, অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম তপোলোক। শিবসংহিতা এবং অন্যান্য যোগ গ্রন্থের মতে, কৈলাস ও গোলোক উভয় ধামই শিরস্থ সহস্রারপদ্ম]

মানবের দেহ ধরি, সেভাব স্বীকার করি,
ফির বিধবার আচ্ছাদনে।
পতিহীনা কবে তুমি ? অক্ষর তোমার স্বামী !
পূর্ণব্রহ্ম এক পরমেশ।
বৃদ্ধা তুমি কভু নও, নব বিশ্ব সদা হও,
ফাটে বুক হেরি দীনা বেশ।
মানবের হিত তরে, ফির ছদ্মবেশ ধরে,
রাখি ঢাকি ঈশ্বরী স্বরূপ।
নহে নর ভয় পাবে, ঐশ্বর্যে ভুলিয়া যাবে,
তব গুরু আর মাতৃরূপ।
মাতা তুমি সকলের, আর গুরু তাহাদের,
নাহি জানে মূঢ় বিশ্ববাসী।
এ দুই ভাবের একে, যে চিন্তে সদা তোমাকে,
না হয় পুনঃ দেহবাসী। (২৪)

শরদিন্দু-কালিকা

মা ব'লে ডাকিলে, বিশ্বনাথে যাই ভুলে,
ধেয়ে যাই, লই তারে কোলে!

বিষয়—শরদিন্দুর একটি দুর্গম, প্রস্তরময় পথ আমার সমভিব্যাহারে অতিক্রমণ কালে, একদল দস্যুর দ্বারা পথরোধের আশঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে কালীমাতাকে আহ্বান, আমাকে সবলে ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখ দিয়া দৌড়, তাঁহার ছোট মূর্তিতে আবির্ভাব ও উভয়কে দুই ক্রোড়ে উত্তোলন—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— পুনা সহরের বাসা-বাড়ী।

কাল— সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর, ১৯৩১। তখন শরদিন্দুর দ্বিতীয় সন্তান, পুত্র অখিলেশের বয়স চারি-পাঁচ মাস মাত্র।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"আমি যেন—*অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান (১০)—*আমার স্বামীর সমভিব্যাহারে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় পথ দিয়া কোথায় যাইতেছি। দুই পার্শ্বে খুব বিস্তীর্ণ মাঠ, মধ্যে রাস্তা এবং উহার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। আমার স্বামীকে ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া আগে যাইতে যাইতে দেখিলাম যেন দুই ধার থেকে কতকগুলি ভীষণাকার দস্যু আসিয়া আমাদের পথরোধের চেষ্টা করিতেছে। লোকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় জটা, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষমালা, লালবর্ণের বস্ত্র পরিহিত এবং কপাল ও হাত সিন্দুরের তিলক-চিহ্ন যুক্ত। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার স্বামীকে বলিলাম, 'দেখ! আমাদের ধরিবার জন্য ডাকাতদল এসেছে, কি হবে? কেমন করে যা'ব?' তিনি অবিচলিতভাবে আমাকে উত্তরে বলিলেন, 'তুমি অগ্রসর হও। ভয় কি? উহারা কিছুই করিতে পারিবে না!' কিন্তু আমি তাহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। পলায়ন করিলে দস্যুদল ধরিতে পারিবে না এই ভাবিয়া, তাঁহার হাত সবলে ধরিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম এবং চিৎকার করিয়া 'কোথায় মা কালী'—'কোথায় মা কালী,' বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলাম। তখন দেখিলাম যে,

আমাদের অপেক্ষা দেখিতে অনেক ছোট একটি মা কালী আবির্ভূতা হইয়া উভয়কে তাঁহার দুই কোলে যেন দুইটী পুতুলের মত নিয়ের দুই হস্ত দিয়া তুলিয়া লইলেন এবং ডাকাতগণ ত্রস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিরোধান করিল। কালিকার রঙ কালো, গলায় মুণ্ডমালা ও হাতে খাঁড়া—কিন্তু জিহ্বা মুখের ভিতর। তাহার পর, মায়ের কোল হইতে নামিয়া সেই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মা অন্তর্হিতা হইলেন এবং নিরাপদে কিছুদূর গিয়া একটি ধপধপে শ্বেতবর্ণ প্রাসাদে আমরা উভয়ে উঠিলাম। তৎপরে, নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। ক পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, শরদিন্দু কালীমাতার যে অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাহা খ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, তাঁহার অজ্ঞানোদ্ভূত কুকর্মফল দগ্ধ করিয়াছিল, তাহা এই স্বপ্নে কালীমাতার আরও কৃপারূপে অন্তরাত্মায় প্রকটিত হইয়া, তাঁহাকে এইরূপ জানাইয়াছিল, 'তোমাদের—*অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান (১১)—*অতি দুর্গম সংসার পথ অতিক্রমণে, নানাবিধ বাহ্য আপদ-বিপদ ও সাধনার প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইলেও, তাহারা আমার কৃপায় তোমাদের অবিভূত করিতে পারিবে না এবং তোমরা নিরাপদে শেষে তোমাদের পবিত্র গন্তব্য স্থান আমার বিদ্যামায়ার বাসভূমি (প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ইত্যাদিতে) পৌঁছাইবে'। এই স্বপ্নে, উক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময় পথ সংসারের বাহ্য দুর্গম গতির স্বরূপ নির্দেশক। কৃষ্ণবর্ণ, লালবর্ণের বস্ত্র পরিহিত, রুদ্রাক্ষমালাধারী দস্যুগণ কালীমাতার দূতরূপে আমাদের প্রারব্ধ কর্মফল ও সাধনার বিঘ্ন নির্দেশক—কেননা, ঐ কর্মফল তাঁহার দূতরূপেই আগত হয়। গীতায় (৯, ১৭-১৮) আছে যে, ঈশ্বরই কর্মফলদাতা ও কর্মফল! ধপধপে শ্বেতবর্ণের প্রাসাদ, যাহাতে আমরা শেষে প্রবিষ্ট হইলাম, আমাদের পবিত্র গন্তব্যস্থান, বা মহামায়ার বিদ্যাংশের (প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ইত্যাদি) বাসভূমি। কালীমাতার অভয়মুদ্রা বীজ ক্রমে অঙ্কুররূপে পরিণত হইয়া মহীরুহ রূপ ধারণোন্মুখী হইতে চলিল। ইহাই আমাদের নিয়তি বা কর্মফল!

৩। কে এই অহৈতুকী কৃপাময়ী জগদম্বার কার্যের কারণ উদ্ঘাটনে সমর্থ? পাপাত্মাদিগের নিকট তিনি ভীষণ হইতে ভীষণা, কিন্তু সৎপথাবলম্বীদিগের নিকট পুষ্পাদপি কোমলা! এইরূপ স্বভাব বিনা, 'বিশ্বকর্ত্রী' নাম সার্থক হয় না! খ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, ছদ্মবেশী গুরুরূপে জগদম্বা শরদিন্দুর আভ্যন্তরিক মুক্তি-বিঘ্ন তাপ অপসারিত করিলেন এবং এই পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, তিনি শরদিন্দুর (ও আমার) বাহ্যিক মুক্তির অন্তরায় দূর করিলেন। ইহার পরে যাহা উভয়ের

অবশিষ্ট রহিল, তাহা অনিবার্য এবং প্রবল প্রারব্ধ জাত—যাহা ইহজন্মে ভোগ বিনা দূরীভূত হইবার নহে ! মা সারদেশ্বরী বলিয়াছেন (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১২ (১) অনুচ্ছেদ)—'যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ—ইহাই সংসারের নিয়ম। মহাপুরুষ হইলেও, দেহ ধারণ করিলে, দেহের ভোগটি সব লইতে হইবে। কর্মফল ভুগিতে হইবেই, কারণ প্রারব্ধের ভোগ অনিবার্য। তবে ঈশ্বরের নাম করিলে, যেখানে ফাল যাইত, সেখানে ছুঁচ যায়। জপতপে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হইয়া যায়।' মহামায়া পথ না ছাড়িলে, কোন মানব নিজ পুরুষকার বলে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু, তিনি যখন কৃপাবশে (ইহার সঠিক কারণ নির্ধারণ মানব বুদ্ধির অতীত—কারণ, তিনি ইচ্ছাময়ী ও স্বাধীন) নিজে মানবকে পথ দেখান, বা তাহার পথের বালাই দূর করেন, তখন মুক্তি অনিবার্য ! এই জন্য সারদেশ্বরী বলিয়াছেন, (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ) —'আমি যার গুরু, তাহার সাধন ভজন কিছু নাই এ কথা সত্য বটে··· মনে রেখো যে এখানে (আমার, বা রামকৃষ্ণের নিকট) যারা এসেছে, যারা আমার ছেলে (বা শিষ্য), তাদের মুক্তি হয়ে আছে ! বিধির সাধ্য নাই যে তাহাদের রসাতলে ফেলে। আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।' ঈশ্বরের উপর ভার দিয়া অবস্থান, বা আত্মনিবেদন বা নির্ভরশীলতা তাঁহার কৃপালাভের প্রধান উপায় ! স্বাপ্ন (বা সূক্ষ্ম) উক্ত কাহিনীতে, শরদিন্দু স্ত্রীস্বভাব বশতঃ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আমি ঐ নির্ভরশীলতার বলেই তাঁহাকে এই বলিয়া অভয় দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, 'তুমি অগ্রসর হও। ভয় কি ? উহারা কিছুই করিতে পারিবে না !' শরদিন্দুর আত্মার দ্বারা প্রকটিত, আমার স্বভাবেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, পলায়নের উপায় নাই এবং দস্যুদলের পথরোধের চেষ্টা বিফল করিবার একমাত্র উপায় নীরবে, কাতরতা না দেখাইয়া, ঈশ্বর-চিন্তা ! এইটাই আমার স্বভাব, বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি এবং স্বপ্নটি পূর্ণভাবে উহা প্রকাশ করিয়াছিল। এই স্বভাব বলেই—আমি সাংসারিক অনিবার্য নানা আপদ, বিপদ, শত্রুতা, ইত্যাদি উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাবশে নির্ভয়ে বিচরণশীল, প্রিয়ংবদার মৃত্যুকালে সংসারের গোলযোগের বাহিরে তারকেশ্বরে ধন্না দিতে গিয়াছিলাম এবং স্বপ্নে প্রিয়ংবদা একটি ভীষণ দানবের দ্বারা আক্রান্ত দেখিয়া, তাহার সহিত বল পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এই স্বভাব, পরে ১৭ ও ৭৬ পর্বে বর্ণিত স্বপ্ন দুইটি, আরও স্পষ্টরূপে প্রকট করিবে। এই প্রকৃতি কালিকারই নামান্তর ! বিশ্বে সকল (ভাল বা মন্দ) শক্তিই তিনি এবং 'রামের রমণ ছাড়া কিছু নাহি হয়।' কালিকাই বিশ্বের সকলের প্রকৃতি।

শরদিন্দু—কালিকা

স্বপ্নে মা সারদেশ্বরী, অজ্ঞানের তাপ হরি,
রাধাকৃষ্ণ পূজা সংকেতিলে।
অবিদ্যার চর তব, ঐ পথের বাধা সব,
স্বপ্নে মোরে পরে দেখাইলে।
অতি ভীত হয়ে তায়, পতিকে পুছি উপায়,
'নাহি কোন ভয়' শুনিলাম।
না লভি আশ্বাস তায়, বলে ধরি করে তাঁয়,
'কোথা—কালী' রবে ছুটিলাম।
মোর আঁখি নীরে গলি, রূপ ধরি ছোটকালী,
দুই কোলে দোঁহে তুলি নিলে।
চর দল পলাইল, পথ নিরাপদ হ'ল,
তব বিদ্যাধামে স্থান দিলে।
অভেদ সারদেশ্বরী, সহ কালী বিশ্বেশ্বরী,
ভিন্ন রূপে উভে একাকার।
'মা' বলিয়া যে ডাকিবে, কোল তব সে পাইবে,
হবে না জনম ভবে আর।
তুমি পথ নাহি দিলে, প্রেমে নাহি দর্শাইলে,
কিম্বা না করিলে বাধাহীন।
মুকতি না লভে নর, না ভাঙ্গে দেহ পিঞ্জর,
রয়ে যায় কালের অধীন।
কৃপা করে তুমি যবে, গুরুরূপে কোলে লবে,
সাধনা না হবে প্রয়োজন।
অহেতুকী কৃপা তব, মহিমা অজ্ঞাত ভব,
শরদিন্দু করে গো চুম্বন! (২৪)

শরদিন্দু-সাধনা

আগম-শাস্ত্র

কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গুরুর ঋণ হইতে শিষ্য মুক্ত হইতে পারে না।

বিষয়—গঙ্গাকূলে শরদিন্দুর বিধবা-বেশিনী প্রৌঢ়া সারাদেশ্বরী হইতে প্রাপ্ত একটি পুষ্প-মাল্যের দ্বারা গঙ্গায় নিমর্জ্জিত একটি শ্বেত-হস্তীর গলদেশ ভূষিত করণ, বৈকুণ্ঠধাম মন্দিরের বহির্দেশ দর্শন ও সেই স্থানে একটি মানুষমুখী বৃষের তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— পুনা সহরের বাসা-বাড়ী।

কাল— অক্টোবর বা নভেম্বর, ১৯৩১। তখন কলিকাতার ৬নং তারিণী-চরণঘোষলেনস্থ বাড়ীর নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"আমি যেন কোথায় গঙ্গাস্নানের জন্য গিয়াছি। ঘাটে বহুলোকের ভিড় ও গঙ্গাজলে খুব ঢেউ দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'এত ঢেউ কেন?' তখন কে যেন কোথা থেকে বলিলেন. 'তুমি জান না, হাতী আসিতেছে?' পরে দেখি কতক গুলি মালাকর অনেক ফুলের মালা লইয়া ঘাটের স্ত্রীলোকদিগকে বিক্রয় করিতেছে। আমার একটি মালা কিনিবার ইচ্ছা হওয়াতে, কাপড়ের অঞ্চলে পয়সার খোঁজ করিলাম। কিন্তু পয়সা নাই দেখিয়া একজন মালাকরকে একটি মালা আমাকে ধারে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিলাম। সে তাহাতে রাজী হইল না। এমন সময়, একটি বিধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক (হয়তো তিনিই আমার অজ্ঞাতসারে আমায় হস্তী আসিবার সংবাদ দিয়াছিলেন!) 'আমার হাতে একটি ফুলের মালা দিয়া বলিলেন, 'এই লও মা, মালা'। আমি উহাতে খুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম যে, বাড়ীতে ফিরিয়া উহার দাম দিব। তিনি কোনও উত্তর করিলেন না এবং নীরব রহিলেন—এই ভাব, যেন উহা নিষ্প্রয়োজন! ইতিমধ্যে,

ঘাটে হাতী আসিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিলাম। হাতীটি সাদা, শুঁড়টি উত্তোলিত এবং তাহার মাথা ও পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন সর্বাঙ্গ জলমগ্ন। তাহার পর, যখন গঙ্গায় স্নান না করিয়াই ফিরিতেছি, তখন প্রৌঢ়াটি আমার সঙ্গ লইলেন। পথে, বহুদূর বিস্তীর্ণ বিরাট ফুলবাগানের দ্বারা বেষ্টিত, একটি মনপ্রাণমুগ্ধকর, শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত, গগনভেদী মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, প্রৌঢ়াকে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি জানাইলেন যে উহা বৈকুণ্ঠধাম এবং পরে তিরোহিতা হইলেন। আমি বিশেষ আনন্দের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের পূজার সুবিধা আগত ভাবিয়া, বাগানে প্রবেশ করিলাম এবং নিজ মনে গুনগুন করিয়া তাঁহাদের কীর্তন করিতে করিতে একটি সাজি (কোথা হইতে পাইলাম জানি না !) ভরিয়া ফুল তুলিতে লাগিলাম। এমন সময়, একটি অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণের মানুষমুখী বৃষ আমার পশ্চাতে আবির্ভূত হইল এবং বাগানে অসংখ্য ফুল থাকিতেও, আমার সংগৃহীত ফুলগুলিই খাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি ভয়ে আর ফুল তুলিলাম না এবং সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের দালানে উঠিতেই, সেই বৃষটিও আমার পশ্চাতে ফুল খাইবার উদ্দেশ্যে উঠিল। তখন আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরের ভিতর প্রবেশদ্বার খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়াও, উহার কোন সন্ধান পাইলাম না। এমন সময়, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।”

২। ঈশ্বর কৃপা এবং কর্মফল নির্দেশক এই সকল স্বপ্নের নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করা মানব বুদ্ধির অতীত—ইহা বার বার পূর্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা কেবল অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘটনার সহিত মিলাইয়া ইহাদের অর্থ অনুমান করিতে পারি মাত্র। আমার অনুমান অনুযায়ী, এই স্বপ্নে—গঙ্গাটি, বৈকুণ্ঠধামের বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা মূল নদী ; শ্বেত হস্তীটি, জলক্রীড়ায় নিযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর স্নান-সেবক ; বৈকুণ্ঠ-বাসিনীগণ হস্তীটিকে পূজার উদ্দেশ্যে পুষ্প-মাল্যের দ্বারা তাঁহার গলদেশ ভূষিত করিতে যত্নশীলা এবং বিধবা প্রৌঢ়াটি ছদ্মবেশিনী, কৃপাধারা, আমাদের সারদেশ্বরীদেবী। তিনি ভবিষ্যৎ-শিষ্যা শরদিন্দুকে একটি মাল্য দান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর সেবকের পূজায় উৎসাহিত করত পূর্ব হইতেই গুরুর কার্য করিলেন, কিন্তু শরদিন্দু পুষ্পের দাম শোধ দিতে চাহিলে, নীরব রহিলেন—কেননা, শিষ্যের গুরুর সহিত ঋণ আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয়াদি শাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে গুরুর ঋণ হইতে শিষ্য মুক্ত হইতে পারে না (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)। মানুষমুখী বৃষটি সাক্ষাৎ কর্মফলদাতা ধর্মরাজ শিব।

ধর্মস্বরূপ বলিয়া, মহাদেব বৃষরূপী (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ৭ অনুচ্ছেদ)।

৩। এই স্থলে, প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। শিষ্য নরক বা স্বর্গ, বদ্ধ বা মুক্ত, যেখানে বা যে অবস্থায়, থাকুক না কেন—পরব্রহ্মরূপী সদ্‌গুরু কখনও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন না। শিষ্য সদ্‌গুরুর গর্ভস্থ সন্তান! মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানের সর্ববিধ নড়ন-চড়ন বুঝিতে পারেন, সদ্‌গুরুও সেই প্রকার শিষ্যের সমস্ত অবস্থা বা চেষ্টা জানিতে পারেন। সর্বদা সকল বিষয়ে তিনি শিষ্যের শুভেচ্ছু এবং শিষ্য সিদ্ধাবস্থা লাভ করিলেও, তাহাকে ছাড়েন না। কুমীরে পোকার আরশুলা ধরার মত, তিনি দীক্ষা দান করিয়া শিষ্যকে আত্মসাৎ করিয়া লন্‌ ও মুক্তি দান করেন। এই পর্বে বর্ণিত ঘটনার কালে, জগদম্বা সারদাদেবী শরদিন্দুকে যথার্থ দীক্ষা দান না করিয়াও, তাঁহার সদ্‌গুরুর সকল কার্য করিতে লাগিলেন ও সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। কি নরক, কি সংসার, কি বৈকুণ্ঠধাম, সর্বত্রই তিনি শরদিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের যাহা প্রয়োজন সব পরিবর্তনই করিতে লাগিলেন। প্রথমে অজ্ঞান নরক হইতে সূক্ষ্ম দেহ পরিশুদ্ধ করত রাধাকৃষ্ণ ভজনের ইঙ্গিত করিলেন। তৎপরে, সংসারে নিজ অবিদ্যা দস্যুদলের কবলমুক্ত করিয়া শরদিন্দুকে (ও আমাকে) নিজ বিদ্যাধামে আশ্রয় দিলেন। সেই বিদ্যাধাম, (নিজ-নির্বাচনে) লক্ষ্মীনারায়ণ সেবিকা শরদিন্দুর নিকট বৈকুণ্ঠ ভিন্ন আর কি হইবে? সেই জন্য, তিনি শরদিন্দুর আত্মায় (স্বপ্নের সাহচর্যে!) ঐ ধাম প্রকটিত করিলেন, কারণ আত্মচৈতন্য সর্বোপকরণ-সম্পন্ন। সেখানে বৈকুণ্ঠ বাসিনীদিগের সহিত লক্ষ্মীর স্নান-সেবক শ্বেতহস্তীকে নিজদত্ত পুষ্পমাল্যে পূজা করাইলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। বৈকুণ্ঠধাম শরদিন্দুর আত্মস্থ হইলেও, অন্তিমগতি নহে। গোলোকধামই তাঁহার অন্তিমগতি—কারণ, তাঁহার গুরু-নির্বাচিত, বা কর্মফল প্রসূত, ইষ্ট ও ইষ্টা কৃষ্ণ-রাধা (চ পর্ব), নিজ-নির্বাচিত ঐশ্বর্যের আকর দেব-দেবী নারায়ণ-লক্ষ্মী নহেন। সেই জন্য—বৈকুণ্ঠ মন্দিরের দ্বারদেশে সারদেশ্বরী বাহ্যতঃ অন্তর্হিতা হইলেন, শরদিন্দুর পূজার পুষ্প সংগ্রহে বা নারায়ণ-লক্ষ্মী পূজার কোনও সাহায্য করিলেন না, শিবস্বরূপ বা নিজ ভিন্নরূপ কর্মফলদাতা বৃষকে বিঘ্নরূপে প্রকটিত করিলেন এবং নানারূপ চেষ্টা করিয়াও শেষ অবধি শরদিন্দু স্বাত্মস্থ বৈকুণ্ঠের দ্বার খুঁজিয়া পাইলেন না ও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নারায়ণ-লক্ষ্মীর পূজা সমাপন করিতে অক্ষম হইলেন। ঙ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, শরদিন্দু বালক-বেশী কৃষ্ণ হইতে একটি জপের অপ্রাকৃত তুলসীমালা ও আশীর্বাদরূপে অপ্রাকৃত

কতকগুলি শ্বেতপুষ্প প্রাপ্ত হইবেন। ছ পর্বে বর্ণিত স্বপ্ন, তিনি বালক-কৃষ্ণের 'মাতারূপে' বৃতা হইবেন। এই সব কারণে, তাঁহার যথার্থ সাধন বস্তু (বা ইষ্টদেব) বৈধীমার্গে নিজ নির্বাচিত ঐশ্বর্যময় হরি, নারায়ণ নহেন—রাগ বা রসমার্গে, গুরু নির্বাচিত প্রেমময় হরি, কৃষ্ণ! শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের পূজা সম্বন্ধে ভগবান নিজে বলিয়াছেন—'**স্ত্রী-শূদ্র কর সংস্পর্শে বজ্রপাতো মমোপরি।**' এই জন্যই, সাধন মার্গে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন এবং এই জন্যই, গুরুকরণ অত্যাবশ্যক। কোন অপরিচিত স্থানে যাইতে হইলে, একটি উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক এবং কোন সামান্য বিষয় শিখিতে হইলে, একটি উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন হয়। আর মানবের সর্বাপেক্ষা দুর্লভ গতি মুক্তিধাম ও সর্বাপেক্ষা কঠিন আধ্যাত্মজ্ঞান, কোন উপযুক্ত সাহায্য বিনা লাভ হইবে ইহা অসম্ভব! মানবের ইষ্ট ও ইষ্টা তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইলে, তাহার সাধনা শীঘ্র ফলদায়ী হয়—এই বিষয়, অনুপযুক্ত গুরু ভুল করিলে, সাধনা বা পূজা প্রায় পণ্ডশ্রমে পরিণত হয় (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৪ (২) অনুচ্ছেদ)। প্রেমভক্তি, রাগানুগা ভক্তি, ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বর অতি সহজে লাভ হন। যাহার এই সব সম্পদ অন্তরে আছে, তাহার সদ্‌গুরু ঈশ্বরই যোগাইয়া থাকেন এবং কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সদ্‌গুরুই ঈশ্বর এবং তিনি মানব হইলেও, ঈশ্বররূপে পূজ্য ও মুক্তিদাতা। চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যময় হরিসেবী, সকাম বৈষ্ণব, অন্তিমে বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করেন এবং ফলভোগান্তে পুনরায় সংসারে আবর্তিত হন। কিন্তু দ্বিভুজ প্রেমময় হরিসেবী, নিষ্কাম বৈষ্ণব, অন্তিমে গোলোক গতি লাভ করেন এবং তথায় জ্ঞান-লাভ করত মহাপ্রলয়ে কৃষ্ণসহ পরব্রহ্মে লীন হন (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ)। নিষ্কাম শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা যে কোন ঈশ্বর মূর্তির (গণেশ, রাম, নারায়ণ, শিব, দুর্গা, ইত্যাদির) মাধুর্যভাব অবলম্বনে সাধনই বৈষ্ণবত্ব, বা প্রেমভক্তের লক্ষণ। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যে মন দিলে, তাঁহাকে নিকটস্থ, বা কোন আত্মীয় ভাবে চিন্তা সম্ভব হয় না। তিনি খুব নিকটস্থ, খুব আপনার এবং অন্তর্যামী আত্মা এইরূপ ভাবের দ্বারাই সহজে লভ্য। ঐশ্বর্যভাবে সাধনায়, ঈশ্বরকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা দূরে রাখা হয়। তিনিই যে আমাদের আত্মা! অতএব, এই ভুল অমার্জনীয়! সারদেশ্বরী যদি বৈকুণ্ঠ মন্দিরের বহির্দেশে শরদিন্দুর বাহ্য সঙ্গ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুষ্প সংগ্রহে বা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা সম্পন্ন করিতে, কোন বিঘ্নই উদয় হইতে পারিত না। সদ্‌গুরুর শিষ্য সম্বন্ধে কোন• ইচ্ছার প্রতিরোধ-শক্তি বিশ্বে নাই! গুরুরূপে তিনি শরদিন্দুর নারায়ণ পূজার বাধা দান করিয়াছিলেন, যদিও নারায়ণ দাস হস্তীর পূজাতে সাহায্য

করিয়াছিলেন—কারণ, ভগবানের এই নিয়ম আছে যে, ভক্তের পূজাই তাঁহার পূজা এবং লক্ষ্মীদেবীর পূজা না করিলে, মানবকে সংসারে শ্রীহীন হইতে হয়। সাধারণ সদ্‌গুরু ও ঈশ্বর গুরুর মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা চ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। এই পর্বে বর্ণিত ঈশ্বরী-কৃপাও, 'রামের রমণের' ফলরূপেই শরদিন্দুর নিকট স্বপ্নে প্রকটিত হইল! এই বিশ্বে, একমাত্র বিশুদ্ধ বোধের (বা আত্মার) ভিত্তিতে, নানাবিধ শক্তিরূপে বোধতরঙ্গগুলি ক্রিয়মাণ—বোধ শিব এবং বোধতরঙ্গ অভেদ কালী! যে ইহা বুঝে, সে জীবন্মুক্ত ও সমদর্শী এবং যে ভেদবুদ্ধিতে ইহা না বুঝে, সে বদ্ধ। দ্বৈতবোধ না থাকিবার জন্য, যাহার সংসারে ও ঈশ্বরে সমজ্ঞান, সে সব করিয়াও বাসনাহীন! 'আমি', 'তুমি', 'তিনি', ইত্যাদিদ্বিধ কল্পনা ত্যাগ করত, সবই 'শিব-দুর্গা' (বা পুরুষ-প্রকৃতি)—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, মহা-পাপীও মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়! এই প্রসঙ্গে, ঙ পর্বে ৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। আত্মা শিব সর্বময় এবং আত্মা হরি তাহা নহেন—ইহা সমদর্শন নহে। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শরদিন্দু-সারদা

জয় মা! সারদামণি, বিশ্বমাতা, কাত্যায়নী,
খণ্ডহীনা বিশ্বাকারা।
দুর্গা, দুর্গতি-নাশিনী, ভকত ভয়-হারিণী,
অন্নপূর্ণা, বিশ্বসারা।
জয় মা! গুরুরূপিণী, রামকৃষ্ণ বামাঙ্গিনী,
অহেতুকী কৃপাধারা।
কালী, দুরিত-বারিণী, অভয়া ভবতারিণী,
সারা বিশ্ব মূলাধারা।
জয় মা! কৃষ্ণরূপিণী, ব্রহ্ম-ইচ্ছা প্রকাশিনী,
জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মপরা।
নমিশ্রীচরণে সদা, রাধা, ভক্তিস্মৃ, জ্ঞানদা,
কামদা, প্রকৃতি-পরা। (১২)

শরদিন্দু-বালকৃষ্ণ

ব্রহ্মসংহিতা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

বিষয়—ছদ্মবেশী বাল-কৃষ্ণের শরদিন্দুকে একটি জপের তুলসীমালা ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কতকগুলি শ্বেতপুষ্প রহস্যপূর্ণ ভাবে প্রদানের স্বপন।

স্থান— কারাচী সহরের বাসা-বাড়ী।

কাল— সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর, ১৯৩৫। তখন শরদিন্দুর তৃতীয় সন্তান, কন্যা বাণীরাণী তিন চারি মাস গর্ভস্থ।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিয়া বলিতেছেন—

"নিদ্রাকালে আমি অনুভব করিলাম যেন এক পার্শ্বে হাঁটুর নিকটে একটি কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত-কেশবিশিষ্ট, সাত-আট বৎসর বয়স্ক বালক, হস্তে দুই গাছি তুলসীমালা ও কতকগুলি শ্বেতপুষ্প লইয়া উপবিষ্ট আছে। তজ্জন্য, ঈষৎ চমকিত হইয়া, পা দুটি গুটাইয়া লইলাম, যাহাতে বালকটির অঙ্গ উহা স্পর্শ না করে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুই কাদের ছেলে রে? তোর হাতে ঐগুলা কি? তুই কি মালা করিতে পারিস্?' সে এই প্রশ্নের সরল উত্তর না দিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, 'তুমি কি ঐ মালা লইবে?' আমি বলিলাম, 'দে, না!' তখন সে একগাছি মালা ও কতকগুলি তাহার হস্তস্থিত শ্বেতপুষ্প আমাকে দিয়া অদৃশ্য হইল। এই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে, বিছানার চারিদিকে ফুল এবং তুলসীমালা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই পাইলাম না।"

২। বালকটির পরিচয় অনাবশ্যক মনে হইলেও লিখিতে হইবে যে, তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—স্বপ্নে তুলসীমালা দিয়া শরদিন্দুকে নিজ নামজপের ইঙ্গিত ও শ্বেত পুষ্প দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে যেন একাধারে গুরু

ও ইষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন ও আশীর্বাদ করিলেন। গুরুরূপিণী জগদম্বা সারদেশ্বরী ঘ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে শরদিন্দুকে বৈকুণ্ঠ মন্দিরে প্রবেশ করত লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজার যে বাধা সৃজন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই ধারায় বর্ণিত স্বপ্নে বেশ পরিস্ফুট হইল। শরদিন্দুর ইষ্ট প্রেমময় হরি, কৃষ্ণ; ঐশ্বর্যময় হরি, নারায়ণ নহেন—এই জন্যই সারদেশ্বরী ও বৃষরূপী শিব, নারায়ণের ধামে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পূজার বাধা দিয়াছিলেন। গুরুই, ইষ্ট-ইষ্টা এবং ইষ্ট-ইষ্টাই, গুরু। অতএব, শরদিন্দুর নিকট রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীই কৃষ্ণ-রাধা এবং কৃষ্ণ-রাধাই রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী। কৃষ্ণ, শরদিন্দুকে তুলসীমালা দিয়া, ইঙ্গিতে তাঁহার গুরুর কার্যই করত মন্ত্রদান কার্যটি কেবল সারদেশ্বরীর জন্য বাকি রাখিলেন (চ পর্ব)। শরদিন্দুর কৃষ্ণকে স্বাপ্ন অবহেলন, আমার তারকেশ্বর মন্দিরে মহাদেবকে জাগ্রত অবহেলনের সহিত (২ পর্ব) উপমেয়, তবে ওজনে আমার দিকের ভার অনেক অধিক। লোকচক্ষে এই সকল ব্যাবহার অবহেলন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহারা প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি মাত্র এবং ঈশ্বরই মানবের প্রকৃতি। উহার অভিব্যক্তি স্বপ্নাবস্থাতে কোনই দোষের নহে এবং জাগ্রদাবস্থায়ও নহে, যদি সেই ব্যক্তি ভাবে তাহার প্রকৃতি ঈশ্বরকে অর্পণে অভ্যস্ত থাকে। যথার্থ দীক্ষা না পাইয়াও, শরদিন্দু যে-কৃপা কৃষ্ণের নিকটে প্রাপ্ত হইলেন (হউক স্বাপ্ন !), তাহা বড় সামান্য জিনিস নহে। আগে বীজ বপন (গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র প্রাপ্তি), তাহার পরে ফল (ইষ্ট-দর্শনাদি) হয় এবং সাধারণতঃ মুনি, ঋষি এবং মহাপুরুষগণও এই নিয়মের অধীন ! কিন্তু এই ক্ষেত্রে পূর্বেই আভাসে ফল লাভ হইল—তাহার পর বীজ বপন হইবে ! আমিও এইরূপ ঈশ্বর কৃপার পাত্র !

৩। শরদিন্দুর পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সাধনার ফল (বড় সামান্য নহে !) আমার অগোচর। ইহজন্মের তাঁহার সাধনা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার পাঁচ পর্বে বর্ণিত এ-যাবৎ যে আধ্যাত্মিক বিভূতি লাভ হইল, তাহা অহেতুক ঈশ্বর কৃপা ও পূর্ব জন্মের সাধনার ফল। এই পুস্তকে যে সকল কাহিনী বর্ণিত হইতেছে, সবই যেন এক ছাঁচে ঢালা ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধাবদ্ধ। মনে হয় না যে, ইহজন্মের মাপকাঠিতে আমাদের নিজ বাহাদুরী ইহাদের ভিতর আছে। আছে মাত্র অচিন্তনীয় ও অহেতুক ঈশ্বর কৃপা, যাহা অবশ্য অনেক জন্মের সাধনার ফলেই মানব লাভ করিতে সমর্থ হয় (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১৬ (২) অনুচ্ছেদ) এবং যাহা লাভে আর এই নশ্বর, অনন্ত দুঃখের আগার ও জরা-ব্যাধি সঙ্কুল জগতে পুনরাগমন করিতে হয় না। কাহিনীগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে চিন্তা করিলে, উহাদের ভিতর প্রবেশ দুঃসাধ্য। কিন্তু, একত্রে আলোচনা করিলে, উহাদের গূঢ়ার্থ

কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে ও ভক্ত পাঠককে মুগ্ধ করিবে। অনেককাল ব্যাপী চিন্তার দ্বারা, আমি উহাদের যৎকিঞ্চিৎ গূঢ়ার্থ বাহির করিয়া এই দ্বিতীয় ভাগে নিহিত করিতেছি। এই চিন্তার শেষ ফলই আমার এই শেষ বয়সের পুস্তকগুলি। প্রথম ভাগে নিহিত তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা বিনা, দ্বিতীয় ভাগ লেখা অসম্ভব হইত। ঈশ্বর নানাকার হইলেও যে স্বরূপতঃ এক ও অভেদ পরমাত্মা এবং আমাদের হৃদয়স্থ অন্তর্যামী নিয়ামক আত্মা, বা নিয়ম্য আমাদের সহিত স্বরূপতঃ অভেদ—এই সার তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই পুস্তক হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে না। এ-যাবৎ কাল দ্বিতীয় ভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যেন এই তত্ত্বটিই সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রস্ফুটিত! যিনি পরমাত্মা, তিনিই মহাদেব, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, রাধা, সারদেশ্বরী, ইত্যাদি। অভেদভাবে তাঁহারা মানবের নিয়ামক ও বিশ্বে সর্বময় হইয়া রহিয়াছেন ও সবই করিতেছেন এবং আমরা নিয়ম্য—বাস্তবিক কিছুই না করিয়া, বিশ্বকে নানাভাবে দেখিয়া এবং তন্নিবন্ধন অহঙ্কার ও বাসনা বশে প্রমত্ত হইয়া, নানা দুঃখের আগার এই বিশ্বে পুনঃ পুনঃ কর্মফল উপলক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছি। স্বপ্নগুলিতে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা আমাদের কর্মফলগুলি প্রকাশ করিতেছেন মাত্র। জীবিতাবস্থায়, বাস্তবিক শরদিন্দু নরক বা বৈকুণ্ঠ ইত্যাদিতে স্বদেহে যান নাই। তাঁহার সর্বোপকরণ সম্পন্ন আত্মা, ঐ সকল দৃশ্য বা ঈশ্বর কৃপাদির অনুভূতি স্বপ্নরূপে চিত্তে প্রকটিত করিয়া, তাঁহার ভাবী অতিশুভ পূর্বজন্মার্জিত সাধনফল সূচনা করিয়াছিল। আমাদের আত্মাই ঈশ্বর ও পরমাত্মা এবং 'অণুভ্যোঽহণু'। ইহার ভিতরেই সারা ব্রহ্মাণ্ড (স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ, কৃষ্ণ, মহাদেব, কালী ইত্যাদি) ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান! একই রূপে এই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা সারা বিশ্বে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত। 'আমাতেই সব' এবং 'আমিই সব', এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। যোগবাশিষ্ঠে আছে যে, স্বপ্নেও এই সত্যের যথার্থ উপলব্ধি অনন্ত সৌভাগ্যের ফল। অজ্ঞের নিকটে যাহা ' চিত্ত ' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি', তত্ত্বজ্ঞের নিকটে তাহা 'সত্ত্ব' বা 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম'। এই বিষয়ে, ঘ পর্ব ৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। গীতায় (৬, ২৯-৩১) ভগবান বলিতেছেন—

> সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
> ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
> যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
> তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
> সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
> সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

শরদিন্দু-বালকৃষ্ণ

অর্চি রাঙ্গা পদদ্বয়, ওহে প্রভু প্রেমময়,
বাল-কৃষ্ণ গোপ বংশীধারী।
চুমি মুখ সুধাময়, অনন্ত রহস্যময়,
বিশ্বনাথ গোলোকবিহারী।
আশীষ কুসুম তব, পাথেয় তরিতে ভব,
রাখিয়াছি হৃদে যত্ন করি।
জপমালা দিয়া মোরে, বাঁধিয়াছ নাম-ডোরে,
নিজ জন রূপে প্রেমে বরি।
কে বুঝিবে তব গুণ ? কন্যা অবোধ নির্গুণ!
ক্ষম পিতঃ নিজ সদাচারে।
তব প্রেম চিন্তা করি, সুনিশ্চয় বুঝি হরি
গুরু-ইষ্ট তুমি একাধারে।
অভেদ সারদেশ্বরী, সহ মাতা ব্রজেশ্বরী,
আর দুর্গা তিন মূর্তিধারী।
ভেদহীন রামকৃষ্ণ, সহ গুরু ব্রজ-কৃষ্ণ
আর শিব তিন দেহধারী।
ইষ্ট-ইষ্টা বলি কারে, আর গুরু ভাবি কারে,
কভু মোর উপজে সংশয়!
প্রেমময় সবে মোর, আর প্রেমময়ী ঘোর,
সবে গুরু-ইষ্ট সুনিশ্চয়।
সমস্যার সমাপন, গুরু মন্ত্র আলম্বন,
গুরুদত্ত ইষ্টের ভজন।
তথাপি বুঝিতে হবে, অদ্বয় ঈশ্বর সবে,
ইষ্ট পূজা সবের পূজন।

হরি-দ্বেষ উপজয়, হর-দ্বেষ সুনিশ্চয়,
হরি-পূজা হয় হর-পূজা।
সেইরূপ কালী-দ্বেষী, সুনিশ্চয় রাধা-দ্বেষী,
কালী-পূজা হয় রাধা-পূজা।
ভেদহীন শিব-কালী, আর রাধা-বংশীমালী,
না বুঝিলে ভীষণ দুর্গতি।
হরি-হর এক তত্ত্ব, না জানি সৃজি অনর্থ,
মৃত্যু তার নরক বসতি!
নমি দোঁহে বারবার, চুমি মুখে কোটী বার,
নাহি মোর অন্য কোন গতি!
রামকৃষ্ণে সমন্বয়, দোঁহের অবশ্য হয়,
তাঁর প্রেমে গলে যেন মতি! (৩৬)

যতীন-রামকৃষ্ণ (বিশ্বেশ্বর)
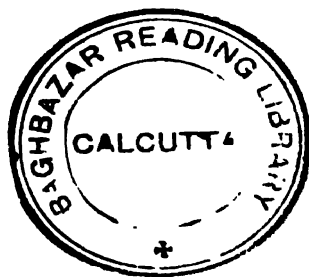
বিষয়—কলিকাতা হইতে দেবীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত উড্ডীন হইয়া আমার গয়া অবতরণ এবং তথা হইতে একাকী উড্ডীনাবস্থায় কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে রামকৃষ্ণকে লিঙ্গ ভেদ করত দণ্ডায়মান দর্শন ও প্রণাম করণ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— লাহোরস্থ আনারকালী পল্লীর বাসা-বাড়ী। এই বাড়ীর সংলগ্ন একটি মুসলমানদিগের কবরস্থান ছিল এবং সম্ভবতঃ বাড়ীটি কবরস্থানের উপরেই নির্মিত হইয়াছিল। উহাতে কখন কখন ভৌতিক উপদ্রব হইত। ৫ হইতে ৭ ও ৮ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নগুলি এই বাড়ীতেই প্রকটিত হইয়াছিল। অতএব, আমি ও শরদিন্দু এই কবরস্থানেই স্বাপ্ন-দীক্ষাদি লাভ করিয়াছিলাম। উহার কোন তাৎপর্য থাকা অসম্ভব নহে!

কাল—অক্টোবর ১৯৩৭, গভীর রাত্র—কনিষ্ঠা কন্যা দীপারাণীর জন্মের পর।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন আমি রামকৃষ্ণভক্ত, মিষ্ট স্বভাব, আমার অধীনস্থ কর্মচারী ও বন্ধু দেবী-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে, তাঁহার সহিত কাশীধাম দর্শন মানস করত, উভয়ে আমার কিশোর বয়সের কলিকাতার বাসাভবনের (১৪ নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, পেয়ারাবাগান) ছাদের নৈর্ঋত কোণ হইতে আকাশে উড়িলাম। উভয়ে গয়াধামে উত্তীর্ণ হইলে, বহু দর্শক অবাক্ হইয়া আমাদের দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে, আমি একাকী উড্ডীয়মান হইয়া কাশীধামে বিশ্বনাথ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম, কিন্তু দেবীবাবুর কোন খবর পাইলাম না। সেখানে দেখিলাম যে, রামকৃষ্ণদেব লিঙ্গমূর্ত্তির ভিতর হইতে প্রায় অর্ধ-শরীর বাহির করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে একটি প্রণাম করিবার পর, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। উক্ত স্বপ্ন-দর্শনের কিছু পূর্বে, আমি ও শরদিন্দু রামকৃষ্ণদেবের ও সারদেশ্বরীদেবীর অবতার ও অবতারিণী স্বরূপ দেবীনারায়ণ বাবুর সহিত চর্চাদি

করিয়া বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলাম (খ পর্ব্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। এই বিশ্বাস উৎপত্তির অল্পদিন পরেই, রামকৃষ্ণদেব আমার নিকটে উক্ত স্বপ্নে নিজেকে বিশ্বেশ্বর শিব স্বরূপেই প্রকটিত করিলেন। এই ঘটনার আরও প্রায় তিন মাসের মধ্যেই, সারদেশ্বরী শরদিন্দুকে দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন। আমাদের বিশ্বাস না হওয়া অবধি, তাঁহারা নিজ স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। প্রায় আট বৎসর কাল, সারদেশ্বরীদেবী শরদিন্দুকে ছদ্মবেশে কৃপা করত, পরিশেষে দীক্ষা দিয়া আত্মসাৎ করিবার যোগাড় করিতেছিলেন। সঠিক কাল আগত হইলে, তিনিই দেবীনারায়ণবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করাইলেন। হায়! তাঁহাদিগের অহেতুক কৃপায় কারণ কে আবিষ্কার করিবে ?

৩। উক্ত স্বপ্নে, দেবীনারায়ণ বাবুকে যেন গঙ্গায় রাখিয়া যাইবার জন্যই আমরা উভয়ে ঐ স্থানে আকাশ হইতে নামিয়াছিলাম। উনি রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ভক্ত, স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং ১৯৪১ বা ১৯৪২ সালে Appendicitis রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছেন। মনে হয়, তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে আভাসে বলিয়াছেন যে, এই জন্ম তাঁহার শেষ জন্ম নহে। বোধ হয় সেই জন্যই, বা কর্মফল বশেই, তিনি আমার সহিত স্বপ্নে শিব ও শক্তির নিত্যধাম কাশীর অপ্রাকৃত বিশ্বনাথ মন্দিরে পৌছাইতে পারিলেন না। বলা বাহুল্য যে, এই স্বপ্নটিও অন্যান্য স্বপ্নের ন্যায় —অর্থাৎ, আমার আত্মা উহার দ্বারা আমার অন্তরে দৃশ্যটি কর্মফলরূপে প্রকটিত করিয়াছিল। পরমাত্মাস্বরূপ শিবলিঙ্গের উপাসনায় জন্মমৃত্যু নিবারণ হয় (**'জন্মজদুঃখ বিনাশক লিঙ্গং'**)। গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্দেশক। গৌরীপট্টই মহামায়া আদ্যাশক্তি। ইনি বিশ্বমাতা বিন্দুরূপিণী ব্রহ্মযোনি এবং লিঙ্গ নাদরূপী শব্দব্রহ্ম বা অক্ষরব্রহ্ম (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ)। অব্যক্ত জীবভাবাপন্ন চেত্যোন্মুখী জ্যোতির্ময় চিদাকাশই ব্যক্তাবস্থায় বিশ্বরূপী গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিঙ্গ **'নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী হরো হরিঃ'**। অতএব, শিবলিঙ্গ **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'** ব্রহ্মস্বরূপ এবং ওঁ-কারও তথৈবচ (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ।

৪। চিদাকাশ বা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই (৪ পর্ব) এবং সেই পরমাত্মা মিলিত শিব ও শক্তি। সেইজন্য, পরমাত্মা শিব-শক্ত্যাত্মক। বিশ্বের অভিব্যক্তাবস্থায়, পরমাত্মা নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ এবং বামাঙ্গ প্রকৃতি—মিলিত এই রূপের নাম অর্ধ-নারীশ্বর (শিব-অন্নপূর্ণা),

বা শিবলিঙ্গ। ইহার ভিতরেই সারা বিশ্ব—বা সারা বিশ্বই শিব-শক্তিময়, বা বোধের ভিত্তিতে, বোধ-শক্তির লীলা। আবার এই লিঙ্গই অন্যান্য পুরুষ ও প্রকৃতি, অর্ধ-অর্ধ অঙ্গধারী, যথা—কৃষ্ণ-রাধা, বিষ্ণু লক্ষ্মী (বা সরস্বতী), ব্রহ্মা-সাবিত্রী, রাম-সীতা, গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, ইত্যাদি। এই সব বিষয় ও কাশীর বিশ্বেশ্বর-শিবলিঙ্গ মাহাত্ম্য, প্রথম ভাগ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত আছে। স্বরূপতঃ ইঁহারা সকলে অভেদ, কিন্তু বিশ্বে কার্য্যভেদে রূপ ও শক্তি ভেদ হইয়াছে। সকলেই পরমজ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা; কিন্তু, যেমন এক ব্যক্তিরই হস্ত, পদ, মস্তক, ইত্যাদি ভেদে কার্য্য-সাধক অনেক অঙ্গ, সেইরূপ ইঁহারা পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গস্বরূপ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কোন কোন কল্পে পদ বিনিময় করেন (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ)। অতএব, তাঁহারা সম্পূর্ণ অভেদ! আদ্যাশক্তি দেবীও বিশ্বে কার্যভেদে দুর্গা, রাধা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী রূপধারিণী। অবতার ও অবতারিণীগণ পুরুষ-প্রকৃতি এবং পরমাত্মা-স্বরূপ ঈশ্বর-ঈশ্বরী মূর্ত্তি। তাঁহাদের দর্শন ও চিন্তন ঈশ্বর-ঈশ্বরী দর্শন ও চিন্তনের সম ফলদায়ী—যেমন গঙ্গার একস্থান দর্শন ও স্পর্শনে, সর্বস্থান দর্শন ও স্পর্শনের ফল হয়। যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য মূলপ্রকৃতি মহা-কালীর শক্তিতেই সম্পন্ন হয়, সেইরূপ আদ্যাশক্তির সাহায্যেই অবতারলীলা! তিনি ব্রহ্মময়ীর জমিদারীর গোলমাল (অধর্মের অভ্যুত্থান, সাধুদিগের নির্যাতন, ইত্যাদি) মিটাইবার জন্য যুগে যুগে ঈশ্বররূপে অবতরণ করেন এবং তাৎকালিক বিশ্বের মুক্তির চাবি নিজ হস্তে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করেন। তিনি মানবের পরিত্রাণ কর্তা এবং সাধু নরনারীদিগকে নানা উপায়ে প্রেমভক্তি শিক্ষা দান করেন। অবতারগণ শত সহস্র উপযুক্ত মানব-মানবীকে গুরুরূপে সংসার হইতে মুক্ত করেন। দেহ ত্যাগের পরেও তাঁহাদের কার্যের বিরাম হয় না—এই পুস্তক ইহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ! নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহারা দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেম বিগ্রহরূপে কার্য করেন। তাই রামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন—

ওরে, তারে কেউ চিনলি নারে!
সে যে পাগলের বেশে,
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে,
ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।

আর সারদেশ্বরী দেবী বলিতেন—

আমাদের তো দীক্ষা দিতেই জগতে অবতরণ! ... আমরা যদি পাপ-তাপ

না লইব, বা হজম করিব, তবে আর করিবে কে—পাপী তাপীদের ভার আর কাহারা সহ্য করিবে?…ভগবান লাভ শুধু তাঁর কৃপাতে হয়—তপস্যা করিলেই যে তাঁহার কৃপা হইবে, এমন নয়…প্রেমভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে পাওয়া যায় না… ঠাকুরের মাঝে গুরু, ইষ্ট সব পাইবে—উনিই সব…ইষ্টমন্ত্রে সব কাজ হয়… এই শরীরটা না থাকিলেও, যাহাদের ভার লয়েছি তাহাদের একজনও বাকি থাকিতে আমার ছুটী কোথা?…যাহাদের নিজের বলে লয়েছি, তাহাদের তো ফেলিতে পারি না।

এই সব বিষয় প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অবতারগণ শিবলিঙ্গরূপী এবং শিবলিঙ্গের পূজা মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা বুঝায়। ভক্ত এই বলিয়া পূজা করে, 'ঠাকুর! দেখো যেন আর জন্ম না হয় ও শুক্র-শোণিতের মধ্য দিয়া ধরায় যেন আর আসিতে না হয়।'

৫। রামকৃষ্ণদেবের অবতার স্বরূপের উপর সামান্য বিশ্বাস উদয় হইতেই, তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, তিনি ও সারদেশ্বরী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ শিব ও অন্নপূর্ণার স্বরূপ! তাঁহারা যে কৃষ্ণ ও রাধার অবতার ও অবতারিণী তাহা তো পুস্তক পাঠেই বুঝিয়াছিলাম। অতএব— কৃষ্ণ-রাধা, শিব-অন্নপূর্ণা (কালী) এবং রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী যে অভেদ, তাহাই এই পর্বে আলোচিত স্বপ্নটির প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্ববর্তী কয়টি পর্বও এই তত্ত্বটি প্রস্ফুটিত করিয়াছে। দুইটি ঘোর তমসাচ্ছন্ন গৃহ আলোকিত করিবার জন্য, অভিন্ন ইঁহারা সকলে এক জোটে ও এক উদ্দেশ্যে দপ্ দপ্ করিয়া অবিরাম আগুন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু কতদূর সফলকাম হইলেন তাহা তাঁহারাই মাত্র জানেন। ভরসা এই যে, তাঁহারা ধীরে ধীরে সমস্ত সংকল্প পূরণ করেন এবং হঠাৎ কোন প্রলয়ঙ্করী পরিবর্ত্তন তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ! সেইজন্য, মা সারদেশ্বরী বলেছিলেন (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১১ (৪) অনুচ্ছেদ), 'আমার কৃপালাভ করেও যেমন ছিলে তেমনি আছ ঐ কথাটা ঠিক নহে। তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ উহার সহিত তোমাকে অন্যত্র লইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি ঘুম ভাঙ্গিতেই কি বুঝিতে পারিবে যে স্থানান্তরে গিয়াছ? না, যখন পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ? গুরুর কাছে বেশী দিন থাকিতে নাই, কারণ গুরুর লৌকিক আচরণ দেখিয়া শিষ্যের ভক্তিশ্রদ্ধা কমিয়া যায়।' যতদিন মানবের প্রারব্ধ কর্মফলের বেগ অবশিষ্ট থাকে, ততদিন তাহার অজ্ঞান ঘুমের ঘোর পূর্ণভাবে কাটে না। নরদেহে অবতারগণও অনেক সময় বাহিরে সামান্য মানবের ন্যায় ব্যবহারবান্ হন। চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়া মানিতে, রামকৃষ্ণদেবেরও অনেক কাল বৃথা অতিবাহিত হইয়াছিল।

৬। মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন যে, যেখানে লিঙ্গরূপী, বা স্বশক্তি মহাদেব অবস্থিত, যেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থগণ, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুণ্যক্ষেত্র সকল ও চতুর্দ্দশ ভুবন বিরাজিত থাকেন। বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে, শিব নিজে বলিতেছেন (প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ ও ৩ পাদটীকা)—

এ লিঙ্গ পরম ভূপ, ভুবনে কৈবল্য যূপ,
আমার স্থাবর রূপ পরাৎপর জ্যোতি।
সতত যে জন ভক্ত, মম প্রতি অনুরক্ত,
ইহার পূজনাসক্ত হইবেক মতি।...

বারেক যে প্রণমিবে, ধরাপতি সেই হবে,
তার বন্দনা করিবে এ তিন ভুবন।...
বিশ্বেশ্বর সম পদ, মণিকর্ণি সম হ্রদ,
কাশী সম মুক্তিপ্রদ ত্রিভুবনে নাই।

আমি দৃশ্য কদাচিত, কখন অপ্রকাশিত,
ইনি সদা বিরাজিত আনন্দ কাননে ···
ইঁহারে যে নরবরে, নয়নে দর্শনে করে,
মম এই কলেবরে হেরিল সে জন।

আনন্দ কানন মধ্য, এ আনন্দ লিঙ্গ সদ্য,
সপ্তম পাতাল ভেদ্য হইলা প্রকাশ।
হেতুবাদী লোক ওহে, ইহারে কৃত্রিম কহে,
তার গর্ভবাস দেহে না হবে বিনাশ।

যতীন-রামকৃষ্ণ (বিশ্বেশ্বর)

অবিশ্বাসী অভাজনে, আপন মাহাত্ম্য গুণে,
স্ব-স্বরূপ করিতে প্রকাশ।
কাশী লইলে স্বপনে, বিশ্বনাথ নিকেতনে,
উড়িয়ে পাখী সম আকাশ।
সেথা লিঙ্গ ভেদ করি, প্রেমময় মূর্তি ধরি,
প্রতীক্ষায় আছিলে আমার।
প্রণাম মোর লইলে, কৃপা ক'রে বুঝাইলে,
তুমি বিশ্বেশ্বর সারাৎসার।
নাম তব 'রামকৃষ্ণ', একাধারে রাম, কৃষ্ণ,
সর্বময় অর্ধনারীশ্বর।
শিব তব যাম্য দেহ, আর শিবা বাম দেহ,
পরমাত্ম-জ্যোতিঃ পরাৎপর।

যুগে যুগে অবতরি, বিশ্বের কলুষ হরি,
যুগ ধর্ম কর বিতরণ।
হয়ে ভব কর্ণধার, করি পাতকী উদ্ধার,
নাম ধর পতিত পাবন।

—* অবশে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান (১২)—

নরদেহ না ধরিলে, নরলীলা না করিলে,
বুঝে না নর ভক্তি সাধন।
তাই নরদেহ ধরি, সে ভাব স্বীকার করি,
আচরিলে সাধন ভজন।
তুমি শিব বিশ্বগুরু, আর কালী কল্পতরু,
পুরুষ-প্রধান নিরঞ্জন।
সাধন তোমার কার? পূজন কেন তোমার?
চিন্মাত্র করে না পূজার্চন!
অবতার অর্থে 'ত্রাতা,' মানবের মুক্তিদাতা,
ঈশ্বর-ধেনুর ক্ষীরাধার।
অহেতুক কৃপাগার, সাধুজনে কর পার,
হয়ে ভব নদী কর্ণধার।
কিছু জানে না যতীন, গুণ তব অন্তহীন,
অক্ষম বেদ উহা কীর্তনে।
পূজি রাঙ্গা পদদ্বয়, চুমি মুখ সুধাময়,
প্রেম দাও মূঢ় অভাজনে। (৩২)

শরদিন্দু-সারদা

(১) ধ্যান-মূল গুরু-মূর্তি, গুরু-পূজা সার,
মোক্ষ-মূল গুরু-কৃপা, মন্ত্র বাক্য তাঁর।
গুরু সত্য দেবদেবী, তীর্থ, পূজা, হোম।
ওঁ তৎসৎ ওঁ—ওঁ তৎসৎ ওঁ—ওঁ তৎসৎ ওঁ।

(২) হরিঃ স্বয়ং গুরুর্ভূত্বা তারয়ত্যখিলং জগৎ।

বিষয়—সারদেশ্বরীর শরদিন্দুকে ইষ্ট ও ইষ্টা কৃষ্ণ-রাধার ছবি দর্শন ও দীক্ষা দান ইত্যাদির স্বপন এবং উহার কিছুদিন পরে তাঁহার দিব্য জ্যোতিপূর্ণ মূর্তিতে এক স্বপনে প্রকটন ও শরদিন্দুকে নিকটস্থ হইবার আহ্বান।

স্থান— লাহোরস্থ আনারকালী পল্লীর বাসা-বা

কাল—জানুয়ারীর শেষভাগ, ১৯৩৮। তখন শরদিন্দুর চতুর্থ সন্তান, কনিষ্ঠা কন্যা দীপার বয়স চারি মাস মাত্র।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"যেন দুইটি আসন পাশাপাশি পাতা রহিয়াছে—একটিতে আমার স্বামী এবং তাঁহার বামপার্শ্বে আমি উপবিষ্ট—আর শ্রীমা (মধ্য-বয়স্কা বিধবা) আমাকে মন্ত্রদানে উদ্যুক্তা। আমার তখন মন্ত্র হয় নাই বলিয়া উহার বিষয় কিছুই জানিতাম না। মা প্রথমে মন্ত্রটি এমন ধীরে উচ্চারণ করিলেন' যে, আমি উহা বুঝিতে না পারিয়া বিশেষ বিরক্তির সহিত ঈষৎ রুক্ষস্বরে তাঁহাকে বলিলাম. 'কি করিয়া বলিতেছ? ভাল করিয়া বল।' ঐরূপ বলিলে, তিনি উচ্চরবে আমার দুই কর্ণে মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন এবং আমি তাঁহাকে পুনরায় বিরক্তির সহিত জানাইলাম যে, অত উচ্চরবে বলিবার জন্য আমার স্বামী উহা শুনিতে পাইলেন। তাহাতে তিনি অতি সুমিষ্ট স্বরে—যেন কত অপরাধিণী, এইভাবে—বলিলেন. 'উহাতে দোষ নেই, মা!' তাহার পর, আমার মন্ত্রোদ্দিষ্ট দেবদেবী রাধা-কৃষ্ণের একটি চিত্রপট আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ তোমার ঠাকুর!' এমন সময়, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল।"

উক্ত স্বপ্নের কয় দিন পরে শরদিন্দুর আর একটী স্বপ্ন বিবরণ এইরূপ—

"আমি কোন কারণে আমার স্বামীর নিকট ভৎর্সিত হইয়া ক্রন্দন করত রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। সেই রাত্রে স্বপ্নে মা সারদেশ্বরী শত শত সূর্য-চন্দ্রোপম জ্যোতিঃপূর্ণ দিব্য-মূর্তিতে অন্ধকার গৃহ উদ্ভাসিত করত আবির্ভূতা হইলেন এবং ঘরের মেঝে একটি আসনে উপবিষ্টা হইয়া আমাকে এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, 'তুই এখনও কাঁদিতেছিস্ ? আয় ! আমার নিকট আয় !' "

২। প্রথম স্বপ্নটিতে, শিবারূপিণী সারদেশ্বরীদেবী আমাকে মন্ত্র দিলেন না, কারণ উহা পরে শিবরূপী হনুমানদেবকে দিয়া দেওয়াইবেন (৭ পর্ব) এবং আমাকে শরদিন্দুর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট রাখিয়া, তাঁহাকে গুরুরূপে দীক্ষা মন্ত্র দিলেন—অর্থাৎ, তাঁহার যাহা মন্ত্র ও ইষ্ট-ইষ্টা হইল, তাহা আমাকে জানাইতে যেন ইঙ্গিত করিলেন। স্বপ্নটিতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা না ঘটিলে, শরদিন্দু আমাকে তাঁহার মন্ত্র হয়তো জানাইতেন না। শাস্ত্রমতে, গুরুভাই বা ভগিনী ভিন্ন কাহাকে ইষ্টমন্ত্র বলিতে নাই, এবং সাধারণতঃ স্বামী ও স্ত্রীর এক গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণীয়। লোকচক্ষে, সারদেশ্বরী দেবী আমার দীক্ষাগুরু নহেন, কিন্তু জ্ঞান—* অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (১৩)—*দৃষ্টিতে ইহা ঠিক নহে। অভেদ শিবারূপিণী সারদেশ্বরীদেবী, শিবরূপী হনুমান দেবের সহিত একজোটে মিলিত হইয়াই দুই দিনে আমার দীক্ষা-কার্য পূর্ণ করিয়াছিলেন —একজন ইষ্ট-ইষ্টার চিত্রপট দেখাইয়া (৬ পর্ব) এবং অন্যজন দীক্ষা দান করিয়া (৭ পর্ব)। শরদিন্দুর সারদেশ্বরীর সহিত স্বাপ্ন রুক্ষ-আচরণ তাঁহার প্রাকৃতিক—অতএব, দোষের নহে (ঙ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। কিন্তু ইহার সহিত বিশ্বজননী, জীবত্রাণকর্ত্রী, ঈশ্বর-ধেনুর ক্ষীরাধাররূপিণী, সারদেশ্বরীর স্বাপ্ন সুমিষ্ট ব্যবহার তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে কেন তিনি অহেতুকী কৃপারূপিণী নামে পরিচিতা। এই প্রসঙ্গে, ৫ পর্বের ২ ও ৪ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। দেবীনারায়ণবাবুকে উপলক্ষ করত শরদিন্দুকে নিজ ঈশ্বরী স্বরূপের জ্ঞান দিবার পর, মা সারদেশ্বরী তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন—নতুবা অবিশ্বাস বশতঃ তাঁহার অকল্যাণ হইত। আট বৎসর সাথে সাথে ফিরিয়া—কভু অজ্ঞান-নরকে, কভু সংসারের দুর্গম-পথে, আর কভু বা বৈকুণ্ঠধামে, তাঁহার যাহা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ছিল তাহাতে সাহায্য করিয়া—পরিশেষে উপযুক্তকাল সৃজন করত সারদেশ্বরী শরদিন্দুকে দীক্ষা দান করত আত্মসাৎ করিলেন। দীক্ষাদানের কয় দিন পর, তিনি শরদিন্দুকে নিজ পরমাত্মরূপী দিব্য জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার ক্রন্দনে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি সদাই তাঁহার

সাথে ফিরিতেছেন এবং তাঁহার আত্মরূপিণী, বা দেহ ও সুখ-দুঃখ রূপিণী। গুরু ও তৎসহ অভেদ ইষ্ট, সদাই মানবের হৃদয়ে জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া অবস্থিত, এই ভাবে ও সর্বাপেক্ষা পূজ্য ও প্রিয় বোধে উপাস্য ও ধ্যেয়। ইহাই আপনাকে আপনার ভিতরে দর্শন এবং সাধনার চরম ও পরম উদ্দেশ্য পূর্ণ-করণ (প্রথম ভাগ, দ্বাদশ অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। ইহা হইতেই তাঁহাদিগের উপর সর্বার্পণ বুদ্ধি আগত হইয়া, সাধক নিজেকে পূর্ণ শরণাগত ভক্তরূপে পরিণত করত, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। সারদেশ্বরীর দীক্ষায়, কৃষ্ণ-রাধাই শরদিন্দুর ইষ্ট-ইষ্টা রূপে পরিণত হইলেন। এই উদ্দেশ্যেই শরদিন্দুর সহিত, গুরুরূপিণী সারদেশ্বরীর খ হইতে ঘ পর্বে বর্ণিত লীলা ও ইষ্টরূপী শ্রীকৃষ্ণের ঙ পর্বে বর্ণিত লীলা। যিনি কৃষ্ণ-রাধা, তিনিই রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী এবং তিনিই শিব-অন্নপূর্ণা সকলেই বিভিন্ন নাম ও রূপে, পরমাত্মরূপী তেজোময় সগুণ ব্রহ্ম, বা কুণ্ডলিনী শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম, বা কাশীস্থ বিশ্বেশ্বর-শিবলিঙ্গ (৪ ও ৫ পর্ব)।

৩। প্রথম ভাগের নবম ও একাদশ অধ্যায়ে, সদ্গুরু ও জগদ্‌গুরুদিগের মুক্তিদায়ী স্বরূপের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছে এবং পূর্বে খ হইতে ঘ পর্বে, প্রসঙ্গানুযায়ী ঐ বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা আছে। শরদিন্দু সারদেশ্বরীকে গুরুরূপে লাভ করিয়া কি দুর্লভ বস্তু পাইলেন তাহার বিষয় কিছু বলিতে হইবে। সাধারণ সদ্গুরু ও ঈশ্বর গুরুতে—*অবশেষ কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (১৪)—*পার্থক্য আছে। স্বপ্নে ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে গুরুরূপে পাইলে কি ফল হয়, তাহা সারদেশ্বরী নিজ মুখে জনৈকা শিষ্যাকে এইরূপে জানাইয়াছিলেন, 'ষাট্‌, ষাট্‌, তুমি ভিখারিণী মেয়ে ও কথা কেন বল, মা? তুমি আমার রাজরাণী মেয়ে! তোমাকে আমি নিজে গিয়ে (স্বপ্নে) দীক্ষা দিয়েছি। তোমার দুঃখ করিবার কিছু নাই। তোমার ভালমন্দ সবই আমি দেখবো, তোমার চিন্তা নাই।' আবার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'মনে রেখো যে এখানে যারা এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়েই আছে! বিধির সাধ্য নাই যে তাহাদের রসাতলে ফেলে।' ঈশ্বর গুরু সম্বন্ধে, চৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন—

> কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে,
> গুরু অন্তর্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে।
> অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়,
> বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়।

উক্ত বিষয়ে রামকৃষ্ণদেব এই ভাবে বলিতেছেন—"গুরুরূপে ঈশ্বর স্বয়ং যদি

মায়াপাশ ছেদন করেন, তাহা হইলে আর ভয় কি? কাঁচা গুরু হইলে, গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা, শিষ্যের অহঙ্কার ঘুচে না, আর সংসার বন্ধন কাটে না। ব্যাঙগুলাকে ঢোঁড়া সাপে ধরিলে, 'ক্যাঁ,' 'ক্যাঁ' ক'রে হাজার ডাক ডেকে ঠাণ্ডা হয় এবং কোনটা বা পালিয়ে যায়; কিন্তু যখন কেউটে বা গোখ্‌রোতে ধরে, তখন তিন ডাক ডেকেই সব ঠাণ্ডা হয় এবং যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্তে ঢুকে মরে থাকে। এখানকার সেইরূপ জানবি। যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে। যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে, তাকে এখানে আসতেই হবে।" স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন (অবতরণিকা, ১৬ অনুচ্ছেদ)—'কোটী জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে মুক্ত করে দেওয়া, কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন।' বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী সাধারণ সদ্‌গুরুর বিষয়ে এইভাবে বলিতেছেন—"যে গুরু শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই বা ভগবানের পদাশ্রিত মহাপুরুষেরাই সদ্‌গুরু। তিনি শিষ্যের পরকালের ভার বহনে সমর্থ। সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম—নাম নহে, অক্ষর নহে, বা একটা বাক্য নহে। ঐ নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতর ঐ শক্তি সঞ্চারই সদ্‌গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কৃপায়, একবার কাহার লাভ হইলে, তাহার নিজের আর করিবার কিছুই থাকে না। তাহার জীবনের সমস্ত কার্য, সেই একজনেরই ইচ্ছাধীন। সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলে, মানুষ কখনই আর নূতন কর্ম বা কর্মফল সৃষ্টি করিতে পারে না—পূর্ব পূর্ব কর্মের ফল ভোগ করিতে থকে মাত্র। শুধু প্রারব্ধ যেন বাধ্য করিয়া ঐ সব কর্ম করাইয়া লয়। শাস্ত্রে আছে যে এই দীক্ষায়, '**দীক্ষা গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ**'। মহাত্মারা ও মুনি-ঋষিরা যে সকলেই সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সদ্‌গুরু লাভ কি এতই সহজ? একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই ইহা হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু প্রাপ্তির পর যে কোন অবস্থাই লাভ হউক না কেন, তাহা একেবারে স্থায়ী।" পরব্রহ্মরূপী সদ্‌গুরু অপেক্ষা মানবের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে নাই (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, পাদটীকা (১))। তিনিই ইষ্ট-স্বরূপ এবং শাস্ত্র বলিতেছেন—

গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবঃ সুহৃদঃ শিবঃ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ সর্বাত্মনা গুরুম্॥

৪। সারদেশ্বরী শরদিন্দুকে মন্ত্র দিলেন বটে; কিন্তু তিনিই যে অভেদ রামকৃষ্ণ, এই কথা যিনি ভুলিবেন, তিনি মূলেই ভুল করিবেন। উভয়েই অভেদ, জগদ্‌গুরু-রূপী বিশ্বেশ্বর নিজস্ব শিব-অন্নপূর্ণা ও সর্বদেবদেবী স্বরূপ (৫ পর্ব)। একাদশ

পর্বে এযাবৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে ভক্ত পাঠক নিশ্চয় মুগ্ধ হইবেন, কিন্তু এখনও অনেক বাকি! এই পুস্তকে যে সকল কাহিনী লিখিত হইবে, তাহা নানারূপিণী এক পরা-প্রকৃতিদেবী কালিকার কৃপা ও মাহাত্ম্য (৩২ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ) এবং আমাদের মূর্খতা, প্রকাশক! তবে মূর্খ আমরা যে তাঁহার কৃপার নির্বাচিত পাত্র ও পাত্রী, ইহা বড় সামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদ নহে! আদ্যাশক্তি দেবীই যে বিশ্বে সর্বদেবদেবীর ও অন্যান্য সর্ববস্তুর রূপের ও প্রাণের আধার বা মূল, তাহা প্রথম ভাগে নানা স্থানে বিশেষ ভাবে অকাট্য যুক্তি সহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে, পূর্বে ৩ পর্বের চিহ্নিত স্থান (৬) দ্রষ্টব্য। সংসারে এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্ম নহেন। সুতরাং এখানে যাহা কিছু বাহ্য বস্তু, সবই কল্পিতাকার ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি। হরিহরাদি হইতে কৃমীকীট অবধি ভিন্নাকার বস্তুসমূহ যে পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বোধ হয়, তাহার কারণ কেবল দ্বিত্ব ভাবনা। এই ভাবনা ছাড়িলেই, সব একাকার। বিশ্বে আদ্যা একাকিনী ও সর্ব নিয়ন্তৃব্রহ্মেচ্ছারূপিণী মহানির্বাণ তন্ত্রে মহাদেব তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—

মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥

শরদিন্দু-সারদা

নমি পাদ পদ্মদ্বয়, চুমি মুখ মধুময়,
গুরু মোর অভয়া সারদামণি।
আট বর্ষ চেষ্টা করি, দীক্ষা মোরে দান করি,
সফল করিলে শ্রম কাত্যায়নী!
নাহি জানি বৈধী জপ, কিবা ধ্যান, পূজা, তপ,
অর্চি যথা ইচ্ছা হয় প্রেমময়ী।
কৃপায় তব বিধান, স্বপনে মন্ত্র প্রদান,
অযাচিত মোক্ষদাত্রী, ইচ্ছাময়ী।

নিজ বাক্যে বাঁধা আছ, যার মাতা হইয়াছ,
সাধনা তাহার নহে প্রয়োজন।
তুমি গুরু, তুমি ইষ্ট, ভেদহীন প্রাণকৃষ্ণ,
এই ভাব মাত্র আমার সাধন।
আর তুমি বলিয়াছ, দীক্ষা যাদের দিয়াছ,
ভবে শেষ এই তাদের জনম্।
রামকৃষ্ণ বাণী আছে যে আসিবে তব কাছে,
তার নাহি আর সংসারে করম্।
চন্দ্র-সূর্য যত দিন, উক্ত বাণী ততদিন,
বেদবাক্য সম কার্যকর রবে।
যে হবে বিশ্বাসী এ'তে, পাবে ত্রাণ এ জগতে,
শেষে লয় রামকৃষ্ণ পদে হবে।
ভবার্ণবে তরি ঝড়ে, টলমল সদা করে,
কিন্তু মোর রামকৃষ্ণ কর্ণধার।
তাই হইয়া নির্ভয়, ক'রে তাঁর পদাশ্রয়,
শরদিন্দু চেয়ে আছে পর পার।
তুমি দুর্গা, তুমি ধাত্রী, আর কালী, মোক্ষদাত্রী,
অন্নপূর্ণা, সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া।
সব তুমি জানিয়াছি, অটুট বিশ্বাসে আছি,
বিশ্ব লয়ে নাহি যাবে হতে হিয়া।
পতি সহ ইষ্ট সবে, পতি সহ গুরু সবে,
ভেদহীন, দ্বিত্বহীন, একেশ্বর।
লহ সকলে বন্দন, আর প্রেম চুম্বন,
বিশ্বহেতু জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর। (৩২)

যতীন-সারদা

বিষয়—সারদেশ্বরীর আমাকে নিরাকার ইষ্ট ও ইষ্টা শিব-অন্নপূর্ণার ছবি প্রদর্শনের স্বপন।

স্থান—লাহোরস্থ আনারকালী পল্লীর বাসা-বাড়ী।

কাল—মধ্য ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ সাল।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"আমি যেন আমার বাল্য ও কিশোর বয়সের কলিকাতাস্থ বাসা ভবনে (১৪ নং কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, গোয়াবাগান), মা সারদেশ্বরীর সহিত একত্রে রহিয়াছি। সেখানে তিনি আমাকে একখানি ছবি দেখাইয়া বলিলেন, 'বাবা! ঐ দেখ শিব ও অন্নপূর্ণারূপী তোমার ইষ্ট ও ইষ্টা এবং তৎপরেই অন্তর্হিতা হইলেন। ছবিখানি নিরাকার, কিন্তু তথাপিও দেখিবার পরেই বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে, ঐরূপ অবস্থা অপসারিত হইলে দেখিলাম যে, উক্ত বাটীস্থ আমার আত্মীয়গণ আমাকে মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ঘটনাটি বলিলে, তাঁহারা যেন কোনরূপ আগ্রহ না দেখাইয়া, বা কোন প্রশ্নাদি না করিয়া, অদ্ভুতভাবে নীরব রহিলেন। তৎপরে, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। শরদিন্দুর সহিত বিবাহ রাত্রে জাগ্রদাবস্থায় আমার নিরাকার শিব-শক্তি, বা পরমাত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন হইয়াছিল (৪ পর্ব)। রামকৃষ্ণদেব আমাকে ৫ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে বুঝাইয়াছেন যে, তিনি ও সারদেশ্বরী—***অবশে কালির দাগে ও ছিদ্রে চিহ্নিত স্থান (১৫)—***কাশীর বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গস্থ শিব ও অন্নপূর্ণা, বা অর্ধনারীশ্বররূপী। ইহা মহাবিরাটরূপী ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বস্তুর হৃদয়পদ্ম মধ্যে সদা আত্মরূপে অবস্থিত। শরদিন্দুকে দীক্ষাদানে শিষ্যারূপে আত্মসাৎ করত, মা সারদেশ্বরী আমাকে নিজ গুরুশক্তি প্রয়োগে ইষ্ট ও ইষ্টার নিরাকার রূপ দেখাইয়া ও ভাবে মূর্চ্ছিত করিয়া শিবারূপে আমার গুরুর একটি প্রধান কার্য্য করিলেন—কেননা, শাস্ত্রমতে আত্মজ্ঞান বা উপাসনা বিষয়ে শিক্ষাদাতা গুরু, দীক্ষা-দাতা গুরুর ন্যায় সদা গ্রাহ্য। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ

দ্রষ্টব্য। প্রকারান্তরে, তিনি আমায় বুঝাইলেন যে, তিনি ও রামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য প্রকৃতি ও পুরুষরূপী দেবী ও দেব (সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, ইত্যাদি) সকলেই আমার ইষ্টা-ইষ্ট রূপে স্বাত্মস্থ! এই নিরাকার ভাবে, আমার ও শরদিন্দুর ইষ্ট ও ইষ্টা একই। অবশিষ্ট গুরুর কার্যটি (মন্ত্রদান) শিবরূপী হনুমানদেবের জন্য রাখিয়া দিলেন। সেই জন্য চ পর্বে ২ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, অভেদ শিবারূপিণী সারদেশ্বরী ও শিবরূপী হনুমান উভয়ে মিলিত হইয়াই আমার দীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য, উভয়েই আমার গুরু এবং রামকৃষ্ণ ও হনুমান অভেদ—একজন কৃষ্ণাবতার, আর অন্যজন শিবাবতার। গুরুরূপিণী সারদেশ্বরী (যাঁহার অর্ধাঙ্গ পীঠে সদা রামকৃষ্ণ বিরাজিত) কর্তৃক প্রকাশিত আমার নিরাকার ইষ্ট ও ইষ্টা. শিব ও অন্নপূর্ণা, কাশীস্থ পরমাত্ম জ্যোতিঃরূপী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গই জীবভাবাপন্ন চিদাকাশ এবং ইঁহার ভিতরেই অর্ধার্ধ অঙ্গে মিলিত যুগলমূর্তি ব্রহ্মা-সাবিত্রী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী (বা সরস্বতী), মহেশ্বর-অন্নপূর্ণা, কৃষ্ণ-রাধা, রাম-সীতা, গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, ইত্যাদি (২৬ পর্ব)। অতএব, আমার নিকট কোন ঈশ্বর-ঈশ্বরী মূর্তিতে ভেদ নাই এবং সকলেই শিব-শিবারূপী ইষ্ট-ইষ্টা, জীবভাবাপন্ন অদ্বয় চিদাকাশ—যাহা পরাৎপর কুণ্ডলিনী শক্তি কর্তৃক উদ্ভাসিত (' **সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্** ') জ্যোতিঃস্বরূপ। একাগ্রভাবে আত্মবোধ সুধাতে, এই অখণ্ড চিন্ময় পরমাত্মা বা শিব-জ্যোতিঃ আমার অর্চনীয়—**চিদানন্দরূপ: শিবোহহং শিবোহহম্**—এবং ইহাতে অন্য কোনও পূজার বিধি বা উপকরণাদি নিষ্প্রয়োজন (৪ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। অনন্ত কৃপায় অভেদ শিব-শিবা, ঐ জ্যোতিঃ-মূর্তিতে আমার নিকট শরদিন্দুর সহিত বিবাহ রাত্রে জাগ্রদাবস্থায় প্রকটিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সদ্‌গুরুর দীক্ষা ভিন্ন, প্রকটন স্বরূপ-জ্ঞানদায়ী হইলেও, পূর্ণ—* **অবশেষ কালির দাগে ও ছিদ্রে চিহ্নিত স্থান** (১৬)—*শক্তিশালী হয় না। সেই জন্য, ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহারাই আমার দীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিলেন (এই পর্ব) ও করিবেন (৭ পর্ব)। গুরু বা ঈশ্বর কৃপা ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। গুরু ও ইষ্ট ভিন্ন মূর্তিধারী হইলেও অভেদ।

৩। অর্চনার পদ্ধতিতে, আত্মরূপে কূটস্থ চৈতন্যের উপাসনাই উন্নত সাধকোচিত ও সুপ্রশস্ত মার্গ এবং ইহা 'পরাপূজা' নামে অভিহিত (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪৭ অনুচ্ছেদ, চতুর্দশ অধ্যায় (১) পাদটীকা ও পঞ্চদশ অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ)। মহানির্বাণ তন্ত্রে (১৪ উল্লাস) শিব বলিতেছেন—

এবমেব পরাপূজা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া ব্রহ্মবিত্তমৈঃ।...

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্॥
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ॥

উক্ত বিষয়ে, বশিষ্ট মুনি রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—"এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় 'যোগ' নামে অভিহিত। চিত্তের উপশান্তিই 'যোগ' এবং উহা (সাধারণতঃ) দ্বিবিধ। প্রথমটি আত্মজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি প্রাণস্পন্দরোধ। সকলের পক্ষে দ্বিবিধ উপায় সহজ সাধ্য নহে—সেই কারণে, যাহার যেটি সাধ্য সে তাহাই গ্রহণ করিবে। সংসার তরণ বিষয়ে, দুইটি উপায়ই সমান ও সমফলপ্রদ। আমার মতে জ্ঞানই সুসাধ্য। দ্বিতীয় উপায় দুঃসাধ্য, কারণ তাহাতে ধারণা, আসন দেশ, প্রভৃতি প্রশস্ত হওয়া চাই—যাহা সুলভ নহে। উৎসাহযুক্ত, অনলস, সমর্থ ও ধীর ব্যক্তির নিকটে দুই মার্গই সুসাধ্য" (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৫ অনুচ্ছেদ ও ষোড়শ অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ।

৪। অখণ্ডাকারে এই বিশ্ব ব্রহ্মময়—সগুণ শ্রীদেবী, ও বা নির্গুণ রাম। সগুণ ব্রহ্ম ভাবে, যাহা কিছু বিশ্বে সমস্তই শিব (বিশুদ্ধ বোধ) ও শক্তি (নানাবিধ বোধ শক্তি), বা শিব-শক্তির অপ্রাকৃত রমণোদ্ভূত এবং এখানে কেহ কোন বিষয়ে স্বাধীন নহে—বা সমস্তই আত্মারূপী, বা ঈশ্বরেচ্ছাসম্ভূত (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ)। জীবাত্মার নিষ্ক্রিয় স্বরূপ উপলব্ধি ও দেহাভিমান ত্যাগ করত যে-ব্যক্তি বিশ্বের সর্ববিধ অভিব্যক্তিকে শিবশক্তি বা ঈশ্বরকে যথার্থ অর্পণ করিতে পারে, সে ইহজন্মেই জীবন্মুক্ত হইয়া, আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ)। তবে, যতকাল অবধি মানবের শুভাশুভ দেহাত্ম-

বোধে সৃষ্ট কর্মফল অবশিষ্ট থাকে, ততকাল শতকল্পেও মুক্তিলাভ হয় না (মহা-নির্বাণতন্ত্র, ১৪-১০৯) এবং সে সঠিক উক্ত ভাব সাধনা করিতে সক্ষম হয় না। সদগুরুর কৃপালাভ করিতে পারিলে, সকল কর্মই সহজে ক্ষয় হইতে পারে বটে, কিন্তু সে কৃপালাভ সকলের পক্ষে সহজ নহে। নিগুর্ণ ব্রহ্মভাবে, সারা বিশ্বই নিরাকার ও অখণ্ড পরমাত্মা-স্বরূপ এবং ইহার বাহিরে যাহা কিছু সমস্তই কল্পনা হইতে উদ্ভূত, বা ভ্রান্তির পরিণাম—যেমন মরুভূমিতে মরীচিকার নানাবিধ স্পন্দন ভ্রান্তিময়। এই ভাবে, বিশ্ব চিরকালই নিরাকার ও নির্ব্যাপার (শত সহস্র বিশ্বযুদ্ধ এবং দেবদানব ও মহাভারত-রামায়ণের যুদ্ধ হইলেও) এবং প্রস্তরান্তর্বর্তী স্থানের ন্যায় নিস্পন্দ ও কঠিন (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯ অনুচ্ছেদ)। সঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুকেও ঈশ্বর বা শূন্য ব্রহ্মভাবে দর্শন করিয়া সর্বত্র সমদর্শী ও নিজে অন্তরে ব্যাপারহীন হন এবং তাঁহার প্রারব্ধোৎপন্ন সর্ববিধ দেহমনাদির স্পন্দন—লোকচক্ষে বিসদৃশ বোধ হইলেও—কোন কর্মফল উৎপন্ন করিতে পারে না। সারা বিশ্বই তাঁহার নিকট যখন ঈশ্বর বা শূন্য ব্রহ্ম, তখন 'আমি', বা 'তুমি', বা 'কর্ম,' ইত্যাদি সবই ঈশ্বর বা শূন্য ব্রহ্ম। বিশ্বে চিত্তোদ্ভূত নামাত্ম বোধ মানবের পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর প্রধান কারণ। এই সংসার মাত্র 'চিত্তের তরঙ্গ' হইতেই সত্তাশালী রহিয়াছে—কেননা, সাধারণ মানবের চক্ষে বা অন্তরে যাহা কিছু সবই অবিদ্যা, বা চিত্তেরই স্ফূর্তি। প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিত্ত, ব্রহ্ম। পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মফলে, তিনি বাহ্যিক নানা মায়িক বিকার ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলেও, অন্তরে সদাই সমদর্শী ও ব্যাপারহীন। অবিদ্যা, বা চিত্তের তরঙ্গ-সৃষ্ট এই বিশ্বে—কি বদ্ধ, কি প্রবুদ্ধ, সকল ব্যক্তিরই—চিত্ত লইয়াই ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। চিত্ত-সৃষ্ট জগৎ যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম স্বরূপ—এই ভাবই মুক্তির উপায়! বিশুদ্ধ চৈতন্য ভিন্ন জগতে কিছুই সম্ভব নহে—অতএব, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ',—সগুণ ব্রহ্ম (শ্রীদেবী), অখণ্ড মণ্ডলাকার পরাৎপর জ্যোতিঃ স্বরূপ জীবভাবাপন্ন চিদাকাশ ও/বা নির্গুণ ব্রহ্ম (রাম), অখণ্ড মণ্ডলাকার মহান্ধকার স্বরূপ (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২১ অনুচ্ছেদ)। মহাদেব বশিষ্টদেবকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি জীবভাবাপন্ন চিদাকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও—এতদ্ভিন্ন অন্য কেহই পূজ্য নহেন। চিদাত্মাই সর্বপ্রধান দেব এবং এই সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সকলেই মায়োপাধিক পরমাত্মা—অন্য কিছু নহেন। চিদাত্মা চৈতন্য-রূপে সর্বত্রই অবস্থিত, যজ্জন্য ইঁহার অর্চনে আত্মবোধ বিনা অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই।' এই স্থলে, ৪ ও ৮ পর্বে লিখিত কবিতাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যতীন-সারদা

আলু থালু কেশ করি, কাঙ্গালিনী বেশ ধরি,
পটে থাক অবগুণ্ঠিতা সারদামণি।
সদা যেন সংকুচিতা, জীব প্রেমে বিগলিতা,
রামকৃষ্ণারাধ্যা, ত্রিপুরা বিশ্বজননী।
হরিতে ধরার ভার, করিতে পাপী উদ্ধার,
অবতর বিশ্বে নিস্তারিণী বার বার।
ডাকিছ সন্তানে, 'আয়! আয় কোলে আয়, আয়!
তোর্ তরে কোল পাতা চল্ ভব পার'!
ডাক শুনে যে যাইবে, তব কোল সে পাইবে,
লয়ে যাবে প্রেমে তারে অন্তিমে স্বধাম।
সে বড় সুখের ঠাঁই, ভব তাপ সেথা নাই,
মূর্তিমান প্রেমানন্দে গড়া নিত্যধাম।
শিষ্যরূপে যারে বর, নিমেষে নিষ্পাপ কর,
স্বপ্নে কর তার দীক্ষা-কার্য সমাধান।
শক্তিযুত সেই মন্ত্র, ভব নদী পার-যন্ত্র,
করে শিষ্যে প্রেম আর ভকতি প্রদান।
তুমি গুরু, তুমি ইষ্ট, তুমি মোর রামকৃষ্ণ,
শিব-শিবা রূপী ব্রহ্ম—লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর।
উভে রাধা-কৃষ্ণরূপা, আর সীতা-রামরূপী,
খণ্ডহীন চিদাকাশ জ্যোতিঃ-পরাৎপর।
মম আত্মা মধ্যে সবে, আমি সর্বাত্মক ভবে,
ভেদহীন মোরা সব, আত্মা জ্যোতির্ময়।

নাহি কিছু বিশ্বে আর, বাহ্যে সবই অসার,
মিলিত 'শ্রী-রাম' মাত্র বস্তু সত্যময়।
আদ্যা তুমি, জ্যোতির্ময়ী, সারা বিশ্ব-বীজময়ী,
ব্রহ্মরূপী, আর ঈশ-জীবাদি রূপিণী।
নানাবিধ ভাব ধরি, চিদাকাশ স্পন্দ করি,
মহাচিতি তুমি ব্রহ্ম—সগুণ-ভাবিনী।
মোক্ষদা সারদাদেবী, তুমি গুরু মহাদেবী,
পাদপদ্মে তব মোর অনন্ত প্রণতি।
জীবনে মরণে গুরু, শয়নে স্বপনে গুরু,
বুঝে বুঝে না যতীন-বড় হীনমতি। (৩২)

যতীন-হনুমান

শিববাক্য

গুরোঃ সেবা গুরোর্ধ্যানং গুরোঃ স্তোত্রং গুরোর্জ্জপঃ।
গুরোঃ পূজা গুরোস্তৃপ্তি গুরোর্ভক্তি নৃণাং যদি॥
জন্ম ভাগ্য বশাদ্দেবি যেষাং সংযায়তে কদাচিৎ।
তেষাং মন্ত্রো ভবেৎ সিদ্ধি জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ॥

বিষয়—নিরাকার হনুমানদেবের আমাকে ব্রহ্ম-দীক্ষা দানের স্বপন।
স্থান— লাহোরস্থ আনারকালী পল্লীর বাসা-বাড়ীর উঠান।
কাল—মে, ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগ—গভীর রাত্র।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন দুইখানি আসন পাশাপাশি পাতা রহিয়াছে এবং আমি একখানিতে উপবিষ্ট থাকিয়া কাহার আগমনের অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু সেইস্থানে কোনওরূপ পূজোপকরণাদি দেখিতেছি না। এমন সময়, যেন 'সোঁ-সোঁ' শব্দে, ঝটিকাবেগে, অদৃশ্যভাবে কে একজন সেখানে আসিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট না হইয়া আমাকে বলিলেন, 'যতীন বাবু! আমি হনুমান! * এই তোমার মন্ত্র' এবং পুনরায় 'সোঁ-সোঁ' শব্দে ঝটিকাবেগে চলিয়া গেলেন—এমন কি, তাঁহাকে একটি প্রণাম করিবারও অবসর আমায় দিলেন না।"

২। উক্তরূপে স্বপ্নটি ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু আমি জাগ্রত হইতে পারিলাম না এবং আচ্ছন্ন, বা অর্দ্ধনিদ্রিত, অবস্থায় মন্ত্রটিকে বার বার উচ্চরবে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, যেন উহা জিহ্বা-সংলগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত! উহাতে শরদিন্দুর নিদ্রাভঙ্গ হইল, কারণ ঘোর গ্রীষ্মকালে উঠানেই সকলে রাত্রে নিদ্রা যাইতাম এবং তিনি নিকটস্থ একটি তক্তাপোষে দুইটি কনিষ্ঠ কন্যা লইয়া শুইতেন। তিনি আমার অর্দ্ধ-নিদ্রাবস্থা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মন্ত্র পাইলে? উহা চিৎকার করিয়া জপ করিতেছ কেন? মনে মনে জপ কর।' আমি তাঁহাকে স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া কিছুক্ষণ শয্যায় মন্ত্র জপ করিলাম, যাহাতে উহা ভুলিয়া না যাই। কিন্তু ঐ আশঙ্কা অমূলক ছিল, কারণ মন্ত্রটি যেন জিহ্বায় সংলগ্ন হইয়া

গিয়াছিল এবং উহা পরে অনেক কালাবধি যেন অজ্ঞাতসারে, সর্ব স্থানে, কালে ও অবস্থায়, সামান্য কিছু অবসরেই স্বতঃ জপ হইয়া যাইত। দপ্তরের কার্যবশতঃ অধিকক্ষণ বন্ধ রাখিলে. বড় কষ্ট অনুভব হইত। শাস্ত্রমতে, এইরূপ চৈতন্যযুক্ত মন্ত্র কেবল সদ্‌গুরুই দিতে পারেন এবং সাধারণ গুরুর উহা দিবার শক্তি নাই। মুক্তিদায়িনী শক্তির নাম 'মন্ত্র'— অর্থাৎ, পরিত্রাণের জন্য যে সকল বাক্য মনন করা হয়, তাহাই 'মন্ত্র'। যেমন কাষ্ঠ ও অগ্নি যোগে রন্ধন সম্ভব, সেইরূপ মন্ত্র ও চৈতন্য একত্রে মুক্তিদায়ক। সাধারণ গুরু মন্ত্ররূপ কাষ্ঠ দান করেন, কিন্তু চৈতন্যরূপ অগ্নিদানে সক্ষম নহেন। প্রকৃত গুরু ব্যতীত অপরের প্রকৃত মন্ত্র দিবার শক্তি নাই। প্রকৃত গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট ও পরমাত্মা এক ও অভেদ। দস্যু রত্নাকর, নারদ কর্তৃক চৈতন্য-সম্পন্ন ' মরা ' মন্ত্রটি জপ করিয়া পরম পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু অর্থে এমন গুরু বুঝায় যিনি শিবত্ব লাভ করিয়াছেন, শিষ্যের মুক্তিদাতা ও তাহার পরকালের ভার বহনে সমর্থ। ভগবানের পদাশ্রিত মহাপুরুষরাও সদ্‌গুরু। অপর গুরু, যাঁহার নিজ পরকালই অনিশ্চিত, তিনি কেমন করিয়া শিষ্যকে মুক্তি দান করিবেন? কেবল চৈতন্যরূপ পরমাত্মাই একমাত্র গুরু এবং ' আমি গুরু ' এইরূপ অভিমান, বা 'গুরু মানুষ' এইরূপ বোধ নিতান্ত অজ্ঞতা! সদ্‌গুরুলাভে মানব কি অমূল্যধনের অধিকারী হন. তাহা. পূর্বে কয় পর্বে কিছু ও পুস্তকের প্রথম ভাগের নবম ও একাদশ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। বেদান্তশাস্ত্র মতে—

শিব এব গুরুঃ সাক্ষাদ্‌ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্‌।
উভয়োরন্তরঃ কিঞ্চিৎ ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্ষুভিঃ॥

অন্যত্র. শাস্ত্রে আছে যে. স্বয়ং হরি গুরুরূপে অখিল জগৎ পরিত্রাণ করেন। অতএব, হরি ও হর অভেদ এবং অবতারও জগদগুরুরূপে তথৈবচ। দীক্ষা সত্যে অবস্থিত এবং সত্য হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, কারণ হৃদয়েই মানব সত্য উপলব্ধি করে।

৩। এই স্থলে, শাস্ত্রে শিব যে ত্রিবিধ দীক্ষার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বায়বীয়-সংহিতা বলিতেছেন যে, দীক্ষা ত্রিবিধ—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। ' শাম্ভবী ' দীক্ষায়, গুরুর দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, প্রণাম, বাক্য-শ্রবণ, ইত্যাদি মাত্রেই শিষ্যে শম্ভুর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয়। ' শাক্তী ' দীক্ষায় গুরু দিব্যজ্ঞান বলে শিষ্যে নিজ শক্তি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার ধর্মভাব জাগ্রত করেন। ' মান্ত্রী ' দীক্ষায় মণ্ডলাঙ্কন, ঘট-স্থাপন, এবং ইষ্ট দেবতার পূজাদির পর শিষ্যের কর্ণে গুরুর মন্ত্রোচ্চারণ হয়। রুদ্রযামল বলিতেছেন যে, সিদ্ধ পুরুষগণ কোনরূপ বাহ্য উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবল নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে

শিষ্যের ভিতর যে দিব্যজ্ঞান উদয় করেন, তাহাকেই 'শাক্তী' দীক্ষা বলে। 'শাম্ভবী' দীক্ষায় গুরু ও শিষ্যের দীক্ষা প্রদান ও গ্রহণ ইত্যাদির কোন সঙ্কল্প থাকে না। পরস্পর দর্শন মাত্রেই, গুরুর শিষ্যকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয় এবং উহাতেই শিষ্যের মধ্যে জ্ঞানোদয় হইলে, সে শিষ্যত্ব স্বীকার করে। রুদ্রজামলে আরও আছে যে, শাক্তী ও শাম্ভবী দীক্ষা সদ্যোমুক্তি-বিধায়িনী ('শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তি-বিধায়িনী')। পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র বলিতেছেন যে, বীর ও দিব্য ভাবাপন্ন গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে কালাদি বিচারের আবশ্যকতা নাই। উত্তরায়ণ কালে সদ্‌গুরু কৃপা করত শিষ্যকে দীক্ষা দিতে আহ্বান করিলে, লগ্নাদি বিচার না করিয়াই উহা লওয়া যায়। সাধারণ সদ্‌গুরুদিগের যখন এই সকল শক্তি আছে, তখন অবতার, অবতারিণী ও ঈশ্বর যখন সদ্‌গুরু রূপে কাহাকে কৃপা করেন, তখন তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করেন তাহা নির্ণয় করা মানব বুদ্ধির অতীত। সেই জন্য, শরদিন্দুর বা আমার দীক্ষা উপরোক্ত কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে যে শরদিন্দুর দীক্ষার সহিত আমার দীক্ষার কিছু পার্থক্য ছিল তাহা চ ও এই পর্ব পাঠ করিলেই বেশ বোধগম্য হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেহান্তের কিছু পূর্বে নিজের ভিতর যে-শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজমুখেই এইরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন (রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-গুরুভাব-উত্তরার্ধ, চতুর্থ অধ্যায়), 'মা দেখাইতেছেন যে এর ভিতর এমন একটা শক্তি এসেছে যে, আর কাহাকেও ছুঁয়ে দিতেও হবে না! তোদের (নিজ সেবকদিগের) বোলবো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাহাতেই অপরের চৈতন্য হয়ে যাবে। মা যদি এবার আরাম করে দেন, তো দরজায় ভিড় ঠেলে রাখা যাবে না। এত খাটতে হবে যে, ঔষধ খেয়ে গায়ের ব্যথা সারতে হবে।' এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৪ (২) (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রামকৃষ্ণদেবের স্পর্শন-শক্তি প্রয়োগের ঘটনা দৃষ্টান্তরূপে আলোচ্য।

৪। পূর্ব পর্বে বর্ণিত ঘটনায় কৃপাময়ী শিবারূপিণী সারদেশ্বরী আমায় যথার্থ দীক্ষা না দিয়া যাহা সূচনা করিয়াছিলেন, এই পর্বে বর্ণিত ঘটনায় তাহা শিবরূপী হনুমান যথার্থ দীক্ষা দানে সম্পন্ন করিলেন। ইহা অন্নাক্ষরী সগুণ 'ব্রহ্মমন্ত্র'। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ, ব্রহ্ম—যেমন কেহ কখন সাম্বর এবং কখনও বা দিগম্বর। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা সহজ ও সুখকর (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ)। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে (প্রথম ভাগ, একাদশ, অধ্যায়, ৭ (১) অনুচ্ছেদ)—যখন গুরুর কৃপা প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত

হওয়া কর্তব্য ; যে-কোন বিধানে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলে, শিষ্য ব্রহ্মস্বরূপ ও পবিত্র হয় ; ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণে আত্মা ব্রহ্মময় হয় ও অন্য সাধনার প্রয়োজন থাকে না ; আর শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত, ব্রাহ্মণ বা অপর বর্ণীয় ব্যক্তি সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকার আছে। আমার যোগ্যতার অবস্থা বুঝিয়া, কৃপাময় শিবাবতার হনুমানদেব ব্রহ্মমন্ত্র দান করিলেন এবং ১৯ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নের আশ্রয়ে উহার অর্থ ইঙ্গিত করিলেন। দীক্ষা দিতে আসিয়া তিনি কেন আমাকে সম্মানসূচক 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তাহার যথার্থ কারণ নির্দেশ করা সহজ কার্য নহে। বোধ হয় যেন অল্প সময়ের মধ্যে অত্যল্প কার্যের দ্বারা আমার নরদেহের সম্মান দিয়াছিলেন এবং নিজ শক্তী-দীক্ষার, বা গুরুর নিরাকার পরব্রহ্মত্বের, সামান্য স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন। তারকেশ্বর মন্দিরে শিবঠাকুর প্রায় একবিংশতি বর্ষ পূর্বে যে কৃপাবীজ আমার উদ্দেশ্যে বপন করিয়াছিলেন, তাহাকে নিজ অবতার হনুমানদেবের দ্বারা এই ব্রহ্ম-দীক্ষায় বৃক্ষরূপ দিলেন। শাস্ত্রমতে, দীক্ষাদাতা গুরু, মন্ত্র, ইষ্টা-ইষ্ট ও মূলপ্রকৃতি-সমন্বিত পরব্রহ্ম, এই চারিটিকে অভেদ ভাবে চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে, মন্ত্র চৈতন্যপ্রাপ্ত হয় না এবং সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত হয় (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১০ (৯) অনুচ্ছেদ)। আমার দীক্ষায়, এই অভেদত্ব স্বতঃসিদ্ধ এবং ইহার অনুভূতি স্থাপন বিশেষ কোনও চেষ্টা সাপেক্ষ নহে—কেননা, গুরু মিলিত আদ্যাশক্তি (সারদাদেবী) ও পরব্রহ্ম (হনুমানদেব), (অনুক্ত) মন্ত্র মিলিত আদ্যাশক্তি ও পরব্রহ্ম এবং ইষ্টা-ইষ্টও মিলিত আদ্যাশক্তি ও পরব্রহ্ম। এই শাস্ত্রীয় বিধিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় সারদেশ্বরীদেবী ও হনুমানদেব উভয়ে এক জোটে আমার দীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, নতুবা এই বিভাগের বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আর ইহার দ্বারা কৃষ্ণাবতার রামকৃষ্ণদেবের সহিত শিবাবতার হনুমানদেবের অভেদত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। রাম ও হনুমান অভেদাত্মা। সেই বিষয়ে 'কালী কুল-কুণ্ডলিনী' বলিতেছেন—

ইতর তর্ক রাম বড়, কি বড় হনুমান, যে যা ব'লে ডাকে, ডাক শুনে একজন,
যিনি রুদ্রাবতার হন, তিনিই প্রভু রাম। ধন্য সে যে ভেদ-শূন্য, প্রেমে পূর্ণ মন।

৫। ১৯২৪ সালের প্রথমার্ধে আমাকে আমার পিতামাতার গুরুপুত্র জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণচক্রবর্তী, দ্বিতীয়া পত্নী মনোরমার সহিত একত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। উহা ক্রিয়াযোগযুক্ত ছিল। সেইজন্য, দপ্তরের কার্য্যের নানাবিধ ছিড়িকে সাধন হইত না। ঈশ্বর-লব্ধ দীক্ষায়, ভাবই ক্রিয়াযোগের স্থান গ্রহণ করিল এবং স্থান, কাল ও অবস্থার কোন বালাই রহিল না। সাধারণ গুরু মানবের

সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া দীক্ষা দিতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বর গুরু হইলে, সে আশঙ্কা থাকে না। ঈশ্বর গুরু বা ব্রহ্ম-দীক্ষা হইলে, পূর্ব মন্ত্র-ত্যাগে দোষ হয় না। তথাপিও, পূর্ব গুরু ঈশ্বর রূপেই চির-আরাধ্য এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রেরাও চির-বরণীয় থাকেন। গুরুদেবের মৃত্যু নাই, কারণ তিনি সদা শিষ্যের হৃদয় পদ্মে আত্মারূপে অবস্থিত। আমার উভয় বিধ মন্ত্রেই, ইষ্ট-ইষ্টা এক।

৬। উক্ত স্বপ্নে, বাস্তবিক হনুমানদেব ঝড় বেগে আসিয়া আমায় দীক্ষা দান করেন নাই। তিনি আমার আত্মস্থ—যাহা সারা বিশ্বরূপী এবং সেই আত্মাই তাঁহাকে উক্ত ব্যাপ্তরূপে আমার অন্তরে প্রকাশ করিয়াছিল (প্রথম পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী চিদাকাশ ও সগুণ ব্রহ্মরূপী আমার আত্মা শিব, অন্তরে উক্ত স্বাপ্ন অনুভূতিটি, প্রকট করিয়া অন্তরেই বিলীন করিলেন—অর্থাৎ, আমার অন্তরে বিশুদ্ধ বোধের (শিবের) ভিত্তিতে একটি বোধতরঙ্গ (কালী) উদিত হইয়া আমাকে মন্ত্রপ্রাপ্তি রূপ কর্মফল প্রদান করিলেন। ইহাকেই 'রামের রমণ' কহে এবং এই বিশ্বে কি জাগ্রত, কি স্বাপ্ন, উভয় অবস্থায় সবই বোধতরঙ্গ, কালী (শিব ও শক্তি)। বোধকে (আমাকে) বাদ দিলে, জগতে কিছুই কিছু নহে। নিরাকার ভাবে স্বপ্নটি প্রকটিত হইল বটে, কিন্তু হনুমানদেবের আগমন, মন্ত্রদান ও গমন, ইত্যাদি ঘটনাসমূহকে তো 'কিছুই নহে' বলিয়া উড়ান সম্ভব নহে! প্রকারান্তরে, স্বপ্নটি জানাইল যে, বিশ্ব নিরাকার ভাবেই চির বর্তমান এবং ইহা কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি মাত্র, যাহারা কাল্পনিক চিত্ত-সৃষ্ট (অতএব, মিথ্যা—কারণ ব্রহ্মে কোনরূপ ভাবাভাব অসম্ভব), সুখ-দুঃখের আধার বাহ্য দেহাদি লইয়া কার্যকর। এই দেহাদির প্রতি অণু-পরমাণুও চিজ্জড় পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তি উপাদানে গঠিত। বিশ্বে যাহা কিছু সবই শিব-শক্তির লীলা—ইহা যে সঠিক বুঝে, সে জীবন্মুক্ত। অতি অল্প কথায়—'আমি জ্ঞানরূপী আত্মা' এবং 'আমি দেহ নহি' এই ভাবদ্বয় সঠিক অবলম্বনে, মানব সংসার হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

যতীন-হনুমান।

(৭ পর্ব)

জয় হনুমান জয়, রুদ্রদেব জয় জয়,
নির্বিকার নিরঞ্জন পুরুষ রতন।
পবন নন্দন জয়, রামদাস জয় জয়,
দীক্ষাদাতা গুরু মোর ব্রহ্ম সনাতন।

ভানুধারী দেব জয়, মহাবীর জয় জয়,
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সার হ'তে সার।
অঞ্জনা-নন্দন জয়, সীতাদাস জয় জয়,
মুক্তিদাতা গুরু মোর ব্রহ্ম-পরাৎপর।
সাগর-লঙ্ঘির জয়, লঙ্কা-দাহকের জয়,
সর্ব বিশ্বের কারণ সর্ব মূলাধার।
সীতার বার্তা-বাহক, অশোক বন নাশক,
সগুণ-নিগুণ ব্রহ্ম তুমি চিদাকার।
আর্তজন দুখহারী, সকলের উপকারী,
ধর্মময় গুরু তুমি মহা মহীয়ান্।
তুমি সর্ব দেবময়, আর সর্ব বেদময়,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপী ভগবান।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি প্রভু, তুমি ভর্তা,
মণ্ডল আকারে ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচর।
অযাচিত কৃপাধার, ভবনদী কর পার,
অদ্বিতীয় দেব-দেব কাশী-বিশ্বেশ্বর।
রাম তব যাম্য হৃদে, সীতা তব বাম হৃদে,
রাম-সীতারূপী গুরু করি প্রণিপাত।
কৃষ্ণ তব যাম্য দেহ, রাধা তব বাম দেহ,
কৃষ্ণ-রাধা রূপী গুরু করি প্রণিপাত।
তুমি রামকৃষ্ণ রূপী, আমার সারদা রূপী,
জগতের গুরু সবে—কালীর আকার।
রহ সবে অহোরহ, মোর আত্মা সনে রহ,
গুরু-ইষ্টরূপী আত্মা ভব কর্ণধার।

মোর আত্মা বিশ্বরূপী, সারাৎসার জ্যোতিঃরূপী,
অখণ্ড সগুণ-ব্রহ্ম, বিশ্ব মূলাধার ।
লহ নতি পদে সবে, আর চুমো মিষ্ট রবে,
জ্ঞান প্রেম মাগি তাত নিকটে সবার । (৩২)

(১৯ পর্ব)

বুঝি মোর ভিক্ষা শ্বন, বিগলিল তব মন,
বুঝাইলে স্বপ্নে, আমি প্রিয় সখা তব ।
আর জ্ঞান দিলে ঢালি, আমি ব্রহ্ম, আমি কালী,

[(*অবশে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান (১৭))]

অন্য কিছু নাহি বিশ্বে, মোর আত্মা সব ।
বাহ্য জড় জগৎ যাহা, অলীক কল্পনা তাহা,
সত্য যেন নিদ্রাকালে স্বপন নগর ।
অথবা সকলি অসৎ, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ,
নমস্কার লহ সখে ব্রহ্ম-পরাৎপর । (৪০)

(৭৭ পর্ব)

স্বপনে আশ্বাস দিলে, সংশয় দূর করিলে,
এই জনমে লভিব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ।
তুমি ব্রহ্ম সনাতন, বিশ্বে পুরুষ রতন,
তব কৃপায় সাগর গোষ্পদ সমান ।
মিছা মোর এই কায়া, অসার সংসার মায়া,
মরু-মরীচিকা সম বিশ্বের স্পন্দন ।
বুঝেও বুঝি না কথা, হয় ভ্রম যথা তথা,
তব কৃপা যতীনকে দিবে ব্রহ্ম ধন । (৪৮)

যতীন্দ্র-কালিকা (জ্বালামুখী)

বিষয়—দুর্গম পার্বত্য মোটরযান পথে 'জ্বালামুখী' পীঠস্থান দেখিতে যাইবার কালে, রক্তবর্ণ জ্বলন্ত জিহ্বাযুক্ত কালীমাতার দর্শন লাভ।

স্থান— বর্ত্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত পার্বত্য-সহর ধর্মশালা হইতে জ্বালামুখী যাইবার পথ।

কাল—গ্রীষ্মকাল—সম্ভবতঃ, ১৯৩৮।

সরকারী কার্যোপলক্ষে ধর্মশালায় সফর কালে, আমি এক ছুটির দিন প্রাতঃকালে আমার চাপরাসীর সহিত 'জ্বালামুখী' পীঠস্থান দেখিতে দুর্গম, অতি সংকীর্ণ, সর্পাকার বাঁকা পার্বত্য মোটরযান পথে, রওনা হইলাম। পথটি অসমতল ও বিপদ-সঙ্কুল—কারণ, চালকের অতি সামান্য মাত্র অসাবধানতায় যানটি অতল খাতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং উহার যন্ত্রাদি বিকৃত হইলে পদব্রজে বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করত প্রত্যাবর্তন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ঐ সব চিন্তায় কোন লাভ নাই বুঝিয়া, দুর্গাদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অতি অল্প কালের মধ্যেই, তিনি কালীরূপে সম্মুখে বার বার প্রকটিতা হইলেন এবং তাঁহার তরল-লৌহের ন্যায় রক্তবর্ণ জিহ্বাটিকে দেখাইতে লাগিলেন। আমি উহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। দুই তিন ঘণ্টা পরে পীঠস্থানে পৌঁছাইলাম। তথায় স্নান, মাকে দর্শন ও জলযোগাদি করত বেলা দুইটা নাগাত পুনরায় মোটরযানে আরোহণ করিয়া প্রায় সন্ধ্যা ছয়টায় ধর্মশালা পৌঁছাইলাম। সফর শেষে লাহোরে ফিরিয়া পঞ্জিকায় দেখিলাম যে, দুর্গা দেবীর জিহ্বা বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হইয়া জ্বালামুখীতে পড়িয়াছিল। অতএব, আমাদের শাস্ত্র বাক্যগুলি গাঁজাখোরের প্রলাপ নহে। বিশ্বাসই ঈশ্বর লাভের সর্বপ্রধান অবলম্বন। কিন্তু, দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই এই বাহ্য জড় জগৎ ভিন্ন উহার অন্তরস্থ কিছুতেই বিশ্বাসী নহে। বিশ্বাসী ব্যক্তি অচিরে তাহার বিশ্বাসের ফল উপলব্ধি করে (খ পর্ব ২ অনুচ্ছেদ)। পুরাতন কঠিন রোগে, দৈব ঔষধের সুফল অনেকেই জানেন।

যতীন-সারদা

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোহহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি সারদেশ্বরী॥
ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান।
ভকত হৃদয়ে তাঁর সদা অবস্থান॥

বিষয়—নিরাকারা সারদেশ্বরীর আমাকে অন্তরাত্মা হইতে সুমধুর রবে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন এবং আমাকে আত্মা ও পুত্র রূপে বরণের স্বপন।

স্থান— লাহোরস্থ আনারকালী পল্লীর বাসা-বাড়ী।

কাল—জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"সারদেশ্বরীকে দেখিতে পাইতেছি না; অথচ, হঠাৎ যেন তাঁহাকে অন্তরে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করত একটি প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমাকে অন্তরেই 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করত প্রশ্নটির বিশেষ সন্তোষজনক উত্তর দিয়া বিষয়টি কাহাকে বলিতে নিষেধ করিলেন। তখন স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল! কিন্তু আমার সুদৃঢ়ভাবে মনে হইল যেন, আমার অন্তরে একস্থানেই প্রশ্ন ও উত্তর হইল।"

২। উক্তরূপে স্বপ্নটি ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু 'বাবা' সম্বোধনের রবটি অনেকক্ষণ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি তখন একটা অনির্বচনীয় দিব্যাবেশে বিভোর হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেই রবে কি ত্রিদিবের সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি মিলিত ছিল? কখনও তো ঐরূপ মাধুর্যমিশ্রিত 'বাবা' সম্বোধনের রব এই পৃথিবীতে আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই! এখনও যখন মাঝে মাঝে এই সম্বোধনের বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হয়, তখন যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাই এবং মনে হয় যেন জগন্মাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর সুর একত্র করিয়া আমায় পুত্ররূপে আকর্ষণ এবং আত্মরূপে

বরণ করিতেছেন। এইরূপ তো হইবারই কথা! মা যে আমার বিশ্বের সমস্ত সন্তান-স্নেহ শক্তির আধার এবং ছয়টি চন্দ্রযুক্ত কৃষ্ণ-বংশী স্বরূপিণী কালিকা—যাহার 'রাধা' 'রাধা' ধ্বনি জগদাকর্ষক এবং ত্রিভুবন-মাদক (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, (১) অনুচ্ছেদ)। মা নিজ মুখে বলিতেছেন—আমার নিকট যাহারা অসিয়াছে এবং যাহাদের আমি পুত্র (বা কন্যা) রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের ভয় কি? বিধির সাধ্য নাই তাহাদের রসাতলে পাঠায়···আমি রাধা! আমি কালী! যে-ভাবে আমাকে পূজা করিবে, সেই ভাবেই আমি তাহা গ্রহণ করিব··· ঈশ্বরের ভালবাসা না পেলে, তাঁর জন্য প্রাণ কেন ব্যাকুল হবে—এ কথা সত্য বটে! তবে সে-ভালবাসা লাভ করা তাঁর কৃপাসাপেক্ষ! চাওয়ার সঙ্গে কে ভাব ক'রতে পারে? এ কথাও ঠিক! ভগবান লাভ শুধু তাঁহার কৃপাতে হয়। তপস্যা করিলেই যে তাঁহার কৃপা হইবে, এমন নয়। আগে ঋষিরা উর্ধ্বপদে, হেঁট মুণ্ডে, নীচে আগুন জ্বালিয়া হাজার হাজার বর্ষ কত তপস্যা করিতেন। তাহাতে কখনও কাহারও উপরে কৃপা হইত, আর কাহারও উপর বা হইত না। জপ, ধ্যানাদি করিয়া যাইতে হয়—তাহাতে মনের ময়লা ও কর্মপাশ কাটে। ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না।' এই ক্ষেত্রে, মা স্বয়ং আমাকে পুত্ররূপে বরণ করিলেন! আমি তাঁহার নিকটে না যাইলেও, তিনি আমার নিকটে আসিলেন। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন যে ঈশ্বরীর সহিত মাতৃ-সম্বন্ধ সাধনার শেষ কথা। এই ভাব দেখিলে, মায়াদেবী লজ্জায় পথ ছেড়ে দেন। বহুজন্মের সাধনার ফল-স্বরূপে, অতি বিশুদ্ধ আদি মহাভাব ও ত্বরায় মুক্তিপ্রদ পিতা বা মাতা রূপে ঈশ্বর ভজনের স্পৃহা মানবে উদিত হয়। তাহার বহু ভাগ্যবলেই ঈশ্বরে বা ঈশ্বরীতে মমতা বা আসক্তি উৎপন্ন হয়, এবং কপিলদেব বলিতেছেন যে, ঈশ্বরকে আত্মার ন্যায় প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহপাত্র, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্টদেবের ন্যায় পূজনীয় এইরূপ কোন এক সম্বন্ধে সম্বন্ধী করিতে পারিলে, আর কালচক্রের বশীভূত হইতে হয় না। বলা বাহুল্য যে, ঐ সকল সম্বন্ধগুলি যখন উল্টা দিক হইতে আসে, তখন 'বরণ' রূপে পরিণত হইয়া অটুট ভাব ধারণ করে (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ)। পাঠক ক্রমে ক্রমে জ্ঞাত হইবেন যে, এই সকল সম্বন্ধেই আমরা ঈশ্বর কর্তৃক বৃত।

৩। উক্ত স্বপ্নে বেশ অনুভব হইয়াছিল যে, আমার প্রশ্নটি অন্তরে যে স্থানে উদিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই উহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এবং সেই স্থান হইতেই উহার উত্তর আসিয়াছিল—অর্থাৎ সবই যেন একাকার এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান ইত্যাদি সবই মদাত্মা হইতে উদ্ভূত ও সারদেশ্বরী আমার আত্মা, বা

আমার আত্মাই সারদেশ্বরী। এইরূপে স্বপ্নে জগদম্বা আমাকে বেদান্তোক্ত নিম্নলিখিত একটি মুখ্য তত্ত্বের জ্ঞান অদ্ভুতভাবে গুরুরূপে দিলেন—

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

বাস্তবিক, জ্ঞাত-জ্ঞেয়-জ্ঞান ইত্যাদি কিছুই নাই, সবই চিন্মাত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানী ইহা বুঝেন। 'বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ আমিই সব'—ইহাই সার ব্রহ্মজ্ঞান। ৬ পর্বে বর্ণিত ঘটনায়, সারদাদেবী আমার সহিত গুরু ও ইষ্টা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই পর্বে আত্মা ও মাতা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

যতীন—সারদা।

(৯ পর্ব)

বেদান্তের সার, মাতা! জ্ঞান জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা,
যাহা কিছু সকলের মূলে আত্মাকাশ।
সেই জ্ঞান দিতে মোরে, স্বপন সৃজন ক'রে,
বুঝালে আত্মায় মোর সবের বিকাশ।
আর সেই আত্মা তুমি, আমা সহ এক তুমি,
বিশ্বময়ী বিশ্বরূপী এক চিদাকাশ।
সব সেজে আছ বিশ্বে, সব করিতেছ বিশ্বে,
একা তুমি হেথা, কিন্তু নির্লিপ্ত প্রকাশ।
একদিন দুর্গারূপে, বরেছিলে আত্মরূপে,
আবার করিলে সেই ভাবে বরণ।
প্রেমে জ্ঞান দিলে আর, আত্মান্তরেই আমার,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব হতেছে সাধন।
বেদান্তের আছে বাণী, আত্ম যাঁরে লন টানি,
তাঁর মাত্র হন লব্ধ প্রকৃত স্বরূপ।
প্রেমে মোরে টানিতেছ, বার বার বুঝাতেছ,
আমা সহ তুমি এক ভেদহীন রূপ।

জ্যোতির্ময়ী তুমি ব্রহ্ম, জ্যোতির্ময় আমি ব্রহ্ম,
অভেদ আমরা, জুড়ি বিশ্ব গোলাকার।
বিশ্বে যাহা বস্তু আর, সব নিতান্ত অসার,
মায়ায় বিকাশ মাত্র, অধীন তোমার।
'বাবা' বলি ডাক দিয়ে, স্বর্গ-বীণা বিনিন্দিয়ে,
পুত্র রূপে প্রেমে মোরে বাঁধিলে কৃপায়।
কে বুঝিবে রীত তব ? না জানেন বিধি ভব !
ছোট স্বপ্নে দুই ভাবে বরিলে আমায় !
বড় ভাল দ্বিজ কন্যা ! কিছুই তুমি জান না !
তাই অবগুণ্ঠিতা ঐ চাঁদ মুখ খানি !
কিন্তু আমি প্রচারিব, লুকাইতে নাহি দিব,
বিশ্বপ্রেম সুধা ঢালা ছদ্ম তনুখানি।
কৃপাধারা ঐ মূরতি, জমাট কৃপা শকতি,
পাপী-তাপী উদ্ধারিতে ধরা আগমন।
লহ মা নতি আমার, চুম্বন অনন্ত বার,
বুক ফাটে, অল্প অতি মোর প্রেম ধন। (৩২)

(১৩ পর্ব)

দিতে বেশী প্রেম ধন, স্বপন করি স্বজন,
পুনঃ 'বাবা' বলে ডাকি প্রেমে টান দিলে।
মন প্রাণ বিগলিয়া, আনন্দাশ্রু আকর্ষিয়া,
মম আত্মান্তরে তুমি প্রেমে শিখাইলে।
আর চুপি মনে আনি, বেদান্তের অতিবাণী,
বুঝাইলে তুমি-আমি পূর্ণ ভেদহীন।
কিবা জানি গুণ তব ? কিবা প্রচার করিব ?
সূর্য-রশ্মি তেজে সদা প্রদীপ মলিন ! (৪০)

শরদিন্দু-বালকৃষ্ণ

১। কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ। কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা।

২। প্রমদং চ মে কামদং চ মে বেদনং চ মে বৈভবং চ মে।
জীবনং চ মে জীবিতং চ মে দৈবতং চ মে দেব নাপরম্॥

৩। জয় জয় জয় দেব দেব দেব, ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য নাম ধ্যেয়।
জয় জয় জয় বালকৃষ্ণ দেব, শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার।

৪। ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। আমাকে ঈশ্বর মতি আপনাকে হীন।
ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

৫। মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। আপনাকে বড় মানে মোরে সম হীন।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধাভক্তি॥ সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

বিষয়—অদৃশ্য বালগোপাল-কৃষ্ণের শরদিন্দুর নিকটে সুমধুর করুণ-সুরে শরদিন্দুর ন্যায় একটি কাণপাশা ও পীতধড়া ভিক্ষা এবং এইরূপে তাঁহাকে মাতৃরূপে বরণের স্বপন।

স্থান— নং ৫।১বি, তারিণীচরণ ঘোষ লেনস্থ বাড়ীর দ্বিতলের ছোট-ঘর। তখন ঐ বাড়ীর অন্য মহল এবং ৫।১সি ও ৫।১ডি নং বাড়ী নির্মাণ হইতেছিল।

কাল— জুন বা জুলাই, ১৯৪১।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"যেন কোন অদৃশ্য বালক বলিতেছে, 'তোর্ মত একটি ছোট্ট কাণপাশা আমায় দে!' তাহার পর, আরও করুণসুরে সে আমায় বলিল, 'একটা পীতধড়া সেলাই করে দে-না!"

তৎপরে, নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, কিন্তু 'দে-না' শব্দ দুইটির উচ্চারণের যে-ভাব তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। উহা একাধারে অতি করুণ ও সুমধুর—যেন সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টধ্বনিগুলিকে পরাজিত করিয়া উদ্ভূত এবং যেন কোন শান্ত ও শিষ্ট বালক তাহার মাতার নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় বেশভূষার অভাব জ্ঞাপন করিতেছে।

২। উক্ত স্বপ্নের উলঙ্গ ও কর্ণালঙ্কার হীন বালকটির পরিচয় অনাবশ্যক বোধ হইলেও লিখিতে হইবে যে তিনি বালগোপাল, যিনি শরদিন্দুর সহিত পূর্বে একবার লীলা করিয়াছেন (ঙ পর্ব)। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আত্মার উক্ত দীনতার মাধুর্য চিন্তা করিলে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইতে হয়। শরদিন্দুর নিকটে 'শরদিন্দুর মত' একটি ছোট্ট কাণপাশা এবং 'শরদিন্দুর হাতের সেলাই' একটি পীতধড়া ভিক্ষা করিয়া, বালকটি তাঁহার সহিত বাৎসল্যভাবে পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এই দুর্লভ সম্বন্ধের ফল ৯ ও ২১ পর্বের ২ অনুচ্ছেদের শেষে উক্ত হইয়াছে। হায়! হায়! শরদিন্দুর নিকট হইতে উক্তবিধ কাণপাশা ও পীতধড়া প্রায় দ্বাদশ বর্ষ কাল না পাইয়া, তাঁহার পুত্রটি কর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র হীন অবস্থায় কি করিয়া যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কার্য চালাইলেন, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয় ও হাসি পায়! অনন্ত গুণের আধার হইয়াও, ঐ বাঁকা বংশীবাদক ঠাকুরটির কার্যে ও আচরণে চিরকালই একটি মধুর অপেক্ষা মধুর ও ঘোর রহস্যপূর্ণ কুটিলতা দৃষ্টিগোচর হইয়া আসিতেছে। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। কোথায়, কিরূপ মূর্তিকে, কোন্ মন্দিরে, ঐরূপ বেশভূষায় তাঁহাকে সজ্জিত করিতে হইবে, তাহার যদি কিঞ্চিৎ নিদর্শনও দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'কুটিল' এই অপবাদ নিজেদের অভিজ্ঞতায় দিতে পারিতাম না। কোন নিদর্শন না পাইয়া, আমরা ঠিক করিয়াছি (বা তিনিই সেই বুদ্ধি দিয়াছেন) যে, একটি মন্দিরে তাঁহাকে উক্তরূপে সজ্জিত করিতে হইবে। কতদিন পরে উহা স্থাপন করিতে পারিব তাহা তাঁহার ইচ্ছাসাপেক্ষ এবং আমরা জানি না—এই স্থলে, অবতরণিকা খণ্ডের ২৪ (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সয়ত্নে বেশভূষা চাহিয়াছিলেন বলিয়া, অপ্রকটিত ঠাকুরটির নাম, আমরা 'রাজরাজ' দিয়াছি।

৩। অন্যান্য স্বপ্নের ন্যায়, এই স্বপ্নটিও—* অবশেষে ছিদ্রোকারে চিহ্নিত স্থান (১৮)—*শরদিন্দুর আত্মা প্রকট করিয়াছিলেন এবং বালগোপাল কৃষ্ণরূপী সেই আত্মা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি শরদিন্দুর আত্মার সহিত অভেদ। শরদিন্দু প্রথমে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের আত্মার ভিতরেই সারা বিশ্ব ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান এবং সেই আত্মাই সর্বময় জ্যোতিঃরূপী তেজোময় ব্রহ্ম, কৃষ্ণ-রাধা, বা রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, বা শিব-অন্নপূর্ণা, ইত্যাদি। শরদিন্দুর গুরু ও ইষ্ট (অভিন্ন সারদেশ্বরী ও কৃষ্ণ) তাঁহারাই আত্মা এবং একান্ত প্রিয় রূপে উপাস্য। গুরু ও ইষ্ট এই ভাবে উপাসিত না হইলে, সাধনা পণ্ডশ্রমেই পরিণত হয়—কারণ, আপনাকে আপনার ভিতর দেখাই যথার্থ সাধনা (প্রথম ভাগ, দ্বাদশ অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ) এবং যে-ব্যক্তি জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় অল্পমাত্রও ভেদজ্ঞানী, সে মূঢ় ও অশান্তচিত্ত এবং তাহাকে মায়াভিভূত হইতে হয় (অবতরণিকা, ২৪ (৩)

অনুচ্ছেদ)। অন্য প্রকারে বলা যায় যে, শরদিন্দুর আত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নটি প্রকট করিয়া তাঁহাকে—*অবশেষে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান (১৯)—*মাতারূপে বরণ করিলেন। শরদিন্দুকে পঙ্কিল সংসার-গতি হইতে চিরতরে অব্যাহতি দেওয়াই যে ইহার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তো অত অহেতুক, অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত কৃপার প্রয়োজন নাই, তথাপি কেন হইতেছে—কে বলিবে? ঠাকুরটি মাধুর্যভাবে কাহার পিতা এবং কাহার বা পতি, বা পুত্র, বা বন্ধু এবং তৎসম্বন্ধোত্থিত সর্ববিধ দাবী রহস্যপূর্ণ ভাবে সংস্থাপক! ১৯৫২ সালে, এক শীতকালের রাত্রে শরদিন্দু তাঁহার পুত্রটির ছবিকে লেপাবৃত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, ভোরবেলা কর্ণে এইরূপ মিষ্ট নালিশ শুনিয়াছিলেন—'মা! আমি উঠেছি'! অন্য এক রাত্রে ঐরূপ ভুলের জন্য শরদিন্দু সারারাত্র অতিরিক্ত শীতে ঘুমাইতে পারেন নাই। শরদিন্দু তাঁরই এক মূর্তি!

শরদিন্দু-বালকৃষ্ণ।

গোলোক *ভূষণ জয়, বালকৃষ্ণ জয় জয়,

[* অবশেষে ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২০)]

গুণময়, গুণাতীত, ব্রহ্মসারাৎসার।

রাধিকা-রমণ জয়, রসরাজ জয় জয়,

বন্দি শ্রীচরণ তব, তুমি বিশ্বাধার।

যশোদা-নন্দন জয়, ননীচোরা জয় জয়,

জীব ত্রাণ তরে ঈশ—মানব আকার।

শ্রীমধুসূদন জয়, দামোদর জয় জয়,

নমস্কার তব পদে কোটী কোটী বার।

গোপীকা-মোহন জয়, বংশীধারী জয় জয়,

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর রূপী সারা বিশ্বাকার।

পুতনা-নাশন জয়, গদাধর জয় জয়,

বেদাগম-রূপী নাথ করি নমস্কার।

কালীয়-মর্দন জয়, জনার্দন জয় জয়,

কাশীনাথ শিবলিঙ্গ, তুমি বিশ্বেশ্বর।

সহ গুরু রামকৃষ্ণ, ভেদহীন তুমি ইষ্ট

চুম্বন দোঁহাকে এক দেব পরাৎপর।

স্বপন স্বজন করি, মাতারূপ মোরে বরি,
মাগিলে সরঙ্গে পীতধড়া কাণপাশা।
জানালে না, 'রঙ্গরাজা' কোন্ দেহে তব কাজ,
মোর স্যুত ধড়া সহ মোর কাণপাশা।
দ্বাদশাব্দ হ'ল গত, নিদর্শন অনাগত,
শোচি পাশা-ধড়া হীন মোদের সন্তান।
তাই ইচ্ছি হৃদি মাঝে, স্থাপি তাত 'রঙ্গরাজে'
মন্দিরে—বেলুড়ে পার গঙ্গা সন্নিধান।
যদি ইচ্ছা তব হয়, মনস্কাম পূর্ণ হয়,
ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু দেব কৃপাধার।
ধন-জন সাধ্য কার্য, *বহু বাধা অনিবার্য,
[* অবশে ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২১)]
কিন্তু পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি কৃপায় তোমার!
সেই আশা চিতে রাখি, ভকতি অঞ্জন মাখি,
যাচি তাত ত্বরা সাধ যাহা প্রয়োজন।
গীতা তোমার ঘোষিছে, আত্মভাবে যে ভজিছে,
তার যোগক্ষেম তুমি করহ বহন।
না আছে বুদ্ধি আমার, না বুঝি তব প্রকার,
কিবা জানে শরদিন্দু তোমার স্বরূপ?
তাই বলি রঙ্গ ত্যজি, স্বধাম ত্বরায় স্থজি,
ধর বেশভূষা আর 'রঙ্গরাজ' রূপ।
আর যাহা প্রয়োজন, কর তার আয়োজন,
বাকি দিন কাটে যেন তব সেবার্চনে।
না শুনিলে মোর কথা, নিন্দা তব হিয়ে ব্যথা,
মাতা ধনজন হীন, জানে সর্ব জনে।

যতীন-দুর্গা

বিষয়—দুর্গা পূজার অষ্টমী তিথিতে পল্লীস্থ এক প্রতিমার ধ্যানকালে মাকে বার বার উলঙ্গিনী-রূপে দর্শন।

স্থান— পল্লীস্থ এক দুর্গাপূজার মণ্ডপ—কালাচাঁদ পণ্ডিতপ্তু লেন।

কাল— দুর্গাষ্টমী তিথি—১৯৪১, বা ১৯৪২।

উক্ত দিবস দুপুর বেলা শরদিন্দুর সহিত আমি উল্লিখিত দুর্গামণ্ডপে পূজা দেখিতে গিয়া মা'কে ধ্যান করিতেছিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই, মা উলঙ্গিনী মূর্তিতে তাঁহার যোনিদেশটিকে ইঙ্গিতে আমাকে দেখাইয়া, আবির্ভূতা হইতে লাগিলেন। প্রথমে, উহা আমার ভ্রম মনে করত অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু, যখন পুনঃ পুনঃ যতবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে লাগিলাম, ততবারই সম্মুখস্থ বসন পরিহিতা মূর্তির পরিবর্তে একই দৃশ্য আবির্ভূত হইতে লাগিল, তখন অপরাধের আশঙ্কায় ধ্যান বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

২। উক্ত ঘটনার তাৎপর্য ১৯৪৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত—যেন অপরাধের ভয়েই—আমি বুঝিতে পারি নাই (৪২ পর্ব দ্রষ্টব্য)। কালী-মূর্তিতে মা যখন, স্বপ্নে বলিলেন যে, তাঁহার যোনিদেশ আমার পূজ্যা, তখন'ই নির্ভয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানে বুঝিলাম যে ব্রহ্মযোনি হইতেই বিশ্বে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এই জগৎ যে শিবশক্তিময় এবং ইহাতে যাহা কিছু সব শিব ও শক্তির রমণ হইতে জাত ('সর্বত্র হরগৌরী করেন রাসলীলা'), তাহা পূর্বে নানা পর্বে উক্ত হইয়াছে। দুর্গাযোনিই সেই অপ্রাকৃত রমণ স্থান। আত্মময় সারা বিশ্বই এই যোনিপূর্ণ এবং উহা সর্বত্র শিবশক্তি রূপে ধ্যেয় (অবতরণিকা, দ্বিতীয় পট ও ২৯ অনুচ্ছেদ)। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে শিবের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া, ব্রহ্মময়ী নিত্যা রাধা-যোনির অনেক সাধনা (পূজা, ধ্যান, ইত্যাদি) করিয়াছিলেন। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া দুর্গাদেবীর যোনিদেশ কামাখ্যায় পড়িয়াছিল এবং ঐ পীঠস্থানে তিনি যোনিরূপেই সকলের পূজ্যা। ব্রহ্মমন্ত্র সাধক আমার, সাকার তাঁহার মূর্তি অপেক্ষা বিশ্বব্যাপী, বিশ্বকারণ আত্মরূপী, ব্রহ্মযোনিই প্রিয়ভাবে অর্চনীয়। গুরুরূপিণী দুর্গাদেবী আমাকে উক্তরূপ ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। মানব-মানবীর লিঙ্গ ও যোনি শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনির অনুরূপ! এই জ্ঞানে, কাম নিবারিত হয় এবং স্বীয় আত্মরূপী শিবলিঙ্গ বা ব্রহ্মযোনির ধ্যানে পুনর্জন্ম হয় না।

শরদিন্দু-সাক্ষ্য

বিষয়—শরদিন্দুর, গঙ্গার পশ্চিম কূলে স্থিতা সারদেশ্বরীর প্রদর্শিত পথে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরঘাট হইতে পদব্রজে গঙ্গা পার হইয়া তাঁহার নিকটে গমন, আন্দাজ বেলুড় মঠ সন্নিকটস্থ গঙ্গার উপর একটি আকাশ হইতে পতিত অসংখ্য তারকামণ্ডিত জ্যোতির্ম্ময় জলপ্রপাত দর্শন ও তদভিমুখে গমন—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— নং ৫।১ ডি, তারিণীচরণঘোষ লেনস্থ নূতন বাড়ীর শয়ন-ঘর।

কাল—আন্দাজ অক্টোবর ১৯৪২।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"আমি যেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ঘাট হইতে গঙ্গার দক্ষিণদিকে একটি অপরূপ দিব্য-জ্যোতিঃ দেখিয়া গঙ্গার ঠিক অপর কূলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি—এমন সময়, মা সারদেশ্বরীকে বিধবার বেশে আমার গন্তব্যস্থানে জলে হাত ধুইতে দেখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! আপনি কি করিয়া ওখানে যাইলেন? আমি যে যাইব!' তিনি হাত সোজা বাড়াইয়া বলিলেন, 'এস না, এস!' আমি তাঁহার প্রদর্শিত পথে পদব্রজে অনায়াসে গঙ্গা পার হইয়া তাঁহার নিকটে পৌঁছিলাম। তখন ভাল করিয়া দেখিলাম যে দক্ষিণদিকে, আন্দাজ বেলুড় মঠের সন্নিকটস্থ গঙ্গার উপর, একটি অদ্ভুত জলপ্রপাত আকাশ হইতে পতিত হইতেছে। জল নীলবর্ণ, জ্যোতির্ময় এবং উহার ভিতর হইতে যেন অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা চারিদিকে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে। হতভম্বভাবে আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উহা দেখিবার উদ্দেশ্যে, মা সারদেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! ওখানে কেমন করিয়া যাইব?' তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় হাত দেখাইয়া বলিলেন, 'এস না, এস! ভয় কি?' এইরূপে, গঙ্গার পশ্চিম কূলের নিকট জলের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। তৎপরে, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। মা সারদেশ্বরী গুরুরূপে শরদিন্দুর আত্মায় অভেদভাবে মিলিতা—অতএব, সদাই তাঁহার সঙ্গিনী। এই স্বপ্নে, তিনি গুরুরূপে শরদিন্দুকে বেলুড়মঠ সন্নিকটস্থ গঙ্গার চিন্ময় অপ্রাকৃত মাহাত্ম্য বুঝাইলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনিই শরদিন্দুর

আত্মারূপে স্বপ্নটি প্রকট করিয়াছিলেন এবং শরদিন্দুর আত্মাকাশেই সমগ্র-দৃশ্যটি উদ্ভূত হইয়াছিল—অন্য কোথাও নহে! এই স্থলে, প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৪ (২) (চ) অনুচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য। মা সারদেশ্বরী জীবিতাবস্থায় দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ ও উহাদের মধ্যস্থিত গঙ্গামাহাত্ম্য যে-ভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা উহা পাঠে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বাসের সহিত দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়মঠ দর্শন করিলে, কাশী বা অন্য ধাম দর্শনের ফল লাভ করা যাইতে পারে এবং উক্ত স্থানের গঙ্গায় কৃষ্ণাবতার রামকৃষ্ণদেব চিন্ময় দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান অতএব, ঐ জল অসীম মুক্তিদায়িনী শক্তিযুক্ত। গঙ্গা বারি ব্রহ্ম বস্তু—অর্থাৎ, কৃষ্ণ-রাধা বা শিব-শক্তি মিলিত পদার্থ। কাশীখণ্ডে আছে যে, গঙ্গাজলে সাঙ্গ-চতুর্বেদ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, সর্বদেব, সর্বদেবী ও সর্বশক্তি সূক্ষ্মরূপে বর্তমান (প্রথম ভাগ, সপ্তম অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ)। সমস্ত গঙ্গাজল এইরূপ গুণসম্পন্ন হইলেও (প্রথম ভাগ, সপ্তম অধ্যায়), মণিকর্ণিকা, কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ, ইত্যাদি স্থানস্থ গঙ্গা-মাহাত্ম্য যে আরও অনেক অধিক সে বিষয়ে সন্দেহ কি (প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়)? মা সারদেশ্বরী উক্ত স্বপ্নে শরদিন্দুকে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়মঠ মধ্যস্থিত গঙ্গার অপরূপ মাহাত্ম্য স্বচক্ষে দেখাইলেন এবং বুঝাইলেন যে, আজকাল রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গগুণে বেলুড়মঠের (যেথায় রামকৃষ্ণদেবের দেহভস্ম অবস্থিত) সন্নিহিত গঙ্গা যেন ভুগঙ্গা ও আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, যেথানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ সদা বিকীর্ণ হইতেছে (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৪ (২) (ছ) ও (জ) অনুচ্ছেদ)। রাম, কৃষ্ণ, হরি এই নামগুলি মন্ত্র স্বরূপ (বীজহীন হইলেও), এবং ইহাদের এক একটির উচ্চারণে, যাবতীয় বৈদিক ও অপরাপর সকল মন্ত্রজপের অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয় (প্রথম ভাগ, অষ্টম, নবম ও একাদশ অধ্যায়)। প্রয়োজন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা! দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড়মঠ চিন্ময়, তন্মধ্যস্থিত গঙ্গা চিন্ময় এবং রামকৃষ্ণ নাম চিন্ময় (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৩ (৫) অনুচ্ছেদ); কিন্তু—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর,
বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর।

৩। শরদিন্দু জগদম্বা গুরুর কৃপায় অতি দুর্লভ দর্শন লাভ করিতে পারিলেন। এই কৃপা বিনা, আধ্যাত্মিক কোন সম্পদই লাভ হয় না, ইহা সত্য; তবে ভুলিলে চলিবে না যে, কৃপাও স্বকর্মফলোদ্ভূত (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১৬ (২) অনুচ্ছেদ)। হরি পূজায় যে ফল তাহা নিজ সঙ্কল্পিত ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে এবং হরি হইতে বর লাভ নিজ অভ্যাসেরই ফল প্রাপ্তি। লোকে যাহা পায়, সমস্তই ঈশ্বর শক্তি পুরুষাকার জাত এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহার কুত্রাপি কিছুই

হয় না। পুরুষকার রূপেই দৈব ফল দান করেন। তবে, শেষ কথা এই যে, সবই তাঁহার ইচ্ছা বা নিয়তি, এবং এই নিয়তি বিনা কিছুই বিশ্বে সম্ভব নহে। উক্ত দৃষ্টের সহিত রামকৃষ্ণদেবের ভিন্ন দেহ ও আত্মা গৌরীরূপিণী সারদেশ্বরীদেবীর যে কি সম্বন্ধ তাহা বিশদ ভাবে না লিখিলেও চলিবে। পাঠক-পাঠিকাগণ উহা নিজ বিচারে স্থির করিয়া লইবেন। তবে কাশীখণ্ড হইতে এইটুকু মাত্র লিখিতেছি—

গঙ্গা গৌরী দুই তুল্যা পূজ্যা এক মন্ত্রে,
বিশেষ বিধান যত আছে নানা তন্ত্রে।

আদ্যাশক্তি রূপে ধরায় পাতকী উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা হইয়া, মা জননী সারদা আমার-নিরীহা, অবগুণ্ঠিতা, লজ্জাশীলা, ঘোর-সংসারী ও বাতরোগ পীড়িতা রমণীর ন্যায় নিজ কার্য করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহান্তেও মা আমার—সমভাবেই নিজ অনন্ত ঐশ্বর্য ঢাকা রাখিয়া, তাঁহার জীব-উদ্ধার ও গুরুশক্তি পরিচালনে নিযুক্তা। কাহার সাধ্য যে তাঁহার মাহাত্ম্য ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ করিবে? বিনা কারণে যে উক্ত স্বাপ্ন-ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি মনে করি না এবং সম্ভবতঃ উহার নিগূঢ় অর্থ পরে ঘটনার দ্বারা প্রকাশিত হইবে। বোধ হয় যে, ছ ও জ পর্বে বর্ণিত ঘটনাদ্বয় আমাদের অবশিষ্ট জীবতাবস্থার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ! সেই ভাবে, নিম্নের কবিতাটি লিখিত হইতেছে—

শরদিন্দু-সারদা

চিন্ময়ী সারদা জয়, পরাশক্তি জয় জয়,
বিশ্বগুরু বিশ্বের জননী।
ত্রিগুণ-ধারিণী জয়, গুণাতীতা জয় জয়,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটনী।
বিশ্ব-প্রসবিনী জয়, বিশ্ব-প্রাণশক্তি জয়,
যুগে যুগে সাকারা তারিণী।
পাপী ত্রাণকর্ত্রী জয়, মুক্তিদাত্রী রাধা জয়,
রামকৃষ্ণ লীলা বিকাশিনী।
বুঝিবে কে লীলা তব? প্রতি যুগে ভাব নব,
বুদ্ধিহীনা আমি শিষ্যা তব।

পাপ বিষ রাঙ্গা পায়, দিয়েছি ঢালিয়ে, হায় !
সহিছ দাহন বিনা রব।
স্বপন সৃজন* ক'রে, কৃপায় দেখালে মোরে,
[*অবশেষ ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২২)]
বেলুড়স্থ গঙ্গার চিদ্রূপ।
ঐ জ্ঞানে কি কাজ মোর, আঁধারে না রেখো ঘোর,
বল অভিপ্রায় মা কিরূপ ?
রীত দুর্জ্ঞেয় তোমার, আমার বুদ্ধির পার,
কিন্তু বাঞ্ছি কৃষ্ণ-নিকেতন।
গঙ্গার অতি নিকটে, বেলুড়ের পার তটে,
ইথে গুরু-আজ্ঞা প্রয়োজন।
মিছা কাজে দিন যায়, শরদিন্দু করে, হায় !
পুত্র বেশ-ভূষা-ধাম হীন।
গুরুদেবী লহ নতি, চরণে এই মিনতি,
দূর কর সমস্যা কঠিন। (২৪)

শরদিন্দু-রামকৃষ্ণ

বিষয়—জাপানীদিগের বোমার আক্রমণ হইতে বাড়ী রক্ষা করিবার নিমিত্ত, ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রহরীবেশে সদর দরজা রক্ষায় নিযুক্ত—এইরূপ দর্শনের শরদিন্দুর স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন-ঘর।

কাল— ডিসেম্বর, ১৯৪২।

শরদিন্দু নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আট হাত ছোট লাল নরুন পাড় কাপড় পরিহিত হইয়া ও গামছা কাঁধে করিয়া, ৬নং বাড়ীর সদর দরজায় বহির্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায়, উহার পার্শ্বস্থ দুই কাষ্ঠে হস্ত দিয়া প্রহরীর কার্য করিতেছেন—এই ভাবে যে, বাহির হইতে কিছু ভিতরে আসিতে দিবেন না।"

২। হায়! হায়! এই অহেতুক —* **অবশেষে ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান** (২৩)—*কৃপাধার ঠাকুরটিকে আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? বলিবার বা লিখিবার কিছুই খুঁজিয়া পাই না এবং লিখিতে গেলে চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে চায় এবং লিখিবার শক্তি লোপ করে! ডিসেম্বর, ১৯৪২ সালে, জাপানীদিগের বোমার আক্রমণের নমুনা দেখিয়া, শরদিন্দু বিশেষ ভীতা হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ও বাটীস্থ সকলের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বুঝিয়া, আমি অনিচ্ছায় প্রায় আড়াই মাস কলিকাতা হইতে মাজুগ্রামে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কলিকাতা ত্যাগের পর, নূতন বোমার আক্রমণ কিন্তু হয় নাই।

শরদিন্দু-রামকৃষ্ণ

জয় রামকৃষ্ণ জয়, পরম করুণাময়,
ভক্তাধীন, রক্ষাকর্তা, দেব পরমেশ।
কন্যা বড় মূঢ়মতি, অবিশ্বাসী তব প্রতি,
বোমা ভয়ে ভুলি তোমা ছেড়ে ছিল দেশ।
নির্ভরতা হীনা আমি, ক্ষম তাত প্রাণস্বামী,
তুমি যদি নাহি ক্ষম আমি নিরুপায়।
লহ নতি কোটী বার, গুরুদেব সারাৎসার,
বিশ্বপিতা, প্রাণনাথ, হারক অপায়। (৮)

শরদিন্দু-সারদা

বিষয়—একই নিদ্রায়, শরদিন্দুর দুইটি স্বপন—

(১) একটি ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায়, তাহাকে দরজার অন্তরাল হইতে লৌহদণ্ডের দ্বারা প্রহার, ভয়ে 'জয় রামকৃষ্ণ জয়' বলিয়া চীৎকার, সারদেশ্বরীর আবির্ভাব, ব্যাঘ্রটির মনুষ্যাকার ধারণ এবং শরদিন্দুকে 'গুরু' বলিয়া সম্বোধনান্তে তাহার সাধনোদ্দেশ্যে বনে গমন।

(২) তাঁহার একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে সারদেশ্বরীর সহিত আগমন, একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আমাকে গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীবেশে না চিনিয়া, অপরিচিতা কোন সন্ন্যাসিনীর সহিত একটি বৃহৎ শঙ্খে তাম্রকুণ্ড হইতে পঞ্চগব্য ঢালিতে ও উভয়ের মুখের ভিতর দিব্য-জ্যোতিঃ দর্শন, সারদেশ্বরীর উহাকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণন এবং আমাকে শরদিন্দুর স্বামী বলিয়া পরিচিত করণ।

স্থান—আমার শয়ন-ঘর।

কাল—মার্চ বা এপ্রেল ১৯৪৩।

শরদিন্দু একই নিদ্রায় দুইটি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন পর পর দেখিয়া বলিতেছেন—

(১) "যেন আমার স্বামী, আমি ও দুইটি কন্যা (আশারাণী ও গীতারাণী) এক পল্লীগ্রামের বাড়ীতে রহিয়াছি,। সেইখানে বাহিরে বাঘের ভয়। একদিন দিবাকালে আমার স্বামীর অনুপস্থিতির সময়, শৌচান্তে আশাকে বাড়ীর সংলগ্ন পুকুরে গাত্র প্রক্ষালনের জন্য ভয়ে ভয়ে লইয়া গিয়াছি, তখন দেখি যে নিকটস্থ একটি বড় বৃক্ষের গোড়ায় একটি শ্বেতব্যাঘ্র একটি শ্বেতকুকুরের মুখ কামড়াইয়া ধরিয়াছে এবং কুকুরটি বাঘটিকে গাছের গোড়ার অপর পার্শ্বে কোনও রকমে রাখিয়া অনেক ছাড়াইবার চেষ্টা সত্ত্বেও, ক্রমশঃ জখম হইয়া পড়িতেছে। তখন আশাকে বাড়ী পাঠাইয়া ও বাঘটিকে একটি ঢিল মারিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করত দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছি, এমন সময় বাঘটি কুকুরটিকে ছাড়িয়া আমার পশ্চাতে বেগে তাড়া করিল ও দুই পাটি দরজার

মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া সবলে বাড়ী প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দরজা বন্ধ করা অসম্ভব ভাবিয়া ও বিপদ ঘনীভূত দেখিয়া, আমি 'জয় রামকৃষ্ণ জয়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম ও একটা লৌহদণ্ডের দ্বারা সেই বাঘের গাত্রে আঘাত করিতেই, সে মনুষ্যাকার ধারণ করিল ও বিধবাবেশিনী মা সারদেশ্বরী কোথ থেকে সেইখানে আবির্ভূতা হইলেন। মানুষটি আমাকে প্রণাম করত 'গুরু' বলিয়া সম্বোধন করিল ও সাধনের অভিপ্রায়ে বনে চলিয়া গেল। আমি এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলাম। তখন মা সারদেশ্বরী আমাকে বলিলেন যে, সত্যই আমি ঐ ব্যক্তির গুরু হইলাম—কারণ, আমার 'রামকৃষ্ণ' নামের প্রভাবেই অন্যান্য নানা জীব জন্ম হইতে উদ্ধার পাইয়া, বাঘটি একেবারে মনুষ্য জন্ম লাভ করত সেই জন্মের শত শত নিম্ন স্তর অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ শেষ স্তরে ঈশ্বর সাধনের জন্য বনে গমন করিল।

(২) তৎপরে, মা সারদেশ্বরীর সহিত আমি যেন একটি ছোট মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি বড় গাছের গোড়ায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধানে দুইটি লোক (পুরুষ ও স্ত্রী) সামনাসামনি ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন ও মধ্যস্থলে একটি বড় তাম্রপাত্রে পঞ্চামৃত রাখিয়া কুশির দ্বারা একটি বড় শঙ্খে উহা সেচন করিতেছিলেন। প্রাঙ্গণস্থ অন্যান্য লোকও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া শঙ্খে পঞ্চামৃত ঢালিতেছিলেন। আমিও সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে কুশি লইয়া শঙ্খে পঞ্চামৃত সিঞ্চন করিলাম। তৎপরে মনে হইল, যেন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর উভয়ের মুখের অন্তর বিদ্যুৎপ্রভ দিব্যজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। সন্ন্যাসীটির মুখের ভিতর ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি যে, সেখানে দুইটী পদ্মাকৃতি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ রহিয়াছে। বড় পদ্মটির কিনারা লালবর্ণের জ্যোতিঃ ও ছোট পদ্মটির কিনারা পীত বর্ণের জ্যোতিঃ মণ্ডিত, আর দুইটি জ্যোতিঃই পরস্পর সংলগ্ন। সারদেশ্বরী দেবীকে এই অদ্ভুত দৃশ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—'উঁহারা অহোরহ রামকৃষ্ণের চিন্তা ও নাম করিতেছেন বলিয়া, ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মুখ হইতে নির্গত হইতেছে।' তখন তাঁহাকে পুরুষটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'উনি যে তোমার স্বামী! তুমি উঁহাকে চিনিতে পারিতেছ না?' তখন যেন আমি কষ্টে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমার স্বামীই বটে—যদিও তাঁহার আকৃতি পরিবর্তিত, খুব ভাল করিয়া না দেখিলে চেনা যায় না। তাহার পর, নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনীটি যে কে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, কারণ খুব ভাল করিয়া তাঁহাকে দেখি নাই। বোধ হয়, আমি নিজেই তিনি—আমার স্বামীর ন্যায়

পরিবর্তিত! গুরুদেবী কেন উহা স্পষ্ট ভাবে আমায় জানাইলেন না ও অনুমানের উপর রাখিয়া দিলেন তাহার কারণ জানি না।"

২। অন্যান্য স্বপ্নের ন্যায়, এই স্বপ্ন দুইটি শরদিন্দুর আত্মা ও গুরু সারদাদেবী তাঁহার শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি রূপী আত্মাকাশে প্রকটিত করিয়াছিলেন এবং ইহাতে অনুভূত ঘটনারাজি অন্য কুত্রাপি ঘটে নাই। মোটামুটি ভাবে, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শরদিন্দুকে গুরু-মাহাত্ম্য এবং ঈশ্বরের চিন্তা ও নাম মহিমা দুইভাবে প্রদর্শন—প্রথম ভাবে, অতি হীন জন্তুর গুরুমুখে রামকৃষ্ণ নাম শ্রবণের ফলে, নানা জরায়ুজ জীব জন্ম ও শত শত স্তরস্থ নিকৃষ্ট মনুষ্য জন্ম অতিক্রম করিয়া একেবারে ঈশ্বর সাধনাসক্ত চরম মনুষ্য জন্ম লাভ প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় ভাবে, আমার ও শরদিন্দুর সাধনের ফলজাত চিন্ময় 'ভাগবতী'-তনু প্রদর্শন। প্রথম স্বপ্নে, শ্বেত-বর্ণের বাঘ ও কুকুর এবং তাহাদের আচরণ কোন গূঢ়ার্থ সূচক কি না, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। পরে হয়তো উহাদের অর্থ প্রকাশ হইতে পারে—কেননা, গুরু ও দেবতা সম্পর্কিত সব স্বপ্নই সত্য এবং উহাদের ভিতর অসংলগ্ন যাহা কিছু তাহারও একটা তাৎপর্য থাকে (অবতরণিকা, ৯ (৫) অনুচ্ছেদ)। জীব-ব্রহ্ম বাসনাবশে ব্রহ্মচক্রের আবর্তনে কত অনন্তবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম বিবিধ যোনিগত হইয়া পরিশেষে মুক্ত স্ব-স্বরূপ পুনরায় উপলব্ধি করে, তাহা প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদে বিশদ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ-মূলক এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইবারও তাহার একটা সাধারণ প্রগতির ক্রম আছে এবং সেই বিষয় প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ৬-৮ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের কৃপায় কোন কোন স্থলে এই সমুদয় নিয়মের ব্যতিক্রমেও জীবের মুক্তি লাভ হইতে পারে এবং সেই বিষয় প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৪ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। সেই অনুচ্ছেদে, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত নারদ ঋষির কৃপায় কেমন করিয়া একটি পিপীলিকা মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার সম্মুখেই পর-পর নানা পক্ষী, পশু ও মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া ভগবানের আরাধনা করত মুক্ত হইয়াছিল, সেই বিবরণ পাঠ করিলে, পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন কেমন করিয়া এই স্বপ্নে বাঘটি শরদিন্দুর উচ্চারিত 'রামকৃষ্ণ' নাম শ্রবণে, মনুষ্য জন্ম লাভ করত তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া বনে তপস্যার্থে গমন করিয়াছিল। প্রথম ভাগ, অষ্টম, নবম ও একাদশ অধ্যায়ে 'রাম,' 'কৃষ্ণ,' 'হরি,' 'কৃষ্ণচৈতন্য', 'রামকৃষ্ণ', ইত্যাদি ঈশ্বর নামের অনির্বচনীয় মুক্তিদায়িকা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। হরি নাম কীর্তন কর্ণে যাহাদের প্রবিষ্ট হয়, তাহারা (সঠিক বিশ্বাসী হইলে) ঘোর

পাপমুক্ত হইয়া যায় এবং চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ নাম ও কীর্তন শ্রবণ করিয়া একত্রে হস্তী, ব্যাঘ্র, মৃগ, প্রভৃতি জন্তুও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভুলিয়া তালে তালে ঈশ্বর প্রেম-বিগলিত হইয়া নৃত্য করিত (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১০ অনুচ্ছেদ)। অতএব, জগন্মাতা সারদেশ্বরীর সৃজিত স্বপ্নে যে তাঁহার শিষ্যা বাঘটিকে 'রামকৃষ্ণ' নামে প্রভাবে মানুষরূপে সাধনার্থে বনে গমন করিতে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। ঈশ্বর কৃপাপ্রাপ্ত ও তাঁহার আশ্রিত শরদিন্দু যে, সারদেশ্বরীর অনুমোদনেই ঐ মানুষটির গুরুরূপে বৃতা হইলেন, তাহাও স্বভাবিক। গুরুর অনুমোদনে শিষ্য গুরুর কার্য করিতে পারেন, ইহা একটা শাস্ত্রীয় প্রথা! মনে হয় যে, পরে শরদিন্দু ঈশ্বর নাম-মাহাত্ম্য অবলম্বনে, শুভচিত্ত (শেত!) কোন কোন ব্যক্তির সদ্‌গুরুর কার্য করিবেন, ইহাই সারদেশ্বরীদেবীর ইচ্ছা। শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সদ্‌গুরুরূপে অজ্ঞকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করেন। আত্মাকে যিনি অবগত হইয়াছেন, তিনি নিজে সাধু বা অসাধু, বেদবিৎ বা বেদজ্ঞানহীন, ধার্মিক বা পাপকৃৎ যাহাই হউন না কেন, সংসার হইতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইবেন। এমন কি, যিনি আত্মাকে জানিতে চেষ্টাশীল, তিনিও কর্মকাণ্ড অতিক্রম করত সংসারে অবস্থান করেন এবং স্বকর্ম ত্যাগের নিমিত্ত দোষভাগী হন না। কর্ম ও কর্মফলের কারণই অজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উন্মেষে, উহারা ব্রহ্ম স্বরূপ!

৩। কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে, দ্বিতীয় স্বপ্নটি বুঝা যাইবে না। সেইজন্য, সেই সকল বিষয় প্রথমে এই স্থলে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিব। পুস্তকের প্রথম ভাগে, নানা স্থানে ও প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে, অন্তর্যামী ঈশ্বরের নিয়োগক্রমেই বিশ্বে জীবগণ স্ব-স্ব কর্ম করিতেছে এবং কেহই কোনও বিষয়ে স্বাধীন নহে। ঈশ্বরই কর্মফল ও কর্মফলদাতা এবং তাঁহার সংকল্প (নিয়তি) ও জীবের যত্নের দ্বারা বিশ্বের সর্ববিধ স্পন্দন চলিতেছে। ঈশ্বর দ্বিবিধ (কারণ ও সূক্ষ্ম) ও জীব ত্রিবিধ, দেহবিশিষ্ট। বিশ্বে জীবের তৃতীয় বা স্থূলদেহই সমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়ার আশ্রয় এবং কারণদেহ ও সূক্ষ্মদেহ যথাক্রমে জ্ঞান ও ইচ্ছার আশ্রয়। অতএব, বিশ্বের সমস্ত বাহ্য বিকাশই ঈশ্বরেচ্ছাসম্ভূত—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' —যিনি নিজেকে যতই কোন বিষয়ে বাহাদুর (বা হীন) মনে করুন না কেন! ঈশ্বরই সর্ব বিষয়ে অটুটভাবে বিশ্ব কর্তা এবং এইখানে আর কেহই কোনও বিষয়ে কর্তা নাই—কেননা, জীবাত্মা নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য, ঈশ্বরকে মানবের সর্বার্পণ বিধেয় (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ ও তৃতীয় নিবেদন, ৪ অনুচ্ছেদ)। ঈশ্বরে বা আত্মাতেই সমস্ত দ্বৈতের সমবায়—এই ভাবে ভাবুক ব্যক্তি 'জীবন্মুক্ত' এবং সর্ববিধ বাহ্য অবস্থায় বর্তমান থাকিলেও, তীর্থ-প্রবর, সদা-পূত, 'সর্বত্যাগী' ও

'সন্ন্যাসী' (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬-২২ অনুচ্ছেদ)। সর্বত্র সমদর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞান সলিলে সদা অবগাহন অপেক্ষা অধিক কোন শুদ্ধি নাই। বিশ্বরূপী পরমাত্মা যে বিশ্বের সর্বকার্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা তাঁহার কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে। ইনি জীবদেহে সর্বোত্তমা শক্তিরূপে বিরাজিতা এবং তাহার সত্তাস্ফূর্তিপ্রদা। ইনি মেরুমধ্যে সূক্ষ্মদেহস্থ ষট্-চক্র স্পর্শ করিয়া তাহাতে গ্রথিতা রহিয়াছেন এবং অখণ্ড জ্যোতিঃ-স্বরূপিণী হইয়া (৪ পব) আত্মায় অবস্থিত, জীবের প্রাণশক্তি। প্রাণই লীলায়িত হইয়া—'**সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ**'- সমস্ত পদার্থ ও জীবকে প্রকাশ ও কার্যক্ষম করিয়াছে—**অরা-ইব রথ-নাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্**'—অর্থাৎ, রথচক্রের নাভিতে শলাকা সমূহের ন্যায়, বিশ্বে সমস্তই প্রাণ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণশক্তি দেহে নানা কেন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়া উহাকে সজীব রাখিয়া সর্ববিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। অতএব, আত্মাশক্তিরূপিণী প্রাণবায়ু বিশ্বের সর্ববিধ স্পন্দনের নিয়ন্ত্রী। এই সব বিষয় অবতারণিকার ৬ (১২) অনুচ্ছেদ, প্রথম ভাগের প্রথম অধ্যায়ের ২১ অনুচ্ছেদ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্মে সার্ধ ত্রিবলয়াকারে অবস্থিতা এবং ইঁহাকে দেখিতে সলিলাবর্তের, বা অর্ধ ওঁ-কারের তুল্য—অর্থাৎ, ইনি শঙ্খাকৃতি। বিবিধ ঈশ্বর মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি-গণ প্রকারান্তরে এই পঞ্চ দেবময় ও পঞ্চ প্রাণময় কুণ্ডলিনী শক্তিরই উপাসক এবং ইঁহাকে সাধনায় তুষ্টা করিয়া মূলাধারে জাগরিতা না করিতে পারিলে, যন্ত্র-মন্ত্র-জপ-অর্চনাদি কখনও সিদ্ধ হয় না (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১০ (৮) ও (১০) অনুচ্ছেদ)। শাস্ত্রানুসারে, সকল সাধকেরই ভাব-অনুযায়ী একটি অন্তরস্থ 'সাধন' বা 'ভাগবতী' চিন্ময় তনু উৎপন্ন হয়। এই প্রেমঘন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেহেতেই আত্মার সহিত রমণ হয়—চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন, কর্ণের দ্বারা বাণী শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শানুভব, ইত্যাদি। সাধারণ চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করা, বা সাধারণ কর্ণের দ্বারা তাঁহার বাণী শ্রবণ করা, যায় না। দ্বিতীয় স্বপ্নে, শরদিন্দু মন্দির প্রাঙ্গণস্থ ব্যক্তিদিগকে কুণ্ডলিনীর অর্চনা করিতে এবং নিজের ও আমার 'ভাগবতী' তনু দেখিয়াছিলেন। ঐ স্বপ্নে, শঙ্খরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তিকে পঞ্চামৃতের দ্বারা আমরা অর্চনায় নিযুক্ত ছিলাম—অর্থাৎ, আমরা যে তাঁহাকে সর্বার্পণে অভ্যস্ত, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেইজন্য, আমরা বাহিরে সংসারী হইলেও, অন্তরে সর্বত্যাগী ও সর্বত্যাগিনী—অর্থাৎ, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, যাহা শরদিন্দুকে মা দর্শন করাইলেন। এই স্থলে প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১১ (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, যেখানে সারদেশ্বরী বলিয়াছেন যে, গৃহীদের সাধারণতঃ বহিঃ-সন্ন্যাস নিষ্প্রয়োজন। যদিও আমাদিগের নির্দিষ্ট ইষ্টদেব নামে রামকৃষ্ণ নহেন, তথাপিও তিনি পরব্রহ্মস্বরূপ গুরুরূপে কাজে

আমাদের ইষ্টদেবের সহিত সম্পূর্ণরূপে অভেদ এবং অর্চনায় তাঁহার অপেক্ষাও অধিক বরণীয় (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৪ (১) অনুচ্ছেদ)। সেই জন্যই, মা সারদেশ্বরী শরদিন্দুকে কৃপা করিয়া এই স্বপ্নে জানাইলেন যে, আমাদের ইষ্টমন্ত্র সাধনায় রামকৃষ্ণদেবের সাধনাই সম্পন্ন হইতেছে—যজ্জন্য, আমাদের চিন্ময় ভাগবতীতনুর মুখ ব্রহ্মজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। সদা লজ্জাশীলা আমার মা, নিজেকে একেবারে ধরাছোঁয়া দিলেন না। কিন্তু তিনিই পরব্রহ্মেচ্ছারূপিণী, জ্যোতিঃরূপিণী, বিশ্বকর্ত্রী কুলকুণ্ডলিনী—আ পর্ব। গ ও ঞ পর্বে বর্ণিত স্বপ্ন দুইটিতে, শরদিন্দুর বিশ্বব্যাপী ও সর্বোপকরণ-সম্পন্ন আত্মা (অভেদ সারদাদেবী), আমাদের উভয়ের আধ্যাত্মিক কিছু স্বরূপ জানাইলেন। পরে ট পর্বে বর্ণিত শরদিন্দুর স্বপ্ন, আমার অন্য একটি আধ্যাত্মিক স্বরূপ এবং সারদা'ই যে দুর্গাদেবী, তাহা প্রকট করিবে।

শরদিন্দু-সারদা

জয় জননী সারদা, পিতা রামকৃষ্ণ,
জয় বধু দেবী রাধা, পুত্র দেব কৃষ্ণ।
জয় গুরু রামকৃষ্ণ, জয় গুরু দেবী,
জয় ইষ্ট-কৃষ্ণ, আর ইষ্টা-রাধা দেবী।
হৃদয় কমল বাসী ইষ্টা-ইষ্টে নমি,
সহস্রার বাসী গুরু-যুগলে প্রণমি।
শিব-শক্তি রূপী গুরু অগ্রেতে পূজন,
তাঁর আজ্ঞা ল'য়ে হয় ইষ্টের সাধন।
বিনা জ্ঞান হয় ত্রাণ গুরু তুষ্ট হ'লে,
আত্মজ্ঞানী সদ্‌গুরু শিব—শাস্ত্র হেন বলে।
তিনিই কভু নন নর—ব্রহ্ম সুনিশ্চয়,
ত্রিভুবন-ব্যাপী তিনি, দেবতা চিন্ময়।
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু শিবময়,
গুরু হ'তে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি বিশ্বময়।
গুরু সূর্য, গুরু চন্দ্র, গুরু হুতাশন,
গুরু শক্তি, গুরু মুক্তি, মাতা পিতা হন।

তাহা জানিনা এবং তাঁহারই পায়ের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাদের সম্মুখে ভূমিতে বসিয়া 'মা-গো,-মা' বলিয়া মাঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে কাঁদিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ এইরূপে কাঁদিলেও, মা কোনরূপ সাড়াই দিলেন না—যেন শুনেও শুনিতে পাইতেছেন না, এইভাব! এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'মা! ও তোমা'কে এত ডাকিতেছে তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?' তখন তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'তুই এত কাঁদছিস্ কেন? তোর্ কি হয়েছে?' আমি বলিলাম, 'মা! আমি তোমার নিকটে কবে আসরো?' মা বলিলেন—'শীঘ্রই আসবি।' এমন সময়, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। এই স্বপ্নটি দেখিবার কালে, গীতা চতুর্দশ বর্ষ বয়সও অতিক্রম করে নাই, তাহার আধ্যাত্মিক বিশেষ কোন জ্ঞানই ছিল না এবং আমাদের দৃষ্ট স্বপ্নাদির বিষয় সে একটুকুও জানিত না। ঐ স্বপ্নে, গীতার আত্মা বা আত্মস্থ অভেদ সারদেশ্বরী ও কৃষ্ণ ছিলেন, সেইজন্য ইহা নিঃসন্দেহ যে উহা তাঁহাদের কৃপা-সম্ভূত। স্বপ্নটির শেষাংশ তাহার অন্তরস্থ আত্মাকাশে সেই কৃপা সুন্দরভাবে প্রকট করিয়াছিল। অত কম বয়সে এইরূপ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর কৃপালাভ (গ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য স্থানে পূর্বে ব্যাখ্যাত), অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বর কৃপালাভ অতি দুর্লভ বস্তু এবং বহু জন্মের সাধন সাপেক্ষ ইহা যে পাঠক অবগত আছেন, তিনি বোধ হয় আমার এই কথা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিবেন যে, আমি নিজ কন্যার 'গুণগান' করিতেছি না—সত্য কথাই লিখিতেছি মাত্র! এই স্বপ্নটি, পিতা ও মাতার প্রতি সন্তানের ও ভক্তসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকাশক! গীতা চিরকালই আমাদের বাধ্য ও বিবেচনাশীলা কন্যা এবং আমরা যাহা করি (ঐহিক বা পারত্রিক) তাহাই ভাল, এইরূপ ভাব তাহার স্বাভাবিক। সেই ভাব বলেই সে বিনা বিচারে শিখিয়াছিল যে, আমরা যে দেবদেবীকে ভক্তি বা পূজা করি তাঁহারা তাহারও বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তু। বাস্তবতঃ আমাদের সহিত সেই পারত্রিক সঙ্গের গুণে, গীতা অতি অল্প বয়সেই উক্ত ঈশ্বর কৃপা লাভ করিয়াছিল—অবশ্য সর্ব প্রধান কথা এই যে, তাহার পূর্বজন্মের সংস্কারই তাহাকে ঐ পথে লইয়া গিয়াছিল! আমার অন্যান্য সন্তানের উক্ত আধ্যাত্মিক সুসংস্কার প্রবল না থাকিবার জন্যই, তাহারা নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পীড়নে আমাদের সঠিক আধ্যাত্মিক সঙ্গী হইতে পারে নাই। এই সব কারণেই, মহাপুরুষগণ সাধুসঙ্গকে ঈশ্বর লাভের পথে একটি উৎকৃষ্ট সোপান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সঙ্গদোষে দেবতাও নারকী

হইতে পারে এবং সঙ্গগুণে নারকীও দেবতা হইতে পারে। এই বিষয়ে আরও একটি কথা যে, পিতা, মাতা, পতি. ও গুরুজনে ভক্তি এই সব গুণ ভিন্ন মানব অহঙ্কার ত্যাগ, বা স্বেচ্ছাচার নিবারণ করিতে, পারে না এবং তন্নিবন্ধন চিত্তশুদ্ধির অভাবে জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভের পথ সঠিক অনুসরণে সমর্থ হয় না (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৬ (৯) অনুচ্ছেদ)। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'ঈশ্বরের পথে যেও না, এই আদেশ ব্যতীত পিতামাতার সব কথাই মানিতে হয়···মাতা ব্যভিচারিণী হইলেও, তাঁহাকে ত্যাগ করা চলে না··· মাতাপিতাকে অবহেলা করিয়া যে ধর্ম করিবে, তাহার কিছুই ফল লাভ হইবে না··· তাঁহারা প্রসন্ন না হইলে, ধর্মাচরণাদি কিছুই হয় না' (প্রথম ভাগ, সপ্তদশ অধ্যায়, ১ (১১) অনুচ্ছেদ)। এইস্থলে, আর একটি কথা লিখিবার যোগ্য। রামকৃষ্ণদেবই বলিতেছেন—'হাজার দোষ থাকুক, বংশে যদি মহাপুরুষ জন্মে থাকেন. তিনি টেনে লন—অর্থাৎ, মহাপুরুষরূপে তিনি স্ব-বংশীয় অনেককে মুক্ত করেন. যেমন যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে গন্ধর্বের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বংশে একজন মুক্ত হইলে, অনেকেই মুক্তি পান।' হরিভক্ত কুলে জন্মলাভ করিলে, অন্তিমে যোগ্যতানুসারে সেই বংশে অনেকে গোলোকবাসী হন (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ)। সেই একই নিয়মে, সুরথ রাজার পুত্রপৌত্রাদি মৃত্যুর পরে অনেকেই দেবত্ব ও দেবীধাম লাভ করিয়াছিলেন (প্রথম ভাগ. নবম অধ্যায়. ১৩ (ক) পাদটীকা)। পরে আলোচিত কয়টি স্বপ্ন, আমার কতকগুলি আত্মীয়ের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও আমার প্রতি ভাব প্রকট করিবে। সবই নিয়তি! বিশ্বে এমন কিছু ছিল না, বা নাই, বা হইবে না—যাহা কালীর অভিব্যক্তি নহে!

৩। স্বপ্নটির প্রথম অংশে গীতার সহিত অখিলের যে মারামারি হইয়াছিল তাহার গূঢ়ার্থ আমার অভিজ্ঞতায় এই যে, তাহাদের ভিতর ভবিষ্যতে বিশেষ সদ্ভাব থাকিবে না। উহাদের নিয়তির লিপি এইরূপই বুঝিতে হইবে! গীতা তাহার মাতার ঠাকুরঘরে কেবল শরদিন্দুর গুরু (সারদেশ্বরী) ও ইষ্টকে (কৃষ্ণ) দিব্যজ্যোতিঃ-মণ্ডিত জাগ্রতাবস্থায় দেখিয়াছিল এবং অন্য কোনও দেবতাকে দেখিতে পায় নাই, কারণ মানবের আত্মস্থ গুরু ও ইষ্টের ভিতরেই সারাবিশ্ব, সর্বদেবতা ও পরমাত্মা বর্তমান! জ্ঞানময় আমিই সব—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য! স্বপ্নটি আরও বুঝায় যে, শরদিন্দুর গুরু ও ইষ্ট সাধন বিফল নহে এবং তাঁহারাই গীতার স্বপ্নের ভিতর দিয়া আমাকে ও শরদিন্দুকে উহা পুনরায় (এ পর্ব) ভিন্নভাবে জানাইলেন। গীতা যে উক্ত গৃহে একটি প্রদীপ জ্বলিতে দেখিয়াছিল তাহার গূঢ়ার্থ এই যে, উহাতে বিধি অনুযায়ী একটি প্রদীপ রাখা

প্রয়োজন, যদিও থাকে না—কেননা, পূজ্য দেবতাবিগ্রহের নিকটে সর্বদা একটা যাগ-প্রদীপ রাখিতে হয়, নতুবা গৃহস্থের অকল্যাণ হয় (প্রথম ভাগ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ১ (২) অনুচ্ছেদ)। এইজন্যই বোধ হয় শরদিন্দু স্বপ্নে নরকের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখিবার কালে, তাঁহাদের মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন (খ পর্ব, ১ অনুচ্ছেদ)। এই স্বপ্নে প্রদর্শিত ত্রুটি, শরদিন্দুর সংশোধন করিলে ভাল হয়। তবে, না করিলেও কোন দোষ হয় না—কারণ, ঈশ্বরে সর্বার্পণে সিদ্ধ ব্যক্তি 'জীবন্মুক্ত' এবং তাহার স্বেচ্ছাচারই বিধিরূপে পরিগণিত হয়। দোষ যদি হইত, তাহা হইলে শরদিন্দু ঈশ্বর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেন। উক্ত স্বপ্নে, গীতা শুনিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অতএব, শরদিন্দুর ঠাকুরঘরে তাঁহার গুরু সারদেশ্বরী, পরাপ্রকৃতি-আদ্যাশক্তি, হরি-হর-ব্রহ্মার মাতা মহাকালী রূপেই বিরাজমান (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৯/৩০ অনুচ্ছেদ । তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহা প্রতীয়মান হয়, ইহা সত্য—কারণ, মানবের গুরুই পরব্রহ্ম ও পরাপ্রকৃতি। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা বুঝা ও ঈশ্বর কৃপার সাহায্যে বুঝিতে পারা, অনেক তফাৎ—কেননা, কাশীর বিষয় পঠন বা শ্রবণ অপেক্ষা, কাশী দর্শনে অনেক তারতম্য। গুরু সারদেশ্বরী উচ্চাসনে এবং ইষ্ট কৃষ্ণ নিম্নাসনে—ইহার অন্য একটি কারণ হইতে পারে যে, অর্চনায় গুরু ইষ্টা অপেক্ষা প্রধান (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, (১) পাদটীকা ও ৪ (১) অনুচ্ছেদ)। সেইজন্যই, নিম্নলিখিত শাস্ত্র বাক্য—

অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু, নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।'

গীতার পরবর্তী স্বপ্ন (আ পর্ব), সারদেশ্বরীকে পরাপ্রকৃতিদেবী কুণ্ডলিনী রূপে প্রকাশ করিবে। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে ষোড়শী রূপে অর্চনায়, সেই পদই দিয়াছিলেন।

৪। সুতরাং, উক্ত স্বপ্ন হইতে আমরা তিনজনই অনেকগুলি বিষয় জানিতে পারিলাম—(১) গীতার সহিত তাহার ছোট ভ্রাতা অখিলের বিশেষ সদ্ভাব জীবনে থাকিবে না; (২) গীতা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরস্থ এবং সে শীঘ্রই আদ্যাশক্তির কৃপালাভে ধন্যা হইয়া ইহজীবনেই জন্মমৃত্যু-সঙ্কুল ঘোর দুঃখময় সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণা হইবে; (৩) শরদিন্দুর ঠাকুরঘরে তাঁহার গুরু-ইষ্ট পূজা সফল ও ঐ ঘর তাঁহাদিগের একটি পীঠস্থানই বটে; এবং (৪) শরদিন্দুর অন্তরঙ্গ উত্তরাধিকারিণী রূপে, তাঁহার কন্যা গীতা তাঁহার সাধন ঐশ্বর্য ক্রমে লাভ করিবে। পরবর্তী আ পর্বে বর্ণিত গীতার স্বপ্নে বুঝা যাইবে যে, সে কালে আমার সাধন ঐশ্বর্যেরও উত্তরাধিকারিণী হইবে। এইরূপে, গীতার আমাদের যথার্থ অন্তরঙ্গ আত্মজা রূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা! তাহার দুইটি স্বপ্ন আমাদের জানাইল যে, শরদিন্দুর ঠাকুরঘর এবং আমার শয়নঘর যথার্থই ঈশ্বর-পীঠস্থান। পাঠক

বুঝুন আমার সদা লজ্জাশীলা ও অবগুণ্ঠিতা মানবী মাতাটি কি অদ্ভুত পদার্থ! ঐ অবগুণ্ঠনের ভিতর যেন সারা বিশ্বের বুদ্ধি একচেটিয়া লুকায়িত রহিয়াছে এবং মা'টি যাহাকে যেমন ইচ্ছা সেইরূপে ঘুরাইতেছেন ও ফিরাইতেছেন। জগতে এমন কোন দেবতাও নাই, যিনি ঐ বুদ্ধির ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা প্রতিরোধ করিতে পারেন ! ভাল মানুষের বেটী ভাল মানুষ বেশিনী হইলেও, তিনি মহা ধূর্ত্ত ও ধড়িবাজ ! কত যে ভাব তাঁহার ভিতর, কে তাহা ইয়ত্তা করিবে ? শরদিন্দুকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আট বৎসর ছুটাছুটি ও নীরবে কত অবহেলন সহ্য করণ। আর তাঁহার কন্যা, অবোধ বালিকা গীতাটিকে কত কাঁদাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে, পরে নিকটস্থ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান—ঈ পর্বে ইহার কারণ দ্রষ্টব্য। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি আমি লোকসমাজে প্রচার করিতে যাইতেছি ! কিন্তু কী' ই বা জানি ? যাহা জানাইতেছেন, তাহাই যে মাত্র আমার বিদ্যা ও বুদ্ধির পুঁজি ! তাঁহার সঠিক স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা আমার বাতুলতা মাত্র ! অপরাধ লইও না, মা ! কোন দেবতাও তোমার সব রীত যে ধারণা করিতে অক্ষম।

গীতা—কৃষ্ণ—সারদা।

মোর মা'র পূজাঘরে, জ্যোতির্ময় রূপ ধ'রে,
আছেন বসিয়া শ্রীমা সহ দেব হরি।
শ্রীমা খট্বার উপরি, তাঁর পদ-পার্শ্বে হরি,
স্বপ্নে মোরে দেখালেন তাঁরা কৃপা করি।
নিকটেতে বসিলাম, কান্না সুরু করিলাম,
দেবীকে ' মা-গো-মা' রবে ডাকিলাম কত।
সাড়া নাহি মা দিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিলেন,
বলিলেন, ' নাহি কেন শুন ডাক অত ?'
পুছিলেন মা তখন, 'কেন তোমার ক্রন্দন ?'
বলিলাম, ' নিকটস্থ কবে হব আমি ?'
তখন মা কৃপাময়ী, বিশ্ব মাতৃ-ভাব ময়ী,
বলিলেন, " কাছে তাঁর যাব শীঘ্র আমি "।

তাঁর নিকট যাইলে, কি বস্তু লোকের মিলে,
জানা মোর নাহি ছিল কিছুই তখন।
বহু পরে বই পড়ি, জেনেছি নিশ্চয় করি,
উহাতে জনম-মৃত্যু হয় নিবারণ।
বুঝা ইহা অতি ভার, কেন করি আবদার,
স্বপ্নে কাঁদি মা'র কাছে যেতে চাহিলাম।
এই মাত্র কথা সার, তাঁর কৃপায় অপার,
স্বপন জ্ঞাপিল—পাব অন্তে আদ্যাধাম।
ভাই ভগ্নী যত সব, উচ্চার 'মা-গো-মা'রব,
কাঁদিকাটি কর সদা সারদা-বন্দন।
হরি কৃপা করিবেন, সব পাপ হরিবেন,
মহামন্ত্র মাতৃ-ধ্বনি প্রণব সাধন।
পাবে ভাই মুক্তিধাম, মা'র চরণে বিশ্রাম,
ভুগিতে হবে না পুনঃ সংসার যাতন্।
গাও সারদা বিজয়! বল সবে কৃষ্ণ জয়!
বড় কৃপাধার তাঁরা দুরিত-বারণ।
সারদা গুরু মাতার, কৃষ্ণ ইষ্টদেব তাঁর,
জানি তাঁরা স্থিত মা'র পূজার আগার।
তাঁদের পদে প্রণতি, আর স্তব-স্তুতি-নতি,
অজ্ঞা গীতা যাহা জানে করে কোটী বার। (৩২)

গীতা-কুলকুণ্ডলিনী (সারদা)

বিষয়—কন্যা গীতারাণীর আমার শয়ন ও পার্শ্বস্থ ঘর যেন অরণ্যে পরিণত বৃহদাকার বৃক্ষ ও তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত দর্শন; তৎপরে তাহার একটি বিরাট সর্পের দ্বারা বেষ্টিত হওন এবং সর্পটির তিনবার তাহার মাথার উপরে ফণা ধরিয়া উঠা-নামা করত অদৃশ্য হওন—ইত্যাদি রূপ স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন ঘরের পার্শ্বস্থ শয়ন ঘর।

কাল—১৯৪৩ সালের মধ্যভাগ।

কন্যা গীতা নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিয়া বলিতেছে—

"যেন আমাদের বাড়ীতে আমি আর মা ভিন্ন আর কেহ নাই—জানি মা, সকলে কোথায় গিয়াছেন। আমি মা'কে বলিলাম—'মা, চল আমরাও যাই, সকলেই তো চলে গিয়াছে!' তৎপরে, সব ঘরের জানালা ও দরজা উভয়ে বন্ধ করিতে লাগিলাম। বাবুর শয়ন ও পার্শ্বস্থ ঘরে আসিয়া দেখি যে, উহাদের মেঝেতে বড় বড় গাছ জন্মেছে—আম, জাম, কাঁঠাল, বট, বেল, ইত্যাদি নানাবিধ জানা ও অজানা গাছ আর আমার হাঁটু পর্য্যন্ত উচ্চ বড় বড় নানাবিধ ঘাস ও অন্যান্য তৃণ মেঝকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া আমরা দুইজনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জানালা ও দরজা বন্ধ করিতে লাগিলাম। বাবুর ঘর থেকে বাহির হইবার কালে, উহার কোথা থেকে একটা বিরাট সর্প আসিয়া আমার পা হইতে সারা দেহ বেষ্টন করত মাথার উপর ফণা ধারণ করিল এবং কিছুক্ষণ পর নীচে নামিল। এইরূপ তিনবার উঠা-নামা করিবার পর, উহা কোথায় অদৃশ্য হইল এবং আমরা ঘরের বাহিরে আসিলাম। সাপটাকে বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু জানি না মা কেন আদৌ ভীতা হন নাই। তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

পরদিনে, ভয়ে মাকে বলিয়াছিলাম—'মা! আমাকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলবে। তুমি পূজাদি দিয়া ইহার একটা উপায় কর!' মা কথা শুনেন নাই।"

২। পূর্বের পর্ব গুলি যাঁহারা সঠিক অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মা কর্তৃক প্রকটিত এই স্বপ্নটিও গভীর অর্থ সূচক!

জীবাত্মা ইহ ও পর লোকগামী এবং স্বপ্ন তাঁহার 'সন্ধ্য' স্থান—যথা হইতে তিনি কোন কোন মানবকে তাঁহার কর্মফল প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। জীবাত্মাই স্বরূপে শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি রূপী ঈশ্বর এবং তাঁহার রূপ:তেই এই সকল স্বপ্ন সাধারণতঃ উদয় হয়। সর্পটি গীতার মূলাধার-পদ্মস্থ ভুজগী আকারা, পরব্রহ্ম-সোহাগিনী, কুণ্ডলিনী, আত্মাশক্তি দেবী (ঞ পর্ব ও প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)। অতএব, এই স্বপ্নটি গীতা ও বাটীস্থ অপর সকলের পরিপক্ক কর্মফল বা নিয়তির লিপি, প্রদর্শক। স্বপ্নটির প্রথম অংশে গীতার খেদোক্তি, সাংসারিক নানা পরিবর্তনাদির সূচক। বিশেষ কিছুই পরে ঘটিয়াছে (৬৪ এবং আনুষঙ্গিক পর্বগুলি ও এই পুস্তকের পরিশিষ্ট) এবং আর কি অবশিষ্ট তাহা কে বলিতে পারে? বর্তমান অবস্থা এই যে, আমার বিবাহ-উপযুক্তা দুইটি ছোট কন্যা বাণী ও দীপার বিবাহের পর, আমরা যদি অন্যত্র বসবাস করি (বরাহনগরে বেলুড়ের পার ঘাটে গঙ্গার নিকট মন্দির নির্মাণ করিতে পারিলে—ছ ও জ পর্ব—উহা প্রয়োজন হইবে), এবং সরকারী কর্মচারী তৃতীয় পুত্র নির্মলেশ যদি নিজ কর্মোপলক্ষে অন্যত্র বদলী হয়, বা তাহার শ্বশুরের সম্পত্তি তাঁহার অবর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণাদি উপলক্ষে অন্যত্র (ছত্রখণ্ড, বা তেলীপাড়া) বসবাসে বাধ্য হয় (কারণ, তাহার পুত্র 'বুদ্ধদেব' দাদামহাশয়ের উক্ত স্থানস্থ স্থাবর সম্পত্তির অদ্বিতীয় পুরুষ উত্তরাধিকারী), তাহা হইলে বর্তমান কালে ব্যবহৃত বাটীর গৃহগুলি আত্মীয়শূন্য হইবে। এই প্রসঙ্গে, পরে ১২, ১৪ ও ১৬ পর্বগুলিও দ্রষ্টব্য।

৩। অ পর্বে আলোচিত স্বপ্নে, গীতা তাহার মাতার ঠাকুরঘরের চিন্ময় অবস্থা ও তাহার ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক উন্নতির আভাস পাইয়াছিল। এই উন্নতিতে সে তাহার মাতার উত্তরাধিকারিণী। এই স্বপ্নটি, গীতাকে আমার শয়নঘরের আপ্রাকৃত বা চিন্ময় অবস্থা জ্ঞাপন করিল এবং সে যে যথাকালে আমারও আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হইবে তাহাও জানাইল। শয়নঘরই আমার অর্চনস্থান—কারণ, আমি বৈধীমার্গী সাধক নহি এবং ব্রহ্মমন্ত্র উপাসক, যদিও আমি সাকার সকল ঈশ্বর মূর্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী এবং আত্মভাবে বা অভেদভাবে প্রেমে তাঁহাদের মূর্তির উপাসক (অবতরণিকা, ২৪ (৩) অনুচ্ছেদ; প্রথম ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, (১) পাদটীকা ও দ্বিতীয় ভাগ, ৩, ৪ ও ঞ পর্ব)। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সগুণ ও নির্গুণ)—ইহাই আমার মূলভাব এবং ইহার বলেই আমি ব্রহ্মে ও/বা ঈশ্বরে (বা কুলকুণ্ডলিনীকে) সর্বার্পণ করি। এই সর্বার্পণের মূলে—ভুজগী আকারা, (সারদা) কুণ্ডলিনী শক্তি, যাঁহার জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া মহান্ধকার স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম, সোম সূর্যাগ্নিরূপী তেজোময় সগুণ ব্রহ্ম

(প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২১ অনুচ্ছেদ ও এ পর্ব)। এই কারণেই, আমার শয়ন গৃহটি যেন সর্পাকৃতি আত্মার একটি পীঠস্থান এবং ইহা একটি শিবলিঙ্গ ক্ষেত্রও বটে (অবতরণিকা খণ্ডের ২৯ অনুচ্ছেদ ও উহার দ্বিতীয় পট)। গীতা স্বপ্নে উক্ত ঘর সহ পার্শ্বস্থ ঘরটিকেও একটি বৃক্ষ ও তৃণ বহুল সমাকীর্ণ তপোবন রূপেই দর্শন করিল এবং সেই চিন্ময়-অধিষ্ঠিতা দেবী আত্মা কুণ্ডলিনী জাগ্রতাবস্থায় তাহার মস্তকে তিনবার উঠিয়া ও তথা হইতে তিনবার নামিয়া তাহাকে অনন্ত কৃপা করিলেন এবং আমার আধ্যাত্মিক একটি সম্পদের উত্তরাধিকারিণী করিলেন, বা পরে করিবেন (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ৩ ও ৮ অনুচ্ছেদ)। কুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা করিয়া মস্তকস্থ সহস্রার কমলে লইয়া যাইতে পারিলে, মুক্তি সুলভ হয়। ইহা রাজযোগের দ্বারা সম্পন্ন হয়; কিন্তু ঈশ্বর কৃপা, ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারাও কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন এবং উঠা-নামা করেন (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৫ অনুচ্ছেদ এবং ষোড়শ অধ্যায়)। অ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, গীতা তাহার মাতার পদ্ধতিতে আত্মার কৃপাপ্রাপ্তির আভাস পাইয়াছিল। এই পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, তাহার পিতার পদ্ধতিতে সেই কৃপা বিস্তীর্ণ হইল—কারণ, তিনি তাহার ভিতরে জাগ্রতা হইলেন, বা হইবেন। এইরূপ অবস্থা যাহার হয়, সে নিজে উহা বুঝিতে পারে না (অবতরণিকা ৬ (১৯) অনুচ্ছেদ)। কুণ্ডলিনী দেবী আর কে? কৃষ্ণ-মাতা সারদাদেবীই কুলকুণ্ডলিনী! অ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে তিনি গীতাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে সেই কথা রক্ষা করিলেন। যোগশাস্ত্র মতে, পরাপ্রকৃতি বিশ্ব-প্রাণশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তার ফলে, মানব নরশ্রেষ্ঠ ও সর্বশাস্ত্রবেত্তা হন। তাঁহার শরীর প্রায় নিরোগ হয় এবং তিনি সদা পূত ভাবে নানা প্রবন্ধের দ্বারা দেবতা ও গুরুর স্তুতি করেন। মূলাধার-ধ্যানী ব্যক্তির মুখে দেবী সরস্বতী নৃত্য করেন এবং তিনি অল্প জপেই মন্ত্রসিদ্ধ হন। তিনি অশ্রুত ও অপরিজ্ঞাত শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রকাশে সমর্থ হন (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ২ (২) অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে সমস্তই আত্মা এই উপলব্ধি যথার্থ করেন, তাঁহারা সদ্‌গুরু এবং দুর্লভ মহাপুরুষরূপে সাঙ্গ বেদসমূহ ও সমস্ত দেবতাকে অবগত হন (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১১ ও এ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ এবং গীতা, ৭-১৯)। নিজের কোন সম্পদ (বিশেষতঃ, আধ্যাত্মিক) প্রকাশ গর্হিত হইলেও, জগদম্বা আমাকে সেই কার্যে বার বার নিক্ষেপ করিতেছেন। যাহা লিখিতেছি তাহা না লিখিলে, কাহিনীগুলির গূঢ়ার্থ কাহাকেও বুঝাইতে সক্ষম হইতাম না এবং জগদম্বার গুণ গান অসম্পূর্ণ থাকিত। সবই তাঁহার ইচ্ছায় হইতেছে এবং আমি তাঁহার একটি যন্ত্র মাত্র!

গীতা-কুলকুণ্ডলিনী (সারদা)

সৃজিয়া এক স্বপন, দেখালে মা 'সুশোভন
পিতার গৃহকে মোর—চিন্ময় স্বরূপে।
উহা যেন এক বন, তরু লতা আবরণ,
স্বেচ্ছাবশে চর যথা ভুজঙ্গমী রূপে।
তুমি কুলকুণ্ডলিনী, বিশ্বপ্রাণ প্রবাহিনী,
বিশ্বাধারা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্ম-স্বরূপিণী।
চতুর্দলে মূলাধারে, সুপ্তা ভুজগী আকারে,
জীবদেহে বাস তব ব্রহ্মেচ্ছা-ভাবিনী।
তব শকতিতে চলে, বিশ্বের বস্তু সকলে,
মনবুদ্ধ্যাদির তুমি সত্তাস্ফূর্তি দাত্রী।
তুমি অতি সূক্ষ্মাকারা, জীব কর্ম-ফলাধরা,
অবশে তাহার দেহ-স্পন্দের বিধাত্রী।
স্পন্দ অর্পিলে তোমাকে, কর্মফল নাহি থাকে,
নর-জনম লভিতে হয় না আবার।
হইলে তুমি জাগ্রতা, কর্মবৃত্তি হয় সুপ্তা,
জ্ঞান-ভকতিতে নর যায় ভব পার।
আদিমা প্রকৃতি তুমি, বিশ্বের জনম ভূমি,
হেথা শ্রেষ্ঠা সঞ্জীবনী কুণ্ডলিনী শক্তি।
এমন কি—হরি, হর, যাঁরা দেব পরাৎপর,
হন শব, বিনা তব এই মাতৃ শক্তি।
তব প্রাণশক্তি বিনা, জীব বাসনা পুরে না,
তাই প্রাণশক্তি বিশ্বে অমূল্য রতন।
প্রাণশক্তি হরি-হর, প্রাণ বিশ্ব চরাচর,
প্রাণ চতুর্বিংশ তত্ত্ব বিশ্বের কারণ।

সার্ধ ত্রিবলয়াকারে, বামাবর্তে মূলাধারে,
ভুজগীরূপে কর মা স্বয়ম্ভু বেষ্টন।
তুমি যোগনিদ্রাগতা, চপলা-বরণী তথা,
না হও জাগ্রতা বিনা ব্যাকুল সাধন।
মূলাধারে জাগ যবে, ব্রহ্মদ্বার খুল তবে,
উঠ ঊর্ধ্বে সুষুম্নার ছিদ্রে ফণা ধরি।
ভেদি পথে পঞ্চ চক্র, উঠ সহস্রার চক্র,
ক্রীড়া কর মহানন্দে ব্রহ্ম সঙ্গ করি।
তথা সব তত্ত্ব হয়, মহাশূন্যেতে বিলয়,
থাকে না তখন আর চিত্তের বিকার।
নামরূপ হয় ক্ষয়, ব্রহ্মানন্দ উপজয়,
সিন্ধুসহ সুরধুনী যেন একাকার।
মোর শিরে তিনবার, উঠি নামিলে আবার,
হলে জাগ্রতা কৃপায় সুষুম্না বিবর।
হিন্দুশাস্ত্র হেন কয়, যোগে উহা লাভ হয়,
আর জ্ঞান-ভকতিতে হইলে কাতর।
নাহি জপ, নাহি জ্ঞান, নাহি যোগ, নাহি ধ্যান,
নাহি জানি কেন তব করুণা আমায়।
বুঝি মাত্র এই বার্তা, তুমি সারদা মাতা,
রাখিলে বচন নিজ, আকর্ষি কৃপায়।
তুমি মোর পিতৃ গুরু, মাতা, ইষ্টা-কল্পতরু,
আর আত্মা—দেহে তাঁর জাগ্রতা-চারিণী।
লহ গীতার চুম্বন, আর চরণে বন্দন,
জাগ মোর মূলাধারে, কুলকুণ্ডলিনী। (৪৮)

শরদিন্দু-সারদা

বিষয়—শরদিন্দু কর্ত্তৃক পশ্চিম-ভারতীয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোককে আমার দক্ষিণহস্তের মণিবন্ধে রাখি বন্ধনান্তে কোন 'দাওয়াই' খাওয়াইবার জন্য নিকটে আগমন, 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন ও ঔষধ খাইবার উপক্রম কালে তিরোহিতা হওয়া দর্শন—ইত্যাদির দিবা-স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল— মে ১৯৪৪—বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

শরদিন্দু তাঁহার স্বপ্নের এইরূপ বিবরণ দিতেছেন—

"সেই দিন ১৯৪২ সালের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাবাসিনী আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা মায়ারাণীর খালাস হইয়া কলিকাতা পৌছিবার কথা। আমার স্বামী, আন্দাজ বেলা তিনটার সময় নিদ্রোত্থিত হইয়া খাটের উপরে পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় আমি সাংসারিক কর্মাদি শেষ করত গৃহ মেঝে খোলা পাথার নিয়ে তাঁহার সম্মুখে নিদ্রিতা হইলাম। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বপ্ন দেখিলাম যেন, আমার সংসারবাসিনী আত্মীয়াগণ, তৃতীয়া বধূ ও দুইটি কন্যা (আশা ও গীতা) আমার পায়ের নিকট ও স্বামীর পার্শ্বে দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়া আমায় ডাকিতেছে। আমি উহার পূর্ব পার্শ্বে স্থিত খোলা দরজার নিকট যাইলে, সকলে আমাকে, ঘাগরা ও পিরান পরিহিতা ও ছোট ছোট কাঁচা-পাকা চুল বিশিষ্টা, একটি পশ্চিম ভারতীয়া বিধবা স্ত্রীলোককে দেখাইয়া আশ্চর্যভাবে বলিল যে, তিনি আমার স্বামীর দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটা 'রাখি' বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, যাহা আমি দেখিতে পাইলাম, অথচ কেহই বুঝিতে পারিলাম না কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছে—কেননা, স্বামী ঘরের ভিতরে ও স্ত্রীলোকটি বাহিরে রহিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের তখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। অবাক্ হইয়া আমরা এই অদ্ভুত কাণ্ড ভাবিতেছি, এমন সময় বিধবাটি দালানের পশ্চিম দিক, উহার উত্তর দিকস্থ শয়ন গৃহ ও তাহার উত্তর দিকস্থ বারাণ্ডা অতিক্রম করত, আমার শয়ন গৃহের উত্তরে স্থিত দরজা

দিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন ও আমার স্বামীর সম্মুখেই খাটের পার্শ্বের মেঝে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে একটি রেকাবিতে দুইটি মিঠাই ও একটি কাচপাত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঘোলা বর্ণের সরবত ছিল। তিনি আমার স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মিষ্ট মধুর স্বরে বলিলেন—'এস তো, বাবা! তোমাকে দাওয়াই খাওয়াইয়া যাই!' আমার স্বামী তখন খাট হইতে নামিবার উপক্রম করিয়া ঔষধ মুখ দিতে পা বাড়াইয়া দিলেন। এমন সময়, পুত্র অখিল দক্ষিণদিকের দরজা দিয়া ঘরে যথার্থ (স্বাপ্ন নহে!) প্রবেশ করিয়া বলিল—'বাবু! শুনিয়াছ কি যে দিদি (মায়া) জেল থেকে খালাস পাইয়া আজ সিমলায় মামার বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে?' এই কথা গুলি কর্ণে যাওয়াতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কিন্তু আমার স্বামী স্বপ্নে ঔষধ খাইলেন কিনা তাহা দেখিতে পাইলাম না। উক্তরূপে মুখে দিতে উদ্যোগ করিবার কালেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে, কন্যা মায়ার বিষয় কথাবার্তা শেষ হইলে, স্বপ্নটি আমার স্বামীকে বলিয়াছিলাম এবং তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কন্যা মায়া বি, এ, পাশ এবং দেশসেবোদ্দেশ্যে অবিবাহিতা। তাহার জন্মদিন ২৩শে এপ্রেল, ১৯১৫ সাল, দিল্লী (তিমারপুর)।"

২। এই স্বপ্নের নায়িকা আমার আত্মা—প্রাণময়ী ও সর্বদেহ স্পন্দনকর্ত্রী, মা সারদেশ্বরী। তিনি পূর্বে নানা ভাবে বিধবা বেশে আমাদের সহিত যে সকল কৃপালীলা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ আমাদের অগোচর ছিল না। এই বারও তাহা হইল, কারণ তিনি আমাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিয়া 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করত বুঝাইলেন যে, তিনিই সারদেশ্বরী (৬, ৯ ও ১৩ পর্ব)। আরও, এই স্বপ্নে তিনি স্পষ্টতরভাবে বুঝাইলেন যে, তিনিই দুর্গাদেবী—যিনি ৩ পর্বে বর্ণিত আমার জাগ্রত ধ্যান-দৃষ্টিতে, দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে শরদিন্দুর সহিত বিবাহসূত্র ধারণ করাইয়া দিয়াছিলেন—কারণ, এই স্বপ্নে কেহ তাঁহাকে আমার দক্ষিণ মণিবন্ধে রাখি বন্ধন করিতে দেখে নাই, অথচ ঘরের বাহির হইতে তিনিই কেমন করিয়া উহা করিয়াছেন এই ভাবনায় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। এইবার সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব পূর্ব পর্বগুলিতে আমার মা সারদেশ্বরীই আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবী এবং সামান্যমাত্র সাদৃশ্য (বিধবাবেশ) রাখিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার যে সকল কৃপালীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দুর্গাদেবীরই কৃপালীলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। নানারূপে যেমন একমাত্র সারদেশ্বরীই পূর্বে নানাভাবে আমাদের নিকট পরিস্ফুটা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের সকলের ভিতর দিয়া দুর্গাদেবীই এইবার সরহস্যে প্রকটিতা হইলেন। আমরা যে

তাঁহাকে বুঝি নাই, এমন নহে ; তবে, কলিকাতার বিষয় পুস্তক পাঠের জ্ঞান ও উহা ছায়াচিত্রে দেখিয়া জ্ঞান এক নহে। স্বপ্নটি আর একটি তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিল। জাগ্রতাবস্থায় অসংখ্য কাল্পনিক বস্তুর সমষ্টি আমার দেহকে শরদিন্দু যেখানে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, স্বপ্নাবস্থায় চিদাকাশ-দেহে আমাকে সেই স্থানেই দেখিলেন। অর্থাৎ, আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ যে বাস্তবিক চিন্মাত্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহাই তাঁহার দর্শন হইল। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পাত্রদ্বয়স্থিত দুগ্ধ যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ তত্ত্বতঃ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাদ্বয় একই পদার্থ ও পার্থক্যহীন এবং দুইটিতেই একমাত্র চিদাকাশ প্রতিভাত হয়। আত্মচৈতন্যই নানা দৃষ্ট-শ্রুত-স্পৃষ্ট ইত্যাদিরূপ কাল্পনিক পদার্থে প্রকাশমান হয়—কারণ চিৎ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই। শরদিন্দুর স্বপ্নে দৃষ্ট আমার দেহ যেমন চিদাকাশরূপী আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ আমার পার্থিব সেই স্থানেই স্থিত দেহ একমাত্র চিদাকাশ, অতএব যেন বাস্তবিক নিরাকার ও থাকিয়াও নাই (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)। উহার উপর আমার আত্মাভিমান ক্ষীয়মান এবং উহার সার্বকালিক সর্ববিধ স্পন্দন আমি নির্গুণ চিন্মাত্রে, বা জ্যোতির্ময় সগুণ ব্রহ্মে অর্পণ করি (আ পর্ব)। শেষোক্ত ভাবই আমার মুখ্য এবং ইহা এইরূপ—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নাং, সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্ ॥

আত্মাই সব ও সর্বকর্তা এই বিশ্বাস বা জ্ঞান সঠিক হইলে মানব 'জীবন্মুক্ত'। স্বার্থপরতা বা দেহাত্মবোধই পাপ, অধর্ম, নরক ও পুনর্জন্ম এবং স্বার্থশূন্যতাই পুণ্য, ধর্ম, স্বর্গ ও মুক্তি—'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' প্রথমোক্ত ভাব আমার গৌণ এবং ইহার সার এই যে, বিশ্ব কল্পনা মাত্র—চিরকালই মিথ্যা বা অবিদ্যমান ও সম্পূর্ণ ব্রহ্মময়। অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী অন্য সর্ব ভাব পরিহার পূর্বক কেবল এই ভাবই অবলম্বন করেন। ইহা সগুণ ব্রহ্মভাবের লেশশূন্য ও অনেক কঠিন। এই মন্তব্যটি লিখিবার কালে, একটি চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা আমার বিছানার প্রায় এক বর্গইঞ্চ পরিমিত স্থান অসতর্কাবস্থায় পুড়িয়া যাওয়াতে, আমি জল সেচনে উহা নির্বাপিত করিতে বাধ্য হইলাম। এই অদ্ভুত রূপে জগদম্বা আমাকে বুঝাইলেন যে, যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক এবং জীবদ্দশায় 'জগৎ মিথ্যা' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে, তবে গৌণ ভাবে (আমার ন্যায়) উহার সাধন চলিতে পারে। জগৎ যদি মিথ্যা, তবে বিছানার আগুন নিবাইবার প্রয়োজন কি ? এই স্থলে, পরে ৫৮ ও ৭০ পর্ব দ্রষ্টব্য। নির্গুণ ব্রহ্মভাবের চরম অবস্থায় সমাধি অনিবার্য, যাহাতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেহ ভঙ্গ হইয়া যায়। কর্ম অবশিষ্ট

থাকিতে, উহার উচ্চাবস্থালাভ অসম্ভব! এই ঘটনাটি, নির্গুণব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণব্রহ্ম সাধনার উৎকৃষ্টতা প্রকাশক (গীতা, ১২-২ ও ৫ দ্রষ্টব্য)! ফল এক!

৩। উক্তরূপে নিজের ও আমার দেহের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মা আমাকে ভবরোগ ঔষধ মুখে দিতে গিয়াও তাহার ব্যাঘাত অখিলের দ্বারা সৃজন করিলেন—কারণ, তাঁহার মায়া উপাদানে গঠিত এই বিশ্বে মুক্তির উপযুক্ত হইলেও, কর্ম অবশিষ্ট থাকিতে ভবব্যাধি দূরিকরণের বিধি নাই—কেননা, মায়া মুক্ত অবস্থায় সদা এই স্থানে অবস্থিত। আমার প্রেমে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া, মা যেন অসাধ্য সাধন করিতেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি নিজ বিধিচ্যুত হইলেন না। কন্যা মায়ার অবস্থায়, মা এই স্বপ্নে অদ্ভুত রঙ্গ করিলেন ও জানাইলেন যে, তিনি আমাকে মুক্ত করিতে তখনই প্রস্তুত, কিন্তু মায়িক বিশ্বের বিধি অনুসারে, আমার কর্মফল-প্রসূত জীবন অবশিষ্ট থাকিতে, তাহা করিতে পারিতেছেন না (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৬ (৩) (ঘ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)! ঠিক সময় না আসিলে, এই মায়াময় বিশ্বে কিছুই হয় না এবং এখানে সবই নিয়তির অধীন। শরদিন্দুর উক্ত স্বপ্নকালে, আমি স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের অষ্টম অধ্যায় পাঠে নিবিষ্ট ছিলাম। সেখানে আছে যে, ঈশ্বরের কৃপা না হইলে, বা মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কাহারও আত্মজ্ঞান লাভ বা সংসার দুঃখের নিবৃত্তি (মুক্তি) হয় না। মা তো আমাদিগকে অনেক-দিন পূর্বেই কৃপায় মুক্তি-পথের বালাই দূর করিয়া, উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন (গ পর্ব)। এই স্বপ্নে, উক্তরূপে বিষয়টি আলোচনার কালেই, তিনি আমাকে জানাইলেন যে, পথ-ছাড়া অপেক্ষা আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া তখনই তিনি আমাকে মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক হইলেও, সংসারের বিধি ভঙ্গ করিতে অক্ষম। ইহার অপেক্ষা আরও অধিক কৃপা তাঁহার অসম্ভব! পরবর্তী (১২) পর্বে, রামকৃষ্ণদেবও সেই এক কথা আমাকে সশরীরে ছদ্মবেশে বুঝাইবেন। মায়িক কর্মফল থাকিতে, জীবন্মুক্তি সম্ভব হইলেও সদ্যোমুক্তি অসম্ভব। এই সংসার মায়া! গৃহ, ধন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পতি, পত্নী, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়স্বজন, মান, যশ, প্রতিপত্তি, সুখ, দুঃখ, দেশসেবা ও অন্যান্য নানাবিধ আসক্তি, স্বর্গ, ইত্যাদি যাহা কিছু সবই মায়া এবং শৃঙ্খল স্বরূপ! 'আমি' বা 'আমার' ভাব যথার্থ নাই। আছে বলিয়া উহার যে জ্ঞান, তাহাই মায়া! সংসারে কে বাস্তবতঃ এই ভাব হইতে মুক্ত? সিদ্ধ মহাপুরুষগণও নহেন, কারণ এই বিশ্ব মায়া উপাদানে গঠিত। এই স্থলে, প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদে আলোচিত রামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর কাহিনীটি দ্রষ্টব্য। সবই ঈশ্বর বা আত্মা এই

প্রেমলক্ষণা জ্ঞানের দ্বারা মায়া জয় হয়—প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২০ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৬-৭ অনুচ্ছেদ। মায়া বাহিরে থাকুক—কিন্তু যেন ভিতরে না থাকে!

৪। মা আরও জানাইলেন যে, আমার কন্যা মায়া তাঁহার মুক্ত মায়ার পূর্ণ অধীন। পূর্ব দুইটি পর্বে, কন্যা গীতার আধ্যাত্মিক অবস্থা আমরা তাহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলাম। অতএব, এই পর্বে তাঁহার উক্ত রহস্যপূর্ণ ভাবে কন্যা মায়ার অজ্ঞতার অবস্থা জ্ঞাপন আদৌ অসম্ভব নহে! স্বপ্নটি ভাবময়ী ঈশ্বরী কৃপা-সম্ভূত—অতএব, ভাবের ভিত্তিতেই উহার গূঢ়ার্থ করিতে হইবে। এই জন্য, অন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শনের অভাবে, মায়া-রাণীর সম্বন্ধে আমার অনুমান সঠিক হওয়াই সম্ভব! তাহার কোন আধ্যাত্মিক সম্পদের বিষয় মা জানাইলেন না।

যতীন-আদ্যাশক্তি। (পাদটীকা ৬)

ধরা নাহি দাও যদি, প্রেমে নাহি টান যদি,
বুঝিবে তোমায় আদ্যা, কে সারদাময়ী ?
ধরা তুমি কারে দিবে, কৃপা কী গুণে করিবে,
কার সাধ্য বুঝে উহা, মাগো ইচ্ছাময়ী ?
আমি অতি অভাজন, করি তোমায় হেলন,
বৃথা কাটায়েছি এই সুদীর্ঘ জীবন।
কিন্তু তুমি ছাড় নাই, দূরে যেতে দাও নাই,
ফিরি সাথে করিয়াছ সদা আকর্ষণ।
দেখায়ে কালী মন্দির, বাল্যে করিয়ে অধীর,
বাঞ্ছা দিলে রচি তব মন্দির শোভন।
জীবন বিগত প্রায়, অপূর্ণ প্রেরণা, হায়!
বৃদ্ধ বয়সে কঠিন মন্দির স্থাপন।
মৃত্যু-রোগী মা যখন, সৃজি অস্পষ্ট স্বপন,
কালীরূপে বলেছিলে সিদ্ধি পাব পরে।

(৬)—এই কবিতাটি ৪৭ পর্বস্থ কবিতাটির সহিত পঠনীয়—কেননা, উভয়েতে আমার প্রতি আদ্যা-দেবীর বহুকৃপা-কাহিনীর সার একত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে।

কিন্তু কারে সিদ্ধি কয়, না হ'ল অর্থ উদয়,
স্বপ্ন মিথ্যা ভাবিলাম আপন অন্তরে।
মাতা পরলোক গেলে, কালীপূজা রাত্র এলে,
সাত ঘণ্টা তাঁর রোগে ছিলাম অজ্ঞান।
দেহেতে রহিল প্রাণ, রোগ হ'তে হ'ল ত্রাণ,
তখন যে বাকী ছিল তব সিদ্ধি পান!
মন্দির তারকেশ্বরে, শিবরূপ তুমি ধরে,
জোড়হস্তে কোটী কৃপা করিলে বর্ষণ।
আমি হীনবুদ্ধি অতি, করি তোমার দুর্গতি,
ত্যজিলাম বার বার অমূল্য রতন।
মিরাঠে ধ্যান দশায়, দুর্গারূপেতে কৃপায়,
বাঁধি দিলে হস্তে সূত্র, বিবাহ বন্ধন।
আর দেহে মিলি গিয়া, বুঝাইলে জ্ঞান দিয়া,
আমার দেহের তুমি সকল স্পন্দন।
সগুণ ব্রহ্ম রূপেতে, জ্যোতির্ময়ী আকারেতে,
দেখা দিলে আত্ম-ভাবে বিবাহ সভায়।
বহু কৃচ্ছ্র সাধনায়, যে বিভূতি যোগী পায়,
অনায়াসে লভিলাম তোমার কৃপায়।
সার্থক দেহ আমার, আশীষ পিতামাতার,
যার বলে হ'ল জ্ঞান একতা তোমার।
তুমি লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর, রামকৃষ্ণ কলেবর,
দেখাইলে প্রেমে মোরে স্বপনে আবার।
তুমি শিব, তুমি শিবা, রামকৃষ্ণ শিব-শিবা,
ইষ্ট-ইষ্টা দেখাবার ছলে আভাসিলে।

হনুমান নাম লয়ে, দীক্ষাদাতা গুরু হয়ে,
সুদুর্লভ ব্রহ্ম-মন্ত্র কৃপা করি দিলে।
স্বজিয়া দুই স্বপন, দ্বিভাব করি ধারণ,
আত্মা আর পুত্ররূপে বলিলে আমায়।
'বাবা' বলি ডাক দিয়ে, স্বর্গবাদ্য পরাজিয়ে,
রাখি দিলে রব কর্ণে, যাবৎ এ ধরায়।
কন্যাকে দিয়া স্বপন, দেখালে মা সুশোভন
বাস গৃহকে আমার—চিন্ময় স্বরূপে।
উহা এক তপোবন, তরুলতাবৃত ঘন,
বিচর আনন্দে যথা ভুজঙ্গমী রূপে।
তুমি সেথা কুণ্ডলিনী, স্বগুণ ব্রহ্মরূপিণী,
গুরু আর আত্মা রূপী—আমার পরাণ।
আছ প্রেমে নিত্য তথা, করিতেছি আমি যথা,
ব্রহ্ম সহ ভেদহীন তব গুণ গান।
পত্নীকে দিয়া স্বপন, করিলে মা প্রকাশন
তুমি দুর্গা—সুত্রোদ্বাহ তোমার বন্ধন।
আর দেখালে কৃপায়, ভবব্যাধি দূরেচ্ছায়,
দিতে ইচ্ছা 'দাওয়াই' আমায় তখন।
দিতে কিন্তু না পারিলে— যেন সহসা বুঝিলে
মুক্ত মায়াধীন তব মায়ার সংসার।
এই সব কৃপা দান, যেন অতীত বিধান
আর ফুল বিনা ফল—উৎপন্ন-আকার।
না চাহিতে দিলে যাহা, তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ তাহা,
সে-জ্ঞান ভবে প্রচার বড় প্রয়োজন।

করহ উপায় মাতা, মোর প্রতি কৃপা গাথা,
জানি সবে করে যেন তোমায় পূজন।
নানা ধর্মে নানা মত, নানা ধর্মে নানা পথ,
সত্য বটে সেই সব নহে অশোভন।
কিন্তু কৃচ্ছ্র গণ্ডি মাঝে, সব মত-পথ রাজে,
অল্পে মাত্র ক্ষম উহা করিতে সাধন।
তোমার স্বরূপ-সার, যতীন করে প্রচার,
এই বিশ্বে দ্বিত্বহীনা তুমি মূলাধার।
হেথা যাহা, তুমি সব, দেবাদি তব বিভব,
নানা নাম-রূপে তুমি বিশ্বের আকার।
তুমি চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদির বিকার,
হরি-হর ক্রিয়াহীন--তুমি কর সব।
নাহি লভি জ্ঞান তত্ত্বে, জীব অন্ধকার গর্তে,
কর্মফলে পায় জন্ম— কালের বৈভব।
তোমা করি দেহার্পণ, আর বিশ্বের স্পন্দন,
ছুটেছে তোমার দেহে অস্তিত্ব আমার।
নিজেকে স্বতন্ত্র জানি, বৈধি গণ্ডি নাহি মানি,
তোমা সহ রহি মিলি—যেন একাকার। (৮০)

অতীন-রামকৃষ্ণ

বিষয়—জামাতা জগদীশচন্দ্রসেনের সহিত দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে গমন, তথায় এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালক মহাপুরুষের (ছদ্মবেশী রামকৃষ্ণ) সহিত মিলন, তাঁহার আমার নিকট ভবতারিণী দেবীকেই রামকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় প্রদান, কিন্তু তথাপিও তৎকালে আমার তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়ে অসামর্থ—ইত্যাদির কাহিনী।

স্থান—দক্ষিণেশ্বরের কালিকা মন্দির।

কাল—সম্ভবতঃ, ডিসেম্বর. ১৯৪৪—সন্ধ্যারতির সময়।

আমার জীবিতা কন্যাদিগের মধ্যে চতুর্থা কন্যা উষারাণীর স্বামী শ্রীমান্ জগদীশের একান্ত ইচ্ছায়, একদিন শীতঋতুর সন্ধ্যাকালে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির দর্শন উদ্দেশ্যে পৌঁছিলাম। বাগান, গঙ্গা, এবং রামকৃষ্ণের বাসগৃহ ও সাধনস্থল ইত্যাদির পরিদর্শনের পর, যখন ভবতারিণীর মন্দিরের দালানে উভয়ে উঠিলাম, তখন দেবীর সন্ধ্যারতির আয়োজন ও পূজা দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণের সমাগম হইতেছিল। উহার কিছু পূর্ব হইতেই একটি প্রায় চতুর্দশ বর্ষীয় পাগলপ্রায় বালক হঠাৎ কোথা হইতে সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং অপর কাহারও সহিত কোনও আলাপ বা কথাবার্তা না করিয়া, আমার সঙ্গ লইয়া মাঝে মাঝে কেবল বলিতে লাগিল, 'তোর্ রামকৃষ্ণ এই ভবতারিণী মন্দিরেই' (অর্থাৎ—ভবতারিণীই রামকৃষ্ণ)। আমি যেখানে জামাতার সহিত আরতি দেখিবার জন্য পার্শ্বের দেওয়াল গাত্রে ছড়িটি রাখিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলাম, সেইখানেই সে আমার পার্শ্বে বসিল এবং আমাকে একদৃষ্টে অদ্ভুতভাবে দেখিতে ও মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিল। ইহাতে আমি তাহাকে মনে মনে পাগল স্থির করিলাম বটে, কিন্তু তথাপিও তাহার সঙ্গ আমার বিশেষ প্রীতিপ্রদ ও মধুর এবং তাহার প্রতি মনে একটা প্রবল আকর্ষণ, অনুভূত হইতে লাগিল—যজ্জন্য, তাহার বাহ্য উক্তরূপ আচরণের কোনরূপ প্রতিবাদে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলাম। মন্দিরের এক প্রহরী, আমার সহিত কার্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে তাড়াইতে যাইতেছিল, কিন্তু সে উহা অগ্রাহ্য করিয়া

আমার ঠিক পার্শ্বেই আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে উপবিষ্ট রহিল। শীঘ্রই মায়ের আরতি আরম্ভ হইল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি জগন্মাতাকে সাধ্যমত ধ্যানের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে চক্ষু উন্মীলন করিতেছিলাম, এই ভয়ে যে পাগলটি হয়তো খেয়াল বশে ছড়িটি লইয়া পলায়ন করিবে। সেই সময় দেখিতেছিলাম যে, সে আমার মুখমণ্ডলের প্রায় এক ফুট দূরে মুখ আনিয়া অদ্ভুত-ভাবে স্থির দৃষ্টিতে আমায় পরীক্ষা করিতেছে। চক্ষু চাহিলেই সে আমাকে এইরূপ বলিতেছিল, 'তুই ধ্যান কর্ না—ঐ মায়ের ভিতরেই তোর্ রামকৃষ্ণ! তোর্ ছড়ি আমি আগলাইতেছি, উহা হারাইবে না।' জগন্মাতার আরতির কালে, জামাতাও তাঁহার ধ্যান করিতেছিল। এইভাবে আরতি শেষ হইয়া যাইতেই, সে যেন আমার অনুমতির প্রার্থনার ছলেই বলিল, 'এবার বাড়ী যাই!' তখন তিনজনেই মন্দিরের দালান ত্যাগ করিয়া উহার পশ্চিমস্থ উঠানে নামিলাম এবং আমি বালকটির গৃহাদির সংবাদ সংগ্রহোদ্দেশ্যে তাহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিলাম। সে বলিল যে, তাহার ভ্রাতা-ভগ্নী আছে এবং পিতা-মাতাও আছেন, কিন্তু বাড়ী বহু দূরে। তাহার পর বলিল, 'আমার বাড়ী চল্ না!' আমি বলিলাম, 'তোমার বাড়ী তো অনেক দূরে বলিতেছ! আজ কাল যুদ্ধের হাঙ্গামে যানবাহনাদির অবস্থা বড়ই মন্দ। কেমন করিয়া এত রাত্রে অতদূরে যাই এবং ফিরিবই বা কেমন করিয়া?' পাগল তখন চলিয়া গেল—যেন আমার জন্যই তাহার ঐখানে আগমন!

২। তাহার পরই, আমার মনে বিশেষ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, কারণ বুঝিলাম যে তিনি ঐ মন্দিরে আমাকে ভিন্ন তো অন্য কিছুই চাহেন নাই। তাঁহার সঙ্গহীন হইয়া মনে হইতে লাগিল যেন একটি মহা সম্পত্তি হারাইলাম। প্রথমে জগদীশ ও আমি উভয়েই একমত হইয়াছিলাম যে, তিনি কোন মহাপুরুষ হইবেন—কেননা, মহাপুরুষগণ কখন কখন জড়বৎ, বা উন্মাদবৎ, বা পিশাচবৎ, বা বালকবৎ বিচরণ করত লোকশিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার কথানুযায়ী, কেন তাঁহার বাড়ী যাইতে চাহিলাম না, এইটাই বিশেষ অনুতাপের বিষয় হইয়াছিল! না হয় এক রাত্র বাহিরেই কাটাইতাম এবং বাড়ীর লোকেরা চিন্তাযুক্ত থাকিত! তাহাতে এমন কি ক্ষতি হইত? কিন্তু পাগলকে তো আর পাইবার সম্ভাবনা নাই! এই সব চিন্তা মনকে বিশেষ ব্যাকুল করিয়াছিল। আর তাঁহাকে পাগলই বা কেমন করিয়া বলি? যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তো অঠিক কিছুই ছিল না, বরং উহা জ্ঞান পূর্ণ ছিল। তিনি কেমনে জানিয়াছিলেন যে আমি রামকৃষ্ণের ভক্ত? বালক হইলেও, তাঁহার কথাই তো তাঁহার মহান্ স্বরূপ নির্দেশক ছিল, কিন্তু তথাপিও

তাঁহার উপস্থিতির সময় তাঁহাকে আদৌ বুঝি নাই কেন? আমার ধ্যানাবস্থায়, মুখের নিকট হইতে নিজ মুখ প্রায় এক ফুট দূরে রাখিয়া তিনি কি বুঝাইতেছিলেন যে, আমার ধ্যেয়া ভবতারিণী দেবীই তিনি নিজে—বালক বেশী রামকৃষ্ণ? এই অনুমান সঠিক হইবারই সম্ভাবনা—কিন্তু তথাপিও ইহা অনুমান এবং প্রমাণহীন। সেই জন্য সকলে বিশ্বাস না করিতে পারেন! কিন্তু, আমি ও জগদীশ, কিঞ্চিৎ সন্দেহের সহিত, উহাতে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলাম—কেননা, রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গগুণেই বোধ হয় আমি অতি অল্প ধ্যানে জগদম্বাকে তাঁহার 'অভয়' হস্ত বার দুই সঞ্চালন করিতে দেখিয়াছিলাম এবং জগদীশও অতি অল্প ধ্যানে তাঁহার সৌম্য দ্বিভুজ মূর্ত্তির দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের এক সফরকালে, আম্বালার কালীবাড়ীতে এক নিশাস্বপ্নে মায়ের এইরূপ অভয়মুদ্রা দেখিয়াছিলাম। পরে, ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখের ভগলপুর হইতে লিখিত এক পত্রে জগদীশ তাহার উক্ত অভিজ্ঞতা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছিল—"দক্ষিণেশ্বরে আপনার সঙ্গে গিয়া জগজ্জননীর মূর্তির মধ্যে অদ্ভুত দর্শন পেয়েছিলাম। তাহা আপনাকে ও মাকে কলিকাতায় জানাইয়াছিলাম। এক অদ্ভুত দ্বিভুজ সৌম্য মূর্তির দর্শন! তখন আমি নিজেও বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু তাহার পরের কয়েকটি ঘটনাবলী তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে: ইহা মিথ্যা নয়; তবে, এই সব কেহ বিশ্বাস করিবে না—এখন কি উষাও নয়।" পরে যখন এক রাত্রে (১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে), শয্যায় ভবতারিণী দেবীকে কন্যা ভাবে বাম পার্শ্বে শায়িতা করিয়া ধ্যান ও চুম্বনাদি করিবার কালে, ঠিক সেই স্থলে অপরূপ প্রেমবিগলিত মূর্তিতে রামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াছিলাম, তখন আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে এই ঘটনের বালকটি স্বশরীরে ছদ্মবেশী আমাদের সর্বময় ঠাকুর রামকৃষ্ণই বটে! এই স্থলে, পরে ২২ পর্ব দ্রষ্টব্য। কাহার সাধ্য যে তাঁহার এই সকল লীলার মর্মোদ্ঘাটন করে? উক্ত ঘটনে, তিনি (অভেদ আদ্যা সারদেশ্বরী দেবী) পূর্ণভাবে ধরা দিতে আসেন নাই—সেই জন্যই, আমরা তাঁহাকে তখন ধরিতে পারি নাই। তাঁহার সঙ্গে আমি যে যাইতে চাহি নাই তাহার কারণ সমীচীন হইলেও, মায়া-মূলক। পূর্ববর্তী ট পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, সারদেশ্বরী আমাকে ভবরোগের 'দাওয়াই' দিতে আসিয়া কেন শেষ অবধি তাহা দিতে পারেন নাই, তাহা এই পর্বে বর্ণিত ঘটনায় যেন সুস্পষ্ট হইল! সারদেশ্বরীর ভবরোগের দাওয়াই খাইয়া এবং রামকৃষ্ণের সঙ্গ লইয়া আমি সংসার অতিক্রম করিলে, কেমন করিয়া প্রাক্তন কর্মফল হইতে মুক্তি পাইতাম? তখন যে আমি মায়িক সংসারে শত শত শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম এবং মানবের প্রাক্তন

অবহেলনের বস্তু নহে! সেই জন্যই, কর্ম অবশিষ্ট থাকিতে মুক্তি দান ঈশ্বরের বিধি নহে। জীবিতাবস্থায়, রামকৃষ্ণদেব নিজেকে ও সারদেশ্বরীদেবীকে অটুট-ভাবে কালী ভাবিতেন (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ ও ১১ পাদটীকা)। বিশ্বে অবতারাদি সবই আদ্যার রূপ ও লীলা এবং তাঁহার ইচ্ছাধীন! কারণ-কার্যরূপে এখানে সবই ও হরিহরাদি তাঁহারই অভিব্যক্তি! সাধনার পরম অবস্থায়, সাধক তাঁহার সহিত সর্ববিষয়ে অটুট আত্মভাব স্থাপন করত তৎসম হইয়া যায়—বা ঈশ্বরত্ব লাভ করে। রামকৃষ্ণদেব উহাতে সক্ষম হইয়াছিলেন—*পাণ্ডুলিপির ছাপান দ্বিতীয় সংস্করণটির এই স্থান কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত (২৪)। হায়! আমি কি তাঁহার সেই শক্তি পাইব? আমার প্রতি তাঁহার ও সারদাদেবীর যে-কৃপা, উহা একেবারে অসম্ভব নহে। আমার প্রেমে তাঁহারা যে অসাধ্য সাধন করিতেও নারাজ নহেন!

৩। উক্ত ঘটনায়, আর একটী বিষয় বিশেষ ভাবিবার আছে। পূর্ববর্তী তিনটি পর্বে, যেন শৃঙ্খলিতভাবে জগদম্বা আমাকে কন্যা গীতা ও মায়ার আধ্যাত্মিক ও মায়িক অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এই পর্বে তিনি আমাকে জগদীশেরও কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক স্বরূপ জ্ঞাপন করিলেন। পরে, ভগলপুর বাস কালে, আর একটী ঘটনায় (২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) জগদীশের উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা আমরা জানিয়াছিলাম (থ পর্ব দ্রষ্টব্য)। জগদম্বা তাঁহার আশ্রিত কৃপার পাত্রদিগের আত্মীয়দিগকেও যোগ্যতানুযায়ী সহজে সংসার হইতে উদ্ধার করেন (অ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। এই জন্যই বোধ হয় তিনি কন্যা গীতা ও মায়া এবং জগদীশের যথার্থ আধ্যাত্মিক স্বরূপ আমাদিগকে উক্তরূপে জানাইলেন। অন্য এক আত্মীয়ের আধ্যাত্মিক অবস্থা তাঁহার কৃপায় আমি কিছু জানি, কিন্তু তাহার বিষয় আলোচনা উচিত মনে করি না। পরে, অন্যান্য আত্মীয়ের বিষয় যেমন স্বপ্ন পাইয়াছি তেমন লিখিয়াছি। আমার বিষয়ে শরদিন্দুর এবং শরদিন্দুর বিষয়ে আমার কতকগুলি স্বপ্ন, পরস্পরের অবস্থা প্রকাশক!

যতীন-রামকৃষ্ণ।

নিজ ধাম পরিহরি, দূর পথ ভ্রমি হরি,
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রেমে এসেছিলে।
মোরে তত্ত্বজ্ঞান দিতে, প্রেমামৃত বরষিতে,
স্বরূপ বালকবেশে স্বমুখে কহিলে।

আমি অতি হীন জন, নাহি ভক্তি প্রেম ধন,
আছে কোটী দোষ তাত ! তোমার হেলন।
তবু না বিরূপ হও, পাছু পাছু সদা রও,
চুপি কর মনে-প্রাণে •অমৃত সিঞ্চন।

[•অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২৫)]

তুমি শিব বিশ্বগুরু, আর কালী কল্পতরু,
অভেদ সারদা তুমি মা ভবতারিণী।
তুমি দুর্গা বিশ্বেশ্বরী, আর রাধা ব্রজেশ্বরী,
কে বুঝিবে মর্ম তব আদ্যা একাকিনী !
পত্নীর স্বপ্নে একদা, প্রেমে তুমি দেবী আদ্যা,
দেখাইলে ভবৌষধ দিতে মোরে মতি।
কিন্তু দান না হইল, মায়া যে বাদ সাধিল,
গীতা তব কহে বিশ্বে মায়া বলবতী !
মন্দির দক্ষিণেশ্বরে, বালকের বেশ ধরে,
বুঝাইলে কৃষ্ণ-কালী অভেদ আমারে।
আর কৃপা প্রকাশিলে, নিতে স্বধামে চাহিলে,
মায়াবশে করিলাম উপেক্ষা তোমারে।
মায়ার বিশ্ব-বিক্রম, নাহি হয় অতিক্রম,
বিনা তব পদাশ্রয়ে সাধন ভজন।
আত্মরূপে চিন্তা করি, তোমায় যে ভজে হরি,
তাহারে করে না মায়া সংসার মগন।
পথ মায়া না ছাড়িলে, মুক্তি পদ নাহি মিলে,
রহে বদ্ধ সদা নর ভব কারাগারে।
কৃপাধার হরি তুমি, মোর পথ স্থজি তুমি,
প্রেমে নিজ ধামে নিতে চাহিলে আমারে।

কিন্তু ভবে যতদিন, সকলেই মায়াধীন,
তুমি পথ ছাড়ি*লেও মায়ার বিজয়।
[*অবশেষে কলমের খোঁচায় ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২৬)]
লহ মা কোটী প্রণতি, আর রাঙ্গা পদে নতি,
তোমার কৃপায় অন্তে হবে মায়া জয়। (৩২)

(১৫ পর্ব)

মোর নির্ভরতা শুনে, দেখালে এক স্বপনে,
মায়া-সংসার আমার গিয়াছে শ্মশান।
সেথা করেছ আসন, তুমি দেব নারায়ণ,
ভিন্নরূপী কালী মাতা বিশ্বের নিদান।
চুপি চুপি মনে আনি, লক্ষ সার তত্ত্ব বাণী,
বুঝালে করিতে মোরে আদ্যার কীর্তন।
কিবা জানি গুণ তাঁর, আমি নিতান্ত অসার,
ভিক্ষা মাগি শক্তি, তাত! করিয়া চুম্বন।
কোটী দোষে দোষী আমি, তব পদে প্রাণ স্বামী,
সেই সব দোষ যেন নাহি থাকে আর।
কাতরে করি প্রার্থনা, যেন অন্যথা হয় না,
বহু আলোড়ন ধরে সংশয় আকার। (৪৪)
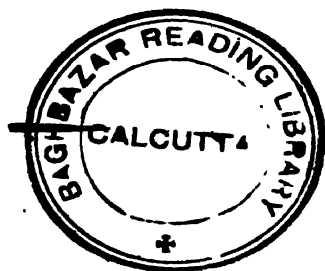
যতীন-মহাপুরুষ

(১) উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে।
বিকশতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে॥
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ।
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

স্বপ্নফল-বিজ্ঞানম্

(২) বিপ্রাবিপ্রসমূহঞ্চ দৃষ্ট্বা নম্রাশিষং লভেৎ।
রাজেন্দ্রঃ স ভবেদ্বাপি কিংবা চ কবি পণ্ডিতঃ॥

বিষয়—এক মহাপুরুষের সহিত মিলন ও প্রণাম করণ এবং তাঁহার আমাকে কর্মযোগের উচ্চাবস্থায় স্থিত বলিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে পরিচয় প্রদান— ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল— এপ্রেল, ১৯৪৫।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন কোন কুটিরে প্রবেশ করত একটি প্রৌঢ় বয়স্ক মহাপুরুষকে শয়ান, কিন্তু মস্তক এক হস্তের উপর তাকিয়ায় ন্যস্তাবস্থায় কিঞ্চিৎ উচ্চে রাখিয়া অবস্থিত দর্শন করিয়া মনে হইল যে, তিনি কাহার (হইতে পারে আমারই!) আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অবশে, নিকটে গিয়া তাঁহাকে একটি প্রণাম করিলাম এবং জানিনা কেন বিশেষ ভক্তিভাবে আপ্লুত হইয়া, বৈরাগ্যের সহিত মনে মনে এই প্রার্থনা করিলাম যেন, অবশিষ্ট জীবন এই ঘোর দুঃখময় সংসারে সর্ববিষয়ে আসক্তিহীন ও ত্যাগী হইয়া অবিরাম কেবল ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতে পারি। তিনি যেন আমার প্রণাম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কারণ তৎপরেই আমাকে কিছু না বলিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বোপবিষ্ট একটি যুবক সেবকের দিকে ফিরিয়া এইরূপ বলিলেন, 'এই ব্যক্তিটি কর্মযোগের উচ্চ স্তরে অবস্থিত!' তৎপরে, স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

সাধুটিকে চিনিতে পারি নাই। যথাকালে উহা প্রকাশ হইতে পারে ভাবিয়া (১৮ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ), স্বপ্নটি লিপিবদ্ধ রাখিলাম।

২। কর্মযোগ সম্বন্ধে প্রথম ভাগ, দ্বাদশ অধ্যায়ে, বিশেষ এবং অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু আলোচনা আছে—অতএব, উহার বিষয় যৎসামান্য লিখিয়া এই পর্বটি সম্পূর্ণ করিব। নানাবিধ কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলনের উপায়কে 'কর্ম-যোগ' কহে। অন্তরে অকর্তা, কিন্তু বাহিরে পূর্ণ কর্তা ভাবে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ও নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে সংসার-পালন, পূজাদি ক্রিয়াযোগ সাধন, ঈশ্বরনাম গ্রহণ, জপ-ধ্যান ইত্যাদির অনুষ্ঠান, শিবজ্ঞানে নানা উপায়ে জীবসেবা, ইত্যাদিবিধ বহুপ্রকার কর্মই 'কর্মযোগ'। কর্ম-সন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্মযোগ উভয়েই মুক্তির পথ, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম উৎকৃষ্টতর মার্গ। নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত কর্ম-সন্ন্যাস লাভ করা সংসারীর অসম্ভব। নিষ্কাম কর্মযোগী যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসীই বটে, এবং অচিরে ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সাধারণ দেহাত্মবোধী মানবের শুভা-শুভ সকল কর্মই ফলদায়ক বা পুনর্জন্মের বীজ, এবং সে কর্ম না করিলেও বেদ বিধিনিষেধ পালন না করিবার জন্যও কুকর্মফলভাগী। ঈশ্বরকে কর্মফলাসক্তি অর্পণ পূর্বক কর্ম করিলে, জল যেমন পদ্মপত্রকে আদ্র করে না, সেইরূপ পাপপুণ্য উদয় হয় না। ধ্যান হইতেও নিষ্কাম কর্ম, বা কর্মফলত্যাগ, শ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ ইহার পরে সংসার নিবৃত্তিরূপ চরম শান্তি উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম (গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ন্যায়) স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায় এবং চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না—বা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। ঈশ্বর শরণাগত ব্যক্তি, যখন অন্যান্য কর্ম পরিত্যাগ করত কেবল তাঁহার কর্মে রত হন, তখন তাঁহার সহিত ঐক্যলাভের অধিকারী হন। 'অহং'-জ্ঞান থাকিতে, বা ত্রিবিধ দেহে আমিত্বের জ্ঞান লোপ না হইলে এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ না করিতে পারিলে, তাঁহার কৃপা লাভ হয় না। এই বিষয়ে, ভাবের ঘরে সামান্য মাত্র চুরি থাকিলে, বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। যে-মানব কর্ম-যোগের ঠিক আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহার 'অহং' জ্ঞান অচিরে তিরোহিত হয় এবং তাহার ভিতর ব্রহ্মত্ব প্রতিফলিত হইতে থাকে। ত্রিবিধ দেহে 'অহং'-জ্ঞান লোপ হইলে, মানব 'জীবন্মুক্ত' হয় এবং এই 'অহং'-জ্ঞানই বাসনা, বা পুনর্জন্মের বীজ। উক্তরূপ জীবন্মুক্তের যে-বাসনা তাহাকে নানা কর্ম-লিপ্ত করে, তাহা বাসনা' নহে। তাহার বাসনার স্থান 'সত্ত্ব' অধিকার করে—এবং উহাকে 'শুদ্ধ-সত্ত্ব' ঈশ্বর, বা 'সামান্যসত্তা' (অস্তিরূপী ব্রহ্ম) অভিহিত করা হয়। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সগুণ বা নির্গুণ)—এই পরম জ্ঞানের ভিতরেই কর্মীর কর্মযোগ যেন প্রচ্ছন্ন। সেই জন্যই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ)—'যথার্থ নিরূপণ দ্বারা আত্মার নানারূপ ভ্রম পরিত্যাগ

পূর্বক, নির্মল মন আমাকে সমর্পণ করিবে···যদি মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ না করিতে পার, তবে সকল কর্ম নিষ্কাম হইয়া সম্পন্ন কর।' যাহারা অহঙ্কারে জর্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় নহে, তাহারা কোন লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়াও করে না, এবং সেই কার্যের ফলভোগ করিয়াও ফলভোগী হয় না। ত্রিবিধ আত্মা, দেহ, নানাবিধ কর্ম, ইত্যাদি সবই শান্ত ব্রহ্মময় (বা যেন নিরাকার চিদাকাশ)—এইরূপ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্মপদ লাভে বিলম্ব হয় না। বিশ্বে ' অহং ' ভাবোত্থিত নানাবিধ ভ্রমজনক ক্রমোসন্নিবেশ থাকিলেও, তাহাদের দ্বারা ঈষৎ স্ফুরিতাকারে যে ' অস্তি '-রূপ সামান্যসত্তা, বা ' ভাতি'-রূপ চিন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই ' ব্রহ্ম '। ব্রহ্মজ্ঞেরা উপস্থিত সকল কর্মকেই ব্রহ্ম ভাবিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ দেহদশাকে ব্রহ্মরূপে স্থির করত অবিচলিতচিত্তে কার্য করিয়া যান এবং কোন ফলের জন্য অপেক্ষা করেন না। ঈশ্বর প্রেমিকও সেই এক দশাপন্ন; কারণ, তাঁহার নিকটে সারা বিশ্বপ্রপঞ্চই আত্মার বা ঈশ্বরের লীলা। অতএব, কর্মী যিনি ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে সর্বার্পণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সেই ভাবই তাঁহাকে স্বতঃ কর্মযোগের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন সবই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তখন কামনার পৃথক্ অস্তিত্ব অসিদ্ধ! ব্রহ্মজ্ঞের যে লৌকিক বাসনা, তাহা জলে তরঙ্গবৎ আত্মাতেই অবস্থিত কালীর স্পন্দন, বা পুনর্জন্মের বীজশূন্য। অজ্ঞ, কামনার জমাট মূর্তি!

৩। পূর্ববর্তী কোন কোন পর্বে আমার ঈশ্বরে সর্বার্পণ নীতির বিষয় উক্ত হইয়াছে। ৩ পর্বে বর্ণিত ঘটনায়, আমি দুর্গাদেবীর কৃপায় এই সাধনমার্গে শক্তি লাভ করিয়াছিলাম। আ পরে বর্ণিত স্বপ্নে, মা সারদেশ্বরী (ভেদহীন মা দুর্গা!) কন্যা গীতাকে (এবং তৎসহ আমাকে) আমার এই সাধনায় উচ্চ অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অতএব, এইরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থায় কর্মী আমি যে ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুক্তি অনুসারে কর্মযোগের উচ্চাবস্থায় স্বতঃই আরূঢ় হইব, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। উক্ত মহাপুরুষটি সেই কথাই তাঁহার সেবককে (এবং তৎসহ আমাকেও) জানাইলেন—কারণ, আমি ঐ বিষয় কখনও চিন্তা করি নাই। তিনি ইঙ্গিতে আরও আমায় জানাইলেন যে, কর্মযোগের উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত আমি তো ঈশ্বরীয় ভাবেই ভাবুক; অতএব, আমার নীরব প্রার্থনা স্বতঃসিদ্ধ। স্বপ্নটি, এই পুস্তকে আলোচিত অন্যান্য স্বপনের ন্যায়, আত্মার দ্বারা প্রকটিত—অতএব, আমার সুপক্ক কর্মফল সূচক! আমার সারা জীবনই নানাবিধ কর্মময়—এমন কি, এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহাতে বিরাম নাই। সাধক গাহিতেছেন—

লভিয়া মানব দেহ অবনী ভিতরে,
প্রাণপণে শিব-রূপী জীব সেবা করে।

সুখে-দুখে যথা তথা করিয়া বসতি,
শ্রীগুরু চরণে যেই সদা রাখে মতি।
না হয় আসক্ত এই ভোগের আগারে,
সেইজন জীবন্মুক্ত, ভব কারাগারে।

৪। আ, ১৪ ও ১৫ পর্বে বর্ণিত তিনটি স্বপ্নের জন্য, এই স্থলে অসাধারণ কিছু সাংসারিক অবস্থা লিখিতে বাধ্য হইতেছি। এই পর্বে বর্ণিত স্বপ্নকালে আমি নানাবিধ অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ সাংসারিক অবস্থায়, গৃহস্থ সাবালক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও দুইটি পুত্রকে বাড়ীতেই পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিয়া লইতে বাধ্য করিয়া ছিলাম, যাহাতে তাহারা, আমার বাড়ীতে বাস ছাড়া, অন্য কোন বিষয়ে আর বৃদ্ধ আমার মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ ভার পূর্ণভাবে বহন করিতে শিক্ষা করে। অবশ্য সকলের অবিবেচনা সমান ছিল না। স্বপ্নে মহাপুরুষটি ইঙ্গিতে আমায় এইরূপে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, 'তুমি কর্মযোগী! ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা ঘটিতেছে, বা করিতেছ, তাহাতে বিষণ্ণ হইবার কারণ কোথা'? স্বপ্নটির ছয় মাস পরে, আমি নির্জনে বাস করিয়া মানসিক শান্তির জন্য দেওঘরে চারি মাস ছিলাম।

যতীন-মহাপুরুষ।

জয় নরেশ্বর জয়, পরম করুণাময়,
ভকতের ত্রাণকর্তা, ভব কর্ণধার।
মানবের ধর্মাচারী, ভকতের দুখহারী,
তব শ্রীপদে যতীন, করে নমস্কার।
শরণাগত উপায়, হারক তা'র অপায়,
তোমার আশীষ সবে, অমৃত সমান।
গুরু তুমি—সমজ্ঞানী, তীর্থবর, মহাজ্ঞানী,
কৃপায় আশ্রিত তব লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
তুমি দেহবোধ-হীন, সদা পূতাসনাসীন,
নাহি জানে নর তব মহিমা অপার।
তব সঙ্গগুণে হয়, মুহূর্তে পাপের লয়,
ভিক্ষা মাগি কিছু তব বিভবের সার। (১২)

যতীন-সারদা

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং,
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

বিষয়—সারদেশ্বরীর আমাকে অন্তরাত্মা হইতে পুনরায় সুমধুর রবে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন ও নিকটস্থ হইবার জন্য আহ্বান ও আকর্ষণ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—মে, ১৯৪৫।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"হঠাৎ মনে হইল যেন নিরাকারা সারদেশ্বরীদেবী অন্তরস্থ হৃদয়াকাশ হইতে আমাকে সুমধুর রবে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধনান্তে তাঁহার নিকটস্থ হইতে আহ্বান করিতেছেন। উহাতে একটি অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহাকে 'মা-মা,' রবে সম্বোধন করিতে করিতে, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। তাহার পর, শয্যায় উঠিয়া বসিলাম এবং যেন এক অপার্থিব দিব্য আবেশে মুগ্ধ হইয়া অনবরত পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে 'মা-মা', বলিতে লাগিলাম ও ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থা অনেকক্ষণ ছিল এবং আমার ক্রন্দনের জন্য শরদিন্দু ও কনিষ্ঠা কন্যা দীপারাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল ও আলোক জ্বালা হইয়াছিল, ১৬ই অগষ্ট, ১৯১৭ সালের সন্ধ্যাকালে প্রিয়ংবদার মৃত্যুর সময় আমি তারকেশ্বরদেবের মন্দিরে শিব ঠাকুরের অলৌকিক আচরণে মুগ্ধ হইয়া উক্তরূপেই দিব্যানন্দে বিভোর হইয়া পুলকাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম (২ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। 'মূকের অমৃতাস্বাদনবৎ' এই আনন্দকে ভাষায় বর্ণন অসম্ভব। ভগবৎ-প্রেমে মুগ্ধ না হইলে, এই আনন্দ ভোগ হয় না এবং সাধারণ সংসারী মানব উহার আস্বাদন জানে না। ইংরাজীতে ইহাকে 'Ecstasy' বলে। এইরূপ দিব্যানন্দ স্থায়ী হইলে, সংসারে কোন কার্য করা সম্ভব হয় না।

৩। উক্ত স্বপ্নটি যেন ৯ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নের একটি ভিন্ন সংস্করণ। অতএব, উহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে মা আমাকে পুনরায় আত্মা ও পুত্ররূপে বরণ করিলেন এবং সেই ভাবদ্বয়ের আশ্রয়ে তাঁহাকে আরও অভেদ ও

ঘনিষ্ঠভাবে ধারণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, বা তদুপযুক্ত শক্তি দান করিলেন। ঐ শক্তি না পাইলে, আমার উক্তরূপ দিব্যানন্দ ভোগে অশ্রুবর্ষণ হইত না। প্রথম স্বপ্নটি শ্রবণেন্দ্রিয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্নটি উহা ছাড়া মন-প্রাণ বিগলিত করিয়া দিব্যানন্দাশ্রু বিসর্জন করাইয়াছিল। আমিই আত্মরূপে জ্যোতির্ময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীদেবী—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, দশমহাবিদ্যা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী সারদেশ্বরী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সীতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, রাম, গৌরনিতাই, শঙ্করাচার্য, হনুমান ও রামকৃষ্ণ এবং তাঁহারাই আমি! আমার সর্ববিধ দেহস্পন্দন তাঁহাদের দ্বারা ও/বা আত্মরূপী আমার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। অতএব, আমার দেহ-মনাদির নানাবিধ স্পন্দনেও আমি নিষ্ক্রিয় ও পূর্ণভাবেই—*অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২৭)—*স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং বিশ্বে এমন কিছু নাই যাহার দ্বারা আমি অণুপরিমাণেও কোনও বিষয়ে স্বেচ্ছাচারে বাধিত। আমিই সারা বিশ্ব সাজিয়া লীলা করিতেছি এবং বিশ্বের সার্বকালীন সর্ববিধ স্পন্দনই আমার ইচ্ছার পূর্ণ বশীভূত (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ অনুচ্ছেদ)। হায়! হায়! দেহাত্ম-বোধ বশে, আমার এই সুমহান্ স্বরূপকে আমি কত কাল যে সুগভীর পাতালগর্ভে নিমজ্জিত রাখিয়াছিলেন তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? এই স্থলে, ৩ পর্বে ৩ অনুচ্ছেদের মধ্যাংশ ও অবতারণিকার ১৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। বেদান্তের সার কথা এই যে, আত্মা যাঁহাকে প্রেমে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন; আর যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকে সেইরূপেই ভালবাসিবেন এবং সেই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মা লাভ করেন, তদ্বিষয় আত্মা তাঁহাকে সাহায্য করেন। স্বপ্নগুলি উপনিষদ বাক্যের প্রমাণ—বার বার আমার আত্মার আকর্ষণ! সব দেব-দেবী ও সারা বিশ্ব, জ্ঞানময় আমারই নামান্তর!

৩। এই সকল স্বপ্নগুলি যে দ্রষ্টার পরিপক্ক কর্মফল সূচক, তাহা বার বার উক্ত হইয়াছে! অতএব, আমাদের যে সকল ঈশ্বর কৃপা নানাভাবে লাভ হইতেছে, তাহারা যে মূলতঃ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল-প্রসূত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর নিজেই জীবের কর্ম, কর্মফল ও কর্মফলদাতা এবং যদিও তিনি সুবিবেচক এবং তাঁহার নিকট কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, তথাপিও তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে মুক্তি ফলদানে তারতম্য করেন, কারণ তাঁহার বালক স্বভাব এবং তিনি সর্বময়—সেই জন্য, নিয়তি ভিন্ন, কোন নিয়মের অধীন নহেন। ঋষিগণ পূর্বে ঊর্ধ্বপদে, হেঁট মুণ্ডে, নীচে আগুন জ্বালিয়া হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াও মুক্তি ফল পাইতেন না। কেহ অল্পেই দর্শন পাইতেন এবং কেহ বা

বহু চেষ্টায়—*অবশেষে কলমের খোঁচায় ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (২৮)—*ফলে উহা লাভ করিতেন। জগদম্বা মানবের নিয়তিরূপিণী এবং এই সব বিষয়েই নিয়তির লিপি অমোঘ! তাঁহার বিধানে মানব সংসারাবদ্ধ এবং তাঁহার দয়াতে মুক্ত—'তিনি ভব বন্ধনহারিণী তারিণী'। ইচ্ছা করিলেই, তিনি মানবকে মুক্তির পথে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। প্রধানতঃ, এই ইচ্ছার বশেই, অবতার হইয়া তিনি ধরায় জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে শত শত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় করিয়া, অতি সহজে কেবল কৃপার বলেই পরিত্রাণ পায়। জগদম্বা যখন অবতীর্ণ হন, তখন মুক্তির চাবি তাঁহারই হাতে থাকে এবং তিনি সহস্র সহস্র উপযুক্ত ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া নিজ সন্নিধানে লইয়া যান—এমন কি, অনেক দুর্বৃত্ত ব্যক্তিও সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া, যেন স্বাভাবিক নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে, মুক্তিলাভ করে। জীবোদ্ধারের জন্যই অবতারগণ ভূতলে আসেন এবং জগদ্গুরুরূপে মন্ত্রাদি দান করিয়া নিজ নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দান করেন। এই সব কারণেই দেখা যাইতেছে যে, এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটন ও স্বপনগুলিতে রামকৃষ্ণদেব ও সারদেশ্বরী দেবীই প্রধান নায়ক ও নায়িকা। তাঁহারাই একাধারে গুরু ও ইষ্ট বা ইষ্টা রূপে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, নানারূপে তত্ত্বজ্ঞান দিতেছেন, নানাভাবে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক প্রেমভক্তি বিলাইতেছেন এবং নানরূপে অদ্ভুত ঘটন ও স্বপন সৃজন করিয়া চূড়ান্ত কৃপা প্রকাশ করিতেছেন। এই জন্যই, ঈশ্বরের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাঁহার করুণা—'**মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্।**' অবতার শব্দের অর্থই 'ত্রাণকর্তা' এবং অবতারলীলা আত্মা-শক্তিরই খেলা; কারণ ব্রহ্ম (হরি-হর) কোন কার্যে অক্ষম—যেমন জীব! তিনি মুক্তি-দান অভিমানী ব্রহ্ম এবং এই বিষয়ে তাঁহার কৃপা-শক্তি অসীম। সাধারণ গুরু যাঁহার নিজ পরকাল অনিশ্চিত, তিনি মুক্তি দিতে পারেন না। মহাপুরুষ সদ্গুরু, শিষ্যকে মুক্তিদান করিতে অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় জন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জন্মের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া সেই জন্মেই মুক্তিদান করিতে কেবল অবতারই সক্ষম (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, পাদটীকা (৭)। তিনি সর্বদেবময় ও সর্বদেবময়ী এবং তাঁহার সাধনায় সর্বসাধনই সিদ্ধ হয়। জগদ্গুরু, সগুণ ব্রহ্মরূপী বলিয়া তাঁহার ভিতরেই সকলের—*অবশেষে কলমের খোঁচায় চিহ্নিত স্থান (২৯)—*ইষ্ট, ইষ্টা ও গুরু বর্তমান। ঈশ্বর কৃপার স্বরূপ অবতরণিকা খণ্ডের ১৩-২০ অনুচ্ছেদে এবং অবতার ও গুরুর স্বরূপ প্রথম ভাগ নবম ও একাদশ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা আছে। দেহান্তের পরেও অবতারগণ

কিছুকাল ভক্তহৃদয়ে সূক্ষ্মদেহে বাস করেন। অতএব, অবতারদিগের জীবদ্দশায় এবং তাঁহাদিগের দেহান্তের পরেও কিছুকাল, তাঁহাদিগকে যাহারা মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, তাহারা অতি সহজে মুক্ত হইয়া যান—*অবশে কলমের খোঁচায় চিহ্নিত স্থান (৩০)। সুসময় অতিবাহিত হইয়া গেলে, মুক্তি লাভ কষ্ট সাধ্য হয় বটে, তবে যথার্থ ঈশ্বরোন্মুখী ভক্তের কোন কালেই ভয় থাকে না—অভীষ্ট লাভে বিলম্ব হইতে পারে মাত্র। অতি সৌভাগ্য বলেই মানব অবতারদিগকে ঈশ্বর ভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে পারে ; কারণ, তাঁহাদিগের লৌকিক দেহ ও আচরণ —ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, সময়-সময় অজ্ঞান, সাধারণ মানবের ন্যায় নানাবিধ মায়িক-ব্যবহার, ইত্যাদি—তাঁহাদের উপর ঈশ্বর-বুদ্ধি উন্মেষণের দুরপনেয় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদিগের কৃপা ভিন্ন তাঁহাদিগকে সঠিক ভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)। যাহাদের নিকট তাঁহারা নিজ স্বরূপ কৃপায় প্রকাশ করেন, তাহারাই মাত্র তাঁহাদিগকে অবগত হইয়া ধন্য হয়। একই কারণে, মহাপুরুষগণও মানবের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন না। এই সবের নিমিত্ত, মা সারদেশ্বরী বলিতেন—'গুরুর নিকট বেশী দিন থাকিতে নাই, কারণ তাঁহার লৌকিক ব্যবহারাদি দেখিলে, শিষ্যের ভক্তিশ্রদ্ধা কমিয়া যায়···ভগবান-বুদ্ধি না করিয়া মানুষ-বুদ্ধিতে, আমি যে-কাজগুলি করিতে বলি তাহা করিয়া যাও···তোমাদের কোন ভয় নাই···তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তাহা হইলেও যাহাদের ভার লয়েছি তাহাদের একজনও বাকী থাকিতে আমার ছুটী আছে ? মনে রেখো এখানে যারা এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়েই আছে। বিধির সাধ্য নাই যে তাহাদের রসাতলে ফেলে ! আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক !' সারদেশ্বরীদেবী যদি জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণা না হইতেন, তাহা হইলে উপযুক্ত ব্যক্তিগণও কি উচ্চ অবস্থার অধিকারী সহজে হইতে পারিতেন ? আমাদের মুক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ কি আপদ-বালাই তিনি দূর করিলেন, তাহার যথার্থ সংবাদ আমরা কী-বা জানি ? এই প্রসঙ্গে 'খ' ও 'গ' পর্ব দ্রষ্টব্য। তবে সর্ব বিষয়ে শেষ কথা—নিয়তির লিপি, বা রামের ইচ্ছা ! এই লিপি বিরুদ্ধ হইলে, কিছুই হইবার নহে ! এই লিপির বলেই, মানব ঈশ্বরের ভালবাসা লাভ করিয়া, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয় এবং এই ব্যাকুলতার ফলই তাঁহাকে প্রাপ্তি (অবতরণিকার প্রথম নিবেদন, ২ অনুচ্ছেদের —* অবশে কলমের খোঁচায় ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (৩১)—*মধ্যাংশ)

[৯ পর্বের শেষে বন্দনা দ্রষ্টব্য]

যতীন-নিস্মৃতি (মায়িক-সংসার)

বিষয়—এক প্রাসাদে নানা অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত করত যখন বিশেষ বিরক্তি সহ বাহিরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, তখন নানা দিক হইতে বড় বড় কুকুরের আবির্ভাব, সরবে বহির্গমনের প্রবল বাধা দান এবং দংশন করিবার উপক্রম —ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—জুন, ১৯৪৫ ।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"একটি বৃহৎ অট্টালিকা যখন উক্তভাবে ত্যাগ করিতে যাইতেছি, তখন চারিদিক হইতে উহার মধ্যে স্থিত বড় বড় হিংস্র কুকুর আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, সরবে পথ রোধ করিয়া দংশন করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল এবং যেন বুঝাইয়া দিল যে, যদি আমি বাড়ী ত্যাগ করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হই, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আমায় ছিন্ন-ভিন্ন করিবে। নিরুপায়ে, আমি সেই অট্টালিকায় স্থিত আমার পোষ্যবর্গের বহির্ভূত ছোট কাকাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু, তিনি সেখানে আসিলেন না, বা চীৎকারে সাড়া দিলেন না।"

২। এই স্থলে, ১২ পর্ব, ৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই স্বপ্নে—অট্টালিকাটি সংসার; কুকুরগুলি পৃথকারে ব্যবস্থাপিত কোন কোন সাবালকের ও তৎসম্পর্কিয়দিগের আমার উপর আন্তরিক নানা ভীষণ কুভাব, যাহার ফলে ও ক্রমোবিকাশে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও পরে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে (৬৪ পর্ব); এবং অট্টালিকা ত্যাগোদ্যোগ আমার তাহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগোন্মুখী মানসিক অবস্থা। আমি যে ছোট কাকাকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়াও তাঁহার কোন সাড়া পাই নাই ইহা নির্দেশ করে যে, তিনি এই বিষয়ে কিছু করিতে অক্ষম ছিলেন। কর্মফলসূচক ও সরল ভাবে নানা লোকের মূর্ত নানাবিধ আন্তরিক সঠিক হিংস্র কুভাব প্রকাশক এইরূপ স্বপ্ন বড় বিরল! ইহা যেন আমার সংসারের তাৎকালিক ও ভবিষ্যৎ অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র! আত্মশক্তি অদ্ভুত!

যতীন-নিস্মৃতি (শ্মশান-কালিকার সংসার)

গান

শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান বাসিনী শ্যামা নাচবে সেথা নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিত্তে,
সদা আগুন জ্বলছে চিতে,
(ওমা) চিতা ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি ॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা চরণ তলে,
নাচ দেখি মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি ॥

বিষয়—একটি মৃত বালককে স্কন্ধে লইয়া তাহার সৎকারার্থে শ্মশানে গমন এবং তথায় অত্যুজ্জ্বল নীলবর্ণ জ্যোতির্ময়ী কলেবরে কালীমাতার দর্শন লাভের পর তাহার পুনর্জীবন লাভ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল— অগষ্ট বা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন একটি মৃত চারি-পাঁচ বর্ষীয় বালককে বামস্কন্ধে ফেলিয়া তাহার সৎকারার্থে শ্মশানে পৌঁছিবার পর দেখিলাম যে, অত্যুজ্জ্বল নীলবর্ণ জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে মা কালী আবির্ভূতা হইলেন। তদ্দর্শনে, আনন্দে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করত ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ মৃত বালকটি পুনর্জীবন লাভ করিল।"

তৎপরে, শরদিন্দু জাগিলেন ও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

২। স্বপ্নটি, পূর্ব পর্বে আলোচিত আমার সাংসারিক অবস্থোৎপন্ন মানসিক পরিণতির কর্মফল প্রকাশক। ৩১শে জুলাই, ১৯৪৫ সাল, কন্যা আশারাণীর বিবাহ সম্পন্ন হইলে, আমি কিছু দিন নির্জনে বাসোদ্দেশ্যে দুর্গাপূজার অল্প পূর্বেই দেওঘরে নিজ পোষ্যবর্গের সহিত চলিয়া গিয়াছিলাম। সেই সময়ে, সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য একরকম পরিহার পূর্বক, আত্মার

তত্ত্ব নির্ধারণে আমি সারাদিন ব্যাপৃত থাকিতাম এবং করোলীবাগের বালানন্দ-গিরির আশ্রমস্থ লাইব্রেরী হইতে অনেক দুর্লভ পুরাতন হিন্দু-ধর্মপুস্তক সংগ্রহ পূর্বক তাহাদের পাঠ করিতাম। তখনও, এই পুস্তকগুলি লিখিবার কোনই সঙ্কল্প ছিল না—তবে, নিজ জ্ঞানার্থে কিছু কিছু স্মারক-লিপি রাখিতাম। প্রায় চারি মাস পরে কলিকাতা ফিরিবার পর, ঈশ্বর-কৃপোদ্ভূত অদ্ভুত স্বপ্নগুলি যখন তরঙ্গের ন্যায় অনবরত আসিতে লাগিল, তখন পুস্তক প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগ হইতে, আমি সংসারে প্রায় সর্ব কার্য ত্যাগ করিয়া ঐ কার্যে মন দিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে, অবতরণিকার ১-৫ অনুচ্ছেদ এবং উহাতে স্থিত, প্রথম নিবেদনের ২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সেইখানে, পুস্তকগুলির উৎপত্তির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগের অত্যাশ্চার্য, ও কতকগুলি অভূত-পূর্ব, ঈশ্বর কৃপার ঘটনারাজি সাধারণের মঙ্গলার্থে জগতে রাখিয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই পুস্তকগুলি সঙ্কলন করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। স্বপ্নটির নিদর্শনানুযায়ীই যেন, আমি দেওঘরে যথার্থ শ্মশানের পার্শ্বে বাস করিতাম (১৬ পর্ব)। আত্মশক্তি অদ্ভুত!

৩। স্বপ্নটি বুঝাইল যে, শব-বালকরূপী আমার মায়িক-সংসার মনে মৃত হইয়াছে। উহাতে কালিকামূর্তি দর্শনের পর পুনর্জীবিত বালকটি, আমার জগদম্বার স্বরূপ নির্ণয়ে ও গুণগানে অহোরহ উন্মুখ ভবিষ্যৎ সংসার-জীবন সূচনা করিল। পুস্তকাদি সঙ্কলন ও প্রকাশ হইয়া গেলে, এই নূতন কালিকার-সংসার দেহান্তাবধি কি আকার ধারণ করিবে তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার সংসারে তিনি যে রূপে নিয়োগ করিবেন, সেইরূপেই অতিবাহিত করিতে হইবে! স্বপ্নটি যে আমার যথার্থ অবস্থা বিজ্ঞাপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সত্যই, মনে তো এমন মায়িক-সংসার আর নাই বলিলেই হয়। কঠিন কঠিন শৃঙ্খলগুলি যেন শিথিল ও মমত্ব-ভাব ছিন্নপ্রায়! ইহা যে শুধু তত্ত্ব-জ্ঞানোদ্ভূত স্বরূপ বা অরূপ মনোনাশ বলে অন্তর্দেশেই তাহা নহে—বাহিরেও, জগদম্বার নিয়তিশক্তির অমোঘ প্রভাবে। নিকট আত্মীয়াদি যদি মনের মত হইত, তাহা হইলে এই 'মমত্ব'-বোধ অপনয়নে বিলম্ব হইতেও পারিত। কিন্তু কৃপাময়ী জগদম্বা কৃপাবশেই আমার সেই বালাইয়ের আশঙ্কা দূর করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মায়া-শক্তি জাত এই বালাই, তাঁহার আমার মুখে ভবরোগ 'দাওয়াই' তুলিয়া দিতে (৮ পর্ব) ও সাথে করিয়া নিজধামে লইয়া যাইতে (১১ পর্ব), বাধা সৃজন করিয়াছিল। অতএব, তাঁহার আত্মা, শিষ্য, সখা ও পুত্রের সেই বালাই যে তাঁহাকে দূর করিতেই হইবে—কেননা, না করিলে তাঁহার কৃপা চরম অবস্থাপন্ন কেমনে হইবে? উহা করিতে হইলে, আমি যাহাতে 'মমত্ব'-জ্ঞান শূন্য এবং এই

বিশাল বিশ্বে তিনি ছাড়া আমার নিজ জন কেহ নাই এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হই, সেইরূপ সাংসারিক অবস্থা সৃজন করিতে হইবে! তিনি যে তাহা করিয়াছেন, তাহা এই স্বপ্নে মায়া-সংসাররূপী বালকটিকে মৃতাবস্থায় স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে দাহ করিতে গিয়াছি দেখাইয়া বেশ বুঝাইলেন। সারদেশ্বরী বলিতেন যে ভগবান ভিন্ন কাহাকেও ভালবাসিতে নাই। আমার পক্ষে, মা উক্তরূপে কঠোর আঘাতে, সেইরূপ অবস্থাই সৃজন করিয়াছিলেন। কাহার সাধ্য যে, গুরুরূপিণী এই করুণাময়ীর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? প্রায় সকল সাংসারিক কার্য ত্যাগ করিয়া এবং মন হইতে 'মমত্ব'-জ্ঞান মন্দীভূত করিয়া, আমি যে এই সাত বৎসর পুস্তক উদ্দেশ্যে প্রায় সমস্ত অবসর কাল আত্মার স্বরূপ ও গুণ-কীর্তনে নিযুক্ত থাকিতে পারিয়াছি, এই অবস্থা তাঁহার আমাকে মহৎ-কৃপার দান! ইহা কর্মযোগের চরম পরিণতি এবং ইহাতে তাঁহার সহিত একত্ব লাভের অধিকার জন্মে (১২ পর্ব, ২ ও প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২২ (২), অনুচ্ছেদ)। শাস্ত্রে আছে যে, গুরুসেবা এবং ঈশ্বরের কার্য করা অপেক্ষা, কোন তপস্যাই অধিক ফলদায়ী নহে। অতএব, শরদিন্দুর প্রবল অর্চনাসক্তি এবং আমার ব্যাকুল পুস্তক-প্রণয়নাসক্তি তুল্যশ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাধনা এবং তপস্যা। একবার অর্চনান্তে প্রণামকালে শরদিন্দু দেখিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণদেব তাঁহার গলে পুষ্পমাল্য দানোদ্যত। 'অহং'-স্বপ্ন রাখিয়া বনবাস বা ভোগাদি ত্যাগ, বিড়ম্বনা মাত্র। সাধক গাহিতেছেন—

হরি কথা নিত্য যারা পরস্পর মিলি,
সতত আলাপ করে মন প্রাণ খুলি।
তাহাদের জীবন্মুক্তি হয় সুনিশ্চয়,
নিত্য সুখে সুখী তারা নিত্য রসময়।
'অহং'-স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই মুক্তি তার নাম,
বুঝিলেই জীবন্মুক্ত নিত্য লীলাধাম।

৪। এই স্থলে, বিশেষ লক্ষ্যের একটি বিষয় এই যে, অ, আ, ট ও ১১ পর্বে আলোচিত কাহিনীগুলিতে আমি যে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ক্রমান্বয়ে আমার কয়টি আত্মীয়ের—দুইটি কন্যা ও একটি জামাতার—আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তাহা ১২, ১৩, ও ১৫ পর্বে আলোচিত কাহিনীগুলিতে আরও বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৬, ১৭, ১৮ ও ২১ পর্ব, পৌত্র বুদ্ধ, আমার নিজ এবং পত্নী ও পুত্র অখিলের অবস্থা জ্ঞাপক। অতএব, এই স্বপ্নগুলি সুন্দররূপে শৃঙ্খলিত।

[১১ পর্বের শেষে বন্দনা দ্রষ্টব্য]

সতীন-গীতা-বুদ্ধদেব

বিষয়—কন্যা গীতার ক্রোড়ে পৌত্র বুদ্ধদেবের একটি ডিঙ্গি আরোহণে, সমুদ্র তরণ, উহার তটে আমার উপস্থিতি, আমার ক্রোড়ে গীতার হস্ত হইতে পৌঁছাইবার পুর্বে হঠাৎ তাহার অতি অল্প জলে নিমজ্জন এবং তাহাকে উদ্ধারের জন্য আমার জলে ডুব দান—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—মৌজা-আশ্রম, করোলীবাগ, দেওঘর। শ্মশানের নিকটে সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যস্থ এই বাসাবাড়ীটি অতি নির্জন ও লোকালয়ের বাহিরে অবস্থিত ছিল। ইহাতে মাঝে মাঝে ব্রহ্মদৈত্যের উপদ্রব (রাত্রে ঢিল পড়া, ইত্যাদি) অনুভূত হইত। বুদ্ধ একদিন রাত্রে প্রস্রাব কালে গালে চড় খাইয়া কাঁদিয়াছিল। পুত্র অখিলকে তিন দিনের ভিতর বাড়ী ত্যাগ করিবার জরুরী আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু শরদিন্দুর কাতর অনুনয় এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ধুপ ও প্রদীপাদির দ্বারা অশ্বথ বৃক্ষতলে অর্চনার ফলে, ব্যাপার ঘনীভূত হয় নাই।

কাল—জানুয়ারী, ১৯৪৬।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন একটি সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় একটি অতি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে, কন্যা গীতা তৃতীয় পুত্র নির্মলেশের পুত্র বুদ্ধদেবকে কোলে লইয়া সমুদ্র তরণ পূর্বক আমার নিকট আসিল। গীতাই নৌকায় চালিকা ছিল। সে যখন নৌকা হইতেই আমার কোলে বুদ্ধকে দিতে যাইল, তখন হঠাৎ তাহার হস্ত হইতে পিছলাইয়া বুদ্ধ সমুদ্রের কিনারাতেই অতি অল্প জলে মগ্ন হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্ধারার্থে জলে যেমন ডুব দিলাম, তখনই স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

এই স্বপ্নের প্রায় এক সপ্তাহ মধ্যে, বুদ্ধের অবিরাম জ্বর হইয়াছিল এবং উহা প্রায় দুই সপ্তাহ ছিল। সকলেই উহাতে ভীত হইয়াছিল—কারণ, তাহার জলমগ্ন হইবার স্বপনের পরেই ঐ রোগ দেখা দিয়াছিল।

২। স্বপ্নটি পৌত্র বুদ্ধদেবের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক অবস্থা সূচক। সেই কালের একমাত্র পৌত্র, সে আমার বিশেষ প্রিয় ছিল এবং আমার দত্ত তাহার নাম ছিল—'সারদাপ্রসাদ'। সেই জন্যই বোধ হয় আমার প্রেমময়ী আত্মস্থা মা, তাহার ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক অবস্থা উক্তরূপে আমায় জ্ঞাপন করিলেন! এই স্বপ্নে, সমুদ্র তরণ সংসার হইতে মুক্তি প্রাপ্তির নির্দেশক। অ পর্বের ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশে উক্ত হইয়াছে যে, জগদম্বা তাঁহার কৃপার পাত্রদিগের আত্মীয়দিগকেও যোগত্যানুযায়ী সহজে মুক্তি দান করেন এবং মহাত্মাগণ তাঁহাদের দোষী আত্মীয়দিগকেও কোনও ক্রমে মুক্তি মার্গে পৌঁছাইয়া দেন। এই স্বপ্ন হইতে মনে হয়, যেন গীতা ও আমি বুদ্ধের ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নতিমার্গে বিশেষ কারণরূপে পরিণত হইব। কিরূপে, কেমন করিয়া, আমার জীবদ্দশায় বা দেহান্তের পর, এই ঘটনা ঘটিবে, তাহার অনুমানও কঠিন। গীতার ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া ও তাহাকে কর্ণধার করিয়া নৌকাযোগে সাগর তরণ, বুদ্ধদেবের গীতার ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক ভাবের বৃত্তমধ্যে আগমন যেন নির্দেশ করিতেছে! পরিশেষে, তাহার যথার্থ মুক্তি লাভে কিছু বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও পরিস্ফুট! এই বিষয়ে আমার, সাহায্য সে কিরূপে পাইবে বোধহয়, ইহা আমার পারলৌকিক ভবিতব্য!

৩। স্বপ্নফল-বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি ভেলার সাহায্যে সন্তরণ করে, সে অচিরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এই ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রবাক্য কতদূর প্রয়োজ্য তাহার নির্ণয় সুকঠিন। আমার আত্মাকাশই এই স্বপ্নটি ভবিতব্যরূপে প্রকট করিয়াছিল এবং ইহাতে ভৌতিক কিছুই ছিল না। আমার স্বপ্নদৃষ্ট বুদ্ধের আন্তর চিদাকাশ-দেহের জলমগ্নবস্থা ও কয় দিন পরেই তাহার বাহ্য ভৌতিক-দেহের রুগ্নাবস্থা, অদ্ভুত প্রাকৃত সমন্বয় নির্দেশক। সারা বিশ্বই অখণ্ডভাবে—কি অন্তরে, কি বাহ্যে—জগদম্বার দেহ এবং জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডলিনী শক্তির হবনীয় দ্রব্য। ইহাতে কিছুই হেয় নাই এবং সবই পবিত্র। শিবঠাকুর বলিতেছেন (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ)—'আমি সর্বভূতস্থ, সর্বব্যাপী, সকলের আত্মা ও সকল ভাবস্বরূপ। এই সংসারে সকলে ও সমস্ত বস্তু আমার তুল্য এবং কোনও দ্রব্যে ইতর বিশেষ নাই—কারণ, আমি ভিন্ন অন্য কিছু জগতে নাই। যাঁহারা সকল পদার্থে আমার সহিত ঐক্য চিন্তা করেন, তাঁহারা সমস্ত দেবতাকে এবং সাঙ্গবেদসমূহ জ্ঞাত হন।' সঠিক আত্মজ্ঞানে, মানবই শিবস্বরূপে পরিণত হন।

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতিনাং, মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
পতিরেক গুরুস্ত্রীণাং, সর্বত্র সমদর্শিনাম্॥

অতীন-যমদূত

শরীর চালক যেই 'অহং'-নাম তার,
তার ত্যাগ সর্বত্যাগ—ছাড় অহঙ্কার।...
কাঁচা 'আমি'-রব তুলি, 'আমার-আমার' বলি,
যতক্ষণ না ছাড়িবে 'আমি' ও 'আমার।'
ততক্ষণ রবে ভ্রান্তি, পাবে না পরমা শান্তি,
নাহি হবে সর্বত্যাগ সাধন তোমার।

বিষয়—মেছুয়াবাজার ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের অগ্নিকোণে আমার যমদূত মৃত্যুরূপী মহিষের সহিত ভীষণ সংঘর্ষে অটুট ও অক্ষত অবস্থায় স্থিতি—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার কলিকাতার শয়ন ঘর।

কাল—মার্চ, ১৯৪৬—বেলা আন্দাজ তিনটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ দিবা-স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের পূর্ব দিকের হাঁটা-পথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে যাইতে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের মধ্যস্থল অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় একটি বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণের মহিষ তাহার শিং বাঁকাইয়া ঝটিকাবেগে ঐ রাস্তার দক্ষিণদিকে তাহার পথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে আসিতে আসিতে আমার অনতিদূরে পৌছিয়াছে। সে যেন সাক্ষাৎ-মৃত্যুরূপী! আমার গতি পরিবর্তনের শক্তি আদৌ ছিল না, এবং তজ্জন্য মনে হইল যে সংঘর্ষ ও মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু সংঘর্ষের ঠিক পূর্বে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, মহিষের দিকে বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলি হেলাইয়া তাহাকে যেন অবশে বলিলাম, 'আমাকে মারিবার শক্তি তোর্ নাই' এবং ভীষণ সংঘর্ষে যাহাই ঘটুক না কেন তাহা চক্ষে দেখিব না, এই উদ্দেশ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। সেই সময়ে, আমার অন্য কোন উপায়ই ছিল না। পর মুহূর্তে চক্ষু উন্মেষ করিয়া দেখিলাম যে, আমি ঈষৎ অগ্রসর হইয়া অক্ষত দেহেই বর্তমান, সংঘর্ষের কোনরূপ চিহ্ন দেহে বা সেখানে নাই (অর্থাৎ সংঘর্ষ হয় নাই) এবং মহিষটি নিজ গন্তব্য পথেই ছুটিতে ছুটিতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়াছে। তৎপরেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। স্বপ্নটির গূঢ়ার্থ যে আমি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত, বা 'জীবন্মুক্ত', বা যমরাজের অধিকার বহির্ভূত, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। এইরূপ অবস্থা লাভের মুখ্য কারণ যে, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনসহ দেহাত্মবোধ ত্যাগ, তাহা পূর্বে স্থানে স্থানে আভাসিত হইয়াছে। শাস্ত্র মতে, সমদর্শী ব্যক্তি সুদুর্লভ (গীতা, ৭-১৯), পূত-সন্ন্যাসী (ঐ পর্ব, ২-৩) ও যমের অধিকার বহির্ভূত (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির স্বরূপ প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ১ (১), ২৯-৩০ অনুচ্ছেদে আলোচনা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ মাহাত্ম্য যে, পাপিষ্ঠতম হইলেও, মানব সেই ভেলার দ্বারাই সমুদয় ধর্মাধর্ম উত্তীর্ণ হয় ; কিন্তু উহা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু মুখে বা মন্ত্রে অবস্থিত! বিদেহমুক্ত পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া, তিনি যেন সব—সূর্যরূপে উত্তাপ দাতা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা—এমন কি, ত্রিকালে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে সে সবই যেন তিনি! মৃত্যুর পর, জীবন্মুক্তের ঈশ্বরধাম লাভ হয়, কিন্তু বিদেহমুক্ত ব্রহ্মেই লীন হন। জীবন্মুক্তই এই জীবনে পরিশেষে বিদেহমুক্ত হইতে পারেন। অল্প কথায়, ব্রহ্ম ভাবের লঘুত্ব বা গুরুত্বের উপর জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি নির্ভর করে। সামান্য ভেদজ্ঞানেও উচ্চাবস্থা লাভের আশা বৃথা। দশরথ সভায় বশিষ্ঠ মুনি বারবার এই উপদেশ দান করিতেন—"আমি কিছু নয়' এই বাক্যের, অথবা 'আমিই সব, আমারই সব' এই বাক্যের, যেটি লোক ধারণা করিতে পারিবে, তাহাতেই তাহার মুক্তি হইবে। যতদিন জড়ীয় বুদ্ধি থাকে, ততদিন প্রথম মন্ত্র এবং পরে যখন অন্তরস্থ চৈতন্যকে 'আমি' বোধ হইবে, তখন দ্বিতীয় মন্ত্র সাধন করিবে।" পুস্তকালোচিত স্বপ্নগুলি দ্বিতীয় ভাব উন্মেষক।

৩। স্বপ্নটি আমার ঈশ্বরে নির্ভরশীল প্রকৃতিকেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল। এই নির্ভরশীল স্বভাব বলেই আমি—প্রথম পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, প্রিয়ংবদার বক্ষারূঢ়, সহিষমুখী, কালপুত্র ভীষণ ব্যাধি-দানবের সহিত বলপরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলাম ; দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত কাহিনীতে, তারকেশ্বর মন্দিরে প্রিয়ংবদার রোগ মোচনার্থে ধন্না দিতে গিয়াছিলাম ; গ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, ভীষণাকার দস্যুদলের সম্মুখীন হইয়াও শরদিন্দুকে এই বলিয়া আশ্বাসিত করিতে পারিয়াছিলাম, 'তুমি অগ্রসর হও, ভয় কি? উহারা কিছুই করিতে পারিবে না' এবং লাহোরে ও করোলীবাগে, কবর স্থানের উপর এবং শ্মশানের নিকট নির্মিত ও ভৌতিক উপদ্রবযুক্ত বাড়ীঘরে সপরিবারে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিলাম (গ পর্বের শেষাংশ)। সর্ববিষয়ে মানব ঈশ্বরে নির্ভরশীল না হইতে পারিলে, ঈশ্বর-কৃপা লাভ হয় না। মা সারদেশ্বরী বার বার তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে তাঁহাতে

নির্ভরশীল হইবার উপদেশ দান করিতেন। স্বপ্নতত্ত্বানুযায়ী, মহিষ দর্শন কুস্বপন মধ্যে গণ্য, ঐরূপ স্বপ্নের পর নিদ্রিত হইলে দোষ খণ্ডন হয় এবং মহিষা-রোহণ মৃত্যু নির্দেশক। অন্যান্য স্বপ্নের ন্যায়, এই স্বপ্নটিকেও আমার মা ব্রহ্মময়ী সারদেশ্বরী আত্মাকাশে প্রকটিত করিয়া কর্মফল ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। বাস্তবিক, ইহাতে ভৌতিক কিছু ঘটে নাই—এমন কি, আমার আন্তর চিদাকাশ-দেহের সহিত চিদাকাশরূপী মহিষেরও কোন সংঘর্ষ হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে পরে রোগাদি হইতে পারিত (১৫ পর্ব)। সার বিষ—কি জাগ্রত, কি স্বাপ্ন, উভয় অবস্থাতেই–ব্রহ্মময়। ইহাতে কিছুই ঘটিতেছে না (বা ইহা অরূপ); আর যদি ঘটে (বা স্বরূপ হয়), তাহাও অদ্বৈত ব্রহ্মলীলা মাত্র এবং ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে (ঈশ্বরই ব্রহ্ম!) অর্পণীয়! রামের ইচ্ছা, বা অপ্রাকৃত প্রেরণা, সর্ব বিশ্ব-ঘটনেরই মূল কারণ এবং ইহাই কাল, বা নিয়তি, বা ব্রহ্ম-বিক্রম। অতএব, নিজ শুভেচ্ছু ব্যক্তি অনন্ত কার্য-কারণ রূপ নিগড়ের অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া, সাক্ষীস্বরূপে সামান্যসত্তা বা চিন্মাত্র ব্রহ্মে সারা বিশ্বের সার্বকালীন—স্পন্দনে কালির দাগে চিহ্নিত স্থান (৩২)—স্পন্দন অর্পণ করেন। অবশ্য সাক্ষী হইতে গেলে, নিজেকে প্রস্তরে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত রামে অর্পিত হইলে, আর পুনর্জন্মের কারণ থাকে না (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৬, ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদ)।

৪। ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—'জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, ভগবদ্বিষয়ে প্রেমলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়। অপরাপর আচরণ বিসর্জন পূর্বক একমাত্র আমাকে আরাধ্য এবং এই আরাধনা বিষয়ে যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধিলাভ। প্রেমলক্ষণা উত্তমা ভক্তি সংসার নিবৃত্তি ও ঈশ্বর লাভের হেতু। স্বীয় আত্মার ব্রহ্ম-চিন্তার দ্বারা তৎপ্রসাদে মুক্তিলাভ হয়।' এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। গীতায় (১৮-৫৫) ভগবান আরও বলিতেছেন যে, জ্ঞানলক্ষণা ভক্তির দ্বারা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া যতি অদ্বৈত চিন্মাত্র তাঁহাকে আত্মরূপে সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাতে তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া অব্যবহিত পরেই তাঁহাতে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ, জীবনকালেই তৎস্বরূপে অবস্থান করেন। উন্নত সাধকের পক্ষে, কেবল আত্মবোধ পুষ্পের দ্বারা জীবভাবাপন্ন চিদাকাশের উপাসনাই সুপ্রশস্ত (প্রথম ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, ১ পাদটীকা)। এই চিদাকাশই ব্রহ্মময়ী আত্মাশক্তি সারদা—সগুণ ব্রহ্ম (৪ ও ৮ পর্ব)—এবং আমার আত্মা তাঁহার ভিতরেই সমস্ত ঈশ্বর মূর্তি ও বিশ্ব।

যতীন-শরদিন্দু

(১) যত্র নার্য্যস্তু নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।

(২) নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে॥

বিষয়—শরদিন্দুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমার এক অকূল সমুদ্র তরণের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—শেষ এপ্রেল, ১৯৪৬—বেলা আন্দাজ তিনটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন আমি, শরদিন্দু, গীতা, আশা ও আর দুই একটি কন্যা (ঠিক মনে হইতেছে না তাহারা কে?) একটি অসীম সমুদ্র পার হইবার অভিপ্রায়ে উহার কূলে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। কোন জলযান ছিল না বলিয়া পরামর্শে স্থির করিলাম যে, উহা হাঁটিয়াই পার হইতে হইবে এবং শরদিন্দুকে সরহস্যে বলিলাম, 'এইবার ডুবাইবে দেখিতেছি!' শরদিন্দু উত্তরে বলিলেন, 'সে কি, গো! তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। আমি তোমাকে লইয়াও সমুদ্র পার হইব।' প্রস্তাবটি অসাধারণ কিন্তু অসম্ভব নহে বুঝিয়া যেন বিশেষ কৌতুক বশেই এবং শরদিন্দুর শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই, আমি উহাতে স্বীকৃত হইলাম এবং তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করত সম্মুখদিকে দুইটী পা ঝুলাইয়া দিলাম। এইরূপ অবস্থায়, অনতিবিলম্বে অকূল সমুদ্রের অপর তটে আমরা অনায়াসে উঠিলাম এবং কুত্রাপি সমুদ্রের জল শরদিন্দুর পায়ের গোড়ালির উপর উঠিল না। অপর কূলে যে-কন্যারা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদেরও পার করিবার উপায় উভয়ে পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। উক্ত স্বপ্নের প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার বন্ধু, ৺নৃত্যগোপাল ঠাকুরের শিষ্য, পরম বৈষ্ণব মুকুন্দলালগুপ্ত মহাশয় (এখন পরলোক গত) আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনায় বিশেষ তৃপ্তি লাভ হইত। তাঁহাকে স্বপ্নটির বিষয় বলিতেছি, এমন সময় শরদিন্দু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আমার স্কন্ধে বড় বেদনা অনুভব করিতেছি, উহা ফুলিয়া উঠিয়াছে, দেখ!'

আমি বলিলাম—'আশ্চর্যের বিষয় নহে! কিছু পূর্বে, প্রয়োজন না থাকিলেও, আমাকে স্কন্ধে করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সমুদ্র পার হইয়াছিলে, বেদনা তো হইবেই!' মুকুন্দ বাবু স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন এবং স্বপ্নটির বিষয় তখন শরদিন্দুকে জানান হইল। শরদিন্দু বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'ঐ সব কথা রাখ! আমার ঘাড়ে বড় যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার উপায় কর! আমি মোটা কাপড় পরিতে পারি না, তবুও তুমি এইবার আমাকে কোথা হইতে এমন কাপড় কিনিয়া পরাইতেছ যে, আমার ঘাড় ফুলিয়া উঠিয়াছে ও বিশেষ যন্ত্রণা পাইতেছি।' যুদ্ধের পরবর্তী কালে, প্রয়োজন মত পরিধানের বস্ত্র যোগাড় করা কত কঠিন কার্য ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমার আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রধান সহায়িকা যে শরদিন্দু, তাহা এই স্বপ্নটির ভিতর দিয়া মা সারদেশ্বরী আত্মরূপে আমায় জানাইলেন। তিনিই দুর্গারূপে আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে বিবাহসূত্র বন্ধন করিয়া শরদিন্দুর সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন ও দেহে মিলিতা হইয়া গিয়াছিলেন (৩ পর্ব), এবং তিনিই আমাকে শরদিন্দুর সহিত বিবাহ রাত্রে বরসভায় সগুণ ব্রহ্মজ্যোতিঃরূপে সুদুর্লভ দর্শন দানে ধন্য করত জানাইয়াছিলেন যে, ঐ বিবাহে কোন আধ্যাত্মিক অবনতির আশঙ্কা নাই (৪ পর্ব)। বাস্তবিক, শরদিন্দুর সাহায্য ব্যতীত আমি আমার নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা-সমন্বিত বৃহৎ সংসার-ভার বহন করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ (অবতরণিকার ২৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। তাঁহার উপর সমস্ত সংসারের ভার (এমন কি, বাহিরের অনেক ক্রয়াদি কার্য পর্য্যন্ত) ন্যস্ত করিয়া, আমি এই পুস্তক সঙ্কলনে অবাধ অবসর পাইয়াছি। শাস্ত্র মতে, বিশ্বে সতী নারীগণ সেই আদর্শ সতী ভগবতীর বিশেষ অংশরূপিণী এবং মহাভাগা রমণীগণ সারা বিশ্বের মাতা ও তাঁহারাই নিজগুণে সসাগরা বিশ্ব ধারণ করিয়া বিদ্যমান। তাঁহাদের অভিশাপ দেবতাদিগেরও ভীতিপ্রদ। তাঁহারা স্বামীর সাধনের বিঘ্নপ্রদা হন না এবং সর্বথা ও সর্বদা সাহায্যকারিণী। সাধ্বী প্রিয়ভাষিণী ভার্যাই প্রকৃত ভার্যা এবং 'সহধর্মিণী'। সুতরাং, ভজন মার্গে তিনি উৎকৃষ্ট আনুকূল্যরূপিণী। তন্ত্রমতে, এইরূপ পত্নীই মানবের যথার্থ 'শক্তি' পদবাচ্য। এইরূপ কামিনী, 'কামিনী কাঞ্চন' পদদ্বয়ের কামিনী নহেন। বিদ্যামায়া-সম্ভূতা সহধর্মিণীর সাহায্য ব্যতীত, সংসারী মানবের ভগবান লাভের জন্য সাধনা সুকঠিন। অবশ্য সন্ন্যাসীদিগের কথা স্বতন্ত্র! এই কারণেই, পশ্চিম বাঙ্গলায় রীতি অনুযায়ী, বিবাহকালে বরের হস্তে যাঁতী দেওয়া হয়—যাহাতে সে বিদ্যামায়ার সাহায্যে সংসারে মায়াশৃঙ্খল ছেদন করিতে পারে। ভারতের অন্যত্র দর্পণ, ছুরিকা, ইত্যাদির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে—

(১) নারদ প্রতি ব্রহ্মা—

গৃহস্থ আশ্রমে থাকি ওহে ঋষিবর,
কৃষ্ণপদ পূজা তুমি কর নিরন্তর।
অন্তরে বাহিরে আর সতত বদনে,
হরিনাম গায় যেই ঐকান্তিক মনে।
অন্য তপস্যায় তার কিবা প্রয়োজন,
গৃহী হয়ে কর বৎস হরি আরাধন।
সর্বসুখে গৃহীজন সুখি নিরন্তর,
নারী সুখ তাহে হয় উৎকৃষ্টতর।
স্বর্গভোগ তার কাছে তুচ্ছ বলি জান,
অতএব মম বাক্য রাখ মতিমান।
স্পর্শসুখ আছে যত অবনী মাঝারে,
নারীস্পর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে॥

(২) শিবের প্রতি কৃষ্ণ—

পতিব্রতা সতী থাকে যাহার আগারে,
তার সম সুখী কেবা অবনী মাঝারে।
পতিব্রতা নারী হয় রমণী প্রধান,
জগতে নাহিক কেহ সতীর সমান।
সতীসহ সম্মিলন লভে যেই জন,
অপার আনন্দে সেই হয় নিমগন।
যত স্নেহ রমণীর শত পুত্রে হয়।
ততোধিক পতি পরে নাহিক সংশয়॥

কাশীখণ্ডে দেখা যায় যে, বিশ্বানর মুনি নিম্নলিখিতরূপ যুক্তি বলে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শিবকৃপায় পরিশেষে অগ্নিদেবের পিতা হইয়াছিলেন—

মিথ্যা ব্রহ্মচর্য, হইয়া অধৈর্য,
অন্তে দুঃখ বহুতর।
নিজ দারা প্রতি, মনোযোগে রতি,
করি ঘরে যদি যদি থাকে।
ব্রহ্মচর্যাধিক, তাহার অধিক,
ইহলোকে পরলোকে।
কাম-ক্রোধ-দ্বেষ, নাহি থাকে লেশ,
রহি সেবাপর গৃহী।

৩। আমার আত্মস্থ রামকৃষ্ণ-সৃষ্ট এই স্বপ্ন তাঁহারই বাণী সমর্থন করিতেছে যে, নিজে ভব সাগর উত্তীর্ণ হইলেও, মুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আত্মীয় (এইক্ষেত্রে, কন্যা) দিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। ১৬ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নটিও সেই শ্রেণীগত। আমার স্বপ্নদৃষ্ট শরদিন্দুর আন্তর চিদাকাশ-স্কন্ধের ভারাক্রান্ত অবস্থা এবং ঠিক তৎপরেই তাঁহার বাহ্য ভৌতিক-স্কন্ধে বেদনা, অদ্ভুত প্রাকৃত-সমন্বয় প্রকাশক (১৬ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। বিশ্ব জড় নহে—ইহা অখণ্ডরূপে জড়-চিৎ'এর মিশ্রিত বিকাশ, আর শিব-শক্তিরূপিণী জগদম্বার দেহ! প্রকৃতিকে বুদ্ধিশক্তি রহিত জড় বলিয়াই লোকে ধারণা করে; কিন্তু বাস্তবিক ব্যাহ্যান্তঃ-প্রকৃতি চৈতন্যময়ী জগদম্বার লীলা বিলাস এবং তৎস্বরূপ। সেই হেতুই, মানব যখন স্থূলদেহ হীন হইয়া মৃত্যুকালীন চিত্তের আকার অনুযায়ী বিশুদ্ধ চিদাকাশে আতিবাহিক দেহ লাভ করে, সেই ব্যক্তি ক্রমে তাহার প্রাকৃত কর্মফলানুসারে পারলৌকিক গতির পর সেই লোকোপযুক্ত ভৌতিক দেহে পরিণত হয় (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৩ অনুচ্ছেদের শেষাংশ ও পূর্বে পাদটীকা ৫,

২ অনুচ্ছেদ)। একই কারণে, ঈশ্বরোদ্ভূত কর্মফলসূচক স্বপ্নগুলি আন্তর-আত্মায় প্রাদুর্ভূত হইয়া, বাহ্য-প্রকৃতিকে তদ্‌ভাবেই অল্পাধিক আণুপ্রাণিত করত উপযুক্ত ফল প্রসব করে। এই পুস্তকে আলোচিত সব স্বপ্নগুলিই সেই শ্রেণীর। ১ পর্বে আলোচিত স্বপ্নটিতে আমি যে প্রিয়ংবদার আন্তর চিদাকাশ-বক্ষে কালপুত্র ব্যাধি বা তাহার দূতকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার ফলে তাঁহার বাহ্য-প্রকৃতি ক্ষয়কাশরোগাক্রান্ত হইয়াছিল এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ স্বপ্নটিতে, ঈশ্বরে নির্ভরশীল আমি যে চিদাকাশ-দানবটিকে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে গিয়াছিলাম, তাহাও আমার বাহ্য-প্রকৃতিতে অভিব্যক্তি হইয়া একান্ত নির্ভরশীল অবস্থায়, আমাকে তারকেশ্বরে প্রিয়ংবদার মৃত্যু-নিবারণের উদ্দেশ্যে ধন্না দিতে লইয়া গিয়াছিল এবং তথায় নানারূপে উভয়কে শিব কৃপার পাত্র ও পাত্রী করিয়াছিল। ৬ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, শরদিন্দু যে আন্তর চিদাকাশরূপ বেলুড় মঠ সন্নিহিত গঙ্গার অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময়ী চিন্ময় রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারও যথাকালে শরদিন্দুকে উপলক্ষ্য করত উপযুক্ত কোনরূপ বাহ্য প্রাকৃত অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। পরবর্তী ৮ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, গীতা তাহার আত্মাকাশে আমার সহিত যে চিন্ময় পথ অতিক্রম করত, অপ্রাকৃত রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী ধামে পৌঁছিয়াছিল, তাহারও আমাদিগকে উপলক্ষ্য করত যথাকালে কোন বাহ্য-প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তবে, এই সকল স্বপ্নের যথার্থ প্রাকৃতিক পরিণতি কিরূপ হইবে তাহা বুঝা (১ ও ২ পর্ব) অতি কঠিন। উহারা যেন ছায়ারূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ নিয়তির লিপি উন্মোচন করে এবং অমোঘ ফলদায়ী। এই প্রসঙ্গে, অবতরণিকার (২) পাদটীকা দ্রষ্টব্য— Dreams reveal to us that aspect of our nature, which transcends rational knowledge. Every dream presentation has a meaning. A dream is like a letter written in an unknown language. এই শিব-কালীময় বিশ্বে, তাঁহাদের রমণ ছাড়া কিছুই হয় না—অর্থাৎ, সবই বোধের ভিত্তিতে অহং-ভাবে বোধশক্তির লীলা। অতএব, স্বপ্নগুলি দ্রষ্টার আত্মস্থ লিঙ্গ ও যোনির মিলনে, শিব-কালী রূপেই প্রকটিত। তাঁহারাই কর্ম, কর্মফল ও কর্মফলদাতা এবং স্বপ্নগুলি দ্রষ্টার কর্মফল। জাগ্রতাবস্থায় মানবের ক্রিয়ার আধার দেহ-মন-বুদ্ধি-প্রাণ-অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদি (গীতা. ১৮-১৪), সবই শিব-শক্তিময় এবং সকল ক্রিয়ার মূলেই তাঁহারা। অতএব—অহঙ্কার ত্যাগ করত. '**সর্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ**'—কালীই শিব! বিদেহমুক্তের জ্ঞানময় আত্মারই বিভূতি এই অখণ্ড নিখিল বিশ্ব (১ ও ১৭ পর্ব. ২ অনুচ্ছেদ)।

গীতা-যতীন-রামকৃষ্ণ-সারদা

বিষয়—আমার সহিত গীতার একটি বিস্তীর্ণ হ্রদোপরি স্থিত অতি সঙ্কীর্ণ ও হীরক সম প্রভাবিশিষ্ট পথ অতিক্রমণ, একটি দালানে রামকৃষ্ণদেবকে কতকগুলি স্তাবক সন্ন্যাসী পরিবৃত ও ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে দর্শন, তাঁহার কৃপা-কটাক্ষে আমাকে ও গীতাকে দর্শন ও প্রণামাদি গ্রহণ, দালানের সংলগ্ন একটি গৃহে আমার মস্তকে সারদেশ্বরীদেবীর হস্তস্পর্শে আশীর্বাদ করণ ও আমার প্রতি একটি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপণ এবং গীতার উদ্ধার কামনায় ক্রন্দনের নিমিত্ত, তাহার নিকট হইতে সহানুভূতি ও করুণা পূর্ণ একটি দৃষ্টিলাভ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান —আমার শয়ন ঘরের পার্শ্বস্থ শয়ন ঘর।

কাল —মে মাসের প্রথম ভাগ, ১৯৪৬।

কন্যা গীতা নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিল—

"হঠাৎ মনে হইল, যেন আমি শ্যামবাজারে স্থিত 'সারদেশ্বরী-আশ্রম' নামক স্কুলে পাঠ করি এবং উহার পরিচালিকা দুর্গাদেবী আমায় বলিতেছেন, 'বাসন্তি! এই মানচিত্র অঙ্কনের রঙের বাক্সটা রাখিয়া দাও, পরে তোমার দরকার হবে।' আমি উহা গ্রহণ করিয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন না—যেন উহা লইবেন না, এই ভাব! এমন সময় স্কুলের ছুটী হইলে বাহিরে আসিয়া দেখি যে বাবু, মা, ছোড়্দি ও আমার একটি বন্ধু আমাকে বাড়ীতে লইবার জন্য উপস্থিত। প্রথমে বাবু, আর তাঁহার পশ্চাতে পর পর আমি, ছোড়্দি, বন্ধুটি ও মা পথে চলিতে চলিতে একটি ফটকওয়ালা স্থানে বাবুর ইচ্ছায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে একটি অতি বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল এবং তাহার উপরে একটি হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট ও অতি সঙ্কীর্ণ, এক পা রাখিবার উপযুক্ত পথ, গোলকধাঁধার মত চারি দিকে ব্যাপ্ত ছিল। পথটি অতিক্রম করিয়া, হ্রদের অপর পারে বাবুর ইচ্ছায় আমরা দুইজন যেন বেলুড় মঠের দিকে আনন্দচিত্তে চলিলাম, কিন্তু আমাদের পশ্চাতে মা ইত্যাদি যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কাহাকেও দেখিলাম না। তৎপরে, যেখানে যাইলাম তাহা বাস্তবতঃ বেলুড় মঠ নহে—স্বরূপে হইতে পারে! সেইস্থানে,

একটি দীর্ঘ দালান এবং তাহার পশ্চাতে একটি সেইরূপ দীর্ঘ ঘর ছিল। দালানের এক পার্শ্বে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বাহির দিকে মুখ করত আসীন ছিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি গেরুয়া বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী উপবিষ্টভাবে জোড়হস্তে তাঁহার স্তবাদি করিতেছিলেন। আমরা দুইজনে দালানে উঠিয়া যখন রামকৃষ্ণদেবের বামদিকে দাঁড়াইলাম, তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া তিনি একবার কৃপা-কটাক্ষে আমাদের দিকে তাকাইলেন। বাবু করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চরবে বলিতে লাগিলেন—

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥

তাহার পর, আমিও রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিলাম। ঐ স্থানের সংলগ্ন ঘরের একটি খোলা জানালা তাঁহার পিছনে দক্ষিণ পার্শ্বে ও একটি বন্ধ দরজা তাঁহার পিছনে বাম পার্শ্বে দালানের মধ্যস্থলে ছিল। ঘরের ভিতরে, মা ঠাকুরাণী কতক-গুলি স্ত্রীলোকের সহিত উপবিষ্টা ছিলেন। বাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দরজাটির নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দক্ষিণাবর্তে দালানটি ঘুরিয়া ঘরের পিছনের একটি খোলা দরজা দিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করত, বাবু যে দরজাটির বহির্দেশে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থানে আসিতেই, তিনি বন্ধ দরজাটি খুলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং মা ঠাকুরাণী তাঁহার নিকট আসিলে, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মা ঠাকুরাণী বাবুর মাথায় হস্ত ন্যস্ত করত আশীর্বাদ করিলেন ও একবার মুখের দিকে কারুণ্যপূর্ণ ভাবে চেয়ে দেখিলেন। তাহার পর, শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার দুটি পা জড়াইয়া আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম এবং একবার আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম, 'মাগো! আমাকে উদ্ধার কর, মা!' এই কথা শুনিয়া তিনি যেন বিশেষ সহানু-ভূতিপূর্ণভাবে আমার দিকে একটি অনির্বচনীয় সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এখানকার শ্রীমার আকৃতি খুব রোগা ও তাঁহার বয়স অনেক হইবে। তাহার পর, ঘরের ভিতরে তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের দুইখানি খুব সুন্দর ছবি দেখিবার পর, নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

স্বপ্নটি বড় বটে, কিন্তু দেখিতে অধিক সময় লাগে নাই।

২। স্বপ্নটি গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ এবং ইহার সমস্ত ব্যাপারের গূঢ়ার্থ নির্দেশ করা বড় কঠিন। যতটুকু অনুমান করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিলাম। সারদেশ্বরী আশ্রমের পরিচালিকা দুর্গাদেবী, শিক্ষাদাতা গুরুরূপেই, গীতাকে রঙের বাক্সটি দিয়াছিলেন; কারণ, গুরুর সহিত আদান-প্রদান অবৈধ—

ঘ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ। ঐ বাক্য দিয়া গুরুভাবিনী ও আত্মরূপিণী তিনি গীতাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যে তাহার জীবন অদ্ভুত, বৈচিত্র্যপূর্ণ, ও মানচিত্রবৎ হইবে, এইরূপ অনুমান হয়। আ পর্বের প্রথমাংশও যেন একই বিধ আভাস বটে। অপ্রাকৃত জ্যোতির্ময় পথ-সমন্বিত হ্রদটি অতিক্রম করিবার পর যে শরদিন্দু ও অন্যান্য সঙ্গিনীদিগকে দেখা গেল না, ইহার হেতু মনে হয় যে, তাঁহারা উহা পার হন নাই। ইহার কারণ নিম্নে অনুমানে লেখা হইয়াছে। আমার ইচ্ছাতেই, গীতা ও আমি অপ্রাকৃত পথে চিন্ময় রামকৃষ্ণ-ধাম বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। ঐ অপ্রাকৃত ধাম যাইতে হইলে যে দুর্গম, সঙ্কীর্ণ, হীরকসম চিন্ময় প্রভাবিশিষ্ট ভক্তি মার্গ অবলম্বন প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। উহাতে পৌঁছিয়া পিতা ও কন্যা উভয়ে যে-কৃপা রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা অনির্বচনীয় ও সুদুর্লভ। সমাধিভঙ্গ করিয়া রামকৃষ্ণের আমাদিগের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ, সারদেশ্বরীর আমার মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া আশীর্বাদ ও তাঁহার আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কারুণ্যভাব প্রকাশ— এই সব বড় সাধারণ আধ্যাত্মিক বিভূতি নহে—'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়!' রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরী যে উভয়েই শ্যামা, তাহা পূর্বে স্থানে স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধক গাহিতেছেন—

শ্যামা ধন কি সবাই পায় রে,   কালী ধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন-বুঝে না একি দায়।
শিবেরও অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়!
নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥

ষোড়শ বর্ষীয়া, নিতান্ত অবোধ বালিকা গীতার, স্বপ্নে মা সারদেশ্বরীর দুটি পা জড়াইয়া ক্রন্দন ও আবেগভরে তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ ভিক্ষা, বহু জন্মার্জিত সাধনার ফল। 'উদ্ধার' কাহাকে বলে সে নিশ্চয়ই ঐ বয়সে অবগত ছিল না। সারদেশ্বরীর প্রেরণাতেই সে ঐরূপ বিজ্ঞোপম প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইরূপ একটি আন্তর প্রেরণাবশেই আমি রামকৃষ্ণকে পিতৃভাবে স্তব করিয়াছিলাম। কারণ, তাঁহার যথার্থ স্বরূপের—*অবশেষ কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৩)—*কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইতে, কখনও তো তাঁহাকে পিতৃভাবে চিন্তা করি নাই—যদিও সারদেশ্বরীকে মাতৃভাবে করিতাম। গীতার এই

স্বপ্নটিই, আমাকে রামকৃষ্ণদেবকে যেন পিতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা দিল—যদিও, আমি তাঁহাকে ভবতারিণীরূপে 'মা' বলিয়া চিন্তা করিতেই অভ্যস্ত। সারদেশ্বরী যখন আমার মাতা, তখন রামকৃষ্ণ তো পিতাই বটে! গুরুরূপে, তাঁহারা আমার এই ভুল অদ্ভুতভাবে সংশোধন করিলেন। ঈশ্বরই সকলের পিতা, মাতা, পিতামহ, কর্ম, কর্মফল, কর্মফলদাতা, পোষণকর্তা, প্রভু, ভেষজ, মন্ত্র, হোমের ঘৃত, হোমাগ্নি, হবনক্রিয়া, কাল, নিয়তি ইত্যাদি (গীতা : ৯-১৬, ১৭, ১৮)—অধিক কি, সারা বিশ্বে যাহা কিছু ছিল, আছে ও থাকিবে সবই আত্মরূপী তিনি এবং অন্য কিছু নাই (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ ও ১৬ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। গীতার স্বপ্নদৃষ্ট অপ্রাকৃত ও চিন্ময় রামকৃষ্ণ ধামের যে বর্ণনা উপরে আছে, আমাকে ও তাহাকে উপলক্ষ্য করত পরে উহার কোন প্রাকৃত অভিব্যক্তি হওয়া সম্ভব। মন্দিরটি কি মণিদ্বীপোপম হইবে? শরদিন্দু যে ঐ ধামে যাইলেন না তাহার কারণ কি যে, তাঁহার প্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণধাম যদি স্থাপন হয়, তাহা চিন্ময় রূপে গোলোকোপম হইবে—মণিদ্বীপোপম নহে? স্বপ্নটি হইতে আরও মনে হয় যে, চিন্ময় রূপে বেলুড়মঠ একাধারে কৃষ্ণধাম গোলোক (ছ ও জ পর্ব) ও আদ্যাধাম মণিদ্বীপ এবং আমরা যদি বেলুড়ের গঙ্গা পারে আলমবাজারে গঙ্গার নিকটে মন্দিরগুলি স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে উহারাও চিন্ময় রূপে একাধারে বেলুড়মঠ, গোলোক ও মণিদ্বীপ সম হইবে। যখন আমার ও শরদিন্দুর এবং আমার শয়নঘরের ও শরদিন্দুর ঠাকুরঘরের চিন্ময় রূপ আছে (এ, অ ও আ পর্ব), তখন উক্ত অনুমান অমূলক নহে। এই স্থলে পরে ২৫ পর্বস্থ 'কৃষ্ণ-রঙ্গিণী'র বন্দনাটী দ্রষ্টব্য। নামটি আমার মাতৃনাম এবং কৃষ্ণ, কালী ও রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী অশেষ আয়োজনে ঐ নাম পরে ধারণ করিবেন। যদি মন্দির নির্মাণে সমর্থ হই, তাহাতে উঁহারা স্থাপিত হইবেন—অতএব, উহার নাম আমার মাতৃ নামানুযায়ী ধাম' হইবে। এই পর্বস্থ স্বপ্নটি যেন ঐ নামের সহিত উহার চিন্ময় রূপের সমন্বয় সাধন করিল। নামটির সহিত পিতৃনাম ('সুরেশ'—শিবলিঙ্গ) যোগেরও বেশ ইঙ্গিত এই স্বপ্ন দিতেছে। পূর্বে গীতার যে স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছিল, এই পর্ব তাহা আরও বিস্তৃত করিল। গীতাও নিজ স্বপ্নে নিজের ও আমার কিঞ্চিৎ স্বরূপ আরও জ্ঞাত হইল। জগদম্বা যে তাঁহার কৃপার পাত্রদিগের আত্মীয়গণকেও যোগ্যতানুযায়ী কৃপা করেন, গীতার স্বপ্নগুলি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাহার প্রথম তিনটি স্বপ্ন, তাহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারিণী সন্তান রূপে প্রদর্শন করিল!

অতীন-হনুমান

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনং।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ॥

মহান্ পরম আমি, জানিলেই ধন্য তুমি,
সর্বত্যাগী হবে ছাড়ি কাঁচা আমি-আমি।
সর্বত্যাগে মহাজ্ঞান, বিশ্বের আশ্রয় স্থান,
সর্বত্যাগে সর্ব ভব করতলে পাবে।
সর্বত্যাগী আকাশ তো সূর্যাদির স্থান,
সর্বত্যাগী আত্মাই তো অখিলের প্রাণ।

বিষয়—নিরাকার গুরু শিবাবতার হনুমানদেবের আবির্ভাব, শরদিন্দুর হস্তপক অন্ন-ব্যঞ্জন দুইবার ভোজন, দ্বিতীয়বার আমার সহিত একত্রে ভোজনের সময় অনবধানতা বশতঃ তাঁহার অন্নপাত্রে আমার একখণ্ড উচ্ছিষ্ট বেগুনখোসা নিক্ষিপ্ত হইলেও, তাঁহার উহা অগ্রাহ্য করণ ও এইরূপে আমার সহিত তাঁহার 'সখ্য'-সম্বন্ধ স্থাপন—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৫ই মে, ১৯৪৬—বেলা আন্দাজ তিনটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন হনুমানদেব আসিয়াছেন এই সংবাদ অদৃশ্য কেহ আমায় দিল। তাঁহাকে দেখিতেছি না, অথচ গদ্‌গদ হইয়া অনবরত অশ্রু বর্ষণ করিতেছি—এমন কি, ভাবপ্রাবল্য বশতঃ তাঁহাকে একটিও প্রণাম পর্যন্ত করিতেছি না। মনে মনে বিশেষ দুঃখ ও অভিমান অনুভব হইতে লাগিল যে, তাঁহার উপযুক্ত কোন অভ্যর্থনাই হইতেছে না—এমন সময়, কোথা হইতে জানি না অদৃশ্য শরদিন্দু তাঁহার প্রীত্যর্থে অদৃশ্য প্রচুর অন্ন ও ব্যঞ্জন দিলেন এবং তিনি নিরাকার ভাবেই তাহা অতি অল্প কাল মধ্যেই উদরস্থ করিলেন। তখন, ঠিক বুঝিলাম না অদৃশ্য কাহার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া, তিনি বলিলেন যে, ভোজন সম্পূর্ণ হয় নাই এবং মুগের ডাল হইলে ভাল হইত। পর মুহূর্তেই অদৃশ্য শরদিন্দু, যেন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াই, দুই থালা

অদৃশ্য ভাত ব্যঞ্জনাদি সহ পরিবেশন করিলেন, কিন্তু অল্প পরিমাণে। এক থালাতে আমি ও আমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ থালাতে তিনি (নিরাকার ভাবেই) উপবিষ্ট হইলাম। তিনি পাত্রের মধ্যস্থলে সমস্ত ভোজ্য পদার্থ একত্রে মিলাইয়া অদ্ভুত দ্রুতভাবে খাইতে লাগিলেন। আমি ভুলক্রমে উচ্ছিষ্ট একখণ্ড বেগুনের খোসা আমার পাত্রের পার্শ্বে ফেলিবার কালে, তাঁহার পাত্রের উপর ফেলিয়া ভয়ে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তিনি ঐ ঘটনা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। উক্ত সমস্ত কার্য ও ঘটনা অদৃশ্যভাবেই হইয়াছিল—কারণ, স্বপ্নান্তে কাহার বা কিছুরই আকৃতি আমার স্মরণপথে আদৌ উদয় হয় নাই। অথচ, পূর্ণ অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস ছিল যে, হনুমানদেবই আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার খাইবার ভাব ও অন্যান্য আচরণ ঠিক মানবের ন্যায় নহে। বেগুনের খোসাটির বিষয় একটু সন্দেহ কিন্তু ছিল—উহা সাকার হইতেও পারে! তাঁহার দ্বিতীয় ভোগে শরদিন্দু নিশ্চয় মুগের ডাল দিয়াছিলেন (কারণ, ভোজ-ব্যাপারে বেগুন-ভাজা মুগের ডালের অঙ্গ), কিন্তু এই বিষয়ে আমার কোন অনুভূতি হয় নাই। আত্মাকাশে প্রকটিত এই স্বপ্নে, হনুমানদেব আমার সহিত 'আত্মা' ও 'সখ্য' সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন—কারণ, সাধারণতঃ এই দুই সম্বন্ধের দ্বারা উচ্ছিষ্ট ভোজন করা চলে। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৪ (৩) অনুচ্ছেদে রামকৃষ্ণদেবের উক্তি, যে তাঁহার আত্মস্বরূপ ও অভেদ প্রাণোপম প্রিয় বিবেকানন্দের উচ্ছিষ্ট তামাক সেবনে দোষ নাই, দ্রষ্টব্য। গুরুই সখা, ঈশ্বর ও আত্মা (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৪ অনুচ্ছেদ)। ঈশ্বরকে আত্মার ন্যায় প্রিয় ও গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, এই দুই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, 'জীবন্মুক্তি' লাভ হয় (৯ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য যে, যখন ঐ সম্বন্ধ উল্টা দিক হইতে —*অবশেষে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৪)—*স্থাপিত হয়, তখন 'বরণ'-রূপে পরিণত হইয়া অচ্ছেদ্যভাব ধারণ করে। বিনা দেহাত্মবোধ ত্যাগ ও আত্মনিবেদন, ঈশ্বর বা গুরু সহ এই আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। ১৭ পর্বস্থ স্বপ্নে আমার যে 'জীবন্মুক্ত' স্বরূপ প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা ১৮ ও এই পর্ব দৃঢ়ীভূত করিল। পরে, ইহাদের অপেক্ষাও অদ্ভুত স্বপন ও ঘটন আরও প্রকাশ হইবে। সবই সর্বময়ী (৩ অনুচ্ছেদ) আত্মার কৃপা মাত্র! হনুমান, শিব, রামকৃষ্ণ, ইত্যাদি, সকলেই তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তির অধীন!

৩। ৯ পর্বে আলোচিত স্বপ্নে, শিবারূপিণী আত্মাশক্তি মা সারদেশ্বরী আমাকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি আমার অভেদ আত্মা এবং বিশ্বে জ্ঞাতা-

জ্ঞেয়-জ্ঞান ইত্যাদিরূপে বাস্তবিক নানা বস্তু নাই এবং সবেরই মূলে বোধ-স্বরূপ আত্মা, অদ্বয় আমি। অতএব—

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

১৩ পর্বস্থ স্বপ্নে, এই শিক্ষাটি আরও ঘনীভূত হইয়াছিল—***অবশে কলমের খোঁচায় ও কালির দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৫)।** গীতায় (৬-২৯) ভগবান কৃষ্ণ বলিতেছেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

এই পর্বস্থ স্বপ্নে, শিবরূপী শ্রীহনুমান সেই এক তত্ত্বজ্ঞান আমাকে গুরুরূপে আরও অদ্ভুত আয়োজনে দান করিলেন। এইরূপে, শিব-শিবা দুই গুরুই যেন এক জোটে আমাকে বিশ্বরূপী নিজ আত্মভাবে বরণ করিলেন। আমি বুঝিলাম যে, জ্যোতির্ময়ী সগুণব্রহ্ম শ্রীদেবীর স্বরূপ আমার আত্মার ভিতরে এই কাহিনীটির অনুভূতি যেন নিরাকার ভাবে কেবল বোধ ভিত্তিতে ঘটিল এবং এই ঘটনার ভিতরে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্যও ছিল—যেমন, অন্নাদির উৎপত্তি ও পরিণতি। নিরাকার (বা না হইবার ন্যায়) ভাবে ঘটিলেও, আমার বোধ (বা অনুভূতি) কিন্তু এত প্রবল ছিল যে, কিছু হয় নাই এই কথা আমার স্বীকার করা অসম্ভব। আরও আমি বুঝিলাম যে, হনুমানদেব, শরদিন্দু ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সবই কেবল চিন্মাত্র স্বরূপ, নিরাকার ব্রহ্ম—***অবশে কালির দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৬)।** অতএব, বিশ্বের সবই শ্রীরাম, বা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ। শাস্ত্র মতে, পাত্রদ্বয়স্থিত জল যেমন এক পদার্থ, সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয় একই পদার্থ, বা পার্থক্যহীন নির্মল চিদাকাশ—যাহা হইতে এই নিখিল বিচিত্র পদার্থ-সমূহের অনুভূতি উদিত হইয়া যাহাতেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। যেমন একটি ভাত টিপলে হাঁড়ির সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝা যায়, সেইরূপ এই স্বপ্ন হইতেই বুঝিতে হইবে যে, বিশ্বে সমস্তই অদ্বয় নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিত আছে, যদিও সগুণ ব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াছে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহাতে লীন হইতেছে এবং উহাই সর্বোপকরণ সম্পন্ন। আমার গুরুদেব আত্মা, স্বপ্নটিতে সমস্তই নিরাকার ভাবে প্রকটিত করিয়া ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে—বাহ্য বিশ্ব বাস্তবিক নিরাকার ব্রহ্মময়—যেন উহাতে কিছু আছে মনে হইলেও, বাস্তবিক কিছু নাই; আর যদি কিছু থাকে (এই ভাবই বলবত্তর) —***অবশে কলমের খোঁচায় ও কালির দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৭)**

—*যেমন উক্ত স্বপ্নে নানা ঘটনার অনুভূতি মাত্র, তাহাও আত্মাতেই রহিয়াছে। সুতরাং, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। শরদিন্দু, হনুমানদেব, অবতারগণ, সকল ঈশ্বর-ঈশ্বরী মূর্ত্তি ও এই নিখিল অবস্তু বিশ্বপদার্থ এবং এই সকলের সার্বকালীন সর্ববিধ স্পন্দন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সদাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মসাগরে অহং-ভাবে বুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে ও বুদ্‌বুদের ন্যায় ডুবিয়া যাইতেছে। ইহাই সদাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মের জগৎ-লীলা—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় চক্র! কিন্তু, বাস্তবিক কিছুই উৎপন্ন বা বিনিষ্ট হইতেছে না, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর একটি জীব বা বস্তু নাই এবং বিশ্ব নিরাকার চিন্মাত্র ব্রহ্মেরই অবিদ্যাবশে কল্পিত অনন্তরূপ এবং অখণ্ডভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপ। ইহা নিরাকার ও নিরুপাধিক ভাবে অচল, অটল ও সুমেরুবৎ হইয়াই চির-বিদ্যমান এবং ব্যবহারবান্ হইয়াও ইহাতে সকলে পাষাণবৎ নিশ্চেষ্ট। জগৎসত্তা বেতালপুরবৎ অবস্তু বা মিথ্যা—কারণ, ব্রহ্মে নানাবিধ বিশ্ব গঠনোপযোগী কল্পনা থাকিলেও, বাস্তবিক কোন ভাবাভাব নাই এবং কল্পনা যখন মিথ্যা, কল্পনোদ্ভূত সবই মিথ্যা! বিশুদ্ধ চিদাকাশ কোনরূপ আকার—*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৮)—*ধারণ না করিয়াও, কল্পনোদ্ভূত অবস্তু মায়ার দ্বারা আবৃত থাকিবার নিমিত্ত, এই জগৎ উহা হইতে বিভিন্ন বোধ হইতেছে। কিন্তু, বাস্তবিক মায়া চিদাকাশের বিন্দুমাত্রও আবরিত করিতেছে না—যেমন, ধূম আকাশে থাকিলেও উহাতে আদৌ সংশ্লিষ্ট হয় না। যেমন লবণে জারিত নেবুর প্রতি অণু ও পরমাণুর ভিতর নিরাকার লবণ, সেইরূপ এই বিশ্বের সকল মায়িক পদার্থের অণু ও পরমাণুর ভিতর অখণ্ড নির্গুণ ও সগুণ চিদাকাশ পরিব্যপ্ত রহিয়াছে ও উহাই ('রাম' বা 'শ্রীরাম') তাহাদের যথার্থ স্বরূপ এবং বাহ্য যাহা কিছু সবই মিথ্যা, নানাবিধ কল্পনোদ্ভূত মিথ্যা বস্তু—যেমন বন্ধ্যার পুত্র, মরুভূমে জল ও শূন্যে বৃক্ষ-পর্বতাদি। জলে জলই, অগ্নিতে অগ্নিই, বায়ুতে বায়ুই বর্ধিত হয়—সেইরূপে, ব্রহ্ম স্পন্দনোদ্ভূত জগৎ ব্রহ্মই এবং ভেদবিকারাদি যাহা প্রতীত হয় তাহাও তদ্রূপ! এই সকল মিথ্যা মায়িক উপাদানে (বা: জড়-চিতের সংমিশ্রণে) শ্রীদেবীর বাহ্য বিশ্বরূপ গঠিত। জগৎ কল্পনোদ্ভূত ও অহং-ভাবাপন্ন ব্রহ্মের এক প্রকার দীর্ঘ স্বপ্ন। যেমন স্বপ্নাবস্থার কল্পনায় স্বপ্নানুভূত সমস্তই পূর্ণ সত্য, তেমন যতদিন কাল্পনিক অহং-ভাব বা দেহ ও দৃশ্য বস্তুর সত্যতা বোধ, ততদিন এই জগৎও সত্যাদপি সত্য এবং সেই ভাবে জগৎ সত্তাও সত্য। দ্বৈতপ্রপঞ্চ বাস্তবিক না থাকিলে-ও—*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৩৯)—*মন (জড়-চিতের কাল্পনিক মিলনে সৃষ্ট) হইতে প্রকাশিত হইতেছে এবং সেই

মনও মিথ্যা! এই অহং বা মন নাশে, বা বাসনা ত্যাগেই মুক্তি। স্বরূপ মনোনাশে, বা জ্ঞেয় বাসনাত্যাগে, মায়িক বিশ্ব আছে বোধ হইলেও, উহা সৎস্বরূপ আত্মাময় বোধ হইবে। অরূপ মনোনাশে, বা ধ্যেয় বাসনাত্যাগে, উহা সৎস্বরূপ ব্রহ্মময় বা মিথ্যা বোধ হইবে। এই প্রসঙ্গে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ ও ২৫-২৭ অনুচ্ছেদ বিশেষ দ্রষ্টব্য। আমিই মহাকালী 'শ্রীদেবী' (সগুণব্রহ্ম), অর্থাৎ আত্মারূপে এই অখিল বিশ্ব. এবং আমি ভিন্ন কিছুই নাই; আর আমিই 'রাম' (নিগুণ ব্রহ্ম), অর্থাৎ আত্মারূপে নিখিল নিরাকার পরমাত্মা। ব্রহ্মের স্পন্দশক্তিই মায়া (কালী)। পবন ও পবনস্পন্দন এবং অনল ও উষ্ণতা যেমন একই পদার্থ, সেইরূপ ব্রহ্ম ও মায়া সর্বদা এক, কদাচ পৃথক নহে। ব্রহ্মেচ্ছা স্পন্দন-শক্তিই মরুমরীচিকাবৎ এই জগৎ প্রকাশ করিতেছে—পূর্বে পাদটীকা (২) পর্ব ১।

অষ্টাবক্র সংহিতা বলিতেছেন—

আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ॥

অর্থাৎ, সমস্ত বিশ্বই ঈশ্বর (বা আত্মা) স্বরূপ এই জ্ঞান হইলে মানব যদৃচ্ছাচারী হইলে কোন দোষ নাই। বুঝিতে হইবে যে—যিনি ষড়বিধ চৈতন্যযুক্ত মায়া বিশ্ববস্তুকে অন্তর্যামী আত্মারূপে সচেতন রাখেন, যিনি নিজ মায়াশক্তির দ্বারা তাহাদের ত্রিবিধ দেহ স্পন্দনের নিয়ন্তা ও সকল বস্তুই অবশে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে যাঁহার ইচ্ছাধীন (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ২০-২১ অনুচ্ছেদ), তিনিই ঈশ্বর। অতএব, বিশ্বের সর্ব স্পন্দনেই মানবের কর্তৃত্বাভিমান, সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এই সকল বস্তুই বাস্তবিক মরু-মরীচিকাবৎ মিথ্যা, কল্পনার মিথ্যা অভিব্যক্তি মাত্র। শিব বলিতেছেন যে, মানব যদি বিশ্বকে অহর্নিশি নিরাকার চিন্তা করে, তাহা হইলে তৎসম হইয়া চিদাকাশে বিলয় হয় এবং অষ্টসিদ্ধি ও সকলের প্রিয়ত্ব লাভ করে। সেই ব্যক্তি এক বর্ষ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করে এবং শূন্যধ্যানে ক্ষণার্ধকালও স্থির হইতে পারিলে, প্রকৃত যোগী ও ভক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, নির্গুণ পরব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাতে নির্মল মন ধারণা করিলে, পরমানন্দ লাভ হইয়া সকল অভিলাষ ধ্বংস হয়। নিজেকে এইরূপে শুদ্ধ চিন্মাত্রে বিশ্রান্ত না করিতে পারিলে, জগৎকে মিথ্যা বোধে উপেক্ষা করা অসম্ভব। 'দৃশ্যমাত্রই অসম্ভব বা মিথ্যা এবং ভ্রান্তির পরিণাম'—এই পরম জ্ঞান ব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্মুখতা নিরোধ হয় না এবং দৃশ্য দর্শনের শান্তি হওয়া অসম্ভব। নিজ দেহ নাই, এই ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কোন ইষ্ট মূর্তিকে চিন্মাত্র ভাবিলে ও নির্গুণ ভাবনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কৈবল্য বা বিদেহ মুক্তি হয়

(১৭ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। সগুণ ব্রহ্মভাবকে মুখ্য, এবং নির্গুণ ব্রহ্মভাবকে গৌণ করিয়া অবস্থানই যুক্তি সঙ্গত—কারণ, দেহাভিমানী মানবের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ অতিশয় ক্লেশকর (গীতা, ১২-৫ ও ৮ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। এই বিশ্ব অহঙ্কার উপাদানে গঠিত—অতএব, এখানে অন্তরে দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিলেও, বাহিরে ' আমি ', ' তুমি ', ' তিনি ' ইত্যাদিরূপে ভেদ ব্যবহার অনিবার্য। যখন একটা কথা কহিতে গেলেও 'দুই' আসিয়া পড়ে, তখন সদা নির্গুণ ব্রহ্মভাব অবলম্বন সংসারীর কঠিন। ইষ্ট প্রেমিক ও অর্চনাসক্ত গৃহীর, সগুণ ব্রহ্মভাবই উৎকৃষ্ট। নির্গুণ ভাবে, বিশ্ব অদ্বয় অপরিণামী চিদাকাশ রূপেই চির-বর্তমান!

৫। শরদিন্দুর হস্তপক্ক অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দুইবার ভোজন করত, হনুমানদেব তাঁহার প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকেও যেন নিজ স্বজন, বা 'সখি' রূপে বরণ করিলেন। বহু ভাগ্যবলেই শরদিন্দু তাঁহাকে পর পর দুইবার ভোগ দিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে, সুদামা-চরিত হইতে কিছু লিখিতেছি। কৃষ্ণসখা, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা, বস্ত্রের খোঁটে সামান্য কিছু চিপিটক কৃষ্ণকে ভোজন করাইবার জন্য সুদূর দ্বারকায় গিয়াছিলেন। সাক্ষাতের পর, যখন কৃষ্ণ নিজে যাচিয়া উহার কিয়দংশ একবার গ্রাস করত পুনরায় গ্রাসে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন রুক্মিণী দেবী (স্বয়ং লক্ষ্মী) তাঁহার উক্ত কার্যে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি কি করিতেছ? আমাকে কি শ্রীভ্রষ্টা করিবার তোমার ইচ্ছা?' ভোজন ব্যাপারে, হনুমানদেবকে তৃপ্তি দান বড সহজ কার্য নহে। রাবণ বধান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হইলে, যখন লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবী স্বহস্তপাকে বানর—ভল্লুক বাহিনীকে ও বিভীষণের সহিত তাঁহার পারিষদবর্গকে ভোজ দিয়াছিলেন, তখন হনুমানদেবকে ভোজন করাইবার কালে তাঁহার অন্নভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই বিপদে, সীতাদেবী হনুমানদেবের পশ্চাৎ হইতে তাঁহার মস্তকে ' শিবায় নমঃ ' মন্ত্রে পূজা করিলে, তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল এবং সীতাদেবী নিজ মান রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সীতার তাঁহাকে উক্ত বিধ অর্চন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁহার আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন, যেন তুল্যফলদায়ী হইয়াছিল। লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষার্থে অতি অল্প কালের মধ্যে হিমালয় হইতে লঙ্কায় গন্ধমাদন পর্বত বহন তাঁহার এক অক্ষয় কীর্তি! অমিত বিক্রমশালী বলিয়া তাঁহার এক নাম ' মহাবীর ' এবং শিশুকালে মাতৃকোল হইতে সূর্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে জবা-পুষ্পগুচ্ছ জ্ঞানে ধরিবার ইচ্ছায়, এক লম্ফে তাঁহার রথ ধারণ করিয়াছিলেন। দ্বাপর যুগে, বনে এক ছোট রুগ্ন বানররূপে ভীমের গন্তব্য পথ রোধ করিলে, ভীম তাঁহার অযুত হস্তীতুল্য সমস্ত শক্তির দ্বারা বানরটিকে এক তিলও হটাইতে

পারেন নাই। এইরূপে ভীমের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিজ পরিচয় দিলে, ভীম তাঁহার যথার্থ মূর্তি দর্শনের অভিলাষ জানাইলে, তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'আমার ভীষণ রুদ্র মূর্তি দ্বাপর যুগের মানব দর্শনে সক্ষম নহে'। হইতে পারে যে, এই জন্যই তিনি আমাকে সাকার রূপে কোন বারই দর্শন দিলেন না।

৬। আমার সহিত 'সখ্য' সম্বন্ধ স্থাপনের এক উদ্দেশ্যে, হনুমানদেব স্বপ্নটি আমার আত্মায় প্রকট করিয়াছিলেন এবং প্রথম ভোগে আমাকে পার্শ্বে খাইবার সঙ্গীরূপে পান নাই বলিয়াই, তাঁহার সেই ভোগ তৃপ্তিদায়ক হয় নাই। তাঁহার মনোভাব যেন বুঝিয়াই, শরদিন্দু দ্বিতীয় ভোগে তাঁহার বাম পার্শ্বে আমার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং দুইজনকেই অল্প পরিমাণে (আমার উপযুক্ত) অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়াছিলেন। আমার উচ্ছিষ্ট ভোজনের পরেই যেন তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছিল, এবং তিনি তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল আচরণে, আমার ও শরদিন্দুর প্রতি তাঁহার প্রেমের স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। গুরুগীতা মতে, শিষ্যের গুরু-পাদোদক ও গুরু-উচ্ছিষ্টান্ন সর্বোৎকৃষ্ট পেয় ও ভোজ্য বস্তু। এই ক্ষেত্রে, তাহার উল্টাই হইল কৃপাময়ের বিধি! হায়! হায়! অধম আমি কি এইরূপ শিব-কৃপার উপযুক্ত পাত্র? তারকেশ্বর মন্দিরেও এইরূপে তাঁহার কৃপা ও প্রেম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্বপ্নটির পূর্বে আমার মাঝে মাঝে মনে হইত, 'যদি গুরুদেব কৃপা করিয়া আমায় একবার জানান তাহার দত্ত মন্ত্রের আমি সঠিক ব্যবহার করিতে পারিতেছি কি না, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।' বলা বাহুল্য যে, এই স্বপ্নটি যেন সেই মনোবৃত্তির উত্তর! বাস্তবিক যখন সবই 'আত্মা', তখন ঐরূপ কোন চিন্তা অনর্থক! ব্রহ্মে বা আত্মায় সর্বসমর্পণ করিতে পারিলে, আর কোন বিষয়ে ভয়ের কারণ থাকে না এবং শাস্ত্র বিধি-নিষেধ পালন করা, বা না করা, তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। সদ্‌গুরু অপেক্ষা মানবের অধিক বন্ধু বা পূজনীয় কেহই নাই। রামকৃষ্ণদেব গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের বিষয় এইরূপ বলিতেছেন—"গুরু যেন সখী—যতদিন না কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন হয়, ততদিন সখীর কার্যের বিরাম নাই। সেইরূপ, যতদিন ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন না হয়, ততদিন গুরুর কাজের শেষ হয় না। এইরূপে মহামহিমান্বিত গুরু, শিষ্যের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব রাজ্যে ক্রমে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে ইষ্টের সম্মুখে আনিয়া বলেন, 'ও শিষ্য, ঐ দেখ'! এই বলিয়া গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন!"

[৭ পর্বে বন্দনা দ্রষ্টব্য]

যতীন-শ্রীচৈতন্য

চৈতন্য-চরিতামৃত

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্! সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কালৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ—কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

বিষয়—চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টায় আমার বাধা দান—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৬ই জুন, ১৯৪৬—বেলা আন্দাজ চারিটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন একটি গৌরবর্ণ, গেরুয়া বস্ত্রধারী, ঝাঁকরা ও কোঁকড়ান চুলবিশিষ্ট, যুবক সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। আমি উহাতে অস্বীকৃত হইলেও, তিনি পুনঃ পুনঃ লইয়া যাইতে জেদাজেদি করিতে লাগিলেন—এমন কি, এক হস্তের মণিবন্ধ সবলে ধারণ করিলেন। আমিও সবলে অপর হস্তের দ্বারা তাঁহার হস্ত ছাডাইবার জন্য উহার কনুইয়ের নিম্নদেশ ধরিতে গিয়া অনুভব করিলাম যে, তাঁহার দেহ যেন হাড়মাসে গঠিত নহে এবং যত আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল যে, উহা এক প্রকার বায়বীয় বা শূন্য পদার্থে গঠিত। যখন ধরিতে অক্ষম হইলাম, তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া অদৃশ্য হইলেন ও আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।"

হাস্যটি যেন স্পষ্ট বুঝাইয়া গেল, 'আমাকে ধরিবার শক্তি তোমার নাই, কিন্তু আমি তোমাকে ধরিতে পারি ও ধরিয়াছিলাম।' পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল যে—*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৪০)—*ঐ মূর্ত্তি আমি এক ছবিতে চৈতন্যদেবের মূর্ত্তিরূপেই দেখিয়াছিলাম। তখন মনে বিশেষ দুঃখ হইয়াছিল, কারণ তাঁহার বার বার সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু অনুতাপের যে কোন হেতুই ছিল না তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্বাপ্ন-দেহ চিদাকাশ—উহাতে ধরা, বা না ধরা, অনুভূতি মাত্র!

২। ১৯৩৮ সালে হনুমানদেবের নিকট হইতে স্বপ্ন দীক্ষা লাভের পূর্বাবধি, আমি চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট সাধন পন্থা (হরিনাম করণ, কীর্তন ইত্যাদি) ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত প্রায় ৫-৬ বর্ষকাল অবলম্বন করিয়াছিলাম এবং উহাতে প্রীতি লাভ করিতাম। বত্রিশাক্ষরী বা ষোড়শ হরিনাম মালাযুক্ত তারকব্রহ্ম মন্ত্র, আমি বিশেষ ভক্তির সহিত অবসর কালে জিহ্বায় রাখিতাম এবং এই বিষয়ে দেশ-কালাবস্থার দিকে কোন লক্ষ্যই আমার থাকিত না। ১৯২৮ সালে, দুর্গাদেবী যে আমার দেহে মিলিতা হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে, আমি কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিব, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ—কারণ, তাঁহার কতকগুলি প্রচলিত নাম এইরূপ—কৃষ্ণপূজিতা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণবল্লভা, কৃষ্ণরূপিণী, কৃষ্ণানন্দ-প্রদায়িনী, কৃষ্ণভক্তি-দায়িনী, কেশব-অর্চিতা। এই স্থলে, একটি কাহিনী লিখিবার যোগ্য। আমার কিশোর বয়সে, বাড়ীর উঠানে, রাত্রে আমার কালী-উপাসক তৃতীয় মাতুলের সঙ্গীবর্গ সহ হরিনাম কীর্তনের কালে, কোথা হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণা, ছিন্নবস্ত্রাবৃতা, বৃদ্ধা পাগলী হঠাৎ আবির্ভূতা হইয়া অদ্ভুত নৃত্যাদি করিয়াছিল এবং অল্পক্ষণ পরেই তিরোহিতা হইয়া শ্রোতাদিগকে হতভম্ব করিয়াছিল। পাগলীটি ছদ্মবেশিনী কালিকা হওয়া অসম্ভব নহে! কালী'ই কৃষ্ণ এবং শক্তিতত্ত্বে কৃষ্ণ-কীর্তন কালীরই কীর্তন। শ্রীচৈতন্য কালীই বটে (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ)। বহু দুর্ভাগ্য বশতঃ, মানবের নানা ঈশ্বর মূর্তিতে ভেদ বুদ্ধি উদয় হয়। চৈতন্যদেবকে আমি রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ রূপেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি—এমন কি, এই স্বপ্ন দর্শনের কিছু পূর্বে, পাড়ার এক হরিকীর্তন সভায় তাঁহার এক ছবির ধ্যান কালে উহার প্রীত-ভাব অনুভব করিয়াছিলাম। এই অবস্থায়—আমার আত্মস্থ প্রিয় তিনি যে স্বপ্নটি প্রকটিত করিয়া, সাধন বিষয়ে আমার নিয়তি অন্যরূপ ইহা বিজ্ঞাত করিবেন, তাহা সহজে অনুমেয়। স্বপ্নটির দ্বারা তিনি আমায় বুঝাইলেন যে, যদিও তিনি আমাকে তাঁহার সাধনমার্গী করিতে ইচ্ছুক, তথাপি আমার সাধনফল উহার অন্তরায়—যাহার জন্য, আমি তাঁহার সাদর আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলাম। ঐরূপ আচরণ বাহ্যতঃ—*অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান (৪১) —*আমার নিজ হইলেও, বাস্তবিক উহা তাঁহারই ইচ্ছা-প্রসূত, কেননা অন্তর্যামী আত্মাই বিশ্বের সর্বনিয়ন্তা। মোট কথা, সাধন পন্থা সকল প্রকৃতির এক নহে এবং বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ভাব, পথ ও গতি (ঘ পর্ব দ্রষ্টব্য)। অকপট বিশ্বাস ও ভক্তিতে কোন এক পন্থা অবলম্বিত হইলে, ঈশ্বর বা সদ্‌গুরুর কৃপাও লাভ হইতে পারে এবং তিনি বিভিন্ন উপায়েও হস্ত ধারণ করত

সাধককে উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে আরোহণ করিয়া ইষ্ট সমক্ষে লইয়া যান। সদ্‌গুরু ভিন্ন সঠিক সাধন মার্গ অবলম্বন অসম্ভব! সারদেশ্বরী, হনুমানদেব ও চৈতন্যদেব সকলেই অভিন্ন জগদ্‌গুরুরূপী, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং আমার আত্মস্থ—তথাপিও, আমার পক্ষে প্রথম দুইজনের প্রদর্শিত সাধন পথই মুখ্য এবং আর যাহা সবই গৌণ! মহৎ কৃপা বশে, চৈতন্যদেব আমাকে স্বপ্নটি প্রকট করত এই পরম তত্ত্ব-সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান দান করিয়া শিক্ষাগুরুর কার্য করিলেন (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, (১১) পাদটীকা)। আত্মাই গুরু, আত্মাই ঈশ্বর এবং সারা বিশ্বই আমার আত্মস্থ—অতএব, চৈতন্যদেবের এই কৃপা আশ্চর্যের বিষয় নহে! বিদ্যা-বুদ্ধি-অধ্যয়ন ইত্যাদির দ্বারা আত্মা লভ্য নহেন এবং যাঁহাকে আত্মা প্রিয় বোধে বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট আত্মা স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। শ্রীচৈতন্য যে আমাতে কৃপা-পরায়ণ, ইহাই আমার যথেষ্ট।

৩। মানব, যেরূপ আচার, ভাব ও সাধনার অধিকারী, তদনুরূপ পথে চলিলে ক্রমে নিষ্পাপ হইয়া সংসার-মুক্ত হয়। কিন্তু, ভুলিলে চলিবে না যে, এই বিষয়ে সদ্‌গুরুই তাহার একমাত্র পথ-প্রদর্শক এবং সর্ব দেবদেবী ও মন্ত্র সাধন, সর্বময়ী আত্মার সাধনার নামান্তর মাত্র। সর্ববিধ বস্তু ও মন্ত্রই পরব্রহ্ম ও আত্মা শক্তির স্বরূপ এবং হরিনামও তথৈবচ (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)। কলিযুগে হরিনাম জপ ও কীর্তনাদি, ভক্তিমার্গে বড় সামান্য সাধনমার্গ নহে এবং এই বিষয় প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। দুই যুগাবতার, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ, একবাক্যে বলিতেছেন যে, এই সাধনমার্গই কলিযুগে সাধারণের যুগধর্ম! ২রা জুলাই ১৯৪৭ সালে, বেলা তিনটায় দৃষ্ট এক স্বপ্নে আমার অন্তর আত্মা হইতে কে যেন বলিলেন যে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ হইতে বর চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে যেন তোতাপাখীতে পরিণত করা হয়, যাহাতে তিনি অহর্নিশি অবিরাম কৃষ্ণনাম করিতে পারেন। আত্মা যাহা প্রকট করিলেন তাহা কিছুতেই মিথ্যা হইতে পারে না—তবে, উহা কোন পুস্তকে পাঠ করি নাই। রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ চৈতন্যদেব, নিজে হরিনাম কীর্তনাদি করিয়া মানবকে ঐ সাধনপন্থা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। হরিনামের এমন মহিমা যে, নিরপরাধে উহা গৃহীত হইলে, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তিও লাভ হয়। কাশীতে প্রকাশানন্দ যখন তাঁহাকে সন্ন্যাসীর উপযুক্ত বেদান্ত মার্গে সাধনা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট রহস্যের ছলে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—

প্রভু কহে শুন দেব ইহার কারণ,
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন।

কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে প্রেমরত্ন ধন।
মূর্খ তুমি তোমা নাহি বেদান্তাধিকার,
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই শাস্ত্র সার।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম,
সর্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম।
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে,
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে।

শ্লোকটি নিম্নলিখিত রূপ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সারদা শরদিন্দুকে উক্ত ভক্তিমার্গ মুখ্যরূপে অবলম্বনই শিক্ষা দিয়াছেন।

৪। বেদান্তমার্গে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বড় কঠিন এবং জ্ঞানযোগের অধিকারী ব্যক্তি বিশ্বে অতি বিরল। ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ এই পুস্তকের প্রথম ভাগে নানাস্থানে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে (বিশেষতঃ, প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায়)। ব্রহ্মজ্ঞানী পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ এবং তাঁহার স্বেচ্ছাচারই বিধি। পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ইহাই বিদেহ, বা কৈবল্য, মুক্তি। তাঁহার অপার মহিমা প্রথম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে ৪০ (২) ও একাদশ অধ্যায়ে ৭ (১) অনুচ্ছেদে এবং পূর্বে নানা পর্বে উক্ত আছে। ভক্তি পথ বিশেষ ভাবে অবলম্বিত না হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভও অতি কঠিন। জগদম্বার বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই সব প্রাপ্তি হয় না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন যে, খুব উচ্চ আধার হইলে আর ভক্তির পথ ধরিয়া থাকিলে, একত্রে ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হইতে পারে (অবতরণিকা ৬ (১২) অনুচ্ছেদ ও পাদটিকা (১))। কিন্তু, যেমন চৈতন্যদেব জোর করিয়া বলিতেছেন যে, কলিযুগে হরিনাম বিনা মানবের পরিত্রাণে পায় নাই, সেইরূপ জোরেই মহাদেব মহানির্বাণতন্ত্রে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতীত এই যুগে কৈবল্যমুক্তি হয় না; যথা—

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ॥

কাহারও কথা ভুল, বা অগ্রাহ্য নহে। কৈবল্য, দেহান্তেই; কিন্তু ইষ্টধাম লাভে সাযুজ্যাদি মুক্তি, বিলম্বে—ব্রহ্মপ্রদা [খ পর্ব; পাদটীকা (৫) অনুচ্ছেদ ৪]। হরিনাম, নিরক্ষর সাধারণের ও অবলম্বন সহজ; কিন্তু গুরুর যখন কৃপা প্রকাশ পায়, তখনই বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণীয় ব্যক্তির ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষায় নির্বাণ লাভের অধিকার জন্মে। বিচার করিতে গেলে, ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা যে উচ্চতর সাধনমার্গ নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গীতায় (৭-৩) ভগবান বলিতেছেন যে, হাজার হাজার লোকের ভিতর কদাচিৎ কেহ আত্মজ্ঞান

লাভে প্রযত্নশীল হয়; আর সেইরূপ মুমুক্ষুগণের মধ্যেও, কচিৎ কেহ তাঁহাকে স্বরূপতঃ অবগত হইতে পারে। বিচার-পরায়ণ না হইলে, জ্ঞান মার্গে বিচরণের চেষ্টা বৃথা! বিচারাক্ষম সাধারণের পক্ষে নাম-সাধন উত্তম মার্গ।

৫। সব মার্গেই কোন না কোন প্রকার মুক্তি আছে। শ্রদ্ধা অনুযায়ী ফল-তারতম্য ঘটে। বৈধী ক্রিয়াযোগহীন এবং জ্ঞান, ভক্তি, ভাব ও প্রেম মার্গের সংমিশ্রণে গঠিত, একটি প্রেমলক্ষণা বিশ্ব ধর্ম, প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদে ও তৃতীয় নিবেদন, ৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গে একটু ঈশ্বর প্রেমরস মিশ্রিত না থাকিলে উহা নিরস ভাব ধারণ করে। সেইজন্য, মোটামুটি ভাবে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে খাঁটি জ্ঞানমার্গ এবং অর্চনাসক্ত গৃহীদিগের পক্ষে উক্ত প্রেমমার্গই প্রশস্ত (১৯ পর্ব, ৪ অনুচ্ছেদ)। এই দুই মার্গে বিশেষ পার্থক্য নাই (গীতা—১৮. ৫৫)। সঠিক প্রেমোদয়ে, জ্ঞান ক্ষীণ এবং সাধক একটি প্রেমের পিণ্ডে পরিণত হইয়া সংসার-জ্ঞান হীন হয়। 'আমি একমাত্র আত্মা এবং জ্যোতির্ময় চিদাকাশ, আত্মাশক্তি, ব্রহ্মই একমাত্র পূজ্য দেবতা'—এইরূপ একাভিমুখী চিন্তায় মানবের সকল দেবতার পূজা সিদ্ধ হয় এবং নানা ঈশ্বর মূর্তিতে ভেদবুদ্ধি অপগত হইয়া সকলের উপরেই ভক্তি ও প্রেম আগত হয় এবং তাঁহাদের আত্ম-স্বরূপতা লাভ হয় (প্রথম ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, পাদটীকা (১))। মহানির্বাণ তন্ত্র ইহাকে 'পরাপূজা' নাম অভিহিত করিয়াছে (৬ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। আত্মার ভিন্নরূপ, ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তিতে ভেদবুদ্ধি থাকিলে, সাধনার মূল সত্যে কুঠারাঘাত হয় এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত হয়। কিন্তু হায়! এই মূল সত্য প্রায় সর্বত্রই পদদলিত হইতেছে। অনেক বৈষ্ণব সেই জন্য হরিনামের ফল পান না। শুনিয়াছি—জানি না সত্য কি মিথ্যা—কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এমন প্রথা আছে যে, কৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন (রূপা) সকল ঈশ্বরের প্রসাদই অভক্ষ্য। বিশ্বপ্রপঞ্চের বাহিরে, আত্মাশক্তি যে কৃষ্ণমাতা (অ পর্ব ও প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৯-৩০ অনুচ্ছেদ), এই বৈদিক তত্ত্ব তাঁহারা মানেন না। ইহা ইষ্ট-নিষ্ঠ নহে—হীন ভেদবুদ্ধি, বা নানাত্বজ্ঞান! স্ত্রীলোক পতিকে বিশেষ ভাবে সেবা করিবেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য শ্বশুর, ভাশুর, দেবর ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করিবেন না! চৈতন্যদেবে ও রামকৃষ্ণদেবে, রামে ও হনুমানে এবং দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন মূর্তির ভিতর, হিন্দুর ভেদ বুদ্ধি প্রায় সর্বত্রই দর্শন হয়। আত্মজ্ঞানাভাবে সে বুঝিতে চাহে না যে, বিশ্বের প্রতি অণু ও পরমাণু ব্রহ্ম ও আত্মাময় এবং মূলে অভেদ! ইহাই সমজ্ঞান—তবে, অন্নে বিষ্ঠা থাকিলে উহা ভোজন চলে না, সাপ বা বাঘ বা অগ্নিকে আলিঙ্গন করা যায় না এবং কলের জলে দেব-দেবীর পূজা হয় না!

যতীন-শ্রীচৈতন্য

জয় শ্রীচৈতন্য জয়, পরম মঙ্গলময়,
রাধাকৃষ্ণ ভাবে ধরা আগমন যাঁর।
অবতরি 'গৌড়' ধামে, শচী সুত 'গৌর' নামে,
নাম-নামী নহে ভেদ, করিলে প্রচার।
শুধিতে রাধার ধার, হলে তাঁর প্রেমাধার,
হৃদয়ের ভাব তাঁর করিলে স্বীকার।
অসীম রাধা মহিমা, কৃষ্ণপ্রেম শেষ সীমা,
রাধাভাবে কৃষ্ণধন করিলে প্রচার।
অপরূপ রীত ধ'রে, হরি নাম হরি করে,
আচণ্ডালে নাম-মন্ত্র হরি করে দান।
হরি নাম যোগ-ধ্যান, হরি নাম পূজা-দান,
হরি নামে মহাপাপী পায় পরিত্রাণ।
হরি নাম যাগ-জপ, হরি নাম মন্ত্র-তপ,
হরি নামে ঘুচে যায় অবিদ্যা সংসার।
হরি নাম নাশে কাম, হরি নাম তীর্থ ধাম,
হরি নামে লভে নর রাধা প্রেম সার।
কোন জনে ভাগ্য বলে, হরি প্রেম সত্য হলে,
কৃষ্ণ সম হয় তার সারা বিশ্বধাম।
সংসার ঘুচিয়া যায়, কৃষ্ণ-রাধা হেরে তায়,
বিশ্বপ্রেমে গলি গিয়া লভে নিত্যধাম।
স্বপন সৃজন ক'রে, দেখালে প্রেমেতে মোরে,
একান্ত সার্থক মোর তোমার সাধন।
তাই তুমি হাত ধ'রে, লইতে চাহিলে মোরে,
আমি কিন্তু করিলাম বাধার সৃজন।

ইহাই মোর নিয়তি, সাধনার পরিণতি,
সবই বিধান তব, কাল ভগবান!
তুমি রামকৃষ্ণরূপী, আর হনুমানরূপী,
ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা মোর, তোমারই দান।
তুমি মোর চিন্তামণি, কালিকা-সারদামণি,
একাধারে গুরু, আত্মা, ব্রহ্ম-পরাৎপর।
তব কৃপায় অপার, ভেদজ্ঞান নাহি আর,
চিন্তি সদা ব্রহ্ম-আদ্যা বিশ্ব চরাচর।
যিনি রাম, তিনি কৃষ্ণ, তুমি, আর রামকৃষ্ণ,
আদ্যার শকতি সবে, আদ্যার প্রকার।
অবোধ নর বুঝে না, ভেদ করিয়া কল্পনা,
জন্মে বিশ্বে পুনঃ পুনঃ কবলে মায়ার।
তোমার শিক্ষার সার, কৃষ্ণ-রাধা এ সংসার,
পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে—শিবলিঙ্গাকার।
এই সাম্য যে মানে না, ধর্মাচার বিড়ম্বনা, (*)
মিছা পূজাচর্না, আর হরিনাম তার। (*)
যথার্থ ভকত জন, না করে পর পীড়ন,
জানি বিশ্ব খণ্ডহীন, তুমি নারায়ণ।
ভক্তে তুমি শুভঙ্কর, অভক্তে তুমি ক্ষেমঙ্কর,
দ্বেষী পাশে ভয়ঙ্কর, তুমি জনার্দন।
লহ নতি অনিবার, অনন্ত চুম্বন আর,
তব পদে যতীনের থাকে যেন মতি।
বিশ্বগুরু তুমি দেব, মম আত্মা মহাদেব,
রাধাকৃষ্ণ বিনা-মোর নাহি অন্য গতি। (৪৮)

[(*)—ফর্মাটির তৃতীয় প্রুফে এই দুইটি লাইন কালির বড় দাগে অবশে চিহ্নিত]

গীতা-দৈববাণীগুরু

বিষয়—এক অপরিচিত ব্যক্তির আমাদের বাড়ীতে গীতাকে দীক্ষা দিবার জন্য বার বার একান্ত ও নাছোড়বান্দা ভাবে অনুরোধ এবং গীতার নিতান্ত অনিচ্ছায় ক্রন্দন করিতে করিতে দীক্ষালনে বসিবার পূর্বে স্বপনের অবসান।

স্থান—আমার শয়ন ঘরের পার্শ্বস্থ শয়ন ঘর।

কাল—জুন মাসের শেষ ভাগ, ১৯৪৬।

কন্যা গীতা নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিল—

"যেন আমাদের বাড়ীতে একজন অপরিচিত পুরুষ নিজেচ্ছায় আসিয়া আমাকে বার বার তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য একান্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু উহাতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না এবং কান্নাকাটি করিতে লাগিলাম। তখন তিনি নাছোড়বান্দা ভাবে দীক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না, এই ভাব লইলেন। বাবুর ঘরে দেখিলাম পূজার জিনিস ও দুইখানি আসন পাতা রহিয়াছে। পুরুষটির অনুরোধে বিরক্ত হইয়াই, শেষে মা ও বাবু আমাকে বলিলেন—'উনি যখন অত করিয়া অনুরোধ করিতেছেন, তখন তুমি—*অবশেষে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৪২)—*উঁহার নিকট হইতে মন্ত্র লও।' মা ও বাবুর কথাতেও, আমি খুব অনিচ্ছার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কাছে দীক্ষা লইতে যাইতেছি—এমন সময়, নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল ও দীক্ষা লওয়া হইল না।"

২। উক্ত স্বপ্নটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাকে উহার বিষয় এই স্থলে কিছু লিখিতে হইবে। যেমন জাগ্রতাবস্থায় বিশ্বের সকল ঘটনাই জীবের কর্মফলানুযায়ী আত্মস্থ শিবলিঙ্গের সহিত শক্তিযোনির রমণ জাত নানাবিধ আত্মশক্তির অভিব্যক্তি মাত্র, সেইরূপেই স্বপ্নাবস্থায় ঈশ্বর ও গুরু বিষয়ক অনুভূতিগুলি আমাদের শিবলিঙ্গরূপী ও শক্তিযোনিরূপিণী আত্মা হইতে জাত কর্মফল প্রকাশক। ঐ সকল স্বপ্ন মিথ্যা নহে এবং উহাদের যথাকালে বাহ্য প্রাকৃত অভিব্যক্তি অনিবার্য (১৮ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। অতএব, এই স্বপ্নটি যে, গীতাকে যথাকালে ফল দান করিবে, তাহা নিশ্চিত। তন্ত্রশাস্ত্রে আছে যে, দুষ্কর্মফলে

বৈরীমন্ত্র প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ মন্ত্র বিশেষ দোষযুক্ত—দৈহিক ও সাংসারিক নানাবিধ অমঙ্গল সূচক এবং মুক্তিদা নহে (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)। ইহা সম্ভব যে, গীতার কোন কুকর্মফলে ঐরূপ বৈরীমন্ত্র প্রাপ্তির বিশেষ যোগ ছায়ারূপে ছিল; কিন্তু তাহার কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরীর প্রতি পরম ভক্তি ও তাঁহাদের বিশেষ কৃপা বশতঃ [অ, আ ও ই পর্ব], শেষ অবধি উহা প্রাপ্তি হইবে না—অর্থাৎ, কুকর্মফল খণ্ডন হইবে। এইরূপও হইতে পারে যে—সে পরে সারদেশ্বরীর স্বাপ্ন মন্ত্র লাভ করিবে, তৎপূর্বে তাহার শ্বশুরালয়ে বা অন্যত্র, নানা ঘটনার সমাবেশে কোন অনুপযুক্ত গুরুর দ্বারা মন্ত্রগ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইবে, তাহাতে তাহার অভিভাবক ও অভিভাবিকা সম্মত হইবেন; কিন্তু শেষ অবধি তাহার সেই গুরু হইতে, প্রধানতঃ নিজ অনিচ্ছা বশতঃ, মন্ত্র প্রাপ্তি ঘটিবে না—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৪৩)। এই 'না' শব্দটি লিখিবার কালে কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে অবশে চিহ্নিত হইল এবং আমার অনুমান যে সত্য তাহা যেন জগদম্বা আমাকে বুঝাইলেন। গীতার কুকর্মফলে তাহার বৈরীমন্ত্র পাইবার যোগ ছিল বলিয়াই, বোধ হয় কর্মফল দাত্রী মা সারদেশ্বরী তাহার সকাতর ক্রন্দন ও 'মা-গো-মা' রব (অ পর্ব) —***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৪৪)—প্রথমে—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৪৫)—*পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই 'প্রথমে,' শব্দটি লিখিবার কালে কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে অবশে চিহ্নিত হইয়া, আমার অনুমানের সত্যতা প্রকাশক (২১ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। অ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নটি, কৃষ্ণের অনুকম্পায় গীতার উক্ত ঘনীভূত কুকর্মফলটির লঘু করণ প্রদর্শক।

৩। এই স্বপ্নটির, পূর্ব পর্বে আলোচিত আমার স্বপ্নের সহিত, কিয়ৎ-পরিমাণে সাম্য আছে। তবে, চৈতন্যদেবকে আমার অবহেলনের কারণ অন্যরূপ। যথার্থ (বা মুক্তিদাতা সদ্‌গুরু) লাভে মানবের কত প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহা ঘ, ২০ ও ঈ পর্ব, বিভিন্নভাবে শরদিন্দু, আমার ও গীতার অবস্থার দ্বারা উদাহরণ রূপে প্রদর্শন করিল। অতএব, গুরু নির্বাচন সহজ ব্যাপার নহে (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ)। অবশ্য সদ্‌গুরুর কথা স্বতন্ত্র! উহা বহু সৌভাগ্যে মানবের মিলে। সাধারণের তাহা হইতে পারে না। [*এই ফর্মাটির দ্বিতীয় প্রুফে, পূর্ব লাইনটির গোড়া ও শেষ কালির দুইটি বড় দাগে অবশে চিহ্নিত হইয়া আমায় যেন বুঝাইল যে, যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক ও এই পর্বে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই—২১ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ]।

যতীন-ভবতারিণী

(১) গানাংশ

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
থাক্‌তে নয়ন, দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে সেই পাবে *কালিকা তারা।

[*অবশেষে গঁদের আঠায় কাগজের ছাল উঠিবার ফলে চিহ্নিত স্থান —(৪৬)]

বের হয়ে দেখ কন্যারূপে,
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া॥

(২) কালিকা-পুরাণ (একচত্বারিংশ অধ্যায়)

হিমালয় গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মের পূর্বে, দুর্গাদেবী মেনকার অর্চনায় সন্তুষ্টা হইয়া, তাঁহাকে বালিকারূপে দর্শন দিয়াছিলেন ও 'মাতঃ' বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—

ততঃ সা মাতরিত্যুক্তা কালিকা সর্বমোহিনী।
বাহুভ্যাং চারুবৃত্তাভ্যাং মেনকাং পরিষস্বজে॥

পরে, স্তবান্তে, তাঁহাকে বীর্য্যবান্ শত পুত্র এবং ত্রিভুবন দুর্লভা একটি কন্যা, প্রার্থনা অনুযায়ী বর দিয়াছিলেন।

বিষয়—কনিষ্ঠ পুত্র অখিল যেন মৃত ও সৎকারার্থে তাহার শব শ্মশানে প্রেরিত, এমন সময় শোকাকুল হৃদয়ে কোন গৃহের ঈশান কোণ হইতে উল্‌টা কোণে স্থিত ভবতারিণী কালী প্রতিমাকে প্রণাম করিতে গমন, তাঁহার অষ্টম বর্ষীয়া এক বালিকা মূর্ত্তি ধারণ, আমাকে অভিনব ও রহস্যপূর্ণ ভাবে উল্‌টা-সেলাম্ করণ, বাম

কক্ষে আরূঢ়া হইয়া হস্তের দ্বারা গলবেষ্টন ও সাদরে মুখ চুম্বন এবং আমার নিকট হইতে উহা প্রতিগ্রহণ—ইত্যাদির স্বপন ও আমাকে পিতৃরূপে কালিকার বরণের অদ্ভুত কাহিনী।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২রা জুলাই, ১৯৪৬—আন্দাজ রাত্র সাড়ে তিনটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"হঠাৎ মনে হইল যেন কোন এক অপরিচিত বাড়ীতে আমার *কনিষ্ঠ পুত্র অখিল মারা গিয়াছে, তাহার—*অবশে গঁদের আঠায় কাগজের ছাল উঠিবার ফলে দুইটি চিহ্নিত স্থান (৪৭ —*শব সংকারার্থে শ্মশানে প্রেরিত হইয়াছে এবং সেই জন্য বাড়ীর সকলে শোকে অভিভূত। আমি একাকী গৃহের কোণে উপবিষ্ট থাকিতে থাকিতে মনে করিলাম যে, উহার উল্‌টা কোণের (সম্ভবতঃ, নৈঋত) নিকটে যে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী প্রতিমা আছেন তাঁহাকে প্রণাম করি। তৎপরে তাঁহার নিকটে যাইতেই, প্রতিমাটি একটি অষ্টম বর্ষীয়া, কৃষ্ণবর্ণা, লাবণ্যময়ী বালিকা মূর্তি ধারণ করিলেন এবং সহাস্যে, বর্ণনাতীত ভাব ও ভঙ্গীর সহিত, তাঁহার বাম হস্তের দ্বারা কৌতূহল পূর্ণ একটি উল্‌টা সেলাম-আমাকে করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিবার অবসর পাইলাম না। তাঁহার করপৃষ্ঠ নাসিকা আবৃত করিয়া উহার মূলদেশের কিঞ্চিৎ উপরাবধি ছিল এবং টুকটুকে রক্তবর্ণ করতলটি সম্মুখে আমার দিকে এমন একটি অপরূপ, অনির্বচনীয়, অপার্থিব শোভা ও সৌন্দর্য বিকীরণ ও আকর্ষণ সৃজন করিল যে, আমি পুলকে আত্মহারা এবং পুত্রটির মৃত্যুজনিত শোক বিস্মৃত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আলিঙ্গনের জন্য দুই হস্ত বিস্তার করিলাম। সানন্দে, মৃদু-মধুর হাস্যে ও সাগ্রহে, বালিকাটি তাঁহার দুই হস্ত প্রসারিত করত আমায় আলিঙ্গন করিলেন ও বাম কক্ষে আরূঢ়া হইয়া দুই হস্তে সাদরে গলবেষ্টন করিলেন। তৎপরে, পিতা ও কন্যার ন্যায় উভয়ের ভিতর কিছুক্ষণ বদনের সর্বস্থানে চুম্বন ও আপ্যায়নাদি আদান-প্রদানের পর, আমি তাঁহাকে ভূমিতে নামাইয়া অনেক কথাবার্তা কহিলাম এবং যেন কিছুক্ষণ অন্যত্রও উভয়ে অতিবাহিত করিয়া গৃহে ফিরিলাম। এমন সময়, পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে আমার ছোট কাকা (পূর্ণচন্দ্রঘোষ) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেই, তিনি অদৃশ্যা হইলেন এবং স্বপ্নটি ভঙ্গ হইল।"

তৎপরে, বিপুল আনন্দে বিভোর অবস্থায় বিছানায় শায়িত থাকিয়া, দেবীর সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, উহা

স্মৃতি পথে উদয় হয় নাই। একটি অতি অস্পষ্ট কথা মনে হইয়াছিল যেন এই ভাবের—'পরে আবার দেখা হইবে!' এই প্রসঙ্গে, পরে ৭৬ পর্ব দ্রষ্টব্য।

২। উক্ত উলূ্ঙ্গা-সেলামের ভাব-ভঙ্গিমা লিখিয়া প্রকাশের শক্তি আমার নাই!· সেলাম্ রূপে উহা আমার জগদম্বার টুকটুকে হস্ত হইতে অভয় প্রাপ্তি। নীরবে উহা হইয়াছিল, কিন্তু সরবে উহা যেন আমায় এইরূপ বুঝাইয়াছিল—'দেখ, পিতঃ! বাহাদুর কন্যা তোমার, আমি কিরূপ রহস্যপূর্ণ নূতন ধরণের সেলাম্ শিখিয়াছি! এইরূপ সেলাম্ তুমি কখনও দেখ নাই এবং ইহা পাইয়া তুমি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না, কক্ষে লইয়া আদর, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি নিশ্চয় করিবে ও আমার নিকট হইতে উহার প্রতি-দান পাইবে!' অদ্ভুত! অলৌকিক! অপ্রত্যাশিত! বিশ্বজননীর অহৈতুকী কৃপা ও প্রেম! ছোট কন্যাটির অভিনব সেলাম্ শিক্ষার নমুনা দেখিয়া (কোথা থেকে অত কম বয়সে, আমি না শিখাইলেও বিদ্যাটি লাভ হইয়াছিল, জানিবার উপায় নাই!) আমি তাঁহার নাম 'রঙ্গিণী' রাখিয়াছি। আকৃতির সহিত ভাবের এইরূপ মিলন অপ্রাকৃত—অর্থাৎ, জগতে দেখা যায় না! উভয়ের মিলন এমন গাঢ়ভাবে হইয়া ছিল যে, আমার উহা জাগ্রতাবস্থার অনুভূতির ন্যায় সত্য বোধ হইয়াছিল এবং পরে উহা অনেক দিন ছিল। এই স্থলে, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শরদিন্দুর মত কাণপাশা ও স্বহস্তে স্যুত পীতধড়া ভিক্ষুক, ত্রিলোকেশ বালগোপাল পুত্রটির আমাদের দত্ত নাম 'রঙ্গবাজ'। **'কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ; কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা।'** কৃষ্ণ ও কালী উভয়েই যেন এক জোটে সরঙ্গে শরদিন্দু ও আমার সহিত যথাক্রমে মাতা ও পিতা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন! একের সম্বন্ধ স্বাভাবিক ভাবে অপরে প্রয়োগ যোগ্য। সেই হিসাবে, বালগোপালও আমার পুত্র এবং ভবতারিণীও শরদিন্দুর কন্যা! শরদিন্দুর অর্চনার কালে, ভবতারিণী দেবী পরে একদিন তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করত শায়িতা আছেন দেখাইয়াছিলেন ('৬' পর্ব)। আমাদিগের সাধনা ব্যতীত এই সকল ঐশ্বরিক সম্বন্ধ লাভ 'বরণ' রূপে অচ্ছেদ্য! অন্য কোন সাধন-বিভূতি থাক আর না'ই থাক, কেবল এই পিতৃ-মাতৃ সম্বন্ধের বলেই মানব দেহান্তে নিত্যধামের অধিকারী হয়। পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিষমাখা স্তন দিয়া নিহত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তথাপিও স্তন মুখে দিবার—* **অবশেষে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত দুইটি স্থান** (৪৮)—*জন্য তাঁহার মাতারূপে পরিগণিত হইয়া *মৃত্যুর পর সুদুর্লভ গোলোকধাম গতি লাভ করিয়া চিরমুক্ত হইয়াছিল। পুতনা পূর্ব জন্মে বলি দৈত্যের কন্যা (নামে রত্নমালা) ছিল। সে বামনদেবের রূপে মোহিত হইয়

তাঁহার সম একটি পুত্র বিশেষ আগ্রহের সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত, পর জন্মে পুতনা রূপে জাম্মিয়াছিল। ঐকান্তিকতার সহিত প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, দ্বেষ, হিংসা, ভয়, বৈরিতা, ইত্যাদি যে-কোন উপায়ে ঈশ্বর ধ্যান বা চিন্তায় তাঁহাকে লাভ করা যায় (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, (৮) পাদটীকা)। কংস ভয়ে, রাবণ বৈরিতায়, এবং শিশুপাল দ্বেষে—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৪৯)—*ভগবান লাভ করিয়াছিল।

৩। উপরে শেষোক্ত প্রসঙ্গে লিখিতেছি যে, এই পর্বের সর্বোপরি যে রাম-প্রসাদী গানাংশ আছে, এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে তাহার অষ্টম লাইনস্থ 'কালিকা' শব্দটি অপ্রত্যাশিত ভাবে কাগজের সামান্য পর্দা উঠা সূক্ষ্ম স্থানে লিখিত হইয়াছে। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, স্বয়ং জগদম্বা রামপ্রসাদের এই বাক্যটি—'যেই ধ্যানে এক মনে সেই পাবে কালিকা তারা'—অনুমোদন করিতেছেন! পাঠক কি আমার এই কথা বিশ্বাস করিবেন? যদি না করেন, তাহা হইলে ঐ চিহ্নটির তাৎপর্য কি তাহা কি বলিতে পারেন? শব্দটি কি অন্য কোন স্থানে লিখিত হইতে পারিত না? এই পুস্তকের প্রতি খণ্ডে আমি মহাবাক্য ও অজানিত বার্তা গুলিতে এইরূপ প্রচুর চিহ্নের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে, অবতরণিকা খণ্ডের প্রথম নিবেদনের ৩ ও ৭ অনুচ্ছেদ বিশেষ দ্রষ্টব্য। '**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,**' বা 'বিশ্বে গাছের পাতাটি অবধি জগদম্বার ইচ্ছার বাহিরে স্পন্দিত হয় না'—এই মহাবাক্যগুলি যিনি সঠিক বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, চিহ্নগুলি কারণহীন নহে এবং জগদম্বার ইচ্ছা-প্রসূত, বা চিহ্নিত বাক্যগুলি সব তাঁহার অনুমোদিত! ঐগুলিকে ভাল করিয়া চিন্তা করিলে পাঠক বুঝিবেন যে, তাহারা বাস্তবিক বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ভক্তির কথা এবং শাস্ত্র যুক্তি সত্ত্বেও, জগদম্বার অনুমোদন ভিন্ন সঠিক বিশ্বাস করা সকলের সুকঠিন। আমার সেই সমস্যা জগদম্বাই মিটাইতেছেন—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৫০)—*কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, এই পুস্তকগুলির যথার্থ—***অবশে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান** (৫১)—*কর্ত্রী তিনি এবং আমি উহাদের সঙ্কলনের এক নির্বাচিত যন্ত্র মাত্র। উক্ত অদ্ভুত ঘটনা যে পূর্বে কোন ধর্মপুস্তক প্রণয়ন কালে ঘটিয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিলে যে ইহা ঘটিতে পারে, এই পুস্তকগুলি তাহার প্রমাণ! এই ঘটনাটি আমার দেহাত্মবোধত্যাগী বা জীবন্মুক্ত স্বরূপ প্রদর্শক (১৭ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের প্রথমাংশ)। সবই জগদম্বার বিধান এবং সবই তিনি। তিনি বিশ্বে সব হইয়া সবই করিতেছেন এবং এখানে যাহা কিছু (ক্ষুদ্র

বা বৃহৎ) অভিব্যক্ত, সবই তিনি ও মানব অবশে ' অহং '-ভাবে ও ভেদ বুদ্ধিতে নিয়তির মার্গে ধাবমান। এই প্রসঙ্গে, পরিশিষ্টের পঞ্চম স্বপ্ন বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৪। এই স্থলে, ১৮ পর্বে ৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল স্বপ্নগুলি যেন ছায়ারূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ নিয়তির লিপি উন্মোচক এবং অমোঘ ফলদায়ী—যদিও যথার্থ ফল সঠিক বুঝা যায় না। আমি যে এই পর্বের —*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৫২) —*স্বপ্নে কনিষ্ঠ পুত্রকে ' মৃত ' অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি যথাকালে অনিবার্য। স্বপ্ন কালে, সে আমার ও তাহার মাতার বিশেষ অনুগত পুত্র ছিল। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে, বৈশাখ ১৩৫৭ হইতে উনবিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়া সে উল্টা ভাব ধারণ করিয়াছে। সে সংসারে বৃদ্ধ আমার ও তাহার মাতার সামান্য কার্যও করে না ও নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্যহীন এবং তাহার স্বাস্থ্য ক্রমে ভঙ্গ হইতেছে! সেই জন্য, সে যেন আমাদের 'মৃত' পুত্র সম, এইরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কারণ, শাস্ত্রমতে-যেপুত্র হইতে সুখী হওয়া যায়, যে পিতা-মাতার প্রিয় কার্য করে, তাঁহাদের বাধ্য ও কার্য-সহায়ক এবং পিতৃ-শ্রাদ্ধাদিতে বিশ্বাসী, সেই যথার্থ 'পুত্র' এবং এই নিমিত্তই ' পুত্র ' প্রয়োজন। ইহার হেতু যে, সংসারে নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও কুপরামর্শ এবং কোন আত্মীয়ের আমার ও তাহার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক ক্রিয়া—যাহার প্রমাণ আমার স্বচক্ষে দৃষ্ট—তাহা আমি মনে করি (আ, ১২, ১৪, ১৫, ৬৪ ও ৬৮ পর্ব এবং বিশেষতঃ পুস্তকের পরিশিষ্টের দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বপ্ন)। তাহার উপরেই ভবিষ্যতে মন্দিরাদির তত্ত্বাবধান ব্যাপারে আমরা অনেক আশা পোষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই কর্মফল-প্রকাশক স্বপ্নের দ্বারা ঐ আশা যে বৃথা তাহা জগদম্বা অদ্ভুতভাবে অনেক পূর্বেই জানাইলেন এবং তৎসঙ্গে আমাদিগকে তাঁহার পিতা-মাতা রূপে বরণ করিয়া যেন বলিলেন—" দুঃখ কি ? প্রিয় পুত্রটি কার্যতঃ মৃত বা মৃতসম হইলেই বা-কি ক্ষতি ? বিশ্বে সর্বময়ী আমি তো তোমাদের অপ্রাকৃত প্রিয়া সুদুর্লভা কন্যা রহিয়াছি এবং তোমাদের ইহ ও পর লোকে যাহা প্রয়োজন সবই পূরণ করিতেছি। ইহার অপেক্ষা অধিক আর তোমাদের কোন্ পুত্র বা কন্যা করিবে ? অখিলের, কোন সাহায্যই তোমাদের প্রয়োজন হইবে না।" এই প্রসঙ্গে, পরে দ পর্ব দ্রষ্টব্য।

৫। স্বপ্নটির শেষকালের ঘটনাগুলি—যথা, জগদম্বার সহিত নানাবিধ অনভিব্যক্ত কথোপকথন, কিছুক্ষণ অন্যত্র যাপন, ছোটকাকার গৃহে প্রবেশে তাঁহার তিরোধান, ইত্যাদি—কিরূপ প্রাকৃত অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে, তাহা

অনুমান করা সুকঠিন। স্বপ্নফল-বিজ্ঞানে দেখা যায় যে—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপত্নী, দেবতা, দেবকন্যা ও রত্নাভরণা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা স্বপ্নে যাহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন, তিনি ভগবতীর প্রিয়।

৬। চারি শ্রেণীর ঈশ্বর সাধকের বিষয়, রামকৃষ্ণদেবের নিম্নলিখিতরূপ উক্তি দেখা যায়—"বৈষ্ণবমতে, ভক্ত চারি শ্রেণীর—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। যিনি মাত্র পথে উঠছেন, তিনি 'প্রবর্তক'। যিনি পূজা, জপ, ধ্যান, নামগুণ কীর্তনাদি করছেন, তিনি 'সাধক'। যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোধে বোধ বা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, বা যাঁর নিশ্চয়াত্মিকা এইরূপ বুদ্ধি হয়েছে যে, ঈশ্বর আছেন আর তিনি সব করছেন, তিনি 'সিদ্ধ'। এই বিষয়ে বেদান্তে একটি উপমা আছে—অন্ধকার ঘরে বাবু শুয়ে আছেন; একজন এখান—ওখান—সেখান হাতড়াইয়া বলছেন, ইহা নয়—'নেতি' 'নেতি' 'নেতি;' শেষে বাবুর গায়ে হাত পড়ে বলছেন, 'ইহ' (এই বাবু)—অর্থাৎ, 'অস্তি' বোধ হয়েছে, বাবুকে লাভ হয়েছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান হয় নাই। এই ব্যক্তি 'সিদ্ধ' ও তাঁহার ঈশ্বর লাভ হয়েছে। 'সিদ্ধের—সিদ্ধ' ঈশ্বরের সহিত বিশেষরূপে আলাপ করেছেন। তাঁহার শুধু দর্শন নহে—তিনি ঈশ্বরের সহিত পিতা, মাতা, সখা, পুত্র, কন্যা, বা মধুর, ইত্যাদিবিধ কোন আত্মীয় সম্বন্ধে আলাপ করেছেন।" নিত্যসিদ্ধ একটি পৃথক স্তর। তাঁহারা অবতারের সহিত এবং কখন কখন বা পৃথক ভাবে, (নারদ, প্রহ্লাদ, ইত্যাদি) জগতে আসেন এবং কাহারও বা শেষ জন্ম। তাঁহারা জন্মাবধি সংসারাসক্ত হন না। সিদ্ধ চারিবিধ আছে—সাধন-সিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ ও স্বপ্ন-সিদ্ধ। (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১ (৪) অনুচ্ছেদ)।

৭। ভক্তি মোটামুটি ত্রিবিধ—সাধন (বা বৈধী) ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। শেষোক্ত দুই প্রকার ভক্তি রাগাত্মিকা—কারণ, উহা ঈশ্বর ভালবাসা মূলক। সাধন বা বৈধী ভক্তি, অভ্যাসাত্মিকা ও শাস্ত্রবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাবভক্তি, চিন্তা বা ভাবাত্মিকা এবং ক্রিয়াযোগ বা শাস্ত্রবিধির মুখাপেক্ষী নহে। ইহার দ্বারা, পরমেশ্বরকে কোন আত্মীয়ভাবে ভজন হয় এবং ইহা একটি উচ্চ সাধন পন্থা। ঈশ্বরের সহিত সখা, বা পুত্র-কন্যা সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক, নিজেকে বড় এবং তাঁহাকে সম বা হীন ভাবে শুদ্ধা ভক্তি করিলে, তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হন। পতি ভাব সর্বোৎকৃষ্ট। প্রেমভক্তি, অনুরাগাত্মিকা এবং মুখ্যভক্তি, যাহা কোন রূপ বিধি-নিষেধ বা ক্রিয়াকাণ্ডের অধীন নহে। ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয় —মূকের অমৃতাস্বাদনবৎ। বৈধীভক্তি বিচ্ছিন্ন এবং সার্বকালীন নহে। ভাবভক্তি, প্রেমভক্তির নিম্নস্তর মাত্র এবং উহা হইতেই ক্রমে মহাভাব বা

প্রেম উদয় হয়। প্রেম ত্রিগুণ-বর্জিত, কামনাতীত, নিয়ত বৃদ্ধি-ধর্মী, অবিচ্ছিন্ন, ঐকান্তিক ও অতি দুর্লভ বস্তু—কেবল অনুরাগের অনুভব স্বরূপ! উহা লাভ হইলে, বিশ্বে ঈশ্বরই সদা ও সর্বত্র দর্শন, শ্রবণ, কথন ও চিন্তার বিষয় হন—যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা ইষ্ট স্ফুরে। অতএব প্রেমিক, প্রেম ও প্রেমময় বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ভগবান, অভেদ হইয়া যান। প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বরের কোন না কোন ভাবে, বা একাধিক ভাবের মিশ্রণে (+)—রূপ, পূজা, স্মরণ, ঋণ-মাহাত্ম্য, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত, তন্ময়তা, বিরহ, আত্ম-নিবেদন, গুরু-পিতৃ-মাতৃ ভাব (প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ অধ্যায়)—অত্যাসক্তি নিবন্ধন, মুক্তির পিপাসা থাকে না—কারণ, তিনি মধুর হইতেও মধুর প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিয়া অন্য কিছুই চাহেন না এবং অন্য কোনও সাধনা তাঁহার প্রয়োজন হয় না। সঠিক প্রেমোদয়ে, জ্ঞান ক্ষীণ হইয়া যায়, বিশ্ব ও সাধকের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায় এবং তিনি একটি ঘনীভূত প্রেমের পিণ্ডে পরিণত হন। দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—যেমন সুভোজ্য-বস্তু প্রস্তুত ক্রিয়ার জ্ঞানে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, তেমন ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা মানবের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না; যজ্জন্য, প্রেমরূপ একটি স্বতন্ত্র পরম পদার্থ তাঁহার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রেমের নাম পঞ্চম পুরুষার্থ—যদিও সকলেরই শেষ পরিণতি ব্রহ্মসাযুজ্য (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)। মহাভাব ও প্রেম, সাধারণ জীবের হয় না। অনেক ভাগ্য বলে যাঁহারা রাগ-ভক্ত, তাঁহাদের ভার ঈশ্বর গ্রহণ করেন,—যজ্জন্য আর পতন হয় না। চৈতন্যদেব বলিতেছেন যে, প্রেমভক্তির সাধনে জ্ঞান বাহ্য (বা —* ফর্মার দ্বিতীয় প্রুফে অবশে লাল কালিতে চিহ্নিত স্থান—*গৌণ) এবং ভক্তিই প্রধান। সেই ভক্তিভাবগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠক্রমে এইরূপ—দাস্য; সখ্য; বাৎসল্য; মধুর (স্বকীয়া); মধুর (পারকীয়া) ও রাধাপ্রেম (মহাভাব)। দ্বিতীয় ভাবে প্রথম, তৃতীয় ভাবে প্রথম দুইটি এবং চতুর্থ ভাবে প্রথম তিনটি, মিশ্রিত। যাহার যেই ভাব, সেই সর্বোত্তম; তবে, তটস্থ হইয়া বিচার করিলে, তারতম্য আছে। উক্ত ভাবগুলি ব্রজধামের ভাব। অন্যান্য প্রেমভক্তির ভাবগুলি চৈতন্যদেব আলোচনা করেন নাই।

যতীন-ভবতারিণী

জয় মা ভবতারিণী, বিশ্বমাতা কাদম্বিনী,
রাঙ্গাপদে নতি মোর লহ নারায়ণী।

[(+)—ফর্মাটির তৃতীয় প্রুফে এই স্থানটি বড় কালির দাগে অবশে চিহ্নিত]

করালবদনা জয়, কালরাত্রি জয়, জয়,
চাঁদ মুখে চুমু মোর লহ কাত্যায়নী।
কেশব-অর্চিতা জয়, কৃষ্ণ-প্রিয়া জয় জয়,
রহ মা হৃদয়ে সদা (+) পতিতোদ্ধারিণী।
কমলা-অর্চিতা জয়, শ্রীকমলা জয় জয়,
জীবণে মরণে মোর, তুমি গো সঙ্গিনী।
সারদা জননী জয়, শ্রীকৃষ্ণ-পূজিতা জয়,
কোলে আছে সুত তব দিবস যামিনী।
তবু কেন রঙ্গ ক'রে, প্রেমেতে কটিতে চ'ড়ে,
পিতৃপদ দিলে মোরে, না জানি তারিণী।
স্বপন সৃজন করি, বালিকার রূপ ধরি,
রাঙ্গা হাত নাকে দিয়ে পাগলিনী বেশে।
উল্‌টা-সেলাম্ ধরে, অভয়ের মুদ্রা ক'রে,
উঠিলে বামাঙ্গে মোর বেষ্টি গলদেশে।
দিলে-নিলে, আলিঙ্গন, অনন্ত প্রেম চুম্বন,
বুঝাইলে তুমি মোর তনয়া রতন।
শুধু আত্মা-দেহ নহি, শুধু পুত্র-সখা নহি,
পিতৃপদ দিলে মোরে করিয়া বরণ।
রঙ্গ দেখি নিস্তারিণী, নাম দিলাম 'রঙ্গিণী',
পিতৃদত্ত এই নাম, ধর মাতা কালী।
ধাম নির্মিতে হইবে, পিতৃ বাঞ্ছা পুরাইবে,
বিরাজিবে তথা রঙ্গে অভয়া করালী।
যথা সরল পূজন, হবে তব প্রয়োজন,
উপায় করহ মাতা বিশ্ব-হিতৈষিণী।

[(+)—ফর্মাটির তৃতীয় প্রুফে এই স্থানটি পূর্ব পৃষ্ঠার বড় কালির দাগে অবশে চিহ্নিত]

নাহি জানি আমি জপ, পূজা, যাগ, দান, তপ,
জানি মাত্র সারা বিশ্বে তুমি একাকিনী। (+)
রামরূপে তুমি কালী, দশরথ বাক্য পালি,
বনবাসে গিয়াছিলে জানে চরাচর।
যদি ইচ্ছ আজ্ঞা রাখ, পিতার সম্মান রাখ,
তুমি মোর কন্যা, বিশ্বে হউক গোচর।
এই সব সমাচার, হইলে বিশ্বে প্রচার,
পিতৃ আজ্ঞা পাল্য সদা, বুঝে নরগণ।
ইথে হবে মহাহিত, তুমি মাগো, বিশ্বহিত,
তব ধাম মোর নহে নিজ প্রয়োজন।
মোর ইচ্ছা বলি যাহা, চাহিলাম জানি তাহা,
তোমার প্রেরণা মাগো, তোমার স্পন্দন।
হয়ে আছে, হবে যাহা, জানে না যতীন তাহা,
তব শক্তি বশে বিশ্বে সকল ঘটন। (৪০)

যতীন-রামকৃষ্ণ
(ঐ ও ২২ পর্ব)

রাতে ধ্যানের সময়ে, বামাঙ্গে শায়িনী হয়ে,
স্কন্ধে দেখা দিলে ধরি রামকৃষ্ণ রূপ।
আহা কিবা মুখ শোভা, প্রেমে অতি মনলোভা,
দূরি গলপীড়া মোর, বুঝালে স্বরূপ।
যিনি কালী, তিনি কৃষ্ণ, তিনি পুনঃ রামকৃষ্ণ,
সবে যতীনের গুরু, ইষ্ট, মাতা, পিতা।
আবার তনয় কেহ, অথবা তনয়া কেহ,
প্রেমেতে বরিলে মোরে, পদ দিয়া পিতা।

[(+)—কর্মটির দ্বিতীয় প্রকে এই লাইন পূর্ব পৃষ্ঠায় লাল কালির দাগে অবশে চিহ্নিত]

পিতা যদি কেহ হয়, সন্তানে নামি'তে হয়,
রামকৃষ্ণে তেঁই মোরে দিতে হবে নাম।
দিতেছি সার্থক নাম, আমার মাতার নাম,
'কৃষ্ণরঙ্গিণী'—সুত ও সুতা, যুক্ত-নাম।
গীতার এক স্বপনে, অপরূপ আয়োজনে,
পিতারূপে করাইলে নিজের স্তবন।
তেঁই দিব অন্য নাম, পিতার 'সুরেশ' নাম,
হবে তব সেই নাম অতি সুশোভন।
কালী তুমি মোর মাতা, শিব তুমি মোর পিতা,
প্রকৃতি-পুরুষ রূপী অর্ধনারীশ্বর।
তুমি সর্ব বেদময়, আর সর্ব দেবময়,
তোমার মহিমা মোর বুদ্ধির উপর।
সৃজ ইচ্ছামত ধাম, অক্ষয় অব্যয় ঠাম,
দুই নামে হও তাত, বিদিত সংসারে।
প্রেমঘন মুখ ধর, ভক্ত প্রাণ তুষ্ট কর,
সরল আপন পূজা আয়োজন ক'রে।
আমি বৃদ্ধ এবে অতি, শিথিল সব শকতি,
ধন-জন নাহি মোর—উপায় সৃজনে।
কিবা আর প্রয়োজন? প্রায় বিগত জীবন!
তব পীঠ তাত—মোর হৃদি পদ্মাসনে।
অন্য নাহি বলিবার, লহ নতি কোটী বার,
সুরেশ-কৃষ্ণরঙ্গিণী, বিশ্বের স্পন্দন!
সঙ্কীর্ণ মোর চরিত, কি বুঝিব তব রীত,
তবু ধন্য—সুত-সুতা, তুমি নিরঞ্জন! (৭২)

ভগবান-রামকৃষ্ণ

গান

(১) ভাবিলে ভাবের উদয় হয়, ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়।
(ও সে) যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়),
তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।

(২) কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ঐ চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি পাবে কাশী দিবানিশি॥

বিষয়—রাত্রে গলদেশে ও দন্তে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব কালে, শয্যার বাম পার্শ্বে ভাবে কন্যারূপে ভবতারিণীদেবীকে চুম্বনাদি করিতেছি, এমন সময় রামকৃষ্ণদেবের বর্ণনাতীত অপরূপ প্রেম-ঘন কারুণ্যপূর্ণ মূর্তিতে ভবতারিণীর স্থলে ক্ষণিক আবির্ভাব ও তৎপরেই আমার পীড়ার উপশম—ইত্যাদির কাহিনী।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৪শে জুলাই, ১৯৪৬—রাত্র আন্দাজ সাড়ে এগারটা।

কন্যা গীতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে (বিবাহ ১৩ই অগাষ্ট, ১৯৪৬), নানাবিধ অত্যাবশ্যকীয় কার্যোপলক্ষে ব্যস্ত থাকায়, পূর্ববর্তী পর্বে বর্ণিত স্বপ্নটির কিঞ্চিৎ স্মারক লিপি আমি ২৪শে জুলাই প্রায় রাত্র আটটায় সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তৎপরে, গলদেশে ও দন্তে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল। নিশাভোজনান্তে কিছু বাইওকেমিক্ ঔষধ খাইয়া রাত্র প্রায় ১১টায় বামপার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিলাম ও ভাবাবলম্বনে নূতন কন্যা রঙ্গিণীকে বামাঙ্গে মিলাইয়া আদর-চুম্বনাদি করিতে লাগিলাম। রোগ বৃদ্ধির জন্য কষ্ট হইতেছিল

বলিয়া কন্যাটিকে বলিলাম,—'মা! তোর পিতা যে এত কষ্ট পাইতেছে, তাহার একটা উপায় তুই কি করবি না? শক্তি থাকিলেও, তুই যে তোর বিধান বশেই তাহার প্রয়োগ করিস্ না তাহা আমি জানি—যেমন রামকৃষ্ণদেবের গলরোগে! তোকে আমি একটু উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু এত কষ্ট হইতেছে যে তাহা আর পারিতেছি না।' তখন রহস্যময়ী কন্যাটি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া রামকৃষ্ণরূপে আমার দেহের বাম স্কন্ধদেশের নিকট অল্পকাল আবির্ভূতা হইলেন। যিনি ভবতারিণী, তিনিই যে রামকৃষ্ণ তাহা আমায় দক্ষিণেশ্বরে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ (বালক রামকৃষ্ণ) অদ্ভুত ভাবেই বুঝাইয়াছিলেন (১১ পর্ব)। এই পর্বে বর্ণিত ঘটনায় রামকৃষ্ণদেব আমার পূর্ণ জাগ্রতাবস্থাই উক্তরূপে প্রকাশিত হইলেন। হায়! হায়! নির্বাক সেই অপার্থিব, প্রেমময় মুখখানি আমাকে যে ভাবে কত কি বলিল, তাহা লিখিয়া বর্ণন অসম্ভব। রামকৃষ্ণদেবের সাধারণ পটে ঐরূপ মুখাকৃতি প্রায় দেখা যায় না। মুখখানি যেন অদ্ভুত ও অপ্রাকৃত প্রেম ও সহানুভূতি-পূর্ণ ভাবে গঠিত এবং নীরবেই বলিল—'পিতঃ! তোমার যে দেহ কষ্ট হইতেছে, তাহার জন্য উহাপেক্ষা আমারও কষ্ট হইতেছে! আর তুমি যে আমাকে কন্যারূপে আদর চুম্বনাদি করিতে পারিতেছ না, তাহার জন্য আমারও বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে! তোমার দেহকষ্ট থাকিবে না, তুমি আমাকে যথেচ্ছ উপভোগ কর'। তৎপরে, অল্পকালের মধ্যেই রোগ-যন্ত্রণা তিরোহিত হইল, আমি ভবতারিণীর স্থলে রামকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত মুখাকৃতিকে সাদরে ধ্যান-চুম্বনাদি ও বাৎসল্যভাবে উপভোগ করত সুখে নিদ্রিত হইলাম। কি অদ্ভুত এই অভেদ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান! আত্মজ্ঞান বিনা ইহা বুঝা সুকঠিন।

২। উক্ত ঘটনাটির দ্বারা কৃষ্ণাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার সহিত পুত্র ও কন্যা উভয় সম্বন্ধেই আবদ্ধ হইয়া ভবতারিণীর সহিত পূর্ণ ঐক্যতা দেখাইলেন। শরদিন্দুও স্বাভাবিক ভাবে সেই সম্বন্ধের অধিকারিণী হইলেন। ঈশ্বরের সহিত এই বাৎসল্য সম্বন্ধের ফল পূর্বে (৯ ও ২১ পর্বে) আলোচিত হইয়াছে। অদ্ভুত প্রেম রহস্যের সহিত এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়া, আমি এই একাধারে পুত্র ও কন্যাটির নাম রাখিয়াছি 'কৃষ্ণরঙ্গিণী'—যাহা আমার পরলোকগতা মাতার নাম ছিল। অতএব, কৃষ্ণ, ভবতারিণী ও রামকৃষ্ণের আমার নামকরণ এইরূপ—'রঙ্গরাজ,' 'রঙ্গিণী' ও 'কৃষ্ণরঙ্গিণী'। নামে পার্থক্য থাকিলেও, সকলে এক ও অভেদ—ব্রহ্ম, ও/বা মহাকালী! অবতারদিগের ভিতর আসলে কোন ভেদ নাই—যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, কৃষ্ণচৈতন্য ও রামকৃষ্ণ। আর যিনি মহাদেব, তিনিই দুর্গা, তিনিই রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, হনুমান ও শঙ্করাচার্য। রাধাতন্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন—

(১) কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্, (২) কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ, (৩) শরীরং কালিকা সাক্ষাৎ বাসুদেবস্য নান্যথা, (৪) হরির্হি নির্গুণ সাক্ষাৎ—শরীরং হি প্রকৃতি পরমেশ্বরী (বা মূল প্রকৃতিঃ)।

৩। নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপ রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় এবং তাঁহারা মহাকালীর শক্তির সাহায্যেই দেহধারী ও শক্তিমান হইয়া সগুণ ব্রহ্ম ভগবান, বা পরাপ্রকৃতি মহাকালী স্বরূপ। আদ্যাশক্তি হইতেই সাকার সকল রূপের উৎপত্তি—রাম, কৃষ্ণ, শিব, প্রভৃতি সকল সাকার ঈশ্বর রূপ আদ্যাশক্তিরই গর্ভ-সম্ভূত এবং তাঁহার শক্তির অধীন (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৩ ও ৬, নবম অধ্যায়, ১৭-১৮ ও প্রথম অধ্যায়, ৯-১১, অনুচ্ছেদ)। সকল ঈশ্বর ও ঈশ্বরী মূর্তিই—এমন কি, বিশ্বের প্রতি অণু ও পরমাণু অবধি—জীবভাবাপন্ন, জ্যোতির্ময় চিদাকাশ, আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং সমদর্শীর নিকট সেই ভাবেই উপাস্য। সকল বিশ্ব বস্তুতে যে নানাবিধ নিত্য পরিবর্তনশীল শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহার উৎসও সেই আদ্যাশক্তি জগদম্বা, (দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, ইত্যাদি), যিনি বিশ্ব-ব্যাপারে সর্বময়ী। শিবাগমে আছে—শক্তিই শিব, শিবই শক্তি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি, গ্রহগণ, ইত্যাদি সবই শক্তি-স্বরূপ ; যে এই নিখিল বিশ্বকে শক্তিরূপে বুঝিতে পারে না, সে নারকী। কালীতন্ত্রে আছে—আপনাকে ও সারা বিশ্বকে স্ত্রীময় বা যুবতীরূপে চিন্তা করিবে। কালিকোপনিষদে আছে— নিজেকে সদা কালী ভাবিবে। এই চিন্তা সূক্ষ্ম স্তরাবধি নামাইতে হইবে—বিশ্বে সবই শিবশক্তির রমণোদ্ভূত !

৪। ঈশ্বরপ্রেমিক সগুণ ব্রহ্মোপাসক জগৎকে শূন্য ভাবিয়া তৃপ্তি পান না। তাঁহার নিকট সারা বাহ্যান্তরস্থ বিশ্বই আত্মভাবে কৃষ্ণময়, বা কালীময়, বা শিবময় এবং এই ভাবে প্রেমভক্তি সাধন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অপেক্ষাও কাম্য পদার্থ। এই জন্যই, সগুণ ব্রহ্মভাবে প্রেমমিশ্রা জ্ঞান, নির্গুণ ব্রহ্মভাবে কেবল জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধন মার্গ (ট পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। সঠিক প্রেমোদয়ে, জ্ঞান গৌণ ও দেহ শূন্যবৎ হইয়া বিশ্বকে কেবল কালীরূপময় বোধ হইবে।

৫। এই পর্বে আলোচিত কাহিনীর পরে, আমার আর কোনও সন্দেহ ছিল না যে, ১১ পর্বে বর্ণিত দক্ষিণেশ্বরের ছদ্মবেশী বালকটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ। অদ্ভুতভাবে• তিনি আমার সহিত একাধারে পুত্র ও কন্যা উভয় সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।• ফর্মাটির দ্বিতীয় প্রুফে, পূর্ববর্তী দুইটি লাইনের শেষ, কালির বড় দাগে অবশে চিহ্নিত হইয়া আমায় বুঝাইল যে, যাহা উহাতে লিখিয়াছি সব সত্য।

[২১ পর্বের শেষে বন্দনা দ্রষ্টব্য]

শুভ্রতীক্ষ-কালিকা

গান

অপার সংসার. নাহি পারাবার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার ॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে মা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি,
দিয়ে চরণ-তরী, রাখ এইবার।

বহিছে তুফান, নাহিক বিরাম,
থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম।
তারা তব নাম সংসারের সার ॥
কাল গেল কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভববন্ধন, কর বিমোচন,
মা বিনে তারিণী কারে দিবে ভার ॥

বিষয়—মা কালীর ভক্তি, ভাব ও প্রেমে যেন আমি উন্মাদ হইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করিতেছি, এইরূপ স্বপন এবং উহার অবসানে শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক ও মনে বিশেষ আনন্দপ্রদা, অবস্থা লাভ।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৭—মধ্য রাত্র, আন্দাজ সওয়া দুইটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"হঠাৎ বোধ হইল যেন মা কালীর ভক্তি, ভাব ও প্রেমে আমি উন্মাদ হইয়া গিয়াছি ও উলঙ্গাবস্থায় বিচরণ করিতেছি—অথচ, কিছুই দেখিতেছি না।"

২। পরে, জাগ্রত হইয়া বেশ মনে হইল যেন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া একটি বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন ও নাভিদেশেরও নিম্নভাগে অবর্ণনীয় ভাবে রুদ্ধ হইয়াছে এবং তলপেট যেন বিশেষ কুঞ্চিত হইয়া নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। ইহা যেন একটি অনির্বচনীয় আনন্দময় মহাবায়ুর গতি স্বরূপ কুম্ভক অবস্থা এবং ইহা কিছুক্ষণ ভোগের পর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবাপন্ন হইয়াছিল। সাধারণতঃ, প্রাণায়ামাদির দ্বারা কুম্ভক হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য মন ও প্রাণের নিরোধ। কিন্তু ভক্তিযুক্ত ঈশ্বর ধ্যানে বা ভাবে, মন ও প্রাণ স্বতঃ নিরোধ হইয়া কুম্ভকাবস্থা লাভ হয় ও কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। মানবদেহে এই শক্তি জাগরণের ফলের বিষয়, প্রথম ভাগ নানা স্থানে এবং এ ও আ পর্বের ও অনুচ্ছেদে আলোচনা হইয়াছে। ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকিলেই ঐ

শক্তি জাগরিতা হন এবং তখন মেরু মধ্যস্থ সুষুম্না মার্গে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অল্লাধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে থাকে। উহার দ্বারা প্রশ্বাসের দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ বহির্গতি হ্রাস পায় (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১১ (২) অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। যাহার এই অবস্থা লাভ হয়, তিনি নিজে, ধ্যানস্থ না হইলে, উহা জানিতে পারেন না। আমার আত্মরূপী কালীদেবী স্বপ্নটী প্রকট করিয়া আমার তাঁহার উপর ভক্তি-ভাব-প্রেমাদির ভবিষ্যৎ অবস্থা জ্ঞাপন করত নিদ্রাভঙ্গের পর জানাইলেন যে, বর্তমান কালে আমার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা—যাহা আমি জানিলেও, ধ্যানাবস্থা ভিন্ন অন্য কালে সঠিক অনুভব করিতাম না। অবশ্য, সামান্য চেষ্টাতেই উহা জানা যায়। ১৮ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, এই পুস্তকে আলোচিত স্বপ্নগুলি আন্তর আত্মায় প্রকটিত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে সেই ভাবেই অল্লাধিক অনুপ্রাণিত করত যথাকালে উপযুক্ত ফল প্রসব করে। এই কাহিনীতে বর্ণিত, সাধন ও প্রাণায়াম বিনাও উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা, সেই সত্যের একটি জলন্ত প্রমাণ ! উক্ত স্বাপ্ন প্রেমভক্তির পরিণতির যথার্থ স্বরূপ আমি বিদিত নহি—অতএব, এই বিষয় এখন ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত থাকিবে। তবে, উহা যে উচ্চ-স্তরের প্রেমভক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ, স্বপ্নে আমার উলঙ্গ দেহ শূন্যবৎ বোধ হইয়াছিল এবং আমি তখন উন্মাদ বা দেহহীন কেবল এক প্রেমের পিণ্ডভাবে অবস্থিত ছিলাম। প্রেমোদয়ে যে এইরূপই হয়, তাহা পূর্বে ২১ পর্বের ৭ অনুচ্ছেদে ও ২২ পর্বের ৪ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আরও কিছু ঐ বিষয় লিখিতেছি। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা না হইলে, ভাব বা প্রেম উদয় হয় না। পুস্তকের প্রথম ভাগে অষ্টম, নবম, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে এই সব বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

৩। রামকৃষ্ণদেব নিজ বিষয় এই ভাবে বলিতেছেন—'প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, যে সব হয়েছিল—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হইত; কখন দেখিতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ, কখন পারার হ্রদ ঝক্ ঝক্ করিত, কখন রূপাগলার মত বোধ হইত, আর কখনও বা রংমশালের আলো জলিত।' তিনি আরও এইভাবে বলিতেছেন—"কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইলে, ভক্তের ভাব ও প্রেম লাভ হয়। যার প্রেম লাভ হয়েছে, তার ঈশ্বর লাভও হয়েছে। প্রেমে ঈশ্বরে এমন অনুরাগ বা ভালবাসা হয়, যে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে (উন্মাদবৎ), আর নিজের দেহ যাহা এত প্রিয়, তাহাও পর্যন্ত ভুলে যাবে (উলঙ্গবৎ)। জীবকোটির ভাব হইতে পারে, প্রেম সকলের হয় না—অবতার

ও ঈশ্বরকোটিরই প্রেম হয়। প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধিবার দড়ি পাওয়া যায়—ডাকিলেই পাবে ও দেখিতে চাহিলেই দেখবে। ভক্তি পাকিলে ভাব, ভাব হইলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক্ হয়ে যায়—জীবের এই পর্য্যন্ত! ভাব পাকিলে মহাভাব, বা প্রেম। মনে করিলেই, সকলের জ্ঞান ও ভক্তি দুই'ই একাধারে হয় না। খুব উচ্চ স্তরের মানবের এই অবস্থা লাভ হয়—যেমন, অবতারাদির ও ঈশ্বর কোটির—তাঁহাদেরই ভক্তিচন্দ্র ও জ্ঞানসূর্য একত্র অবস্থিত। যে মানুষে ভক্তি 'উর্জিতা',—অর্থাৎ, যে ঈশ্বরার্থে পাগল—তাহাতে তিনি নিশ্চিত অবতীর্ণ। উর্জিতা ভক্তির লক্ষণ যেন ভক্তি উথলাইয়া পড়িতেছে এবং উহার দ্বারা ভক্ত হাসে, কাঁদে, নাচে ও গায়। যেখানে এইরূপ ভক্তি, সেখানে ভগবান স্বয়ং বর্তমান বুঝিতে হইবে—শুধু বিন্দু রূপে নহে! ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠক খানা—অর্থাৎ, বিশেষ ভাবে তাঁহার আবাস। ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার সহিত সদা আলাপের ফলে ভক্ত যখন বালকবৎ, তখন সে ত্রিগুণাতীত এবং তাহার লজ্জা-সঙ্কোচ-ঘৃণা প্রভৃতির পাশ থাকে না; যখন জড়বৎ, তখন সে সমাধিস্থ, বা বাহ্যশূন্য, বা কর্মাক্ষম; যখন উন্মাদবৎ, তখন পাগলের ন্যায় কাজ, 'কভু হাসে, কভু কাঁদে' ইত্যাদি এবং যখন পিশাচবৎ, তখন শুচি-অশুচি সমান বোধ এবং বিষ্ঠা-মূত্রে বিচারহীন, যেন সবই ব্রহ্মময়! ঈশ্বর প্রেমোন্মাদ হইলে, সর্বভূতে তাঁহার অনুভূতি হয়। ঈশ্বর প্রেমের শেষ সীমায়, এই ভাব সাধকের জীবনে স্বতঃই আগত হয় ও এইরূপ অদ্বৈত ভাব, সাধনার শেষ কথা।" প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদে জ্ঞানমিশ্রা এই মার্গ বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ২১ ও ২২ পর্বে উক্ত হইয়াছে ইহা কি কারণে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সাধন মার্গ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেছেন—'প্রেমভক্তি কেবল ঈশ্বর কৃপায় লাভ হয়'। এই প্রসঙ্গে, পরে ৩০ পর্ব দ্রষ্টব্য। সেই কাহিনীতে, মা কালী আমাকে প্রেমভক্তি দানে প্রতিশ্রুতা! চৈতন্যদেব প্রকাশানন্দকে বলিয়াছেন যে, প্রেমের স্বরূপ নিম্নলিখিত রূপ—

প্রেমের স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ-কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ্‌বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে কৃষ্ণপ্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
কৃষ্ণকে আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥

অতএব, ভক্তি-উদ্ভূত যথার্থ ঈশ্বর-প্রেম বড় সাধারণ বস্তু নহে। ইহার দ্বারাতেও দেহ ও জগৎ বোধে অস্তিত্বহীন হইতে পারে—যাহা বেদান্ত-জ্ঞানের শেষ সীমা।

৪। অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চাদি হইলেই যে ভাব হইয়াছে, সে ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত—কারণ, অভ্যাসের দ্বারা এই সব আয়ত্ত হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক। শাস্ত্রমতে, ভাবাঙ্কুরের লক্ষণ নিম্নলিখিত রূপ (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১৪ (২) অনুচ্ছেদ)—

> ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
> আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
> আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে।
> ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ক্ষান্তি—সকল বিষয়ে ধৈর্য, ক্ষমা এবং নিন্দা অপমানাদিতে অবিচলিত ভাব।

অব্যর্থকালত্ব—বৃথা কালক্ষেপ বিনা, সদা পারলৌকিক কল্যাণকর কোন কার্য।

বিরক্তি—বৈরাগ্য ও বিষয়ে অনাসক্তি ভাব।

মানশূন্যতা—গর্ব ও অভিমানাদি হীনতা।

আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা—ইষ্টবস্তু লাভের বিষয়ে সদা যেন একটা ব্যস্ত ভাব এবং ভগবৎ-কৃপা লাভ বিষয়ে একটা দৃঢ় বিশ্বাস।

নামগানে সদা রুচিঃ—ভগবৎ-নাম কীর্তনে অনুরাগ।

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে—কোন না কোন প্রকারে ভগবৎ-গুণ কীর্তনে অভিলাষ।

প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে—মন্দির সন্নিকটে বা তীর্থাদিতে বাসাভিলাষ, অথবা সর্বভূতে প্রীতি বা অনুরাগ।

৫। এই পর্বটি সহ পরবর্তী কয়টি পর্ব একত্রে আলোচনায় বুঝা যাইবে যে, আমার ও শরদিন্দুর উভয়েরই অল্প ব্যবধানের মধ্যে ভাবভক্তি ইত্যাদি লাভের ও কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণের নানারূপ অভিব্যক্তি হইয়াছিল। ঈশ্বর যে কেবল একজনকেই কৃপা করেন, তাহা নহে তাঁহার উপযুক্ত আত্মীয় স্বজনও যে অল্প-বিস্তর সেই কৃপার অধিকারী হন, তাহা আমার, শরদিন্দুর ও গীতার কাহিনীগুলি হইতে বেশ বোধগম্য হয়। এই প্রসঙ্গে, ১১ ও ১৮ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে আছে—

> হরিভক্ত কুলে যারা লভয়ে জনম।
> অন্তকালে যায় সবে গোলোক ভবন॥

অবশ্য, উক্ত অবস্থা লাভে যে উপযুক্ততা একেবারে অগ্রাহ্য, তাহা নহে।

যতীন-রামকৃষ্ণ

গান

জয় জয় পরব্রহ্ম, জয় সনাতন।
(জয়) চিন্ময়, আনন্দরূপ, জয় নিরঞ্জন ॥
বিচিত্র লীলা-বিলাস, সৃজন-পালন-নাশ;
(জয়) বিশ্ববীজ, বিশ্বেশ্বর, জয় পরম-শরণ ॥
আনন্দ লহর ছুটে, (কত) দেব-দেবী রূপ ফুটে;
সর্ব-দেব-দেবী রূপে সাধনার ধন;
ত্বংহি শিব বিশ্বগুরু, ত্বংহি কালী কল্পতরু;
ত্বংহি বিষ্ণু ভক্তাধীন, নরদেহ-ধারণ ॥

বিষয়—রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি, ভাব ও প্রেমে যেন আমি গদ্‌গদ হইয়া অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতেছি, অথচ কিছু দেখিতেছি না—এইরূপ স্বপন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল— ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭—দিবা, আন্দাজ সাড়ে তিনটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"হঠাৎ বোধ হইল যেন রামকৃষ্ণদেবের ভক্তি, ভাব ও প্রেমে আমি গদ্‌গদ হইয়া অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতেছি—অথচ, কিছুই দেখিতেছি না।"

২। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। এই স্বপ্নটি, পূর্ব পর্বে আলোচিত স্বপ্নের যেন একটি ভিন্ন রূপ কিন্তু ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অস্বাভাবিক গতি স্বপ্নান্তে বাহ্যতঃ অনুভব করি নাই। এই স্বপ্নেও কিছু দর্শনাদি করি নাই—অথচ, দুইটি স্বপ্নেই অনুভূতিগুলি এমন গাঢ়ভাবে উদয় হইয়াছিল যে, ঘটনাগুলি হয় নাই ইহা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না। এই প্রসঙ্গে, ১৯ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ বিশেষ দ্রষ্টব্য। ১৯ পর্বস্থ স্বপ্নের ন্যায় ২৩ ও ২৪ পর্বস্থ স্বপ্ন দুইটি আমায় বুঝাইল যে, বিশ্বে সবই যেন, না থাকিয়া বা না ঘটিয়া, কেবল আমার আত্মাতেই বা বোধে আছে, বা ঘটিতেছে। অদ্বয়, চৈতন্যময়, ব্রহ্মস্বরূপ আমার আত্মাই বিশ্বে

সর্বভূতস্থ ও সর্বভূতই আমার আত্মস্থ এবং এই আত্মা হইতেই সারা বিশ্ব জাত হইতেছে ও ইহাতেই সব প্রতিষ্ঠিত রহিয়া লয় পাইতেছে। যে-সকল জড়ীয় ভূতের বা পদার্থের ভিত্তি শূন্যস্বরূপ, তাহারা যে শূন্যই হইবে, ইহা সহজে অনুমেয়। অতএব, বিশ্বের যে জড়সত্তা ও তৎস্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা শূন্যাকারই বটে! সুষুপ্তি অবস্থায় যখন বাহ্য বিশ্বের অনুভূতি আমাদের জ্ঞানময় আত্মায় একেবারেই উদয় হয় না, তখন উহা আছে বলা যায় না—কেননা, যাহা একবার আছে, একবার নাই, তাহা নাই মনে করিতে হইবে। বিশ্বে যে অনন্তবিধ ব্যবহার দশা চলিতেছে, সেইটাই মহা আশ্চর্য্যের বিষয়! তবে, এইরূপ ঘটিতে পারে —যেমন স্বপ্নে কামিনী সম্ভোগে, শুক্রপাত! জ্ঞানময় আত্মায় একবার জগদ্ভ্রান্তি সমুদিত হইলে, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে জগৎ কিছুই নয়, বা সকলই শূন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই নিমিত্তই জীবের অনন্ত কাল সংসার বন্ধন ঘটে। এই সংসারে একমাত্র আত্মাই স্বীয় মায়ার সহিত মিলিয়া অখণ্ডভাবে মিথ্যা অভিনয় করিতেছেন। এই মিথ্যা অভিনয়ের মূলে, চিত্ত বা ‘ অহং ’ কল্পনা— যাহা হইতে, মিলিত জড়-চিৎ উপাদানে গঠিত এই কল্পিতাকার বিশ্ব উৎপন্ন। তবে, প্রেমভক্তের নিকটে সারা বাহ্যান্ত বিশ্বই চৈতন্যময়ী মহাকালী জগদম্বার লীলা বিলাস ও তৎস্বরূপ এবং ইহা লইয়াই তিনি সর্বকর্ত্রী ও তিনি ভিন্ন কিছু নাই। 'আমি' বা 'আমার' ভাবকে আছে বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই বিশ্বমূল—মায়া! ইহা ত্যাগ করিলে, চোর, লম্পট, বেশ্যা, ইত্যাদিও মুক্ত—তবে, ত্যাগ জগদম্বার ইচ্ছাসাপেক্ষ।

৩। স্বপ্নটি আমার ভবিষ্যৎ কর্মফলরূপে রামকৃষ্ণদেবে ভাবভক্তির বিকাশ প্রকট করিল। উহার প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি যে যথাকালে অনিবার্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত আমার, অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে আত্মানুভূতিই চরম পরিণতি। এই পর্ব সহ পূর্ববর্তী তিনটি পর্ব ও অন্যান্য নানা পর্বের আলোচিত স্বপ্ন বা ঘটনাগুলি যেন একত্র হইয়া, আমার উক্ত আত্মানুভূতি লাভের মার্গে যে সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরে ভাব ও প্রেমভক্তি মুখ্যরূপে অবলম্বিত হইবে, তাহা প্রকাশ করিল —যদিচ, কেবল এইরূপ প্রেমমার্গে সর্বত্র ঈশ্বরানুভূতিই সাধনার শেষ কথা (পূর্ববর্তী পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। প্রেমভক্তির পরিণতিই যে ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মত্ব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে, পূর্বে ৮ পর্বের ২ অনুচ্ছেদ এবং পরে ৩০ ও ৭৫ হইতে ৭৭ পর্ব বিশেষ দ্রষ্টব্য। শঙ্করাচার্য বলিতেছেন যে, যত কিছু মুক্তির কারণ আছে তন্মধ্যে একমাত্র ভক্তিই গরীয়সী। কৈবল্যই সর্ববিধ মুক্তির শেষ সীমা। ইচ্ছা করিলে, প্রেমভক্ত উহা সহজে লাভ করিতে পারেন।

যতীন-মহাদেব-কালী-কৃষ্ণ

গানাংশ

(১) মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী, যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম,
সকলে আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।

যোগবাশিষ্ঠ

(২) শ্রুতিতে চিদাকাশের যে আকার স্বীকার করা হইয়াছে, সে আকার মিলিত কালী ও রুদ্রমূর্তি! এই বিশাল বিশ্বে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা চিদাকাশ নহে। উহার বাহ্য রূপ ব্রহ্মের বশীভূত কল্পনার বা বাসনার অলীক জমাট-মূর্তি, যেমন বাষ্প হইতে নীহার।

(৩) নারদ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিতেছেন—

উৎকলখণ্ড (১৭-৮১)

অরুণোদয় কালে হি ভগবন্তং দদর্শিথ।
দশাহাৎ ফলদঃ স্বপ্ন তস্মিন্ কালে নৃপোত্তমঃ।

অর্থাৎ—হে নৃপ! যখন অরুণোদয় কালে ভগবানকে স্বপ্নে দর্শন পাইয়াছ, তখন সেই স্বপ্ন দশদিনের মধ্যে ফল প্রদান করিবে।

বিষয়—প্রত্যুষকালে শয্যায় শায়িতাবস্থায় ধ্যানে, ভ্রূদ্বয় মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে (ওঁ-কার স্থানে) মহাদেব ও অদ্ভুত বেশে কালীর অল্পকালস্থায়ী প্রকটন ও তিরোধান কালে তাঁহার কৃষ্ণমূর্তির ভাব ধারণ।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭—প্রত্যুষ কাল।

উক্ত কালে শয্যা ত্যাগ করিয়া, রাত্রে এক অপ্রাকৃত স্থানে নানা লোকের সহিত যোগাসনের বিষয় কথাবার্তার যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতি পথে

ভাল উদয় না হওয়াতে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলাম—কারণ, কিছুদিন পূর্বেও আর একটি স্বপ্নের এইরূপ পরিণতি হইয়াছিল। সেই জন্য, সমস্ত স্বপ্নগুলির উপরেই যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আসিয়া আমাকে বিশেষ শান্তিহীন ও সন্দেহ সাগরে নিমজ্জিত করিল। তৎপরে, শৌচাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিছানায় অন্ধকার গৃহে ঈশ্বর চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বৎসামান্য তন্দ্রাবস্থায় (শাস্ত্রে ইহা যোগনিদ্রা নামে অভিহিত!) ভ্রূদ্বয় মধ্যবর্তী অমৃত স্থানে, বা নাদ ও বিন্দু যুক্ত ওঁ-কারের স্থান আজ্ঞাচক্রে, মহাদেব ও কালী দণ্ডায়মান অবস্থায় অল্পকাল প্রকট হইলেন। যোগশাস্ত্র মতে, এই স্থান বারাণসী ধাম, বা ইতর লিঙ্গের আবাস, তপোলোক এবং এই স্থলের নিকটেই তিনটি পীঠ (বিন্দু পীঠ, নাদ পীঠ ও শক্তিপীঠ) বর্তমান। ঐ অলৌকিক মূর্তিগুলির নির্বাক অবস্থায় তিরোধান কালে, কালিকা দেবী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গিম ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিযুক্ত বেণীর লম্বা কেশগুচ্ছ ভূলুণ্ঠিত, গলদেশ গাঁদা ফুলের মালায় ভূষিত এবং এক হস্তে একটি লম্বা ত্রিশূল ধৃত ছিল। বলা বাহুল্য যে, এই দর্শনে আমার উপরোক্ত সকল সংশয়ই দূর হইয়াছিল। কালীই কৃষ্ণ এবং আমার দত্ত তাঁহার 'রঙ্গিণী' নাম (২১ পর্ব) অসার্থক নহে! পূর্বে রামকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, তিনিই কালী। এইবার কালী বুঝাইলেন যে, তিনিই কৃষ্ণ।

২। রাত্রের স্বপ্নের বিষয় যতদূর স্মরণ করিতে পারি তাহাতে মনে হয় যে, উহাতে যোগাসনের বিষয় চর্চা ছিল। দেখিবার কালে উহা খুব ভাল লাগিতেছিল এবং স্বপ্নান্তে আয়ত্তীভূত মনে হইলেও, তৎপরেই আয়ত্তের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় নাগাত আমি কিছুদিন যোগাসনের আলোচনা করিতাম এবং নিজ অভ্যাসের দ্বারা ব্যবহারোপযুক্ত একটি সহজ আসন অনুসন্ধান করিতাম। উক্তরূপে সব স্বপ্নগুলিকেই সন্দেহ করিবার পরে, উল্লিখিত অদ্ভুত-ভাবে আত্মদর্শন, আমায় যেন বেশ বুঝাইয়া দিল যে, যোগমার্গে সাধনা আমার কর্মফল (বা উপযুক্ত) নহে। পুস্তকের প্রথম ভাগের ষোড়শ অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, এই কলিযুগে যোগমার্গে সাধনা অনুপযোগী—যদিও মানবের রাজযোগের তুল্য শ্রেষ্ঠ বল নাই। হঠযোগ ভিন্ন রাজযোগে এবং রাজযোগ ভিন্ন হঠযোগে সিদ্ধ হয় না। হঠযোগে দেহের উপর মন থাকে, উপযুক্ত গুরু প্রয়োজন ও সিদ্ধাই লাভে বদ্ধ হয় ও মন ঈশ্বরাভিমুখী হয় না। রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেম ও জ্ঞান এবং ইহাদের উৎকর্ষে সাধক স্বতঃই সিদ্ধ হয়। আত্মোপাসকের 'রাজাধিরাজ যোগ' দ্রষ্টব্য (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায় ১৪ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। মা সারদেশ্বরী বলিতেন

যে, যোগাসন অবলম্বনে প্রাণায়ামাদি করিলে সিদ্ধাই আসিয়া সাধককে পথভ্রষ্ট করে এবং মন স্বতঃ স্থির হইলে ঐ সবের কোন প্রয়োজন নাই।

৩। রামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলেছিলেন—'সদাসর্বদা ঈশ্বর দর্শন হইলে, কলিযুগে শরীর থাকে না—একুশ দিন পরে উহা শুকনো গাছের পাতার মত ঝরে পড়ে যায়। উক্ত যোগ-নিদ্রাগত দর্শনের পর, আমার কতকগুলি অসাধারণ অবস্থা লাভ হইয়াছিল সেই গুলি যেন ২৩ ও ২৪ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নানুভূত আমার নিজ অবস্থার একটা বাস্তব আভাস। ভাব প্লাবিত হইয়া সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্যও করিতে পারিতাম না। যাহা করিতাম, সবই যেন যন্ত্রের মত—না করিলে নয় এইভাবে, নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্পন্ন হইত এবং সদা এক প্রকার ভাব-মাদকতায় মশগুল থাকিতাম। হাত, পা, ইত্যাদি যেন কিছুতেই কার্যকরী হইতে চাহিত না। চীৎকার করিয়া মাঝে মাঝে কান্না আসিত এবং উহা সংবরণ করিতে গিয়া বুকটা যেন হাতুড়ি পেটায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বোধ হইত। শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি অস্বাভাবিক অবস্থা প্রায় অনুভব হইত এবং তলপেট ভিতরে প্রবিষ্ট ও চেপ্টা হইয়া যাইত। যে-সকল দেবদেবী মূর্তিকে পূর্বে সহজে ধ্যানে ধারণা করিতে পারিতাম না তাঁহারা সহজেই ধ্যানে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইতেন। রাধিকা-দেবীর মূর্তিকে অপরূপ ভাবাপন্ন দেখিলাম। যে-সকল ঐশ্বরীয ভাব উদয় হইত, তাহা সংবরণ করিতে গিয়াই অধিক কষ্ট হইত।

৪। আমার দত্ত কৃষ্ণে, নাম 'রঙ্গরাজ' কালীর নাম 'রঙ্গিণী' এবং রামকৃষ্ণের নাম কৃষ্ণরঙ্গিণী' (২২ পর্ব)। রামকৃষ্ণই কালী (১১ ও ২২ পর্ব)। এই পর্বের কাহিনীতে কৃষ্ণ ও কালী একত্ব স্থাপন করিয়া রামকৃষ্ণের নাম 'কৃষ্ণরঙ্গিণী' ধারণ করিলেন—যাহা আমার পরলোকগতা মাতার নাম ছিল। পরে ২৭ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, সারদেশ্বরী (অভেদ রামকৃষ্ণ) আমার মাতার পূজাসনে উপবিষ্টা দেখাইয়া, ঐ নামই ধারণ করিবেন। হায়! হায়! কী অপরূপ ঘটনা বৈচিত্র্যে ইঁহারা সকলে আমার মাতৃনাম ধারণ করিয়া তাঁহাকে ও আমাকে ধন্য করিলেন। সারা বিশ্বই যেমন শিবদুর্গা, সেইরূপেই উহা কৃষ্ণরাধা, বা কৃষ্ণকালী (কৃষ্ণরঙ্গিণী)। রামকৃষ্ণ যেমন আমার পিতৃনামধারী 'সুরেশ' (ই পর্ব), শিব, কৃষ্ণ, রাম, ইত্যাদি সকলেই সুরেশ—শিবলিঙ্গ (২৬ পর্ব)।

৫। আমার যোগনিদ্রাগত দর্শনকে, পরবর্তী পর্বে আলোচিত নানা যুগল মূর্তি-সমন্বিত প্রত্যক্ষ অপ্রাকৃত দর্শন ব্যাপকতা দান করিয়াছিল। আমার আজ্ঞাচক্রস্থ শিব-কালীই সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ। ইঁহারাই আবার নানা প্রকৃতি ও পুরুষরূপী কৃষ্ণরাধা, রামসীতা, রামকৃষ্ণসারদা, ইত্যাদি কালীই অন্নপূর্ণা।

যতীন-সুরেশ (মহাদেব

কাশী অধীশ্বর, শিব জটাধর,
রজত-বরণ কলেবর।
যোগেশ্বর হর, ব্যাঘ্র চর্মাম্বর,
ত্রিশূল-ধারক বিশ্বম্ভর।
ত্রিলোক-কারক, ত্রিলোক-পালক,
ত্রিলোক-নাশক মহেশ্বর।
ভক্ত-শুভঙ্কর, অভক্ত-ক্ষেমঙ্কর,
পাতকীর কাল ভয়ঙ্কর।
দর্শনে তোমার, বহু দিন পর,
জ্বলিল বিরহ জ্বালা ঘোর।
সহে না যাতনা, মন যে মানে না,
বুক ফাটি গেল মোর।
বুঝিয়াছি সার, কৃপায় তোমার,
সারা বিশ্ব স্বরূপ তোমার।
তেঁই দেহ ক্রিয়া, সুরেশে অর্পিয়া,
সংসার বন্ধন নাহি আর।
গুরু হে আমার, পিতা যে আবার,
তব তুল্য কেহ নাহি আর।
ভক্তি পূর্ণ হৃদে, প্রণমি শ্রীপদে,
কর জোড়ে কোটি কোটি বার।
নাহি ধ্যান-জপ, নাহি পূজা-তপ,
যতীনের তুমি সার ধন।
না আছে অপায়, পেয়েছি তোমায়,
মি ব্রহ্ম সনাতন। (২৪)

যতীন-কৃষ্ণরঙ্গিণী (কৃষ্ণ-কালী)

নীরদ-বরণী, নিখিল-জননী,
দোলিত গলেতে গাঁদার বেষ্টনী।
ত্রিশূল-ধারিণী, শ্রীকাল-দমনী,
লুণ্ঠিত পদেতে, বিমুক্ত বিননি।
মহেশ-সঙ্গিনী, গিরীশ-নন্দিনী,
কিন্তু এবে 'মোর' নন্দিনী 'রঙ্গিণী'।
কোথায় ত্যজিয়া নরমুণ্ড হার,
পেলে গো রঙ্গিণী গাঁদাপুষ্প হার ?
কখন ত্যজিয়া গাঁদাপুষ্প হার,
পরিবে গো রঙ্গে বনপুষ্প হার ?
কখন ত্যজিয়া ত্রিশূল হস্তের,
ধরিবে গো ঢঙে বাঁশরী ওষ্ঠের ?
নাহি ভ্রম—যেই কালী, সেই কৃষ্ণ,
যেই কালী, সেই সুত রামকৃষ্ণ !
নাহি ভ্রম—'রঙ্গরাজ' মনচোর,
তুমি গো কৃষ্ণ—'রঙ্গিণী', সুতা মোর !
তত্ত্ব বলে রঙ্গ করে তিন জনে,
'কৃষ্ণরঙ্গিণী' নাম নিলে যতনে।
সার্থক করিলে মোর মাতৃ-নাম,
একত্ব স্থাপিলে তিন গুণধাম।
প্রেমে শ্রীমা পরে নিলেন ঐ নাম,
মা'র পূজাসনে রচি স্বাপ্ন ধাম।
হীরাতে মিলিল নীলা-মুক্তা-মণি,
ধন্য আমার মাতা কৃষ্ণরঙ্গিণী !

রুক্মিণীর কার্য মা'র নামকরণ,
নাহি বুঝা যায় বিনা সুচিন্তন।
বহু কাল পূর্বে হয়েছে যে নাম,
সেই নাম মূলে কত সরঞ্জাম।
কৃষ্ণরুক্মিণীর বিধি বিশ্বে সার,
তাঁর ইচ্ছা পালে অবশেষে সংসার।
একা তিনি বিশ্বে, সব ক্রিয়া তাঁর,
বিনা তত্ত্বজ্ঞান বুঝা অতি ভার।
বিশ্ব শক্তি-রূপ, না বুঝে মানব,
বেশ্যা নহে দোষী, শক্তি করে সব।
নাহি অর্পি কৃষ্ণে রতি, সে পাপিনী,
'দেহ কালী' ভাবি, সে মুক্তি-মার্গিনী।
কৃপার আকার, কৃষ্ণ কৃপা-যন্ত্র,
কৃপার আধার, কালী কৃপা-মন্ত্র।
প্রেমে এ'কে নিত্য অর্পি দেহ-মন,
কর্মফলে কেহ বদ্ধ নাহি হন।
না জানে যতীন সাধন ভজন,
জানে কালী সারা বিশ্বের স্পন্দন।
সর্বতীর্থ, বারাণসী-বৃন্দাবন,
রাজে যেথা চুম্বে সে ঐ চন্দ্রানন।
বৃক্ষমূলে জল করে বৃক্ষ পুষ্ট,
কালী-প্রেম তথা করে বিশ্ব তুষ্ট।
চুম্বন মুখে গো লহ অনিবার,
আমি যে তোমার—তুমি যে আমার। (৪৮)

রামকৃষ্ণদেব

(১) সচ্চিদানন্দ যে কি, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথমে হলেন অর্ধনারীশ্বর! কেন? না দেখাবেন বলে যে, পুরুষ-প্রকৃতি দুই'ই আমি। তারপর তা থেকে এক থাক্ নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও প্রকৃতি হলেন।

(২) হরি-হর অভিনয়, সব চিদানন্দময়,
সুধাময় শুদ্ধ সত্ত্ব জাগে।
হরি-হর শুদ্ধ সত্ত্ব সার,
ব্রহ্ম সম প্রায় নির্বিকার।
সে পদ পূজেন যাঁরা, প্রায় মুক্ত হন তাঁরা,
পুনর্জন্ম নাহি হয় আর।

(৩) মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্ব ঘটে,
নগর ফের মনে কর—প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥

বিষয়—সন্ধ্যাবেলা শয্যায় উপবিষ্টাবস্থায় সামান্য ধ্যানকালে, সম্মুখে জ্যোতির্ময় বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ও তাঁহার পর্যায়-ক্রমে শিব-অন্নপূর্ণা, কৃষ্ণ-রাধা ও রাম-সীতা তিনটি মিলিত যুগলরূপ ধারণ এবং তৎপরে লিঙ্গটির বিশ্বব্যাপী স্থূলতা প্রাপ্তি এবং সেই স্থানে ত্রিকোণাকার ব্রহ্মযোনির আবির্ভাব।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭—সন্ধ্যাকাল।

সন্ধ্যাকালে চক্ষু মুদ্রিত ও উপবিষ্ট অবস্থায় সামান্য ধ্যানে রহিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ সম্মুখে কিছুদূরে আবির্ভূত হইলেন এবং উহা যেন, রঙ্গমঞ্চে পট পরিবর্তনের ন্যায়, প্রথমে যুগলমূর্তি ত্রিশূলধারী শিব-অন্নপূর্ণা (বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ), তৎপরে যুগলমূর্তি বংশীধারী কৃষ্ণ-রাধা এবং পরিশেষে যুগলমূর্তি ধনুর্ধারী রাম-সীতা, এইরূপ এক একটি মিলিত মূর্তি ধারণ করিলেন। সমস্ত মূর্তিতেই শক্তি বামে অভেদভাবে অবস্থিতা ছিলেন। তৎপরে, মূর্তিগুলি তিরোহিত হইলে, লিঙ্গটি ক্রমে ক্রমে এত বৃহৎ আকারে পরিণত হইল যে, উহা যেন আমি আর ধারণা করিতে পারিলাম না। পরিশেষে চক্ষু খুলিয়া মনে হইল, যেন একটি ত্রিকোণ যন্ত্র উহার স্থানে আমার সম্মুখে রহিয়াছে। উহা 'শক্তিযোনি' বা 'ব্রহ্মযোনি'—যাহা হইতে বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে অনন্তবিধ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক মায়িক পরিবর্তন চলিতেছে। এই পুস্তকে আলোচিত অন্যান্য সমস্ত স্বপন ও ঘটনাগুলির ন্যায় এই দর্শনও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল।

২। উল্লিখিত দৃশ্যটি, পূর্ব পর্বে বর্ণিত আমার ভ্রূদ্বয় মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের বারাণসীধাম বা তপোলোকস্থ শিব-কালী সমন্বিত ইতর লিঙ্গ-স্বরূপ দৃশ্যের, একটি বিবৃতি মাত্র। প্রথম ভাগের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ওঁ-কার স্বরূপ শিবলিঙ্গ ও কাশীর বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের তত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছে। উহার অন্যান্য স্থানেও প্রসঙ্গানুযায়ী শিব ও শক্তির অপ্রাকৃত রমণ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের বিষয় কথিত আছে (প্রথম অধ্যায়, ৮, ১২ ও ১৮ অনুচ্ছেদ ; অষ্টম অধ্যায়, ১৭ অনুচ্ছেদ ও দশম অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)। অচল, অটল ও সুমেরুবৎ মিলিত শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপী চিদাকাশ ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু বিশ্বে ছিল না, এখন নাই এবং পরেও থাকিবে না। যখন প্রকৃতি বা শক্তি ঐ চিদাকাশ পরব্রহ্মে অনভিব্যক্ত ভাবে থাকেন, তখন পরব্রহ্ম 'নির্গুণ'। যখন প্রকৃতিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পরব্রহ্মে স্পন্দিত হইয়া জগৎ আবির্ভূত হয় ও মায়িক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য প্রকাশিত হয়, তখন পরব্রহ্ম 'সগুণ' কালী। যিনি শিব-শক্তি, তিনিই কৃষ্ণ-রাধা, নারায়ণ-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-সাবিত্রী, রাম-সীতা, চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরী, ইত্যাদি। নির্গুণ ব্রহ্মের অবতার নাই। তাঁহারা সগুণ ব্রহ্ম মহা-কালীরই অবতার এবং শক্তির অধীন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তদ্রূপ।

৩। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অবতারগণ, সকলেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা, বা পরব্রহ্ম। বাস্তবিক বিষ্ণু, শিব, রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি শব্দের 'সৎ' স্বরূপতাই মুখ্যার্থ—অর্থাৎ, উহাদের দ্বারা সর্বব্যাপী পরব্রহ্মই নির্দিষ্ট হন। যখন এই সচ্চিন্ময় বস্তু স্বশক্তি মায়া সহ যুক্ত হন, তখন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিগুণ ভেদে

বিশ্বের স্থিতি-সৃষ্টি-লয় কর্তা ঈশ্বর রূপে বিষ্ণু-ব্রহ্মা-মহেশ্বর নাম ধারণ করেন। বস্তুতঃ, সগুণ পরব্রহ্মই ত্রিগুণের দ্বারা ত্রিবিধরূপে কল্পিত হইয়াছেন। সারা বিশ্বই অদ্বিতীয় ব্রহ্মময়, বা কালীময়—অর্থাৎ, এই বিশ্বে ব্রহ্ম বা কালী সর্বময় ও সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ এবং ইহাতে ঘট, পট, বট, জীব, জন্তু, চতুর্বিংশ তত্ত্ব পর্বত, সাগর, নদী, ইত্যাদি সবই ভেদহীন ব্রহ্ম বা কালী (মিলিত শিব-শক্তি) স্বরূপ! বিশুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্মে বাস্তবিক কোন ভাবাভাব থাকা অসম্ভব, অথচ মিথ্যা 'অহং'-কল্পনা আছে। এই বিশ্বের যে বহিরাবরণ (স্থূল ; সূক্ষ্ম ; কারণ), তাহা এই মিথ্যা 'অহং'-কল্পনোদ্ভূত মিথ্যা বস্তু। নির্গুণ ব্রহ্মভাবে বিশ্বকে ধ্যানে, ইহা নিরাকার, নির্ব্যাপার ও সুমেরুবৎ অচল ও অটল ভাব সাধকের নিকটে ধারণ করে, কিন্তু নিজে নির্গুণ হইতে না পারিলে, এই সাধনা কঠিন। ঈশ্বরভাবে ইহাকে দেখিলে, ইহা সর্বভূতাত্মা জগদম্বার লীলারূপে সাধকের নিকটে পরিণত হয়। এই দুই ভাবের যে-কোন ভাব সঠিক অবলম্বনে, মুক্তি অনিবার্য। প্রথম ভাবে, সাধকের মনোনাশ 'অরূপ' এবং দ্বিতীয় ভাবে উহা 'সরূপ' —কিন্তু, সরূপ মনোনাশ হইতেই ক্রমে অরূপ মনোনাশ আসিতে পারে। সারা বাহ্য বিশ্বই শক্তির রূপ এবং উহা মরুভূমে মরীচিকা স্পন্দনবৎ, বা রজ্জুতে সর্পবৎ, বা আকাশে নীলিমার তারতম্যবৎ, মিথ্যা বা মায়িক হইলেও, বাসনার বশে জীব উহা সেই ভাবে ধারণা করিতে পারে না এবং তাহাকে বাসনার শুভাশুভ ভোগ দান'ই ঈশ্বরের বিশ্বপ্রেম-লীলা! স্বপ্নবৎ হইলেও, বাসনা-সম্ভূত কর্মফল বিষবৎ অনর্থকর এবং উহার ফল ক্ষয় না হইলে, বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ অলীক এই ধারণা অসম্ভব। প্রাক্তন পাপকর্মের ক্ষয়ের নিমিত্তই, নানাবিধ সগুণ ঈশ্বরোপাসনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। এইরূপ উপাসনায় চিত্ত শুদ্ধিলাভ করিলে এবং ভোগ-বাসনা অপগত হইলে, নিরাকার আত্মতত্ত্বে স্থিতি লাভ হইতে পারে। যতদিন প্রবল প্রাক্তন কর্মফল অবশিষ্ট থাকে, আভিজাত্য, মহারাজ্য ধন, জন, মান, বিক্রম, উপবাস, দান, ইত্যাদির দ্বারা সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই সকল—(+) প্রথম গ্রাফে কালির দাগে অবশেষ চিহ্নিত স্থান—(+) মায়িক নানাবিধ কর্মফল ও কর্ম আসিতেও যতক্ষণ, যাইতেও ততক্ষণ! যাহা অস্থায়ী, বা এখন আছে পরে নাই, তাহা মিথ্যা বলিতে হইবে।

৪। বিশ্বে সকল ঘটন বা বিলয়ের মূলেই আত্মা। শক্তিরূপিণী মায়িক দেহেন্দ্রিয়াদি লইয়া এই চৈতন্যের যে নানাত্ব ভাব, তাহা এই স্বপ্নবৎ অলীক বিশ্ব। যে-কোন অতীত ঘটনা আলোচনা করিলেই উহা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। দুই মিনিট পূর্বে আমি যে ভাল খাইয়াছি, তাহার স্বপ্নবৎ অনুভূতি ছাড়া আর কিছু

এখন নাই। ঐতিহাসিক বড় বড় ঘটনাগুলি আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, তাহাদের উক্তরূপ অনুভূতি ছাড়া আর কিছু থাকে না। অতএব, বিশ্ব স্বপ্নবৎ নানা অনুভূতি মাত্র এবং শিব ও শক্তির লীলাভূমি! অনুভূতির চৈতন্যাংশই শিব (বা আত্মা) এবং উহার মায়িক নানাত্ব স্বপ্নবৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পর্কে উদয় হয় বলিয়া, উহা অলীক। জ্ঞানীর নিকট অনুভূতির নানাত্ববোধই অজ্ঞান এবং সবই আত্মা ইহাই জ্ঞান। কিন্তু আত্মজ্ঞানী প্রেমভক্ত, বিশ্বকে মায়িক, বা কাল্পনিক, বা অলীক জানিলেও, উহাকে উড়াইয়া দেন না এবং অখণ্ডভাবে উহাকে অদ্বয় শিব ও/বা শক্তির স্বরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বার্পণ করত ভব সাগর উত্তীর্ণ হন। শিব-গীতায় মহাদেব বলিতেছেন— "যে-ব্যক্তি আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একমাত্র শিব স্বরূপ দেখিতে পান, তাঁহার কোনও তীর্থ গমন বা অন্য ধর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন নাই। যে-ব্যক্তি '**শিবোঽহং**' এই প্রকার অভেদ আত্ম-ভাবনা সঠিক করিতে পারেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন।" প্রতি জীবের প্রাণবায়ুর সঞ্চার স্থানে নালযুক্ত পদ্মকোষের ন্যায় সছিদ্র হৃদয় পদ্ম অধোমুখে অবস্থিত। ইহাকে 'দহর' (অল্পতর) আকাশ বলে। ইহা জীবাত্মার আবাস, আকাশবৎ দেহহীন, সূক্ষ্ম, সারা বিশ্বগত, তেজে আদিত্যবৎ এবং আকারে অঙ্গুষ্ঠবৎ শিবলিঙ্গ স্বরূপ—'দহর' নামক শিব। যোগশাস্ত্র মতে, এই স্থলেই ঈশান শিব, বা বাণলিঙ্গ অবস্থিত। যেমন শিবলিঙ্গে গৌরীপট্ট (প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ), সেইরূপ উক্ত 'দহর' শিব-লিঙ্গের মস্তকে উমা (উ + ম + অ = প্রণব শক্তি) দেবী 'বিন্দুরূপা' ইন্দুকলা রূপে অবস্থিতা। শিবপত্নী এই বিন্দু হইতেই জীবের বাহ্য দেহ বা রূপ জাত হইতেছে— '**রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং**'। সারা বাহ্য বিশ্বই শক্তির রূপ ও তাঁহার অভিব্যক্তি! এইরূপে সারা বিশ্ব অখণ্ডভাবে অদ্বিতীয় শিব-লিঙ্গের (শিব-শক্তির) দ্বারা ব্যাপৃত। সেই জন্যই আমি বিশ্বনাথ জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গকে বিশ্বব্যাপী স্থূলভাবে এবং পরে তৎস্থানে শক্তিযোনি দর্শন করিয়াছিলাম। বিশ্বে প্রতি অণু-পরমাণু, বাক্য ও ও তদর্থের ন্যায়, আপ্রাকৃত রমণে (লিঙ্গ ও যোনি সংস্পর্শে) মিলিত—অন্তরস্থ শিব (আত্মা, বা চিতি) ও বাহ্যস্থ শক্তি (জড়)। প্রতি সাগর তরঙ্গের নানাবিধ অভি-ব্যক্তি যেমন তরঙ্গই, সেইরূপ আব্রহ্মরেণু পর্যন্ত সাকার (স্থূল দেহাদি) ও নিরাকার (সূক্ষ্ম দেহাদি) যাহা কিছু বিশ্ব পদার্থ, সমস্তই চিন্ময় রমণাসক্ত (সুতরাং, প্রজনন শক্তিযুক্ত) শিব ও শক্তি, বা চিতি ও চিতিশক্তির রূপ। অগ্নিতে তেজই এবং জলে জলই বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শিবশক্ত্যাত্মক সগুণ ব্রহ্মই অনন্তরূপে ও ভাবে বিশ্বে নিত্য লীলায়িত। অতএব, সারা বিশ্বই শিব-শক্তির স্বরূপ এবং মানবের সর্ববিধ

স্পন্দনই তাঁহাদিগকে অর্পণীয়। এই সকল শক্তিলীলা কাল্পনিক, বা শূন্যবৎ, ইহা বোধে রাখিতে পারিলে বিশেষ মঙ্গল—কারণ, উহা 'ধ্যেয়' বাসনাত্যাগ, বা 'অরূপ' মনোনাশ (প্রথম ভাগ, সপ্তদশ অধ্যায়, (২) পাদটীকা)। সবই যখন শিব-শক্তির লীলা, তখন বাসনা কোথা থেকে আসিবে? উহা নাই! নানাত্ব মনের কল্পনা মাত্র—উহাও নাই! আছে বলিয়া যে নানাত্ব জ্ঞান, তাহাই পুনর্জন্মের বীজ! সর্ব-বস্তুই অদ্বয় শিবশক্ত্যাত্মক। চোর, লম্পট, বেশ্যা, ইত্যাদি সকলেই শিবশক্তির রূপ এবং যদি তাহারা ইহা বুঝিয়া (দেহাত্মবোধ ত্যাগ করত) তাঁহাদিগকে তদোদ্ভূত ও সর্ববৃত্তি মনপ্রাণ অর্পণ করে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়। আজ যে ঘৃণ্য, কাল সে মহাত্মা—যেমন বাল্মীকি, জগাই, মাধাই।

৫। নির্গুণ ব্রহ্ম মহান্ধকার স্বরূপ (**মহান্ধকারঃ পুরুষো নির্গুণ পরি-কীর্ত্তিতঃ**)। যখন শিবমাতা, বিশ্বপ্রাণরূপিণী, পরাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মে বিকশিত হন, তখন তিনি সগুণ ('**সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্**')—তেজোময় ব্রহ্ম। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র এইসগুণ ব্রহ্মকে 'কালী' বা 'আদ্যাশক্তি' নাম দিয়াছেন। পরমাত্মার স্বরূপ, ইনি ওঁ-কার বা প্রণবের সারশক্তি, পঞ্চ দেবময় (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব), পঞ্চ প্রাণময় (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান) ও সকল চৈতন্যের বীজ—পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত, পরমাত্মাতেই স্থিত এবং পরমাত্মাতেই ইঁহার লয়। সৃষ্টিকালে, স্থির সমুদ্রের বা স্থির সর্পের চঞ্চলাকার ধারণের ন্যায়, জ্যোতির্ময় প্রাণশক্তিযুক্ত সগুণ ব্রহ্ম হইতে নাদ ও বিন্দু প্রকটিত হন। তৎপরে, নাদের বিন্দুর সহ রমণে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়। এই রমণ অবিরাম। শিবলিঙ্গই শব্দব্রহ্ম, বা নাদময় অনাহত ধ্বনি ওঁ-কার স্বরূপ—বিশ্বের পিতৃস্থানীয়, অক্ষর ব্রহ্ম। বিন্দু-রূপিণী ব্রহ্মযোনি বিশ্বের মাতৃস্থানীয়া। ওঁ-কার ধ্বনির অন্তরে যে পীতবর্ণ দিব্য জ্যোতিঃ বর্তমান, মন সেই জ্যোতিঃর অন্তর্গত। ওঁ-কারই আদি শব্দ—কারণ, অন্যান্য সকল শব্দ উহা হইতে জাত হয় বলিয়া উহা অনাহত ধ্বনি—অর্থাৎ, উহা স্বতঃই সদা হইতেছে এবং উচ্চারিত হউক বা না হউক, উহা প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইতেছে। শব্দ ব্রহ্মরূপী শিবের মস্তক হইতে চরণ পর্যন্ত নানা অঙ্গে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি সংন্যস্ত (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ) এবং উহার দক্ষিণে 'অ,' উত্তরে 'উ,' মধ্যে 'ম', তদুপরি বিন্দু এবং সর্বোপরি তৎসমূহের সমবায়—স্বরূপ 'ওঁ' বিরাজিত। হরি ও হর উভয়েই তেজোময় সগুণ ব্রহ্মরূপী নাদ ও সম্পূর্ণ অভেদ।

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং, ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরঃ জ্যোতির্নাদরূপী হরো হরিঃ॥

আত্যাশক্তি মহাকালী—*অবশেষ কালির দাগে ও ছিদ্রে চিহ্নিত স্থান (৫৩)—*সগুণ ব্রহ্ম, মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ-স্বরূপা (৪ পর্ব) কুণ্ডলিনী এবং উহা হইতে ওঁ-কারাত্মক নাদ-বিন্দু, পীত-জ্যোতিঃ, মন, মনদেহী সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, মহত্তত্ত্ব এবং সঙ্কল্প-বিকল্পময় বিশ্ব ক্রমোদ্ভূত। জগৎ-প্রপঞ্চে তাঁহার অন্তবিধ বিকাশ নাই। তিনি সাধারণ পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র এবং বাহ্য-প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধহীন, অর্থচ কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ নহেন। মহাকালীই বিশ্বমূলাধারা এবং শিব-মাতা (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৯-৩০ অনুচ্ছেদ) ও নাদ-বিন্দু রূপ-ধারিণী—যেমন কারণ ও কার্য। গৌরীপট্ট সমন্বিত ওঁ-কাররূপী শিবলিঙ্গ, মহাকালী সগুণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং শব্দব্রহ্ম বা হর-হরি রূপী। শাস্ত্র বলিতেছেন—

> অনাহতস্য যঃ শব্দস্তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
> তস্য চান্তর্গতং জ্যোতি স্তস্য চান্তর্গতং মনঃ॥
> যস্মিন্ মনো লয়ং যাতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
> তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানঞ্চ হি ব্রহ্মতঃ॥
> ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম নিত্য সঞ্চিন্তয়েদ্ যতিঃ।
> শব্দব্রহ্মাদিরূপেণ শব্দাতীতং নিরঞ্জনম্॥

অতএব, নাদরূপী শিবলিঙ্গ, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ। যেমন সাগর বক্ষে তরঙ্গ, সেইরূপ ব্রহ্মের অন্তর হইতে জ্যোতির্ময়ী মহাকালী কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ-শক্তি সহ প্রথমে নাদ ও বিন্দু রূপ ধারণ করত নানাভাবে ও রূপে লীলায়িত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি সর্বদেহেন্দ্রিয়াদির সত্তা-স্ফূর্তিপ্রদা 'পিণ্ড' নামে অভিহিতা এবং ইহা হীন হইলে, হরি-হর-ব্রহ্মাদিও—(+) প্রাণহীন, বা শববৎ। পিণ্ড ও বিন্দু শক্তির সাহায্য বিনা ইহারা নিজ নিজ সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করিতে অক্ষম। কুণ্ডলিনী শক্তির অভাবে, সকলেরই দেহ ও ইন্দ্রিয়-গণ থাকিতেও শক্তিহীন হইয়া অকর্মণ্য হয়। (+) 'শক্তিং বিনা পরং ব্রহ্ম নিভাতি শবরূপবৎ'। নির্গুণ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি নাই (+)। [এই চিহ্ন [illegible] অন্তর্গত লিখনগুলি, প্রথম প্রুফে দুইটি কালির দাগে অবশে চিহ্নিত]। সগুণ ব্রহ্ম মহাকালীই পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের যথার্থ কর্ত্রী এবং তাঁহা হইতেই হরি-হর-ব্রহ্মা-অবতারগণের সাকাররূপ উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তির দ্বারাই বিশ্বকার্যে তাঁহারা পরিচালিত (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ ও দশম অধ্যায়, ২-৪ ও ৬ অনুচ্ছেদ)। যেমন শক্তি বিনা শিব জড়বৎ, সেইরূপ শিব বিনা শক্তিও জড়বৎ। অভেদ উভয়ে মিলিত হইয়াই সৃষ্টি কার্য চালাইতেছেন। শিব সদা শক্তিযুক্ত এবং শক্তি সদা শিবযুক্ত। অতএব, 'শিব' বা 'শক্তি' বলিলে উভয়কেই বুঝায়।

সারা বিশ্বই (পুরুষ) শিব ও/বা (প্রকৃতি) দুর্গার স্বরূপ—'পুরুষ-প্রকৃতি যন্ত্র ভিন্ন এই ভবে, তিনকালে কখনও কিছু না সম্ভবে'। এই পুস্তকের অবতরণিকা খণ্ডে যে দুইখানি ছবি সন্নিবেশিত আছে, উহারা ওঁ-কার প্রতীক শিবলিঙ্গের দুইখানি রমণাসক্ত রূপ। উহাদের অদ্ভুত উৎপত্তির—*অবশে কালির দাগে ও ছিদ্রে চিহ্নিত স্থান (৫৪)—*কাহিনী অবতরণিকা খণ্ডের ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। ঐ ছবিগুলিতে কালী 'বিন্দু'-স্বরূপা আর বাহ্য বিশ্বরূপিণী এবং শিব নাদরূপী অন্তরস্থ অক্ষরব্রহ্ম। শিবের সহিত বিপরীত রমণে, কালী সদা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন। প্রথম ছবিতে, শিবলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন অভেদ বিভিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতির রূপ এবং স্বামী বিবেকানন্দের সগুণ ব্রহ্মোপাসনার স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছবিতে, আমার শয়ন গৃহের পুস্তক লিখিবার স্থানের অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশিত হইয়াছে ('আ' ও ৩০ পর্ব দ্রষ্টব্য)। দুই-খানি ছবির দ্বারা, গুরুভাবিণী জগন্মাতা অদ্ভুত কৃপালীলা করত আমাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও সাধনপন্থা অবলম্বনের ইঙ্গিত করিতেছেন! এই প্রসঙ্গে, ৭৫ পর্ব দ্রষ্টব্য।

৬। যে চিৎ-জড়, বা কামবীজ 'ক্লীং' স্বরূপ, শিবশক্তিময় উপাদানে এই বিশ্বে দেহক্রিয়াদি সমস্ত বস্তু উদ্ভুত, তাহাতে তিনটি গুণ, বা মেজাজ (Disposition) নিবিড় ও ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। কায়মনোবাক্যের দ্বারা কৃত সমস্ত ক্রিয়াই প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের নিবিড় সম্মিলনে—কুণ্ডলিনী-শক্তি চালিত হইয়া—সম্পাদিত হয়। অতএব, এই ত্রিগুণই সর্ব স্পন্দনের মূল। জীবাত্মা বা পুরুষ দেহের সর্ব কার্য জানেন, বা সাক্ষী রূপে দর্শন করেন। তিনি যে নিজেকে দেহের সমস্ত কার্যের কর্তা ও কর্মফল ভোক্তা বোধ করেন, এই ভ্রমই তাঁহার অজ্ঞান ও পুনর্জন্মের বীজ। নিজেকে অকর্তা, অভোক্তা ও কেবল সাক্ষী মাত্র বোধই তাঁহার জ্ঞান এবং মুক্তির উপায়। দেহের সর্ববিধ প্রাকৃতিক স্পন্দন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, তাহারা যেন আমাদের (বা বোধের) সাক্ষী-স্বরূপতায় বা অনুমোদনে চলিতেছে এবং এই বোধ ভিন্ন কিছুই কিছু নহে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য, জ্যোতিঃ-স্বরূপ অভেদ আত্মা আমি, বা ঈশ্বর, বা ব্রহ্ম। আকাশ যেমন ঘটস্থ হইয়া উহার কোন কার্যে লিপ্ত নহে, সেইরূপে ঐ বোধ-স্বরূপ জীবাত্মা দেহস্থ হইয়া উহার কার্যে সদা সাক্ষী, বা অলিপ্ত। দেহ-কার্যে অভিমান, বা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব আরোপ করিলেই, তিনি যেন অতি দীনত্ব ও ঈশ্বর হইতে পৃথকত্ব লাভ করিয়া, বহু জন্ম বহুবিধ দুঃখে অভিভূত হন। নতুবা, বিশ্বের সর্ববিধ স্পন্দন-অনুভূতির অদ্বিতীয় মূল কারণ হইয়া, তিনি—

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥
অনাদিত্বাৎ নিগুর্ণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। দেহী তিন গুণের কার্য নিজেতে আরোপ করিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম দেহে বদ্ধ হন। সত্ত্বগুণ নির্মল ও প্রকাশময়, রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্তিময় এবং তমোগুণ অজ্ঞানময়। সত্ত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ (জ্ঞান আবৃত করিয়া) প্রমাদে, জীবাত্মাকে আসক্ত বা নিক্ষেপ করে। জীব সাক্ষী-স্বরূপতা অবলম্বনে তিনগুণ অতিক্রম করত সংসার মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। ত্রিগুণের কার্যকে যিনি দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত। সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ, রজোগুণ হইতে স্বপ্ন এবং তমোগুণ হইতে সুষুপ্তি হয়, কিন্তু আত্মা তিন অবস্থাতেই বর্তমান। একমাত্র চিন্মাত্র ব্রহ্মই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সর্বময় অধীশ্বর এবং তিনিই বহুরূপে নানা জীব। এই পুরুষ সর্বোপাধি বর্জিত এবং প্রকৃতি সর্বক্রিয়া সম্পাদিকা। '**একোহহম্ বহুস্যাম:**'—এই ইচ্ছার বশে, ব্রহ্ম লীলার ছলে নানাবিধ মনাদি অবলম্বনে, দেহের অন্তরে জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া, দেহের ও মনের অনন্তবিধ অবস্থা জানিবার জন্য, আপনাকে দেহ ও মন স্বরূপতা আরোপ এবং তদ্রূপে লীলা বিস্তার, করিতেছেন। মোটের উপর, বিশ্বের সর্ব-বিধ স্পন্দনের মূলই তিনি এবং জীব অবশে, পুতুল খেলার পুতুল যেমন ক্রীড়নকের অধীন, তাঁহার অধীন—"**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম !**"

৭। কালিকোপনিষৎ বলিতেছেন যে, '**সর্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ।**' ইহার কারণ এই যে, কালিকাই বিশ্বে সকলের প্রকৃতি. বা শক্তি এবং '**শক্তিজ্ঞানম্ বিনা নির্ব্বাণং নহি জায়তে।**' কৈবল্যই চরম মুক্তি! নিজের সর্বাঙ্গ সদা কালীর সর্বাঙ্গের সহিত অভেদ চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে সারা বিশ্বকেই সেইরূপ মনে হইয়া উহার অন্তর-বাহ্য কালীময় বোধ হয়। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ জীব দেহ, কোটি কোটি নানাবিধ রক্ত, হাড়, পেশী, ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষের (cells) সমষ্টি। ইহাদের দুইটি অংশ—প্রোটোজোয়া ও নিউক্লিয়স। মানব দেহে তাহারা প্রায় এক ইঞ্চির তিন শত অংশ পরিমাণের ব্যাসবিশিষ্ট ক্ষুদ্র গোলক-স্বরূপ এবং অণুবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্ট হয়। এই কোষগুলি জীবদেহে স্বতন্ত্র চৈতন্য ও প্রাণ যুক্ত। তাহারা পৃথক-বাসনা, দ্বেষ, অনুরাগ, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত নানা শক্তি—যুক্ত হইয়া দেহে বিরাজিত এবং অন্তর্যামী আত্মার সংস্পর্শে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ

তাহাদের স্পন্দনেই জীবের সর্ববিধ ইন্দ্রিয়বৃত্তি—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রবণ, রমণ, ইত্যাদি উদয় হয়। যেমন বিভিন্ন মানবের সংস্কারানুযায়ী তাহাদের দেহকর্ম সমূহ বিভিন্ন, সেইরূপ তাহাদের সারাদেহব্যাপী জীবকোষ গুলি, সমধর্মী হইয়াও ঐ একই কারণে তারতম্য যুক্ত। উদ্ভিদ দেহও নানাবিধ কোষ দ্বারা গঠিত। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। দেহের এই সকল অনন্তশক্তির কেন্দ্রই জগদম্বা। ব্যষ্টি জীবগুলির কোন এক ইন্দ্রিয়শক্তি সমষ্টি হইয়া কোন এক দেবের শক্তি—যেমন, ইন্দ্র বিশ্বের সমষ্টি হস্তশক্তি, অগ্নি সমষ্টি বাক্‌শক্তি, আদিত্য সমষ্টি চক্ষুশক্তি, ইত্যাদি (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২২ অনুচ্ছেদ); কিন্তু জগদম্বা এই সকল সমষ্টি শক্তিযুক্ত দেবতাদিগেরও সমষ্টি শক্তি। অতএব, দেহের অণু-পরমাণু প্রমাণ অংশও জগদম্বার দেহের সেই অংশের সহিত অভেদ চিন্তনীয়। এইরূপ করিতে পারিলে, দেহের সর্ব বিকারই তাঁহাতে অর্পিত হইয়া আর ফল প্রসব করে না। ইহাই প্রেমভক্তি, যাহা পঞ্চম পুরুষার্থ ও সাধনার শেষ কথা—প্রথম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, ১১ অনুচ্ছেদ (শিব বাক্য) এবং দশম অধ্যায় ২২ (১) অনুচ্ছেদ (কৃষ্ণ বাক্য)। বিশ্বের সমস্তই পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা ভিন্ন অন্য কিছু নহে (গীতা; ১৩-২৬)—অর্থাৎ, এইখানে শিব অনন্তরূপ 'অহং'-ভাবে, অনন্তরূপ কালীমূর্তি ধারণ করত, অনন্তরূপে ও শক্তিতে লীলায়ীত। অতএব, সবই অবিদ্যার মূর্তি কালী ভাবিয়া তাঁহার সহিত অভেদ চিন্তনীয়। এখানে তৃণাবধি সমস্তই জগদম্বার ইচ্ছায় সদা সর্বদা স্পন্দিত হইতেছে এবং তিনি একাকিনী—'তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও. আপনি দাও মা করতালি'। জগদম্বার দেহ-কর্তৃত্ব মুখ্য নহে—গৌণ। তাঁহার আত্মরূপে অধ্যস্ত পুর্যষ্টকের (ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম ও অবিদ্যা) স্পন্দনের দ্বারা তিনি মানবের অভিলষিত ভোগদেহ গঠন করেন এবং এই স্পন্দনই ত্রিগুণরূপে সমস্ত দেহকর্ম মূলে অবস্থিত রহিয়াছে। তিনি অনুভূতির তারতম্য অনুযায়ী সকল বস্তুর এবং সকল জীবের উৎপত্তি সম্পাদন করিয়া, তাহাদের বিষয়াস্বাদন শক্তি উৎপাদন করিতেছেন মাত্র, কিন্তু নিজে কোন ভোগে লিপ্ত নহেন। অবিদ্যা, বা 'অহং'-ভাবই, তাঁহার যথার্থ বিশ্ব-রূপ! এই প্রসঙ্গে, ২৯-৩০ পর্ব দ্রষ্টব্য।

যতীন-বিশ্বেশ্বর (পুরুষ-প্রকৃতি)

[পাদটীকা (৭)]

নেহারিনু ধ্যানে আমি, শিবলিঙ্গ বিশ্বস্বামী,
অল্পদূরে প্রকটিত, ধরি জ্যোতিঃ-রূপ।

মোর প্রেমে বিগলিয়ে, যুগলমূর্তি ধরিয়ে,
দেখালেন অর্ধ-অর্ধ অঙ্গে তিন রূপ।

পুরুষের যাম্য দেহ, প্রকৃতির সব্য দেহ,
দোঁহে যেন ভেদহীন, অতি মনোলোভা।

হেরিনু প্রথমে আমি, অন্নপূর্ণা-কাশীস্বামী,
যাম্য হস্তে শূলধারী, অনুপম শোভা।

নিলেন সে-স্থান পরে, রাধা-কৃষ্ণ কৃপা ক'রে,
দ্বিতীয় যুগলমূর্তি, বংশী যাম্য করে।

তিরোহিলে সেই রূপ, দেখিনু তৃতীয় রূপ,
সীতা-রাম মূর্তি, তীর-ধনু যাম্য করে।

ধ্যান ত্যজিনু যখন, হেরিনু চক্ষে তখন,
লিঙ্গ স্থলে শক্তিযোনি ত্রিকোণ উদিত।

আত্মযোনি সেই যন্ত্র, আত্মলিঙ্গ অন্য যন্ত্র,
প্রকৃতি-পুরুষ যেথা রমণে মিলিত।

সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ,
প্রকৃতি-পুরুষরূপী, চিন্ময় রমণে।

শিবশিবা সহ সবে, -পিতামাতা এই ভবে—
রামের রমণ-রূপী বিশ্বের স্পন্দনে।

সবে নাদবিন্দুরূপী, সবে শব্দব্রহ্মরূপী,
প্রণব স্বরূপ সবে—জ্যোতিঃ সারাৎসার।

সকলে ব্রহ্ম নির্গুণ, আবার ব্রহ্ম সগুণ,
বিশ্বপ্রেমে গলি সবে আদ্যার প্রকার।

অবোধ নর বুঝে না, নানাত্ব করি কল্পনা,
থাকে তার বহু জন্ম সংসার-আবাস।

ইষ্ট দেবের ভজন, অদ্যোশক্তির পূজন,
দ্বেষে না মানিলে, লভে নরক নিবাস।
নমি দেব সদাশিব, বিশ্বেশ্বর-লিঙ্গ শিব,
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' যিনি বিশ্ব মাঝে।
সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ,
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চৈতন্য, সদা যাঁহে রাজে।
আদ্যাশক্তির বিকাশ, সবে দেব শ্রীনিবাস,
থাক সদা প্রেমে মোর, যথা পড়ে দৃষ্টি।
পুরুষ-প্রকৃতি যত, লহ চুমু অবিরত,
ভিক্ষা মাগি সদা যেন হয় সমদৃষ্টি।
সর্বভূতে ঈশদৃষ্টি, যাহা প্রেম, সমদৃষ্টি,
বহু জন্ম সাধনার ফলে লাভ হয়।
ঈশ্বরেতে প্রেমভক্তি, সাধনার শেষ গতি,
অদ্বৈত ভাবেতে স্বতঃ ক্রমে উপজয়।
প্রেমোন্মত্ত করে তায়, অস্তিত্ব চলিয়া যায়,
হাসি, কাঁদি, নাচি, গাহি, ফিরে চারিধার।
গীতায় কৃষ্ণ-বচন— দুর্লভ সে মহাজন,
তার বড় নাহি কেহ সংসার মাঝার।
প্রেমভক্ত—কল্পতরু, পরমেশ, সদ্‌গুরু,
যাঁহার আশীষ সদা অমৃত সমান।
তাঁর সঙ্গগুণে হয়, মুহূর্তে পাপের লয়,
কৃপায় আশ্রিত তাঁর পায় পরিত্রাণ। (৪৮)

(৭)—এই কবিতাটির সহিত পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ডের চারি খানি পটের মিলন কর্তব্য

শরদিন্দু-কুলকুণ্ডলিনীশক্তি

বিষয়—সন্ধ্যাকালে পূজার সময়, শরদিন্দুর ভাবাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার অস্বাভাবিক অবস্থা ও পুলক-কম্প-রোমাঞ্চের আবির্ভাব এবং আনন্দাশ্রু বর্ষণ।

স্থান —শরদিন্দুর পূজা ঘর।

কাল —শেষ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

শরদিন্দু বলিতেছেন—

"ঐদিন সন্ধ্যাকালে যখন আমি আমার পূজার-ঘরে অর্চনার কালে মৃদু সুরে 'জয় রাধে', 'জয় রাধে', বলিয়া কীর্তন করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একটা অস্বাভাবিক ও অনির্বচনীয় অবস্থা ধারণ করত বন্ধ হইয়া আসিল এবং তলপেট ভিতর দিকে ক্রমান্বয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমে ভয় হইয়াছিল যে, উহা বুঝি একটা নূতন রোগ; কিন্তু পরে যখন মনে বিশেষ পুলক উদয় হইতে লাগিল, চক্ষু অনবরত আনন্দাশ্রু বিগলিত করিতে লাগিল এবং দেহ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত বোধ হইল, তখন আর কোন ভয় রহিল না। সেই সময় ঠাকুরদিগের ছবিগুলি অস্পষ্ট হইয়া একটি বর্ণনাতীত আনন্দময় অবস্থা দিয়াছিল! কিছুক্ষণ ভোগের পর, অবস্থা ক্রমে উপশম হইয়াছিল।"

২। উক্ত অবস্থার অনুরূপ অবস্থা আমার ২৩ পর্বে আলোচিত স্বপ্নান্তে ও ২৫ পর্বে আলোচিত দর্শনান্তে লাভ হইয়াছিল। বিনা প্রাণায়ামে, উহা ভাব ও প্রেম ভক্তিতেই লাভ হইতে পারে এবং উহা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণের নির্দেশক। ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকিলে, ঐ শক্তি জাগ্রতা হন এবং তখন সুষুম্নামার্গে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অল্লাধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহার ঐ অবস্থা লাভ হয়, তিনি নিজে উহা সহজে জানিতে পারেন না। এই বিষয়, পূর্বে অন্যান্য পর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, পুলকাদি ভাব ও প্রেম ভক্তির নির্দেশক (২৩ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা না হইলে, ভাব ও প্রেম ভক্তি লাভ হয় না এবং উহার জাগরণে শ্বাস-বায়ুর যে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ স্বাভাবিক বহির্গতি তাহা, বুঝা না গেলেও, হ্রাস পায় (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১১ (২) অনুচ্ছেদ)।

ষড়্ভুজ-ভবতারিণী-জগদ্ধাত্রী-সারদা

বিষয়—একই অহোরাত্রে আমার নিম্নলিখিত রূপ একটি ভাবাবস্থা একটি দর্শন ও একটি স্বপন।

(১) দিবায়, ভাবে কন্যারূপে ভবতারিণীকে বাম ক্রোড়ে লইয়া ও তাঁহার ছায়ামূর্তিকে নয়ন পথে রাখিয়া, কলিকাতায় বেলা প্রায় নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত পথ ভ্রমণাদি কালে, এক-প্রকার ভাবোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্তি।

(২) রাত্র দুইটায়, নিদ্রাভঙ্গে সম্মুখে সিংহ-বাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তি দর্শন।

(৩) রাত্র সাড়ে পাঁচটায়, বাল্যের ১৪নং কারবালা ট্যাঙ্ক-লেনস্থ বাসা ভবনের আমার গৃহে ৺মাতৃদেবীর পূজার আসনে সারদেশ্বরীকে উপবিষ্টা দর্শন, তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ এবং তথায় 'রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরী অভেদ' এইরূপ আকাশ বাণী শ্রবণ—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—(১) কলিকাতার ব্যাস্-পথে।
(২) ও (৩) আমার শয়ন ঘর।

কাল—'বিষয়ে' উক্ত—৩রা মার্চ, ১৯৪৭।

উক্ত দিবস প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিবার পর, আমার বরকন্যা (২১ পর্ব), মধুর-হাসিনী, ভবতারিণী, শ্যামা, তাঁহার এক ষোড়শ-বর্ষীয়া ছবির (উহা এখন কন্যা গীতার অধিকারভুক্ত) মূর্তিতে, আমাকে যেন পাইয়া বসিলেন। যে-কাজই করিতে যাই না কেন, তিনি যেন 'নাছোড়বান্দা' সদাই চক্ষের সম্মুখে, অন্য কিছুকে সেই স্থানটি দিবেন না এবং মাঝে মাঝে আমার চুম্বন গ্রহণ করিয়া আমাকে দিব্যানন্দে আপ্লুত করিবেন! এইরূপ অবস্থায়, তিনি আমাকে পাইলেন, না আমি তাঁহাকে পাইলাম, ইহা ঠিক করা কঠিন—তবে, তিনি যে পাইলেন এই কথাই ঠিক! ভাবিতে লাগিলাম, ইহা কি হইল, আমি কি সত্যই পাগল হইতে চলিলাম—যাহা দুই মাস পূর্বে দুই এক স্বপ্নে অনুভব করিয়াছিলাম

(২০ পর্ব)। ঐ দিন আমার হাওড়া পুলের নিকট, ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোডবাসী কোন লোকের সহিত বেলুড়ের নিকট মন্দির নির্মাণার্থে স্থান সংগ্রহের উদ্দেশ্তে ('ছ,' 'জ,' ২১, ২২ ও ২৫ পর্ব) সাক্ষাতের কথা ছিল। তজ্জন্ত আন্দাজ নয়টায় গৃহ হইতে বাহির হইলাম। ব্যাসে অত্যধিক জনতা সত্ত্বেও, কন্তাটিকে বাম ক্রোড়ে লইয়া ধ্যান ও চুম্বন করিতে করিতে, যেন ভাবোন্মাদ অবস্থায় চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং উহা সামলাইতে বুকের ভিতর কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। এইরূপে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া এবং তথায় বিফল মনোরথ হইয়া, গৃহে প্রায় বেলা বারটায় ফিরিলাম। ফেরতা পথে, কন্তাটির উপর রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেকটা এই ভাবে শাসন করিয়াছিলাম—'তোর্ মন্দির হবে, তার জন্ত আমাকে এত ভোগাইতেছিস্ কেন? যাহা করিতে হইবে, তাহা নিজে ঠিক করিয়া লইলেই তো হয়। এত গরমে ও লোকের ভিড়ে, আমার এই রুগ্ন দেহে ও বৃদ্ধ বয়সে হাঙ্গামা পোহাইবার শক্তি কোথা? আমার অর্থ, দেহ ও জন বল ইত্যাদি কিছুই নাই, তাহা তুই জানিস্—অথচ, মন্দির করিতে হইবে এই প্রেরণায় বুকের ভিতরটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতেছিস্, এখানে-ওখানে-সেখানে চিঠি লিখাইতেছিস্, কোলে উঠে যাইতেছিস্ ও ব্যাস থেকে গত শনিবার নামিবার সময় ফেলিয়া দিয়া বাতরোগে পীড়িত এক পায়ে ব্যথা ও অপর পায়ে ঘা করিয়া দিয়াছিস্! এইরূপে মারবি, কাটবি, অষ্টম-বর্ষীয়া কন্তা সেজে উলটা-সেলাম করবি, কক্ষে চড়বি, চুমো খাবি, আর মন্দির করাবি! যদি মন্দির করিতেই হয়, সমস্ত কার্য সহজ করিয়া দে! অত্য এখনও বাড়ী ফিরি নাই—পথে এই লোকের ভিড়ে হাত-পা কি ভাঙ্গিবে তাহা জানি না। তোর অসাধ্য কিছুই নাই—সবই যে করিতে পারিস—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৫৫)—*ঠেকিয়া শিখিয়াছি!' বাড়ীতে ফিরিবার পরে, ভাব ক্রমে ক্রমে উপশান্ত হইয়াছিল। উহার পূর্ববর্তী সমস্ত ঘটনাই কন্তাটির ইচ্ছা-সম্ভূত—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৫৬)! কে এই লীলা বুঝিতে সক্ষম? ভবতারিণীই রামকৃষ্ণ (১১ ও ২২ পর্ব) ও সারদা (নীচে ৩ অনুচ্ছেদ) এবং এই সবই আত্মার প্রেম-লীলা!

২। ঐ দিন রাত্রে প্রায় বারটায় নিদ্রিত হইলাম। প্রায় দুইটায় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেলে দেখি যে, সম্মুখে সামান্য দূরে সিংহ-বাহিনী জগদ্ধাত্রী দেবী আবির্ভূতা—সিংহের মুখ ও কেশর সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট! অল্পক্ষণ মধ্যেই মূর্তি তিরোধান করিলেন। দিব্য চক্ষু ভিন্ন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না—(গীতা, ১১-৮)। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—"ব্রহ্মের সাকার রূপ যে কি এবং কি

পদার্থের দ্বারা গঠিত, তাহা কল্পনাতীত। 'জ্যোতিঃ-ঘন,' 'চিদ্-ঘন' বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু সে জ্যোতিঃ চন্দ্র-সূর্যের সহিত তুলনীয় নহে—ফলে, ঐ রূপ অনুপমের ও বচনাতীত। আদিশক্তি হইতেই সাকার সকল রূপের উৎপত্তি—কৃষ্ণ, রাম, শিব, প্রভৃতি সব সাকার ঈশ্বররূপ তাঁহার গর্ভসম্ভূত। এই জন্য সকল দেবতাই উৎপত্তির কারণ হিসাবে এক আত্মার রূপ।" ঐ সকল রূপ, সাধক হিতার্থে তাহার নিকটে নানা ভাবে চৈতন্যময় হইয়া প্রকাশিত হন এবং তাঁহারা কেবল (+) কল্পিত, এই কথা ভুল। তাঁহারা চিন্মাত্রে গঠিত ও জড়বর্জিত এবং যোগীদিগের (+) নিকট একরূপেই প্রকট হন। [ফর্মাটির প্রথম প্রুফে (+) চিহ্নদ্বয় মধ্যস্থ লিখন বড় কালির দাগে অবশে চিহ্নিত]। জগদ্ধাত্রী প্রাণ-শক্তিরূপিণী, কুলকুণ্ডলিনী—কারণ, ঐ শক্তির দ্বারাই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ'। ঈশ্বর প্রাণ অবলম্বনেই জীবাত্মারূপে দেহে বিরাজিত—'প্রাণো হি ভগবান ঈশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। সারদেশ্বরীই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, জগদ্ধাত্রী ('আ' পর্ব)। ঐ দেবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত একটি লীলার কাহিনী নিম্নে [পাদটীকা (৮)] সন্নিবেশিত হইল।

৩। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটায় পুনর্বার নিদ্রিত হইলাম এবং প্রায় সাড়ে পাঁচটায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি বাল্যকালের বাসাবাড়ীর যে-ঘরে থাকিতাম সেই ঘরের—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৫৭)—* তক্তাপোষের উপর দক্ষিণমুখে পাঠ করিতেছি ও ঘরের মেঝে যে-দেওয়ালের নিকটে আমার গর্ভধারিণী মাতা পূর্ব মুখে ইষ্টার্চনা করিতেন ঠিক সেই স্থানে সেইরূপে—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৫৮)—*সারদেশ্বরীদেবী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমে নামিয়া তাঁহার পা দুখানি সাদরে জড়াইয়া এই ভাবে বলিলাম—'মা! তুই কি আমার সেই (মৃতা) মা? তাহা না হইলে, কেন তাঁহার পূজার আসনে রহিয়াছিস্?

(৮)—গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ের শিখরদেশে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মানস-সরোবরের এক মহাত্মার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে একবার তিনি একাদিক্রমে একাদশ দিন সমাধিস্থ হইয়া একাসনে ছিলেন। সেই কালের অভিজ্ঞতা তিনি নিজ মুখেই এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"যখন সাধনে বসিলাম, তখন মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী আসিয়া বলিলেন—'মায়ার পারে যাইতে হইলে, পরীক্ষা দিতে হইবে।' আমি বলিলাম—'আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নহি, আমায় মা দয়া কর'। তিনি পরীক্ষার কথাই বলিতে লাগিলেন এবং আমি কাতর প্রাণে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। তখন প্রসন্না মা আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশ পথে চলিতে লাগিলেন এবং আমরা এক দিব্য ধামে উপস্থিত হইলাম, যে স্থানের বৃক্ষ সকল স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল। আপনারা যে কালের কথা বলিতেছেন, সেই কালে আমি ঐ লোকেই ছিলাম।"

যাহা হউক, মা ! আমাকে কৃপা করিয়া, আমার ভিতরে যে-সকল দোষ বর্তমান আছে সমস্ত সংশোধন করত, তোর উপযুক্ত পুত্র করিয়া দে। ' সারদেশ্বরীদেবী মৌনভাবে যেন সম্মত হইলেন—হইবারই কথা, কারণ সকলেরই প্রকৃতি তিনি—এবং তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে এইরূপ একটা আকাশবাণী শুনিতে পাইলাম— ' রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরী অভেদ ! ' তাহার পর স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল। পূর্বে নানা পর্বে সারদেশ্বরীর আমাকে নানাভাবে কৃপার কাহিনীগুলি বর্ণিত হইয়াছে। একাধারে, তিনি আমার গুরু, ইষ্ট, আত্মা ও মাতা। এই পর্বস্থ কাহিনীর দ্বারা, আমার গর্ভধারিণী মাতার সহিত দৈহিক ঐক্য স্থাপন করত, তিনি আরও ঘনিষ্টভাবে আমার সহিত মাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন [(+) কর্মাটির প্রথম প্রুফে স্থানটি কালির দাগে অবশে চিহ্নিত], মাতার নামের (কৃষ্ণরঙ্গিণী) সহিত নিজ নাম মিলাইলেন (২৫ পর্বের দ্বিতীয় কবিতা) এবং রামকৃষ্ণও তাহাই করিলেন। পূর্বে ১ অনুচ্ছেদে আলোচিত আদ্যাশক্তি ভবতারিণীই একাধারে কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ ও সারদা। রামকৃষ্ণ পূর্বে আমার সহিত গুরু, ইষ্ট, আত্মা, পিতা এবং সুত-সুতা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ও সারদেশ্বরী যে অভেদ পরাৎপর জ্যোতিঃরূপী সগুণ ব্রহ্ম এবং ওঁ-কারাত্মক নাদ-বিন্দু, সেই গূঢ় রহস্য ২৬ পর্বে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যতদিন তাঁহারা ধরায় প্রকটিত ছিলেন, তাঁহাদের মায়িক কার্যকলাপ, রোগ, ক্ষুধা, কখন কখন অজ্ঞোপম ব্যবহার, ইত্যাদি দেখিয়া সাধারণ লোকের সাধ্য কি যে তাঁহাদের মহান্ স্বরূপ বুঝিতে পারে ? কৃপায় যাঁহাদের বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহারাই মাত্র বুঝিয়াছিল ! তাঁহাদের দেহান্তে আমি, শরদিন্দু, গীত', যতটুকু এখন তাঁহাদের বুঝিয়াছি, তাহা কেবল মাত্র তাঁহাদের কৃপা ! কৃষ্ণলীলায় স্বয়ং ব্রহ্মারও কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল। রামলীলায় চিরজীবি, মহাজ্ঞানী, কাক ভূশুণ্ডও রামের পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে প্রথমে বিশ্বাসবান্ ছিলেন না। অতি ভাগ্যবলেই তাঁহাদিগের পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, বা তাঁহারা বুঝাইয়া দেন। অবতারগণ নরলীলায় ঠিক মানুষের ন্যায় ব্যবহারবান্ বলিয়া, তাঁহাদের চিনিতে পারা সুকঠিন হয়। অবতার না হইলে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মিটে না এবং সঠিক ভাব ও প্রেম ভক্তি লাভের উপায় তাহারা জানিতে পারে না। ভক্তের জন্যই অবতার— জ্ঞানীর জন্য নহে। তবে, উপযুক্ত পাত্র পাইলে, তাঁহাকে দুই ভাবেই আকর্ষণ করেন। এই পর্বে বর্ণিত তিনটি কাহিনীতেই, আমার মা সারদাদেবী পরাপ্রকৃতি সর্বময়ী রূপে আমার নিকট প্রকটিতা হইলেন।

যতীন্দ্র-কালিকা

গান

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়,
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায় ॥
নখরে অরুণ ছুটে পদচিহ্নে পদ্ম ফুটে,
মকরন্দ গন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায় ॥
অট্টহাস্য অবিরত তড়িত প্রকট কত,
উজল ঝলকে আলো কালবরণ ঘটায় ॥

বিষয়—জ্যোতির্ম্ময়ী কালীমাতার দর্শন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল—১১ই মার্চ, ১৯৪৭—প্রত্যুষ কাল।

উক্ত কালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী কালিকাদেবী সম্মুখে সামান্য দূরে ক্ষণস্থায়ী দর্শন দান দিলেন। পূর্ব্বদিনে মনে এই সকল স্বপন ও দর্শনাদির সত্যতার বিষয়ে কিছু সন্দেহ হইয়াছিল—কেননা ভাবিয়াছিলাম যে, যদি ঈশ্বর-ঈশ্বরীর এত অনির্ব্বচনীয় কৃপাই লাভ করিলাম, তথাপিও কেন সাংসারিক নানা তাপ, অশান্তি, ইত্যাদি দুরীভূত হয় না? কৃপাময়ী মা দর্শন দান করিয়া সন্দেহ দূর করিলেন। তিনিই সন্দেহ, আর তিনিই বিশ্বাস! বিশ্বে সাকার বা নিরাকার যাহা কিছু, সবই শিবের সহিত তাঁহার রমণোদ্ভূত —অর্থাৎ, অহং-ভাব, বা চিত্তের, বা অবিদ্যার রূপ। ৮ পর্বে বর্ণিত শরদিন্দুর স্বপ্নে, আমাকে মায়ার পারে, 'দাওয়াই' খাওয়াইয়া, এখনই লইয়া যাইবার একান্ত ইচ্ছা জানাইয়া, সারদা আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরম করুণা সত্ত্বেও [(৮) পাদটীকা বিশেষ দ্রষ্টব্য], আমি এই সংসারে স্থিত অবস্থায় প্রাকৃতিক বিধানে তাঁহার মায়াশক্তির অধীন। এই মায়ার বশেই, সংসারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও অবতারগণ 'খাবি' খান্। রামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'ঈশ্বর দর্শন হইলেই যে সব হইয়া গেল, তা নয়। তাঁকে ঘরে আনিতে হয়—আলাপ করিতে হয়। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে! রাজাকে কেউ দেখেছে; কিন্তু দুই এক জন মাত্রই বাড়ীতে আনিতে ও খাওয়াতে পারে।'

মতীন-আত্মা

বিষয়—পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের চন্দ্রের আকারে আমার ললাটস্থ আজ্ঞা-চক্রে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৩ই মার্চ, ১৯৪৭—রাত্র প্রায় একটা।

উক্ত কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, গোসলখানা হইতে ফিরিয়া শয়ন করিবার পরে সামান্য ধ্যানাবস্থায়, ললাট দেশে আজ্ঞাচক্রে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের চন্দ্রের আকারে (অর্থাৎ, কেবল কিনারা জ্যোতির্ময় এবং মধ্যস্থল ছায়াবৃত) ক্ষণস্থায়ী আত্ম-প্রতি-বিম্ব দর্শন হইল। চেষ্টা করিয়াও পুনদর্শনে সক্ষম হই নাই। ইহার কারণ এই যে, দর্শনকালে মন অবশেই ক্ষণিক বিষয়জ্ঞানহীন হইয়াছিল—যাহা পরে চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারি নাই। এই দর্শনই ‘ নিজকে নিজের ভিতরে দর্শন’—যাহা সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য! এই দর্শনের ফল ৪ পর্বের ১ ও ৩ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। বিষয়টি যোগবাশিষ্ঠ এই ভাবে বুঝাইতেছেন—“ সাক্ষাৎকার বৃত্তিতে আবির্ভূত ব্রহ্মই অবিদ্যার উচ্ছেদে জ্ঞান-স্বরূপ, নিখিল বাসনার উচ্ছেদে ধ্যান-স্বরূপ এবং নিখিল দুঃখের উচ্ছেদে নির্বাণানন্দ-স্বরূপ। জীবাত্মা পুরুষাকার দ্বারা, বা হরি-হরাদির ভক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ হন। ইঁহারা চিরকাল আরাধিত হইলেও, বিবেকহীন বা বিচারাক্ষম ব্যক্তিকে জ্ঞান দানে অসমর্থ। একমাত্র পুরুষকার সমুত্থিত আত্মবিচারই আত্মসাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়—বরাদি গৌণ উপায়। হরি, গুরু, বা ধনের দ্বারা মহৎ-পদ লাভ হয় না। যাহারা সম্যক্ শাস্ত্রানুশীলন, রীতিমত চেষ্টা ও বিচারে পরাঙ্মুখ, সেই মূর্খদিগের শুভপথে প্রবৃত্তি উৎপাদানার্থ সাকার ঈশ্বর-পূজা—তন্মধ্যে, অভ্যাস ও যত্ন মুখ্য বিধি এবং তাহাতে অক্ষমস্থলে, পূজ্য-পূজক ভাব গৌণকল্প···বিচার ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া ঈশ্বর আরাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়··· অন্তরস্থ হৃদয়গুহাবাসী মুখ্য বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া, হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী গৌণ বিষ্ণুকে সেবা বা পূজা করিতে যাওয়া মূর্খতা···বহু জন্মের সাধনার বলে, তত্ত্বজ্ঞান উদয় হয় এবং এই জ্ঞান বিনা বিশ্বের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। উহা হইবে না ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অনুচিত। গুরু-দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শাস্ত্র মানিয়া চলিলে, ঈশ্বরানুগ্রহ সহজে লাভ হয় এবং এই অনুগ্রহেই মানব সিদ্ধি লাভ করে···দেহাত্মবোধ ত্যাগ

এবং 'আমি ব্রহ্ম', এই ভাবনাই 'সর্বত্যাগ' যাহা অন্য কোন উপায়ে (তপশ্চরণ, বনবাস, অন্নত্যাগ, বস্ত্রত্যাগ, রাজ্যত্যাগ, পত্নীত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাদি) সিদ্ধ হয়না... সাকার হরি দর্শন হইলে, আত্মদর্শনে বিলম্ব হয় না।" ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তবরগণ প্রথমে সাকার সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পরিশেষে পরম আত্মজ্ঞান লাভ করত, বহু সহস্র বৎসর সংসার ও রাজধর্ম পালন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের নানা পর্বে আলোচিত আমার দৃষ্ট ঈশ্বর বা ঈশ্বরী মূর্তিগুলি—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শিব, কৃষ্ণ, রাম, রামকৃষ্ণ, রাধা, সীতা, সারদেশ্বরী, ইত্যাদি সকলেই আমার সহিত স্বরূপে অভেদ, তিলমাত্র ভেদহীন এবং '**একমেবাদ্বিতীয়ম্**' আমার আত্মা ব্রহ্ম, বা কালী! তাঁহারা বিশ্বে যাহা করিতেছেন, আমিও তাহাই করিতেছি—তবে, তত্ত্বজ্ঞানে আমি উহা জানিলেও, সঠিক বাহ্য উপলব্ধিহীন! জীবিতাবস্থায় ইহা অনিবার্য এবং এইরূপ অবস্থায়, আমার এই পর্বে আলোচিত আত্মদর্শন শাস্ত্রানুমোদিত। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'যে গরু বাচ্‌কোচ্‌ করিয়া খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ দুধ দেয়; আর যে গরুর খাদ্য বিষয়ে কোন বিচার নাই, সে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া দুধ দেয়। ইষ্টের সহিত মানবের সম্বন্ধ পৃথক এবং তিনি ঐকান্তিকতার সহিত সদা সর্বদা পূজনীয় হইলেও, যে-ব্যক্তি সকল ঈশ্বর মূর্তিকে সম জ্ঞান করে, সেই ধন্য! আত্মজ্ঞানী প্রেমভক্ত সমদর্শীর নিকট বিশ্বে এমন কিছু নাই, যাহা আত্মা, বা ব্রহ্ম, বা যে-কোন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর এক মূর্তি বা অভিব্যক্তি নহে। সকলেই অভেদ এবং আমার আত্মা (বা আমি), এই ভাবে প্রেমের সহিত চিন্তনীয়। সকলেই যে আত্মাকালীর ভিন্ন মূর্তি (২৭ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ), এই তত্ত্বের ভুল অজ্ঞের পক্ষে মার্জনীয় হইলেও, দ্বেষীর পক্ষে অমার্জনীয় এবং তাহাদের মুক্তি সুদুর্লভ (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ৩৩ (৩) অনুচ্ছেদ)। যোগবাশিষ্ঠে আছে যে, আমাদের বাহ্যন্তরে যাহা কিছু নামরূপাদির সত্তা বোধ হয়, সমস্তই একমাত্র অবিদ্যা, বা অহং-কল্পনার স্ফুরণ—এমন কি, হরহরাদিও তাহা। শান্ত, নির্বিকার, ব্রহ্মের বিমল আনন্দময় অবস্থা হইতে স্বভাবতঃ একটি সংসারোন্মেষক বিকৃত স্পন্দন সমুত্থিত হয়। যাহার উপাধি আছে, বা যাহা কোন না কোন নামে বা গুণে অপর হইতে ভিন্ন, তাহাই সেই অবিদ্যার উন্মেষ। কালী অবিদ্যারূপিণী উক্ত সর্বময়ী স্পন্দনশক্তি। বায়ু ও তৎস্পন্দন যেমন এক, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম ও তাঁহার স্পন্দনশক্তি কালী কদাচ পৃথক নহে। মন, সংসারের আদি উপাদান; সৃষ্টিকর্তা মনোদেহী-ব্রহ্মা, উহার দ্বিতীয় উপাদান; আর এই বিপুল সংসার, অবিদ্যার (বা কালীর) প্রত্যক্ষ স্থূল দশা। বিশ্বে যাহা কিছু, সবেরই স্বভাবের মূলে অজ্ঞান।

শরদিন্দু-ভবতারিণী

গান

(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর উমার পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া, (তারে) জামাই বলে মানবো না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।

বিষয়—অর্চনা করিবার কালে ভবতারিণী দেবীর হস্ত প্রসার করিয়া শরদিন্দুর ক্রোড়ে আরোহণ এবং এইরূপে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের মাতৃ-সম্বন্ধ ঘনীভূত করণ।

স্থান—শরদিন্দুর পূজার ঘর।

কাল—১৬ই মার্চ, ১৯৪৭—বেলা আন্দাজ একটা।

শরদিন্দু বলিতেছেন—

" পূজার সময় যখন ভবতারিণীদেবীকে গঙ্গাজলাদি নিবেদনান্তে তাঁহার ধ্যান করিতেছিলাম, তখন তিনি দুই হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করত যেন ক্রোড়ে উঠিবার চেষ্টা দেখাইতে লাগিলেন। আনন্দে বিভোর হইয়া, ক্রোড়ে কন্যারূপে লইয়া আমি তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম।"

২। রঙ্গিণী ভবতারিণীদেবী সাদরে ও সরলে আমাকে তাঁহার পিতারূপে আট মাস পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলেন (২১ পর্ব)—অতএব, স্বাভাবিক ভাবেই শরদিন্দু তাঁহার মাতা। এক্ষণে, সেই মাতৃ-সম্বন্ধটিকে উক্ত আচরণের দ্বারা আরও গাঢ়ভাবে তিনি স্থাপন করিলেন। যাঁহার বরকন্যা স্বয়ং সর্বময়ী জগদম্বা, তাঁহার আর পূজার্চনাদি কি জন্য ? উল্‌টা দিক হইতে স্থাপিত বলিয়া, ঐ সম্বন্ধ অক্ষয়, অব্যয় ও অটুট। অভেদ রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীই এই ভবতারিণী দেবী (২২ ও ২৭ পর্ব)। অতএব, বালকৃষ্ণ, রাধা, শিব, ভবতারিণী, রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী, ইত্যাদি সকলেই আমাদের অনন্তকাল ব্যাপী বর পুত্র বা কন্যা। যাহাদের এই সব প্রেমময়, দুর্লভ, ভাব-সন্তান, তাহাদের বিরুদ্ধ—ভাবাপন্ন প্রাকৃতিক সন্তানাদির কি প্রয়োজন ? ' কড়ি দিব না, কিন্তু ত্রিলোকরাজ্য দিলাম '—এই দুজ্ঞের ভাব।

ষষ্ঠ দশ-কালিকা

(১) প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।

(২) সদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ।

(৩) সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্ববেদময়ীং পরাম্।

গান।

(৪) আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ী)।
আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্তচিত্ত হরা ডুবাও প্রেমসাগরে॥
তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ ভরে;
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ওমা প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায় কবে হব মা ধন্য, (ওমা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে;
তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, ওমা পাগলের শিরোমণি,
প্রেম ধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

(৫) শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা,
সুরা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না॥
বিপরীত রতাতুরা পদভরে কাঁপে ধরা,
উভয়ে পাগলের পারা লজ্জা ভয় আর মানে না॥

বিষয়—প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে, স্বপ্নে কালীঘাটে কালীদর্শন কালে, তথায় এইরূপ আকাশবাণী—'এখন থেকে, প্রেমভক্তি লাভের জন্য আমার এই মূর্তির চিন্তা (আত্মভাবে ?) অবলম্বন কর'—শ্রবণ।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল—২১শে মার্চ, ১৯৪৭—প্রত্যুষ কাল।

রাত্রে স্বপ্নে মা কালীর নানা মন্দির দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু, তাহাদের বৃত্তান্ত মনে পড়ে না। প্রাতঃকালে, উক্ত সময়ে, নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। ২৫ পর্বে বর্ণিত কাহিনীর ন্যায়, এই স্বপ্নটিও অরুণোদয় কালে দৃষ্ট হইয়াছিল।

"যেন বঙ্গের প্রধান আদ্যাপীঠ কালীঘাটের কালীঘরের পূর্বদিকের দরজা দিয়া তাঁহাকে দর্শনের পর, ভাল করিয়া দর্শনের উদ্দেশ্যে ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এমন সময় সেখানে এই মর্মে আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম—'এখন থেকে, প্রেমভক্তি লাভের জন্য, আমার এই মূর্তির চিন্তা অবলম্বন কর।"

২। উল্লিখিত কালিকোপনিষদ তত্ত্বানুযায়ী, মা আমাকে সমজ্ঞানে আদ্যাপীঠ কালীঘাটের মূর্তিকেই নিজরূপে ও সর্বত্র চিন্তায় প্রেমভক্তি সাধন উপদেশ দিলেন। এই চিন্তার স্বরূপ ২৬ পর্বের ৬-৭ অনুচ্ছেদে আলোচনা হইয়াছে। প্রেমভক্তির বিষয় প্রথম ভাগের নানাস্থানে (বিশেষতঃ, অষ্টম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) এবং পূর্বে ২১ হইতে ২৪ পর্বেও লিখিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, পূজা, ধ্যান, ভাব ও মহাভাব বা প্রেম (বস্তুলাভ), উত্তরোত্তর ক্রমে শ্রেষ্ঠ ভক্তি সাধন পন্থা। প্রেমভক্তি কেবল ঈশ্বর কৃপায় লাভ হয় এবং জগদম্বা যেন উক্ত স্বপ্নে আমাকে উহার সাধন ফলপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দান করিয়া পন্থা বলিয়া দিলেন। ঈশ্বরকোটির ও অবতারদিগেরই প্রেম হয় এবং উহা ঈশ্বরকে বাঁধিবার দড়ি—টান দিলেই প্রকটন! বৈধী ভক্তি আসিতেও যেমন, যাইতেও তেমন। রাগ (ভালবাসার সহিত) ভক্তি সার বস্তু। উহার পতন নাই এবং সাধারণ জীবের ভিতর বিরল। প্রেম সাধনাতীত অবস্থা ও লাভ হইলে জগৎ মিথ্যা বোধ হইবে, আর এই দেহ যাহা এত ভালবাসার জিনিস তাহাও মিথ্যা হইয়া যাইবে। 'যথা যথা দৃষ্টি পড়ে, তথা তথা ইষ্ট স্ফুরে'—ইহাই ঈশ্বর প্রেমের লক্ষণ! অতএব, সমজ্ঞান বা সর্বভূতে—*অবশে ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (৫৯)—*ঈশ্বর দর্শনই প্রেম এবং ইহার চরম সীমায় ঈশ্বর-প্রেমোন্মাদ অবস্থা (২৩ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ) লাভ হয়—যাহা সাধনার শেষ কথা! আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই চিন্তা সহজে লাভ হয়। কেবল ভক্তিতে এই অবস্থা লাভ হইতে পারে, কিন্তু বড় দুর্লভ। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ এবং ইহার লাভে সাধক একটি প্রেমের শিশুতে পরিণত হন—যাহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়—*অবশে কালির দাগে ছিদ্রাকারে চিহ্নিত স্থান (৬০)—*এবং সাধকের নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব যেন লোপ পায়। একাত্মক শিব-শক্তির (বা পুরুষ-প্রকৃতির) অপ্রাকৃত রমণ, বা প্রেম লীলায়, এই জগৎ স্থিতিশীল বা বিধৃত রহিয়াছে। প্রেমবশে জীবকে

কর্মফল দান করিয়া শিব জীবকে পরিশুদ্ধ করেন। যাহা কিছু এখানে সবই বাসনা-মূলক এবং এই বাসনা, বৈকারিক হইলেও, প্রেমের বা প্রাণের ভিত্তিতেই (৪২ পর্ব) কার্যকরী। দেহের এবং সর্ব পদার্থের প্রতি অণু-পরমাণু প্রেমের বা প্রাণের দ্বারাই গ্রথিত এবং পরস্পর পরস্পরের কার্য-সহায়ক। ঈশ্বরের জীব-প্রেম হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন এবং মানবের মানব-প্রেম হইতেই এই জগৎ-কার্য সুচারুভাব চলিতেছে। যাহা সুচারু নহে, তাহা প্রেমের বিকার মাত্র। অতএব, বিশ্বে প্রেম মহৎ-বস্তু এবং বিশ্বরূপী ঈশ্বরে প্রেমভক্তিই যে সর্বোৎকৃষ্ট সাধন বা মুক্তি পন্থা (২২ পর্ব, ৪ অনুচ্ছেদ), তাহা গীতার মহাবাণী (১২·২, ৫)!

৩। উক্ত স্বপনের পর, আমি একখানি কালীঘাটের কালীর দেহের উপরাংশের চিত্রপট (১৭ই মে) সংগ্রহ করিয়া আমার পর্যঙ্কের দক্ষিণস্থ দেওয়ালের কুলঙ্গির ঊর্ধ্বদেশে স্থিত ত্রিকোণাকার স্থানের উপরে অবশে সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। ফলে, কুলঙ্গিটি, তাহার উপরস্থ ত্রিকোণাকার স্থানটি ও তদুপরিস্থিত কালিকা-দেবীর দেহের উপরাংশের পট এই তিনটি মিলিয়া যেন সম্পূর্ণ শিবলিঙ্গের, বা মিলিত অভেদ শিব ও শক্তির, বা তাঁহাদের চিন্ময় বিপরীত রমণ-ক্রিয়ার একটি অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়াছে। অবশেই আবার, আমি উক্ত মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে বা পূর্বদিকে, ১৯৫০ সালে, স্বামী বিবেকানন্দের দেহের উপরাংশের একটি চিত্রপট রাখিয়াছি। এই পুস্তকের অবতরণিকা খণ্ডের দ্বিতীয় ছবি'ই এই স্থানটির চিত্রপট (অবতরণিকা, ২৯ অনুচ্ছেদ ও ২৬ পর্ব, ৫ অনুচ্ছেদ)। শিব ও শক্তির চিন্ময় রমণ হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন এবং এখানে যাহা কিছু সবই সেই রমণ-ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 'সর্বত্র হরগৌরি করেন রাসলীলা'—অর্থাৎ, সবই যেন শুদ্ধ বোধ হইতে জাত অনন্তবিধ 'অহং'-বোধ শক্তির লীলা—'রামের রমণ ছাড়া কোন বস্তু নাই', বা 'পুরুষ-প্রকৃতি যন্ত্র বিনা এই ভবে, তিনকালে কখনও কিছু না সম্ভবে'। এই ভাবই প্রেমভক্তি, বা সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন—এবং সাধনার শেষ কথা! বিশ্বে জগদম্বা (অভেদ শিব) একাকিনী—এই আন্তর-ভাব বিনা সঠিক প্রেমভক্তি হয় না। ইহাই চরমে ঈশ্বর প্রেমোন্মাদ অবস্থা এবং নিতান্ত বিরল। স্বপ্নটিতে, জগদম্বা আমাকে যেন প্রেমভক্তি দান করিয়াই উহা লাভের দ্বিতীয় উপায় যে তাঁহার শিব সহ বিপরীত রমণ ও তদর্থ চিন্তা, তাহাই জানাইলেন!

৪। এই পর্বের লিখন অবশে কালীপূজার দিন (১৮ই অক্টোবর, ১৯৫২) সমাপ্ত হইয়াছিল।

[২৬ পর্বের শেষে প্রেমভক্তের মহিমা কাব্যাকারে কীর্তিত]

মত্তীন-কুলকুণ্ডলিনী

বিষয়—একটি সর্প আমাকে জড়াইয়া রহিয়াছে ও ভয়ে আমি বস্ত্র ত্যাগ করিতে যাইতেছি—এইরূপ দিবা স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৭শে মার্চ, ১৯৪৭—বেলা তিনটা।

উক্ত কালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্বে, নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন আমার দেহের পরিহিত বস্ত্রের ভিতর একটা সাপ জড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমি ভয়ে বস্ত্র ত্যাগ করিতে যাইতেছি—পাছে সে আমাকে কামড়ায়।"

২। উক্ত সর্প কুলকুণ্ডলিনী শক্তি (আ পর্ব)। আমাতে ঐ শক্তির জাগরণের কাহিনীগুলি পূর্বে কতকগুলি পর্বে বলা হইয়াছে। ঐ জাগরণ যে তলপেট হইতে উর্ধ্ব দেশাবধি ব্যাপী, তাহা আমি পূর্বে বেশ বুঝিয়াছিলাম। এক্ষণে, এই স্বপ্নটি স্পষ্টভাবে বুঝাইল যে, উহা বস্ত্র পরিধানের স্থান কোমরের উর্ধ্বদেশ হইতে সারা নিম্নার্ধদেহ ব্যাপীও বটে। ধ্যানস্থ না হইলে, কোন জাগরণই আমি বুঝিতে পারি না। মন স্থির করিয়া ধ্যানস্থ হইলেই, মাঝে মাঝে বিশেষ আনন্দময় কুম্ভকাবস্থা লাভ হয় এবং অন্ততঃ হৃদয় দেশাবধি বায়ুর উর্ধগতি বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু উহার দেহের নিম্নদেশে—অর্থাৎ, গুহ্যের নীচে—গতি বুঝিতে পারা যায় না। আত্মাশক্তিই ঈশ্বর-সুর-নর-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি সর্ব দেহে কুলকুণ্ডলিনী রূপে থাকিয়া উহাদের সর্ববিধ দেহেন্দ্রিয়াদির স্পন্দন প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন এই জগতে কেহ কোন বিষয়ে কর্ত্রী নাই এবং দেহের সর্ববিধ স্পন্দনই তাঁহাকে আহুতি দান! নানা দৈহিক-শক্তি সংমিশ্রণ করত বাহ্য-প্রকাশ করেন বলিয়া, তিনি 'পিণ্ড' নামে অভিহিতা। তিনি জাগ্রতা না হইলে, মানবের চৈতন্য উদয় হয় না, বা লক্ষ লক্ষ জন্মের সঞ্চিত কর্মধারা, বা সংস্কার সমূহের, নাশ হয় না, বা ভগবান দর্শন হয় না। ভক্তিযোগে উনি শীঘ্র জাগ্রতা হন ও তখন ঈশ্বর দর্শন হয়। মন নিরোধ করত, সমাধির (বা যোগ-সিদ্ধির) জন্যই প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদির দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধ প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরকে ভক্তিযুক্ত ধ্যানে, মন ও প্রাণ স্বতঃ নিরুদ্ধ হয় এবং উহারা স্থির না হইলে, 'যোগ', বা সিদ্ধিলাভ, হয় না।

যতীন-কালিকা

গান

(১) তুলে নে রাঙা জবা মায়ের পায়ে সাজবে ভাল।
চল ত্বরা, পূজব তারা, মায়ের রূপে ভুবন আলো॥
নাচ্‌বে শ্যামা হৃদ্‌কমলে, ধোব চরণ নয়ন জলে,
ডাকবো তাঁরে কালী বলে ঘুচে যাবে মনের কালো।

(২) সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।

বিষয়—প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের ঠিক পূর্ব্বে, মা কালীকে অষ্টাধিক শত জবাপুষ্পের দ্বারা পূজনের আদেশ এক কর্ণে প্রাপ্তি এবং পূজা করিবার কালে, অদ্ভুত আচরণে তাঁহার আমাকে বার বার অভয় ও বর প্রদান।

স্থান—আমার শয়ন ঘরের উত্তর দিকস্থ বারাণ্ডা।

কাল—১৪ই এপ্রেল, ১৯৪৭—চৈত্র সংক্রান্তির দিবস (৩১-১২-৫৩) প্রত্যুষকাল।

উক্ত কালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছি, এমন সময় জাগরিতাবস্থায় আমার আম্মা, মা কালী, অদৃশ্য ভাবে এক কর্ণে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে অষ্টাধিক শত জবাপুষ্পের দ্বারা পূজা করিতে হইবে। তিনি যে মা কালী তাহা পুষ্পের নামেই বুঝিয়াছিলাম। তবে, কোথা, কবে, কিরূপে এবং কাহার দ্বারা ঐ পূজা নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিশেষ চিন্তিত ভাবে শরদিন্দুর নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম। শরদিন্দু, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে নবম বর্ষীয়া কনিষ্ঠা কন্যা দীপাকে নিদ্রোত্থিতা করিয়া তাহাকে পুষ্প সংগ্রহের ভার দিলেন। সে তাহাতে রাজী হইল, যদিও ঐ কন্যাটির উপর

দুইটি হুকুম ঐ সময় এক সঙ্গে জারি করা সহজ কর্ম ছিল না। সে প্রতিবেশী যুবক, অনিল সরকারের সাহচর্য অনায়াসে লাভ করত, বাড়ীর অনতিদূরস্থ পাইকপাড়া পার্কের বাগান হইতে অষ্টাধিক শত সদ্য-প্রস্ফুটিত জবাপুষ্প সংগ্রহ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বাড়ী ফিরিল। এইরূপে, প্রধান প্রয়োজন অতি সহজে সিদ্ধ হওয়াতে, আমরা বুঝিলাম যে মা সবই নিজে বন্দোবস্ত করিয়া সেই দিনই ঘরে পূজা চাহিতেছেন। অর্চনার পদ্ধতি আমি কিছু জানি না বলিয়া, শরদিন্দুকে দিয়া পূজা করাইব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু শেষে নিজেই নিবেদন করিয়া দিব এই ভাবিয়া অন্যান্য কিছু পূজোপকরণ (দূর্বা, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র ও মিষ্টান্ন) সংগ্রহ ও স্নানাদি করিয়া, বেলা প্রায় এগারটায় একটি প্রতিবেশীর নিকট হইতে কালীঘাটের মায়ের একখানি চিত্রপট আনাইয়া শরদিন্দুর পূজার ঘরে বসিলাম। প্রথমে মা'কে আমার পূজার পদ্ধতির বিষয়ে অনভিজ্ঞতা জানাইয়া ত্রুটির মার্জনা প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে, একটি একটি ফুল হস্তে লইয়া তাঁহার পটস্থ পায়ের উদ্দেশ্যে ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলাম। কতকগুলি ফুল এইরূপে ফেলিবার পর, দেখিলাম তিনি যেন তাঁহার বামস্য উর্ধ্ববাহুর বৃদ্ধাঙ্গুলীটি ঐ হস্ততলে টিপিতেছেন—অর্থাৎ. হস্তের ঐ স্থানে ফুল দিতে চাহিতেছেন। ঐরূপে পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অনেকগুলি ফুল তাঁহার 'অভয়' ও 'বর' হস্ততলের উদ্দেশ্যে নিবেদনান্তে বুঝিলাম যে, মা পূজার ফুল লইবার ছলে আমাকে বার বার অভয় ও বর দিতেছেন। তখন তাঁহাকে বলিলাম—'মা! কতবার তো ছল করিয়া অভয় ও বর দান করিলে! আমি অত বরাভয় লইয়া কি করিব? তোমার একটি বরাভয় প্রাপ্ত হইলেই তো সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়! আর অধিক তুমি কি দিবে, বা আমি তাহা লইয়াই কি করিব? তোমার কৃপা আমি অযাচিত ও আশাতীত ভাবে লাভ করিয়াছি. আর কিছুর আমার প্রয়োজন নাই। ছাই-ভস্ম চাহিলে, তুমি যে বিরতা হও—তাহা আমার জানা আছে,' (২ পর্ব)। তখন মা শান্ত হইলেন এবং আমি অবশিষ্ট ফুলগুলি তাঁহার দেহের সর্বত্র নিবেদন করিয়া দিলাম, কিন্তু বাম দিকের দুইটি হস্ততলে দিতে ভুল হইল। কতকগুলি সচন্দন দূর্বাদল ঐ দুইটি হস্ত-তলের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—'মা! তোমার অসুর-দলনী হস্তদ্বয়ে এই পূজা গ্রহণ কর। আজকাল দেশে তোমার অসুর দলের দৌরাত্ম্য বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে'—এবং পূজা সমাপ্ত করিলাম। তখন, দেশে সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল এবং পাইকপাড়া একটি অন্যতম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া চারিদিকে সদা ভীতির সঞ্চার করিতেছিল এবং নিরীহ ব্যক্তিগণ প্রাণ হারাইতে-

ছিল। ঐ বর্ষের ১৫ই অগষ্ট, ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

২। উক্ত ঘটনাটী কী এবং কেন, তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। উহা জগদম্বার আমার প্রতি অহেতুকী কৃপা—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে' (জগদম্বা প্রসন্না হইয়া বরদা হইলে, মানব মুক্তিলাভ করে)—এই মাত্র জানি! পাগলী মা যখন কাহাকে কৃপা করেন, তখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞান-হারা হইয়া যান। অথচ, মানব তাঁহাকে কত নিষ্ঠুরা ও নির্দয়া মনে করে এবং বুঝে না যে, অহঙ্কারোদ্ভূত কর্মফলই তাহার সব দুঃখ ও কষ্টের মূল এবং এই কর্মফল প্রাপ্ত না হইলে, সে পরিশুদ্ধ হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ হীনতার নিম্নতম স্তরে নামিয়া যায়। তিনি—

কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা।
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দ বিবর্দ্ধিনী॥

দেহের শুভাশুভ সর্ববিধ সার্বকালিক স্পন্দন জগদম্বাকে অর্পণ করিলে, কর্ম-ফল উৎপন্ন হয় না এবং ইহাই কর্মফল হইতে অব্যাহতি লাভের সহজ প্রধান উপায় (গীতা, ৯-২৭ ও ২৮)। অবৈধ কোন বিষয়ে নিরোধের চেষ্টাতেও বিফল মনোরথ হইলে, সেই অবস্থাও তাঁহাকে অর্পণীয়। যথাযথ এইরূপ অর্পণে আর অধিক কাল সেই দোষ থাকে না—অর্থাৎ, দেহে কর্তৃত্ব জ্ঞানশূন্য হইলে, বেতালে আর পা পড়ে না। প্রকৃত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি জগদম্বাকে দেহের সর্ব স্পন্দন অর্পণ করিয়া বাসনা রহিত। তিনি কেবল তত্ত্ব-জ্ঞানের বলেই মুক্ত। 'জীবাত্মাই ব্রহ্ম এবং অন্যান্য ভাবাভাব সকলই কল্পনা মাত্র, বা জগদম্বার ইচ্ছা-প্রসূত'—এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞাতব্য, বা বক্তব্য বা কর্তব্য অন্য কিছু নাই। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কোন বিষয়েই তাদৃশ পুরুষের বৃথা ক্লেশ নাই। তিনি ত্রিগুণাতীত এবং যখন যাহা করিবার আবশ্যক, তখনই তাহা করিয়া সুখে কালযাপন করেন। মানব স্বাধীনতা চায়, কিন্তু উহা লাভের উপায় জানে না! ভোগে দোষ নাই, কিন্তু উহা প্রকৃতি-পুরুষের দান বুঝিতে হইবে!

৩। এই পর্ব ও পূর্ববর্তী পর্বের লিখন অবশেষে কালীপূজার পর দিন (১৯শে অক্টোবর, ১৯৫২) সমাপ্ত হইয়াছিল। অষ্টোত্তর শত জবাপুষ্পে আমার মায়ের পূজার ফল এই পুস্তকটির অষ্টোত্তরশত পর্ব-সমন্বিত দ্বিতীয় ভাগ, বা চতুর্থ খণ্ড, রূপে পরিণত! অদ্ভুত সামঞ্জস্য! এই পুস্তকে আলোচিত সব ঈশ্বর-ঈশ্বরী মূর্তিই যে আত্মার বিভিন্ন রূপ, ইহা ভুলিলে সবই ভুল (২৭ ও ২৯ পর্ব)। বিশ্ব ব্যাপারে তিনিই সর্বময়ী—৩ পর্বের বন্দনায় (৬) চিহ্নিত স্থান!

[illegible]-মহাপুরুষ

বিষয়—পথে এক মহাপুরুষ পাগলের ভিক্ষা দ্রব্য হইতে আমার কিছু চাউল ও লবণ প্রাপ্তির স্বপন।

স্থান —আমার শয়ন ঘরের উত্তর দিকস্থ বারাণ্ডা।

কাল—১৬ই এপ্রেল, ১৯৪৭—রাত্রি প্রায় আড়াইটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"কোন পথে যেন একটি বদ্ধ পাগলের সহিত দেখা হইল। তাহার হস্তে কিছু ভিক্ষালব্ধ চাউল, লবণ, ইত্যাদি ছিল এবং তাহার নিকট যাহারা যাইতেছিল সে তাহাদিগকে ঢিল ছুঁড়িয়া তাড়াইয়া দিতেছিল। সে কিন্তু স্বেচ্ছায় আমাকে কিছু চাউল ও লবণ দিল এবং আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। এমন সময়, কোথা থেকে শরদিন্দু আসিয়া আমায় বলিলেন—'ঐ লোকটা পাগল নহেন, উনি একজন মহাপুরুষ—তুমি উঁহাকে বুঝিতে পারিতেছ না। তোমাকে ঐ চাউল ও লবণ খাইতে হইবে, কারণ উহা মহাপুরুষের প্রসাদ ও অতি বিশুদ্ধ বস্তু—যাহা তুমি মহা ভাগ্যবলেই লাভ করিয়াছ"।

২। প্রসাদ খাইলাম কি না তাহা স্মরণ হয় না। এমন সময় স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গেল। উক্ত স্বপ্নটির প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে তাহা আমার অগোচর। এখন উহা ভবিষ্যতের গর্ভেই—*অবশেষে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত তিনটি স্থান (৬১ —*নিহিত থাকুক! নারদকৃত ভক্তিসূত্র (৩৮-৪২) বলিতেছেন—'ভক্তি সাধনায় মহাত্মাগণের কৃপা* বা ভগবানের কৃপা-কণা লাভই মুখ্য সাধন। মহৎসঙ্গ* দুর্লভ, অগম্য ও অমোঘ। ভগবানের কৃপা হইলে, মহৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে তাঁহাতে ও তদনুগত সাধু ব্যক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই।' ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—'যে-ব্যক্তি হরিনামাশ্রয়ীকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, সে পরম ধাম লাভ করত ভগবৎ-পার্ষদ হয়। অতএব, দৃঢ় চিত্তে নাম অবলম্বন ও ভজন কর, কারণ নামযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়।' যথার্থ হরিনামাশ্রয়ী ব্যক্তির মহিমা যে ভুবনে অতুলনীয়, তাহা পূর্বে ৩ ও ২০ পর্বে লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলিতেছেন—'যে-ব্যক্তি সদা বৈষ্ণব দর্শন করে, সে অন্তে গোলোক

গতি লাভ করত কৃষ্ণ-পার্ষদ হয়। উভয়ে একাত্মক বলিয়া বৈষ্ণবে ও বিষ্ণুতে কোন ভেদ নাই এবং বৈষ্ণবের নিন্দায় ঘোর পাপ হয় ও সকল দেবতা রুষ্ট হন। বৈষ্ণবের গুণ বর্ণনা করিতে স্বয়ং বিষ্ণু অসমর্থ।' শুধু হরি সাধক যে 'বৈষ্ণব' তাহা নহে। যে-কোন ঈশ্বর মূর্তিকে প্রেমভাবে বা সর্ব-প্রিয় আত্মারূপে সাধনার দ্বারা 'বৈষ্ণবত্ব' সিদ্ধ হয়। এই আত্মা হইতেই সমুদয়, তাঁহাতেই সকল ও তিনিই সর্বময় হইয়া সর্বত্র স্থিত। তিনি সর্বান্তর্যামী ও বিশ্বরূপী। তাঁহারই বেদসম্মত নামান্তর 'ওঁ' (২৬ পর্ব)। সাধারণের পক্ষে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তির পূজা কর্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞের অপমানকারী ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী এবং দেহান্তে তাহারা বহুকল্প নিরয়গামী হয়। স্ত্রী হত্যা ও ভ্রূণ হত্যায় যে-পাপ স্পর্শে, ব্রহ্মোপাসকের নিন্দায় তাহার কোটি-গুণ পাপ প্রাদুর্ভূত হয়। পরব্রহ্মের উপাসক আর ব্রহ্ম পদার্থ অভেদ। এই সকল বিষয় পুস্তকের প্রথম ভাগে নানা স্থানে—বিশেষতঃ, অষ্টম ও একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা আছে। ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায়, যে-ব্যক্তি আপনাকে (আত্মা-মন-দেহাদি) এবং কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অহঙ্কারহীন এবং সর্বভূতে সম (ঈশ্বর)—*অবশে কালিতে জলের দাগে চিহ্নিত স্থান (৬২)— *দর্শী, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণী পৃথিবীতে নাই। সেই ব্যক্তি, সঙ্গত্যাগী, উদাসীন ও অনুষ্ঠিত কর্মের ফলানুসন্ধানহীন ব্যক্তির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ, বেদের অর্থজ্ঞ, বেদের মীমাংসাকারী, স্বধর্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গত্যাগী, উদাসীন ও অনুষ্ঠিত কর্মের ফলানুসন্ধানহীন ব্যক্তি উত্তরোত্তর ক্রমে শ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে, পুস্তকের প্রথম ভাগ চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।' সর্বত্র আত্মা বা ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিকে বজ্র, অস্ত্রশস্ত্র, হুতাশন, জল, বায়ু, ইত্যাদি ক্ষতি করিতে পারে না। ঈশ্বর বা আত্মা হইতে ভিন্ন মায়িক কোন বস্তু নাই এবং তিনিই যখন সেই ঈশ্বর, তখন তাঁহার কোন বিষয়ে ভয় কোথা হইতে আসিবে? নিজ হইতে নিজ ভয় হইতে পারে না! আত্মজ্ঞানীর হিংসাকারী শত্রু-গণ মৃত এবং অন্যান্য শত্রুগণ পরাস্ত হয়। আত্মঘাতী ভিন্ন অপর কেহ এইরূপ মহাপুরুষের প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে না। তাঁহার স্বরূপ এই প্রকার—

সর্ব্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ং।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহং আনন্দোঽহং নিরন্তরং॥
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥

[১২ পর্বের শেষে মহাপুরুষ বন্দনা দ্রষ্টব্য]

শরদিন্দু-আত্মা (নারায়ণ)

ওঁ ধ্যেয় সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥

বিষয়—পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের চন্দ্রের আকারে শরদিন্দুর আজ্ঞাচক্রে আত্ম-প্রতিবিম্বের এবং উহার মধ্যস্থলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—এপ্রেল ১৯৪৭ সালের শেষভাগ—রাত্র প্রায় বারটা।

শরদিন্দু বলিতেছেন—

"শয়ন করিয়া নিদ্রার পূর্বে ইষ্ট চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ললাটে ভ্রূযুগলের মধ্যে, কিনারায় জ্যোতির্ময় ও মধ্যস্থলে ছায়াবৃত একটি সূর্য বা চন্দ্র সম গোলাকার বস্তু এবং তন্মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তির অল্পকাল প্রকটন।"

২। ললাটস্থ উক্ত স্থান 'চন্দ্রমণ্ডল,' বা 'অমৃতস্থান,' বা 'অবিমুক্তক্ষেত্র,' বা 'বারাণসীধাম,' বা 'তপোলোক'। উহা ওঁ-কারাত্মক আত্মার স্থান—যেখানে হাকিনী শক্তি সহ ইতর-লিঙ্গ, বা মহাকাল সিদ্ধ-লিঙ্গ, বিরাজিত। এই স্থানের উপরে বিন্দুপীঠ, নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ আছে। শরদিন্দুর উক্ত দর্শন, ২৯ ও ৩৬ পর্বে বর্ণিত আমার দর্শনের অনুরূপ। এই দর্শনের ফল ২৯ ও ৪ পর্বে লিখিত হইয়াছে। আত্মদর্শন হইলেই মুক্তির অধিকার হয় এবং ইহাই অবিদ্যা, বাসনা ও দুঃখ উচ্ছেদে যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান ও নির্বাণ স্বরূপ। সকল ঈশ্বর মূর্তিই সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ অভেদ আমাদের আত্মা। ইষ্টদর্শন হইলে, আত্মদর্শনে বিলম্ব হয় না এবং আত্মদর্শন হইলে, ইষ্টদর্শনে বিলম্ব হয় না। এই ঘটনাতে শরদিন্দুর ইষ্ট কৃষ্ণ, তাঁহাকে আত্মারূপী নারায়ণ রূপে দর্শন দান করিয়া তিনের অভেদত্ব প্রকাশক। এই প্রসঙ্গে, লক্ষ্যের বিষয় এই যে, আমার যে-সকল বিভূতি লাভ হইতেছে, শরদিন্দুও সামান্য ভিন্নরূপে সেই সকল হইতে বঞ্চিত হইতেছেন না। এই জন্যই শাস্ত্রোক্তি যে, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের কর্মফলভাগী। মনে হয় যে, উক্ত দর্শনকালে শরদিন্দুর মন বিষয়হীন হইয়াছিল।

যতীন-হনুমান

গান

ভ্রূমধ্যে হের দ্বিদলে।

ত্রিতাপহর পরমানন্দকর গুরু চরণ কমলে।

শুক্লাম্বর কটি বিশাল বক্ষ মাঝে,

সচন্দন শুক্ল ফুলমালা সাজে,

রক্ত-বাসা বামে শকতি রাজে,

শত চাঁদ নিন্দি শ্রীমুখ উজলে।

ভকতবৎসল বাঞ্ছা-কল্পতরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরু,

প্রসন্ন দীন প্রতি ধরি দিব্যাকৃতি শ্রীসচ্চিদানন্দ লীলাছলে।

শান্ত মনোহর মধুর মুরতি স্নিগ্ধ শুভ্র শুদ্ধ জ্যোতি,

আব্রহ্ম সর্ব পিতা-প্রসূতি করুণা বীক্ষণ নয়ন যুগলে ॥

বিষয়—প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের ঠিক পূর্বে, গম্ভীর কণ্ঠে হনুমানদেবের স্বরে, এইরূপ আশীর্বাদ বাণী এক কর্ণে শ্রবণ যে, আমি আত্মতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ শ্রেয় লাভ করিব।

স্থান—আমার শয়ন ঘরের উত্তর দিকস্থ বারাণ্ডা।

কাল—২৬শে এপ্রেল, ১৯৪৭—প্রত্যূষকাল।

উক্ত কালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছি, এমন সময় জাগরিতাবস্থায় আমার আত্মস্থ অদৃশ্য হনুমানদেব এক কর্ণে তাঁহার, মন্ত্রদানকালের উচ্চারিত গম্ভীর স্বরে (৭ পর্ব), আশীর্বাদ করিলেন যে, আমি আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে বিশেষ শ্রেয় লাভ করিব। কেমন করিয়া উহা লাভ হইবে, তাহার কোনও নির্দেশ দিলেন না। আমি সেই সময় কিছু দিন পূর্ব হইতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ছিলাম এবং উহা বড় প্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছিল। কিন্তু, নির্গুণ ব্রহ্মভাবে সমস্ত সাকার ঈশ্বর রূপ উড়াইয়া দিয়া 'জগৎ মিথ্যা' এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে, মন আদৌ চাহিতেছিল না। মা'কে পূর্বরাত্রে শয়নকালে এইরূপ জানাইয়া ছিলাম—"মা! যোগবাশিষ্ঠের আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত উপদেশই অতি হৃদয়গ্রাহী যুক্তিতর্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, 'জগৎ মিথ্যা'

বলিয়া প্রেমময়ী তোমাকে উড়াইয়া দিতে আমি অক্ষম।” গুরুদেব উক্ত আশীষের দ্বারা আমাকে এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন—‘তুমি যেরূপে আত্মতত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত আছ, তাহাতেই তোমার বিশেষ মঙ্গল হইবে, তোমার ভয়ের কোন কারণই নাই।’ গুরুদেব আত্মারই এক রূপ এবং তিনিই ব্রহ্ম!

২। আমার লিখিত চারি খণ্ড পুস্তকের পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আমি সাকার ঈশ্বর রূপ সমূহ উড়াইয়া দিই নাই, এবং তাঁহাদের সকলকেই ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ ব্রহ্মভাবে—*অবশে ছিদ্র ও কালির দাগে চিহ্নিত স্থান (৬৩)—*নিজ ও বিশ্বাত্মারূপে অত্যন্ত প্রিয় বোধে, উপাসনার উপদেশ সর্বত্র দিয়াছি। এখনও অবধি, (মুখ্য) প্রেম-ভক্তির সহ মিশ্রিত (গৌণ) নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবই আমার সাধন মার্গ (ট পর্ব)। ভগবান কৃষ্ণের গীতায় (১২-২ ও ৫) প্রকাশিত মতানুযায়ী, সর্বভূতে অদ্বৈত ঈশ্বর-দর্শী (বা প্রেমভক্ত), অক্ষর ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী—কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ মানবের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। দেবী-ভাগবতে জগদম্বাও বলিতেছেন যে, সগুণ ব্রহ্মই সুখসেব্য এবং কৃষ্ণের ঐ মত সমর্থন করিতেছেন (প্রথম ভাগ, প্রথম অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ)—কারণ, বিশ্ব অহঙ্কার বা অবিদ্যা উপাদানে গঠিত—যজ্জন্য বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও এখানে উহা রহিত হওয়া বড় কঠিন এবং পূর্ণ বৈরাগ্য বিশ্বে বড়ই দুর্লভ পদার্থ। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসক চিন্মাত্র, বা শূন্য, স্বরূপ—অতএব, তাঁহার কোন বিষয়ে যদি কখন সামান্য অহঙ্কার ও সুখদুঃখাদি বোধ উপস্থিত হয়, তাহা নিষ্ঠার প্রতিবন্ধক বলিয়া দোষাবহ (ট পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। কিন্তু প্রেমভক্তের সে বালাই নাই—কারণ, কোন বিষয়ে তাহার ঐরূপ ভাব উদয়ে, তাহা আত্মাতে বা ঈশ্বরে অর্পিত বলিয়া দোষহীন—যেহেতু, সমস্ত দ্বৈতের সমবায় ঈশ্বরে। বিশ্বকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিলেও, তাঁহার কিন্তু এই জ্ঞান থাকে যে, ইহা বাস্তবিক শূন্যাকার—কারণ, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বা ঈশ্বরের ভিত্তিতে গাছ, পাহাড়, নদ, ইত্যাদি অসম্ভব এবং উহারা অবস্তু ও কল্পনারই ফল মাত্র (১৯ ও ৭০ পর্ব)। ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত! নির্গুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনায়, এই সিদ্ধান্ত বৈরাগ্যাবলম্বনে কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন—কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই, বোধ কার্যে পরিণত করা চাই—তবেই হইবে। ব্রহ্মের অবস্থাগুলি সাধকের অবস্থার অনুরূপ—অর্থাৎ, সাধকের যখন যেই-প্রকার অবস্থা, ব্রহ্মও তখন সেই প্রকারে প্রতীত হন। সাধক যখন সগুণ, বা নির্গুণ, বা গুণাতীত, ব্রহ্মও তৎক্ষণাৎ সেইরূপেই বোধ হন (প্রথম ভাগ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ৪ অনুচ্ছেদ)।

৩। শাস্ত্রমতে, সদ্গুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদিষ্ট না হইলে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির আশা বৃথা এবং গুরু-প্রসাদ বিনা ব্রহ্মপদলাভের কোন উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞান গুরুমুখেই অবস্থিত। পুরুষাকার ও বিবেক বলে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের ফলে ব্রহ্ম বিদিত হইলে, অমরত্ব লাভ হয়। জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, ভগবদ্বিষয়ে প্রেমভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি সংসার ক্ষয় ও ঈশ্বর লাভের হেতু। ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মসংহিতা ও গীতায় বলিতেছেন—'অপরাপর ধর্মাচরণ বিসর্জন পূর্বক, একমাত্র আত্মাই আরাধ্য এবং এই আরাধনায় যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয়। স্বীয় আত্মার ব্রহ্মচিন্তার দ্বারা তৎপ্রসাদে মুক্তি লাভ হয়। জ্ঞানলক্ষণা ভক্তির দ্বারা আত্মার সবিশেষ ও নির্বিশেষ স্বরূপ তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া, যতি অদ্বৈত চিন্মাত্র আমাকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন। এই সাক্ষাৎকার দ্বারা আমার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া অব্যবহিত পরে (অর্থাৎ, জ্ঞান ও প্রবেশ ক্রিয়ায় কোন ব্যবধান নাই) আমাতে প্রবেশ করেন, বা জীবনকালেই মৎস্বরূপে তাঁহার অবস্থান (অর্থাৎ, জীবন্মুক্তি পদ লাভ) হয়।' অতএব, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান সাধন প্রেমভক্তির মার্গেই প্রশস্ত। গুরুদেব আমায় সেই শিক্ষাই এই পর্বে বর্ণিত ঘটনায় দিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, ঈশ্বরকে উড়াইবার প্রয়োজন নাই এবং যোগবাশিষ্ঠে নিহিত তত্ত্বজ্ঞানই আমাকে তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বে (৭ পর্ব) আমাকে ব্রহ্মমন্ত্র দান করিয়া তিনি আমাকে উহার সাধন পদ্ধতির শিক্ষা দান করেন নাই—যদিও পরে (১৯ পর্ব) সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন কালে, বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা দিলেন এবং আমি বুঝিলাম যে, অবশে যেন যন্ত্রচালিত ভাবে, দীর্ঘ নয় বর্ষ কাল আমি তাঁহার মন্ত্রার্থ সযত্নে সাধন করিয়াছি। সদ্গুরু বা ঈশ্বর গুরুর কৃপা এইরূপ বটে! যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ বিষয়ে, নিয়তির লিপিই শেষ কথা—নতুবা, আত্মজ্ঞানী গুরুই বা কোথা, আর সেই দুরূহ গুরূপদেশ বুঝিবার শক্তিযুক্ত শিষ্যই বা কোথা? অচিন্তনীয়া নিয়তি ভিন্ন কিছুতেই এই সকলের সংঘটন হয় না। গুরু ও শিষ্য উভয়ে উপযুক্ত না হইলে, সুফল হয় না এবং এই বিষয়ে কেবল গুরূপদেশ যথেষ্ট নহে। শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্টরূপে থাকা এবং তাহার কাম, কর্ম ও বাসনা শোধিত হওয়া আবশ্যক। যে-গুরু কৃপা করিয়া উপদেশ প্রদান, স্পর্শন—এমন কি, দর্শন—মাত্রেই শিষ্যে শাম্ভবভাব জাগ্রত করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'গুরু'।
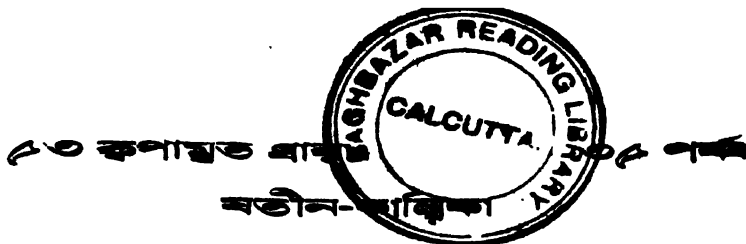
৫৩ কৃপামৃত প্রা[illegible] পর্ব

মতীন-[illegible]ক্কা

(১) আছ অনল অনিলে চির নভনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে।
আছ বিটপি লতায় জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে।

(২) এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা বলে,
তারা বয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে;
ওরে আঁখি অন্ধ, দেখ মাকে,
তিমিরে তিমির হরা॥

বিষয়—ঘোর গ্রীষ্মে, মেঘাবৃত রজনীতে, ছাদে শয়ন কালে দুইদিনের দুইটি অদ্ভুত ঘটনা—

(১) বৃষ্টিপাত আরম্ভ এবং জগদম্বাকে সামান্য কটূক্তি করিবার পরক্ষণেই উহার স্তম্ভন।

(২) ঝটিকা আরম্ভ এবং তালপত্রের পাখার দুর্গতি।

স্থান—ছাদ।

কাল—(১) ৬ই মে, ১৯৪৭—রাত্রি প্রায় এগারটা।

(২) মে, বা জুন, ১৯৫২—রাত্রি প্রায় এগারটা।

প্রথম ঘটনা—পরদিন সারা দিবসব্যাপী Curfew order। রাত্রে বারাণ্ডা গরম ও বায়ুপ্রবাহহীন এবং আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, শীঘ্রই প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। তথাপিও আমি, শরদিন্দু ও ছোট দুইটি কন্যা ছাদে শয়ন করিতে যাইলাম এবং ভয় হইতে লাগিল যে, শীঘ্রই নামিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে

বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, পার্শ্বের ছাদে বাটীস্থ যাহারা শুইয়াছিল তাহারা নামিয়া গেল এবং শরদিন্দু নিজ বিছানা গুটাইয়া কন্যা দুইটিকে লইয়া নামিবার উদ্যোগ করিলেন। আমি বিছানায় উঠিয়া বসিতেই, আরও বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়িতে লাগিল। তখন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—'মা বেটীর কি বদমায়েসী! আজ আমাকে আরামে এখানে শুইতে, বা তাঁহার চিন্তা করিতে দিবেন না!' তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল। আবার শয়ন করিলাম এবং শরদিন্দুও শুইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখনও আকাশের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, শীঘ্রই প্রবল ঝড় বা বৃষ্টি অনিবার্য। কিন্তু, হায়! কিছুক্ষণ পর সমস্ত মেঘই কাটিয়া গেল এবং কৃষ্ণা প্রতিপদের পূর্ণচন্দ্র প্রকাশিত হইল। কেনই বা না হইবে? মা যে আমার সর্বাত্মময়ী ও বৃষ্টিরূপিণী এবং ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু। আমার মুখে কটুভাষা তাঁহারই লীলা মাত্র—কারণ, তিনি পঞ্চাশৎ-বর্ণরূপিণী! পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী মানব, এই সব তাঁহার লীলারূপে দর্শন করে না। জীবনে ও জগতে অতি সামান্য সামান্য ঘটনাগুলি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে, তাঁহার বিশ্বলীলা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বুঝিলে এই জরা-ব্যাধি-দুঃখ সঙ্কুল সংসার হইতে সত্বর পরিত্রাণ লাভ হয় এবং কোন বিষয়েই সৃষ্টিবীজ অহঙ্কার মাথা তুলিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা বিনা—দেহও কোন ইন্দ্রিয় কার্য করে না, সর্প দংশন করে না, জল আর্দ্র করে না, বায়ু নড়ে না, অগ্নি জ্বলে না এবং মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে না। এইরূপে সর্বভূতে (আত্মারূপে ও শক্তিরূপে) তাঁহাকে দর্শনে, প্রেমোন্মাদ অবস্থায় আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না এবং পুনর্জন্ম হয় না। 'আমি কর্তা', আমি ভোক্তা'—এই মিথ্যা ভাবই মানবের সর্ব দুঃখের মূল!

২। **দ্বিতীয় ঘটনা**—ঘোর গ্রীষ্মে রাত্রে যখন ছাদে শয়ন করিলাম, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পরেই প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হওয়াতে, শরদিন্দু বিছানা উঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে যেই বলিলাম—'একটু দেখ না! মা বেটীর দৌড় দেখ না'—তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বস্থ দুই বর্ষের পুরাতন তাল পত্রের পাখা খানি ঝড়ের বেগে প্রায় দশ গজ দীর্ঘ ছাদ ও উহার প্রাচীর অতিক্রম করত বাটীর পূর্বদিকস্থ জমির বিশ গজ দূরে শেষ প্রান্তে গিয়া পড়িল। 'মায়ের দৌড়' দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ মাত্রেই, তিনি উহা দেখাইলেন। তখন অবস্থা মন্দ বুঝিয়া, নীচে নামিলাম ও কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘটনাটি অতি সামান্য হইলেও, শিক্ষাপ্রদ বটে! পাখাখানি এখন আমার খুবই প্রিয় এবং উহার নাম 'মায়ের দৌড়'। বিশ্বে সবই 'আমার মা'।

নবীন-আত্মা (বালকৃষ্ণ)

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ

পরব্রহ্ম জ্যোতিরূপ আর কিছু নয়। ত্রিভুবন ব্যাপী ব্রহ্ম আছে নিরন্তর।
মণ্ডল আকার জ্যোতিঃ জানিবে নিশ্চয় ॥ অদৃশ্য অক্ষম তিনি ওহে মুনিবর ॥
মধ্যাহ্ন সূর্যের সম জ্যোতির আকার। যোগিগণ শুদ্ধমাত্র আপন অন্তরে।
পরব্রহ্ম রূপ তেজ ওহে গুণাধার ॥ চন্দ্রবিম্ব সম সেই জ্যোতিরে নেহারে ॥
বিশ্বরূপী রহিয়াছে আকাশ যেমন! যোগীরা জ্যোতিরে কহে ব্রহ্ম সনাতন।
জ্যোতিরূপে পরব্রহ্ম জানিবে তেমন ॥ সত্যময় ভাবি করে সতত চিন্তন ॥

বিষয়—ছায়াবৃত চন্দ্রের আকারে আমার আজ্ঞাচক্রে আত্মপ্রতিবিম্বের আবির্ভাব এবং তৎপরে উহার মধ্যে বালকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন।

স্থান— আমার শয়ন ঘর।

কাল—৯ই মে, ১৯৪৭—প্রত্যুষকাল।

উক্ত কালে, ঠিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে—যেন, না নিদ্রা না জাগরিত অবস্থায়, নাসামূলের উর্ধে ও ভ্রূযুগলের মধ্যে ছায়াবৃত একটি গোলাকার চন্দ্রের আকারে আত্মপ্রতিবিম্ব আবির্ভূত হইল এবং পরে উহার মধ্যে বালকৃষ্ণের মূর্তি ক্ষণিক দর্শন হইল। এমন সময় পূর্ণ জাগ্রত হইলে, দৃশ্যটি তিরোহিত হইল। এই চন্দ্রমণ্ডল দর্শন, ২৯ পর্বে আমার ও 'চ' পর্বে শরদিন্দুর দর্শনের অনুরূপ এবং খুব মনস্থির করিয়া ধ্যানকালে, উহা সহজেই এখন মাঝে মাঝে উদয় হয়। এই আত্ম-সাক্ষাৎকার, জীবনে 'জীবন্মুক্তি' দায়ক (গীতা, ১৮-৫৫) এবং মরণে মুক্তিপ্রদ (ভগবতী-গীতা, ১—৬৬ ও চতুর্থ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। আমার ও শরদিন্দুর দুই চন্দ্রমণ্ডল অভেদ আত্মপ্রতিবিম্ব। আত্মারূপে নারায়ণই বালকৃষ্ণ এবং সব ঈশ্বর মূর্তিই আত্মার রূপ!

২। যেমন নানাবিধ জলপূর্ণ পাত্রে সূর্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইলে একরূপই দেখায়, সেইরূপ বিশ্বের অনন্তবিধ বস্তুতে পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত রূপে অবস্থিত আছেন। জল, মদ্য ও তৈলে প্রতিবিম্বিত সূর্য যেমন অভেদ, সেইরূপ সর্বজীব ভেদহীন আত্ম-প্রতিবিম্ব। যেমন জলপূর্ণ পাত্র ভগ্ন হইলে, সূর্য-প্রতিবিম্ব থাকে না, সেইরূপ মুক্তিতে দেহের লয়ে আর আত্মা প্রতিবিম্বিত হন না। কৃষ্ণ, নারায়ণাদি ঈশ্বর-রূপ সকল সমষ্টি মায়া-প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা এবং বিশ্বের সকল ব্যষ্টি বস্তু

হইতে স্বরূপে অভেদ ! আমাদের উক্ত দর্শনগুলি সেই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন করিল। যখন নির্গুণ, তখন তাঁহারাই অক্ষর ব্রহ্ম। বিশ্বে সমস্তই সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর (পরমা-প্রকৃতি মহাকালী শ্রীদেবী) স্বরূপ, ও/বা নির্গুণ ব্রহ্ম (রাম) স্বরূপ—অতএব, ভেদহীন। এইরূপ দৃষ্টি ও আচরণই সমদৃষ্টি এবং ইহা অদ্বৈত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবুকের সাধন বিভূতি ! সগুণ ব্রহ্ম উপাসক, ঈশ্বর প্রেমোন্মাদ অবস্থায়, অন্তরে ও বাহিরে বিশ্বকে অখণ্ড ঈশ্বরময় দেখেন বটে ; কিন্তু তিনি নানা বাহ্য নাম ও রূপেই তাঁহাকে দেখেন। সমষ্টিভাবে, এইরূপ ভেদজ্ঞান তাঁহার নামে মাত্র থাকিলেও, ক্ষতি নাই। কিন্তু যথার্থ নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসকের তাহা থাকিলে চলিবে না এবং বিশ্বের বহিরাবরণ ও তাহাদের সর্ববিধ স্পন্দনকে তাঁহার শূন্যাকারেই দেখিতে ও তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে—নতুবা, নানাত্ব জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইবে না। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর একটি জীবও বিশ্বে নাই। এইরূপ অটুট ভেদজ্ঞানহীন, বা চিন্মাত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুকঠিন। সেই জন্যই, জগদম্বা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই যেন একবাক্যে বলিতেছেন যে, সর্বভূতে অদ্বৈত ঈশ্বরদর্শী (বা প্রেম-ভক্ত) অক্ষর ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী (৩৪ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। সঠিক প্রেমভক্তি হইলে, দেহ ও জগৎ স্বতঃই শূন্যাকার ধারণ করে এবং জ্ঞান ক্ষীণ হইয়া যায়। দুইজনেরই শেষ পরিণতি এক (নির্বাণ, বা কৈবল্য)—তবে, সামান্য ভিন্ন মার্গে। প্রেমভক্তি মধুর এবং ব্রহ্মজ্ঞান শুষ্ক মার্গ।

৩। ঈশ্বর মূর্তি সকল সগুণ—ব্রহ্ম বাচক বটে, কিন্তু সমাধির দ্বারা তাঁহাদের নির্গুণ স্বরূপ লাভ সম্পূর্ণ ইচ্ছা সাপেক্ষ। ‘ নেতি, ‘ নেতি ’ সদা চিন্তায় বিশ্বকে স্বাভাবিক ভাবে শূন্যাকার বোধ না করিলে, এইরূপ অবস্থাপন্ন হওয়া অসম্ভব। সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় যিনি—* **অবশেষে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৬৪)—*প্রেমোন্মাদ, বা যিনি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার চরম সীমায় উপনীত, তিনি সাধারণতঃ আর দ্বিতীয়বিধ সাধনার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। অবশ্য অবতারদিগের কথা (যেমন শ্রীচৈতন্য ও রামকৃষ্ণদেব) স্বতন্ত্র। রামকৃষ্ণ-দেবের গুরু তোতাপুরী অতি উচ্চদরের নিগুণ ব্রহ্মোপাসক ছিলেন এবং কালী উপাসনা মানিতেন না, কিন্তু তিনি যখন কঠিন জঠর পীড়ায় আক্রান্ত ও দেহকষ্টে অধীর হইয়া গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জনে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন, তখন সগুণ ব্রহ্মোপাসনার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে, জগদম্বা তাঁহাকে জগতে দেহ সঠিক শূন্যাকার, বা চিন্মাত্র, বোধ করা কত কঠিন তাহা বুঝাইয়াছিলেন। সমাধি কালেই মানব জগদম্বা অধিকারের

বহির্ভূত এবং এই সমাধিও তাঁহার ইচ্ছা সাপেক্ষ—কারণ, তিনিই বিশ্বের সর্ববিধ স্পন্দন। অতএব, যতক্ষণ বাহ্য-জগৎ প্রতীত হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহাকে উড়ান চলিবে না। দেহ স্পন্দন জগদ্ধাকে অর্পণ যত সহজ, উহাকে ব্রহ্মকে অর্পণ তত সহজ নহে। এই বিশ্ব কল্পনা মাত্র, সম্পূর্ণ নিরাকার ব্রহ্মময় বা চিন্মাত্র এবং উহাতে কোন দৃশ্য ছিল না ও এখন নাই—এইরূপ দৃঢ় বোধে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে, নির্গুণ ভাবে ব্রহ্ম উপাসনা সঠিক সম্পন্ন হয় না। এইরূপ বৈরাগ্য লাভ বড় সহজ কথা—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৬৫)—*নহে—বিশেষতঃ, যতকাল বাহ্য জগতের সহিত কর্ম সম্বন্ধ থাকে। সেইজন্য, পুরাকালে নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনপর মুনি-ঋষিগণ সংসারের বাহিরে বনে বা গুহায় বাস করিতেন। (+) সমাধিকালেই হউক, বা ব্যবহার দশাতেই হউক, যখন মানব অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মচিন্তা অবলম্বন (+) করিতে পারেন তখন তাঁহার নিকট এই বিশ্ব সঙ্কল্পপুরী বা স্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া ক্রমে একেবারে অস্তমিত হইয়া যায়। [(+) চিহ্নিদ্বয় মধ্যবর্তী লিখন প্রথমে প্রুফে অবশে কালির বড় দাগে চিহ্নিত]। অনবরত অনুসন্ধানের ফলে, নিমেষমাত্র যাঁহার আত্মস্বরূপ বিস্মরণ না হয়, তাঁহার চিত্তে বিশ্ব প্রপঞ্চের দৃশ্য লয় পায়। তত্ত্বজ্ঞান বলে বিষয়ের প্রতি প্রবল বৈরাগ্যই, ফলে 'সমাধি' স্বরূপ এবং ইহার দ্বারাই বাহ্য বিশ্ব স্বপ্নপুরীতে পরিণত হয়। পাখীর বাসা পুড়িয়া গেলে, সে উড়িয়া বেড়ায় ও আকাশ আশ্রয় করে। সেইরূপ, দেহ ও জগৎ ঠিক মিথ্যা বোধ হইলে, আত্মা সমাধিস্থ হন। সেই অবস্থায় দেহ কাষ্ঠ বা লোষ্ট্র সম হয় ও পরমাত্মা বোধে বোধ হন। বাহ্য পদার্থের আস্বাদ স্পৃহা যাহার একেবারেই নাই, নির্বিকল্প সমাধি তাহার অনবরতই হইতে থাকে—ধ্যান থাকুক বা না থাকুক। ভোগ-বৈরাগ্যে, ধ্যানের আবশ্যকতা থাকে না; আর ভোগ-বৈরাগ্য না থাকিলে ধ্যানেই বা কি ফল—কারণ, তাঁহার নিকট জগৎ শূন্যাকার নহে। নিজ ব্রহ্ম-স্বরূপে যথার্থ বিশ্রান্ত হইলে, ভোগের আবশ্যকতা থাকে না এবং উহা না হওয়াই ভোগের কারণ।

৪। উক্ত নানা কারণে ব্রহ্মতত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইবার পর, সগুণ ভাবে তাঁহার উপাসনায় প্রেমভক্তি লাভ, নির্গুণ ভাবে উপাসনা অপেক্ষা সহজ ও সুখকর। প্রথম ভাব হইতে দ্বিতীয় ভাবে আগমন কঠিন নহে এবং না আসিলেও ফলে কোন তারতম্য নাই; কারণ, যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম।

'অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।'

যতীন-কালিং

গান।

বল্‌রে জবা বল্—
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে,
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা জীবন হোক সফল॥
কোটি গন্ধ কুসুম ফুটে বনে মনোলোভা—
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা;
তোর মত মা'র পায়ে রাতুল
হ'ব কবে প্রসাদী ফুল
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে,
কবে তোর মত রাঙবে রে মোর মলিন চিত্তদল॥

বিষয়—আত্মধ্যানাবস্থায় ঘোর গ্রীষ্মে চৌবাচ্চায় বসিয়া স্নানকালে, সম্মুখে কিছুদূরে কালীঘাটের মা কালীর ছায়ামূর্তিতে আবির্ভাব, বরহস্ততলে বৃদ্ধাঙ্গুলী পীড়ন এবং স্নানান্তে সম্মুখস্থ বৃক্ষডালে সদ্য-প্রস্ফুটিত একটি জবাফুল দেখিয়া উহাকে আমার শয়ন গৃহস্থ পটের বরহস্তে নিবেদন।

স্থান—৬নং বাড়ীর নিম্নতলার চৌবাচ্চা।

কাল—২৯শে মে, ১৯৪৭—বেলা প্রায় বারটা। পৌত্র বুদ্ধের ষষ্ঠবার্ষিকী জন্মতিথি, দশহরা।

উক্ত শুভ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, ঐ দিবস বাড়ীতে কয়জন অতিথি সেবার উদ্যোগ চলিতেছে এবং আমি ঘোর গ্রীষ্মে নির্জন স্থানে চৌবাচ্চার জলে বসিয়া বেশ সুখে আত্মধ্যানে আছি। ঐ ভাবেও, 'মা'—'মা', এই রব (উহাই ওঁ-কার ধ্বনি, ম + অ + উ + ম + অ + উ = অ + উ + ম = ওঁ = পরাৎপর

জ্যোতিঃরূপী শব্দ ব্রহ্ম, শিবলিঙ্গ) মুখ হইতে স্বতঃই নির্গত হইতেছিল। তখন, কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে মাকে বলিলাম—'মা! তোমার আদেশে (৩০ পর্ব) তোমার কালীঘাটের মূর্তিকে আমাকে আত্মরূপে ধ্যান করিতে হইবে; আর, (তোমার ভিন্নরূপী) গুরু হনুমানদেবের আদেশে আমাকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের শিক্ষানুযায়ী ব্রহ্ম সাধনা করিতে হইবে (৩৪ পর্ব)। সগুণ ব্রহ্মভাবে তোমার মূর্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত এই ভাব সাধন সহজ, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মভাব কঠিন। এই সমস্যা মিটাইবার উপায় আমি জানি না। তোমার নির্গুণ স্বরূপ আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।' তখন কৃপাময়ী মা (যিনিই গুরু সারদেশ্বরী) কালীঘাটের মূর্তিতে ছায়ার ন্যায় সম্মুখে অনতিদূরে আবির্ভূতা হইলেন ও তাঁহার বর-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীটি হস্ততলে বেশ স্পষ্ট ভাবে একবার টিপিলেন। আমি মনে করিলাম যে, ঐরূপ ভাবে মা তো গত চৈত্র সংক্রান্তির দিবস আমার সহিত লীলা করিয়াছেন (৩২ পর্ব), সেই জন্যই বোধ হয় উহার স্মৃতি মাত্র আমার মনে উদয় হইল। এইরূপে, নানাবিধ সন্দেহে স্নান সমাপনান্তে উপরে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম যে, পার্শ্বের বাড়ীর জবাগাছের একটি ডাল আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়া একটি সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল বহন করিতেছে। তখন বুঝিলাম যে, মা ঐ পুষ্পটিকে তাঁহার বরহস্তে নিবেদন চাহিতেছেন। পুষ্পটিকে উত্তোলন করিয়া আমার শয়ন গৃহে মা'র যে-পট স্থাপিত হইয়াছে (৩০ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ) তাঁহার বরহস্তে (কাষ্ঠে পিনের সাহায্যে) নিবেদন ও পরে প্রণাম করিয়া পূজা শেষ করিলাম। আমার অর্চনার বিদ্যা ঐ অবধি! তিনি পূজা গ্রহণের ছলে পুনরায় যে বর দিলেন, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বর যে সেই কালের মনোভাব অনুযায়ী পাইলাম, তাহাও নিঃসন্দেহ—অর্থাৎ, প্রেমভক্তি সহ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ! ইহার অপেক্ষা জীবের আর অধিক পাইবার নাই! ৩০ পর্বে বর্ণিত ঘটনায় মা'কে বলিয়াছিলাম—'তোমার একটি বরাভয় প্রাপ্ত হইলেই তো সব প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; আমার ততোধিক বরাভয়ের প্রয়োজন কি?' প্রেম [(+) প্রথম প্রকে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান]—পাগলিনী 'আমার' মা তাহা শুনিলেন না, আরও দিলেন—এবং উহা দেব-ঋষি-মুনিদিগেরও দুর্লভ, যদিও পূর্ণ ফলোদয়ে বিলম্ব অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে, ৩৪ পর্ব, ১ অনুচ্ছেদ ও ১১ পর্ব দ্রষ্টব্য।

২। এই পর্বটির পূর্ণ ও পরবর্তী তিনটি পর্বের অধিকাংশ লিখন অবশেষে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন (২৭শে অক্টোবর, ১৯৫২) সমাপ্ত হইয়াছিল।

৩৮ পর্ব

[illegible]-কুলকুণ্ডলিনী

গান।

ডেকে ডেকে তারা, হলাম জ্যান্তে মরা,
তবু না জাগিলি কুল-কুণ্ডলিনী।
দীনে কর দয়া, জাগো যোগমায়া,
এত ঘুম ভাল নয়গো জননি॥
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে মূলাধারে,
বামাবর্তে বেড়িয়াছ স্বয়ম্ভুরে,
হয়ে ভুজঙ্গিনী, বিদ্যুত-বরণী,
যোগনিদ্রাগতা শাস্ত্রে এই শুনি;
কোথা সে সুষুম্না, কোথা মূলাধার,
নয়ন মুদিলে হেরি মা আঁধার,
খুলে দে মা আঁখি, প্রাণভরে দেখি,
জ্ঞান দে জ্ঞানদে মহেশ মোহিনী॥
খুলে দিয়ে মোর সূক্ষ্ম ব্রহ্মদ্বার,
ফণা তুলি উর্ধে উঠ মা আমার,
ক্রমে ধীরে ধীরে আসি সহস্রারে,
শিব সঙ্গে মিশ ত্রিগুণধারিণী;
সর্বতত্ত্ব যথা মহাশূন্যে লয়,
নিরুদ্ধ সর্ব চিত্ত—বৃত্তি চয়,
ত্যজি নামরূপ ব্রহ্মানন্দময়,
সিন্ধু অঙ্গে যথা মিশে তরঙ্গিণী॥

বিষয়—রাত্রে ছাদে ধ্যান কালে, মেরুদণ্ড বরাবর পিঠের দিকে একটি প্রকাণ্ড চেপ্টা মুখ কৃষ্ণসর্পকে মাথার ভিতরে ফণাটিকে সম্মুখ দিকে উত্তোলন করিয়া থাকিতে এবং অন্যান্য অদ্ভুত জ্যোতিরাদির দর্শন ও অনুভূতি।

স্থান—ছাদ।

কাল—৩১শে মে, ১৯৪৭—রাত্র প্রায় বারটা।

উক্ত কালে ছাদে চিত্ত-ভাবে শয়ন করিয়া আত্মধ্যান করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, যেন দেহ মধ্যে পিঠের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর একটি প্রকাণ্ড চেপ্টা মুখ কৃষ্ণসর্প আমার মাথার ভিতর ফণাটি সম্মুখ দিকে উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। আরও মনে হইল যেন ঐ স্থানে একটি জ্যোতির্ময় পথ (সুষুম্না মধ্যস্থ চিত্রা নাড়ীর সোমসূর্যাগ্নিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগমনের মার্গ) হৃদয়দেশ হইতে মস্তক অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। উহার সহিত, শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক গতি সহ, তলপেট বিশেষ কুঞ্চিতাকার প্রাপ্ত হইয়া, কুম্ভকাবস্থা অনির্বচনীয় পরম আনন্দ দান করিতেছিল। এই মনপ্রাণ মুগ্ধকর, যোগশাস্ত্রে বর্ণিত, যোগীজনের দুর্লভ, দৃশ্যটির যে সর্ববিষয়ে সঠিক বর্ণনা করিতে পারিলাম তাহা মনে হয় না।

২। যিনি এই পুস্তকের প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত সর্পটি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যিনি আমার মুক্তির ইচ্ছায় মূলাধারস্থ ব্রহ্মদ্বার উন্মোচন করিয়া অতি সূক্ষ্মাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মনাড়ী মার্গে উর্ধ্বগতিতে সহস্রার পদ্মের পরম শিব সহ মিলনোন্মুখী—২৩ ও ৩১ পর্ব। এই সব ঘটনাগুলি বুঝাইয়াছিল যে, আমার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা। এই কাহিনী ও পরবর্তী কয়টি পর্বস্থ কাহিনী হইতে আমি জানিলাম যে, উহা সহস্রার পদ্ম পর্যন্ত ব্যাপী। ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতা বিনা, কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হন না এবং এই জাগরণই মুক্তি মার্গের যথার্থ দ্বার উন্মোচন। এই জাগরণের অনুভূতিটি যে কি পরমানন্দ দায়ক, তাহা অনির্বচনীয়। এই প্রসঙ্গে ৪৫ পর্ব দ্রষ্টব্য।

৩। হায়! এই প্রেমময়ী মাকে মানব কত নিষ্ঠুরা মনে করে! সে বুঝে না যে, মাতা সন্তানের পরম মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করে! মা নিজেই জীব, নিজেই তাহার কর্ম, অহঙ্কার, কর্মফল ও কর্মফলদাত্রী! জীবের সর্ব দুঃখের মূল্যেই তাহার অহঙ্কার, বা দেহাত্মবোধ। আমি নাই, তুমি নাই—মা'ই বিশ্বে সব সেজে রয়েছেন ও সব করছেন। তিনি ব্রহ্মের জীবশক্তি 'অবিদ্যা' বা 'মায়া' এবং বিশ্বরূপী হইয়া স্রষ্ট ও সৃষ্টি করেন, পালিত ও পালন করেন এবং সংহৃত ও সংহার করেন।

...-কুলকুণ্ডলিনী

বিষয়—রাত্রে ছাদে ধ্যানকালে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রায় অর্ধ ঘণ্টা-ব্যাপী একটা বিশেষ আনন্দ দায়ক অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তি।

স্থান —ছাদ।

কাল —২রা জুন, ১৯৪৭—রাত্র প্রায় সাড়ে বারটা।

উক্তকালে চিত-ভাবে শয়ন করিয়া আত্মধ্যানকালে মনে হইল যেন, স্বতঃই শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া একটা অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে—অতি ধীরে সঞ্চরণ, মাঝে মাঝে স্থির ভাব ও কুম্ভকাবস্থা ধারণ, তলপেট হইতে বক্ষের নিম্নদেশ অবধি স্থানের মাংসপেশীগুলির বিশেষ কুঞ্চিতাকারে যেন ভিতরে বদ্ধ হইবার উপক্রম এবং একটা বায়ুর বক্ষ হইতে কণ্ঠের নিকট দিয়া মস্তকাভিমুখে গমন। ঐ বায়ুর কণ্ঠ পর্যন্ত গতি বেশ পরিস্ফুট এবং মনে হইতেছিল যে, বক্ষের নিম্নদেশে যেন বায়ু নাই। যোগশাস্ত্র এইরূপ অবস্থার আলোচনা আছে—ইহা ইড়া ও পিঙ্গলা মার্গ ছাড়িয়া প্রাণবায়ুর মূলাধার পদ্মের মুক্ত ব্রহ্মদ্বার দিয়া জ্যোতির্ময় সুষুম্না অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীর পথে শিরস্থ সহস্রার উঠিবার উপক্রম। এইরূপ অবস্থা আন্দাজ অর্ধ ঘণ্টা কাল ছিল এবং ইহা যে কি পরমানন্দময় তাহা ভাষায় [(+) প্রথম প্রুফে কালির বড় দাগে চিহ্নিত স্থান] বর্ণনা অসম্ভব। ইহার সহিত মায়িক কোন আনন্দই তুলনীয় নহে। পরে, ক্রমে ক্রমে অবস্থা উপশম হইয়াছিল। চেষ্টা সত্ত্বেও, উক্ত অবস্থা লাভ করিতে না পারিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—'ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে তাহার দেহস্থ মহাবায়ু গর-গর করিয়া মাথায় উঠিবেই উঠিবে।' এই পর্বস্থ কাহিনী, পূর্ব পর্বে আলোচিত কাহিনীর অনুরূপ। জগদম্বা আমাকে এই সকল পরমানন্দময় সুদুর্লভ অবস্থার আস্বাদন দিয়া জানাইতেছেন যে, কুলকুণ্ডলিনী রূপিণী তিনি আমার ভিতর জাগ্রতা—কারণ, মন স্থির করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেই এইরূপ অবস্থা কখন কখন উদয় হয়। নিদ্রা যাইবার পূর্বে ও নিদ্রোত্থিত হইবার পরে, এই অবস্থা সুলভ—কারণ, ঐকালে মন প্রায় বিষয়হীন হয়। এই রূপ অবস্থায় সাধকের আত্মা প্রায় স্ব-স্বরূপ চিদাকাশে অবস্থিত হয় (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)।

যতীন-কুণ্ডলিনী

বিষয় —প্রত্যূষকালে গৃহে ধ্যানকালে পূর্ব পর্বে বর্ণিত শ্বাস-প্রশ্বাসের-অস্বাভাবিক অবস্থার পুনরাবির্ভাব।

স্থান —আমার শয়ন ঘর। ঐ সময় হইতে বর্ষাগমনের জন্য প্রত্যহ ছাদে শয়ন সম্ভব ছিল না।

কাল—৯ই জুন, ১৯৪৭— প্রত্যূষ কাল।

উক্ত কালে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার পর, বিছানায় শয়ন করিয়া আত্মচিন্তা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ পূর্বধারা বর্ণিত শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক অবস্থা পুনরাভির্ভাব হইল এবং আমাকে পরমানন্দে আপ্লুত করিল। কিছুক্ষণ ঐ অবস্থা ভোগ করত যখন সামান্য কাল তন্দ্রাবেশ ত্যাগ করিয়া নিদ্রোত্থিত হইবার উপক্রম করিতেছি। ইহাকে শাস্ত্রে ' যোগনিদ্রা ' কহে ') তখন কে যেন (হনুমানদেবের ন্যায় গম্ভীর স্বরেই) হৃদয়দেশের গভীরতম স্থান' হইতে একটি উপদেশ দিলেন। মন্ত্র-সম্বন্ধীয় বলিয়া, উহার আলোচনা করিব না।

২। নিদ্রা যাইবার বা নিদ্রোত্থিত হইবার পূর্বে, মন যখন বিশেষ স্থির ভাব ধারণ করে, তখনই ঈশ্বর চিন্তা করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের উক্ত অস্বাভাবিক গতি হয়—ইহা এই সকল কাহিনী গুলিতে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। সংসারীর পক্ষে উহা অন্য সময়ে হওয়া কঠিন। এই জন্যই, পুরাকালে সংসারী মুনি-ঋষিগণ, বনেও স্ত্রী-পুত্রাদির সংস্রব ত্যাগ করিয়া, দূরে ঈশ্বর চিন্তা করিতেন এবং রাত্রে গৃহে ফিরিতেন। যেমন অস্থির জলে সূর্য প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ অস্থির মনে ঈশ্বর দর্শন হয় না। আত্মচিন্তা যত অধিক ও অবিরাম, ততই মঙ্গলজনক (৩৬ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞান ঘোর মূর্খতা ও সর্ব অনর্থের মূল। আত্মতত্ত্ব ক্ষণিক বিস্মৃত হইলে, মায়িক বা অলীক প্রপঞ্চের নানাম্ব ভাব আবির্ভাব হইতে থাকে। সকল পদার্থই চিদাকাশ, বা জগদম্বার রূপ, এইরূপ দৃঢ়ভাব ধারণ করিতে পারিলে জীব তৈলহীন দীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।

যতীন-আত্মা

বিষয়—রাত্রে গৃহে ধ্যানকালে আমার আজ্ঞাচক্রে অত্যুজ্জ্বল বিজলীর, বা শত-সূর্য দীপ্ত সম, জ্যোতিঃর অল্পকাল আবির্ভাব।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৮শে জুন, ১৯৪৭—রাত্র প্রায় সাড়ে এগারটা।

উক্ত কালে বিছানায় শয়ন করিয়া বেশ তন্ময়ভাবে আজ্ঞাচক্রে আত্মচিন্তা করিতেছি, এমন সময় ঐ স্থলে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিজলীর ন্যায় অল্পকাল আবির্ভূত হইয়া মিলিয়া গেল। পূর্বে আত্মজ্যোতিঃ কয়বার বিনা কোন চেষ্টায় দেখিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু উহারা এত উজ্জ্বল নহে। এই প্রতিবিম্বের দীপ্তি যেন শতসূর্যের, বা Oxy-Acetylene gas এর, প্রভাবে পরাজিত করিয়াছিল। তৎপরে, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ দর্শন পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। তৎপরিবর্তে, বিনা চেষ্টায়, পূর্ববর্তী দুইটি পর্বে বর্ণিত শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত হইয়া আমাকে পরমানন্দ দিয়াছিল। যেটুকু কাল আমি বাহ্য বিশ্ব-বোধ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া তন্ময়তার চরম সীমায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সেই সময়টুকু মাত্র ঐ জ্যোতিঃ দর্শন হইয়াছিল। মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রাখিয়া সঠিক ঈশ্বর সাধন হয় না (পূর্ব পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। জগদম্বার কৃপা থাকিলে, সমস্ত বাধাই ক্রমে ক্রমে যথাকালে অপসারিত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ হইতে পারে।

২। শিব-সংহিতায় আছে যে, শিবনেত্র হইয়া (নয়নের তারাদ্বয় উর্ধে উঠাইয়া) কপালদেশে চিত্ত স্থাপন পূর্বক যদ্যপি উহাকে বিকার শূন্য করত আত্মাকে চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে বিদ্যুৎ-প্রভাবৎ আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হয়। অতএব, আমার দর্শন শাস্ত্রানুমোদিত। উক্তবিধ ভাবনায় সমস্ত পাপ নাশ হয়—এমন কি, দুষ্টচারীও শ্রেষ্ঠপদ লাভে সমর্থ হয়। দিবারাত্র ঐরূপ ধ্যানে, সিদ্ধ পুরুষ দর্শন ও তাহাদের সহিত কথোপকথন হয়। প্রাক্তন কর্ম ও কর্মফল অবশিষ্ট থাকিতে, এইরূপ অবস্থা লাভ অসম্ভব।

যতীন-কালিকা

গান

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা,
রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম,
পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা, পতি লেংটা,
শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে,
এবার মেয়ে বসন পর॥

গানাংশ

বসন পরো মা, বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়ে জবা পদে দিব আমি॥...
মা হয়ে সন্তানের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো।...
কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী॥...
খড়্গ হস্তে রুধির ধারা, ও মা মুণ্ডমালা গলে,
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ মা পতি পদতলে।
সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরো পাগল আছে।
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে॥

বিষয়—গভীর রাত্রে মা কালীর যোনিদেশ চিন্তন ও পূজনের আদেশ লাভের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৯শে জুন, ১৯৪৭।

উক্ত দিবস গভীর রাত্রে আমার প্রেমময়ী মা কালী স্বপনে জানাইলেন যে, তাঁহার যোনিদেশ আমার অর্চনীয়। ৩০ পর্ব ৩ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, আমি কালীঘাটের মায়ের একটি চিত্রপট ১৭ই মে, ১৯৪৭ সালে, আমার শয়ন ঘরের একটি কুলজির উপরে স্থাপিত করিয়াছিলাম। ঐ পটটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে যে, উহা তলপেট হইতে দেহের ঊর্দ্ধাংশের পট।

তাহা না করিলে, উহা সর্বদেহের পট বলিয়া সহজেই ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। ঐ ভ্রমে আমি, মাঝে মাঝে তাঁহার পদ চুম্বন করিতে গিয়া পটের নিম্নে যে ত্রিকোণাকার যোনিদেশ তুল্য কুলঙ্গির উপরস্থ স্থান, তাহাতে চুম্বন করিতাম। আমার মা'টি যে বস্ত্রাবৃতা হইয়াও—পাগলীর ন্যায়—তাঁহার যোনিদেশ আবরিতা করেন নাই এবং অশেষ জটিল আয়োজনে ঐ কুলঙ্গিটির ত্রিকোণাকার স্থানটিকে তাঁহার যোনিদেশে পরিণত করিয়াছেন, সে রহস্য কে বুঝিবে? ২৪শে মে আমি অভ্যাসমত চুম্বনান্তে. ছবিটির যথার্থ আকার বুঝিতে পারিলাম ও নিজেকে বিশেষ অপরাধী মনে করত তাঁহার নিকট কাকুতি মিনতি সহ ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম (১০ পর্ব দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তৎপরে, আমার স্বাভাবিক ঈশ্বরে সর্বার্পণ ভাব, আশঙ্কা দূর করিয়াছিল। উক্ত মূর্তিটি অবতরণিকার দ্বিতীয় পট এবং অপরূপ ভাবময়—যেন 'পোঁদ ন্যাংটা, মাথায় ঘোমটা' একটি পাগলীর রূপ। সাধারণতঃ, ঘরের কুলঙ্গি ঐরূপে নির্মাণ হয় না। অপরূপ আয়োজনে মা ছয় বর্ষ পূর্বে কুলঙ্গিটিকে মিস্ত্রীর দ্বারা ঐ রূপ দিয়াছিলেন। বিশ্বের সব ঘটনাই ঐরূপে হইতেছে (২৫ পর্ব, দ্বিতীয় বন্দনা)। গাছের পাতাটি অবধি তাঁহার ইচ্ছায় স্পন্দিত হইতেছে এবং এক ঘটনার মূলে তিনি, আর অন্য ঘটনার মূলে আমি, এইরূপ বোধ ঘোর মূর্খতা! যাহা কিছু হইতেছে, সবই তাঁহার ইচ্ছা—'সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'—ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই পর্বে বর্ণিত স্বপনের পর আমার স্থির নিশ্চয় হইয়াছিল যে, মা ইচ্ছা করিয়াই আমায় তাঁহার ঐ যোনিদেশে চুম্বন করাইয়াছেন ও ১০ পর্বে বর্ণিত ধ্যান কালে, তাঁহার যোনিদেশ বার বার ইচ্ছাবিরুদ্ধে দেখাইয়াছেন। আমার গৃহে কুলঙ্গিটি. উহার উপরিস্থিত ত্রিকোণ ও তদুপরিস্থিত পট এক্ষণে একটি অভিনব শিবলিঙ্গ প্রতীক (অবতরণিকা ২৯ অনুচ্ছেদ)। ত্রিকোণটি আমার সদা ধ্যেয় ঈশ্বরযোনি, যথা হইতে প্রতি নিমিষে বিশ্বের সর্ববিধ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে ব্রহ্মময়ী রাধার যোনির অনেক সাধনা (পূজা, ধ্যান, ইত্যাদি) করিয়াছিলেন। বিশ্বে সমস্তই ওঁ-কার স্বরূপ—নির্গুণ ব্রহ্মময়, বা শিবশক্তিময়! সারা বাহ্য বিশ্বের স্পন্দনই স্বপ্নবৎ শক্তিলীলা। যখন মানব এইরূপে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা অভেদ ও একাত্মক ঈশ্বর ও/বা ঈশ্বরীকে অটুট ভাবে সর্বার্পণ করিতে পারে এবং শক্তিলীলাকে যথার্থ স্বপ্নবৎ বোধ করিয়া নিজ দেহ ও জগৎকে অবস্তু মরীচিকাবৎ বোধ করত প্রবল বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তখনই তাহার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার হয় (৩৬ পর্ব)। এই অধিকার প্রয়োগ না করিলেও, কোন ক্ষতি নাই এবং নির্বাণমুক্তি লাভ হয়।

ষষ্ঠীস-অর্থপেত্নী

বিষয়—দিবাস্বপ্নে অর্থের শূন্যতা প্রকাশক একটি পেত্নীর আবির্ভাব ও তাহার সহিত কথাবার্তা।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১লা জুলাই, ১৯৪৭।

আমি দুপুরবেলা নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন বাল্যকালের ১৪নং কারবালাট্যাঙ্ক লেনস্থ আমার বাস গৃহের তক্তা-পোষে নিদ্রিত আছি, এমন সময় কে একজন বলিল—'আমি একটি পেত্নী, তুমি হাত বাড়াইলেই কিছু পাবে'। স্বপ্নের-স্বাপ্ন অবস্থায় তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসার করিয়া স্বপ্নের জাগ্রতাবস্থায় উপনীত হইয়া দেখিলাম যে, হস্তটি শূন্য এবং পেত্নীর (দেখিতে যুবতীর ন্যায়) সহিত সামান্য কিছু কথাবার্তার পর (যাহা মনে হয় না) মূল স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। উক্ত স্বপ্নটির দ্বারা আমার আত্মা জগদম্বা বুঝাইলেন যে, স্বরূপে হস্তে অর্থপ্রাপ্তি স্বপ্নের স্বপ্নাপেক্ষাও অলীকত্ব দোষে দূষিত। মানুষ জীবনে কত উপার্জন করে, [(+) প্রথম প্রুফে চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ছিদ্র—চিহ্নিত স্থান] তাহার কি'ই বা থাকে! কত রকমে যে ঐ অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজ পরিজন ও পোষ্যবর্গের যথার্থ প্রয়োজনে যাহা উচিত ব্যয়, তাহার অনেক অধিক অর্থ অপ্রত্যাশিত ঘটনারাজিতে —*অবশেষে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৬৬)—*ক্ষয় হইয়া যায়। চৌর্য, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব, মোহ, ভেদজ্ঞান, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রীজন, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ বিধ ব্যসন সর্ব অনর্থের মূল হইলেও, অর্থই যে ইহাদের বীজ এই কথা অত্যুক্তি নহে। অর্থের উপার্জনে, উৎকর্ষে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে কষ্ট এবং অর্থই ভয় (এমন কি, মৃত্যু), দুর্ভাবনা ও ভ্রমের জনক। মঙ্গলকামিগণ অর্থ নামক অনর্থকে দূরে পরিত্যাগ করেন। অর্থাসক্তি বহুবিধ দোষের আকর। কৃপণতা এবং আত্মীয় ও প্রতিপাল্যদিগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া

কেবল নিজ সুখার্থে ব্যয় শোচনীয় এবং যে-ব্যক্তি জ্ঞাতি, বন্ধু, দেবতা, ঋষি, অতিথি, পিতৃ এবং ভূতগণরূপ অংশীদিগকে ন্যায্য অংশ না দিয়া যক্ষের ন্যায় অর্থ সঞ্চয়শীল, তিনি অধঃপতিত হন এবং তাঁহার ধনও কাজে আসে না। ধনী ব্যক্তির অসাবধানতা, নৃপতি, চোর, যাচক ও জ্ঞাতিগণ হইতে ভয় উদয় হয়। তিনি সদা ব্যাকুলচিত্ত—এমন কি, পুত্রকলত্রাদি হইতে ভয়যুক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করেন। যাঁহার বিশেষ অর্থ না থাকিতেও, ধনী বলিয়া অপযশ আছে, তিনি সংসারে বিশেষ দুঃখী। আমি নিজে এই সত্যের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত (১৪ পর্ব)! অর্থ যাহার দাস, সেই মানুষ। যাহারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তাহারা মানুষ হইয়াও মানুষ নহে। টাকা শুধু দেহসুখ, ঐশ্বর্যভোগ ইত্যাদির জন্য নহে। নানাভাবে শিবরূপী ঈশ্বর সেবাই ধনের উদ্দেশ্য। সদুপায়ে অধিক অর্থ উপার্জনের চেষ্টা দোষের নহে। ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হওয়া অনুচিত। টাকা ঈশ্বরেরই এবং উহা প্রতিপাল্য সকলেরই ব্যবহারার্থে। টাকার দ্বারা ঈশ্বর-সেবা হইলে, তাহা দোষের নহে। এই সব কারণে, গুরু জগদম্বা আমাকে পেত্নী-রূপে কথাবার্তায় জানাইলেন যে, অর্থ স্বপ্নের স্বপ্ন সম একটি—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান** (৬৭)—*পেত্নীর ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। সারা বিশ্বই যখন বাস্তবিক শূন্যাকার, তখন অর্থ যে এইরূপই হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই স্বপ্নে, চিন্ময়ী পেত্নীটিও আমার আত্মস্থা জগদম্বার স্বরূপ! বিশ্বে যাহা কিছু (কি স্বাপ্ন, কি জাগ্রত) অভিব্যক্ত হইতেছে, সবই অহং-রূপিণী তাঁহারই প্রকাশ! এই ভাবই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। আমি নাই, তুমি নাই—'রামের রমণ ছাড়া কিছু নাহি হয়'! ঈশ্বর নিবেদিত কোন বস্তুর উপরেই অর্চকের নিজত্ব আরোপ অতিশয় গর্হিত। সেইজন্য, যে-ব্যক্তি বিশ্বকে ঈশ্বর বোধে সর্বার্পণ করে, তাহার ধন-পুত্র-কলত্রাদি নাশে বিচলিত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। এই সব বিষয়ে যদি কখনও মন সামান্য চঞ্চল হয়, সেই মনোবৃত্তি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরে অর্পণীয়! এই স্বপ্নটি দেখিবার চারি দিন পরে, আমার একটি জমি বিক্রয়ের প্রায় আঠার হাজার টাকা পাইবার কথা ছিল। সেই জন্য এই স্বপ্নটি আমার কর্মফল প্রকাশ করিল যে, ঐ টাকা কোন না কোন কারণে ব্যয় হইয়া যাইবে—থাকিবে না। এই পুস্তকে লিখিত সব স্বপ্নগুলিই জগদম্বারূপিণী কর্মফল প্রকাশক ও শাস্ত্রবাক্য অনুমোদক! বিশ্ব শক্তিলীলা ভিন্ন অন্য কিছু নহে এবং ইহাতে সবই কালীরূপে অভিব্যক্ত। শক্তিই ব্রহ্ম এবং '**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**'। এই বিশ্বধর্মে সাম্প্রদায়িকতা নাই।

যতীন-সারদা

গান

মায়ের শ্রীপদ ভুলোনা ভুলোনা।
ওরে মূঢ় মন পেয়ে এ রতন হেলায় খেলায় ছেড়োনা ছেড়োনা॥
জান না কি মন মায়ের করুণা, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি পেয়ে কৃপা-কণা;
তাঁহারি ইচ্ছায় মূক বেদ গায়, ব্রহ্মজ্ঞান পায় আশ্রিত যে জনা॥
মায়ের চরণ যে করেরে ধ্যান, ভব পারাবার গোষ্পদ সমান;
হয় মোহ নাশ, কাটে কর্মপাশ, কাল ভয় আর থাকে না থাকে না।
হেলায় খেলায় হারালি সুদিন, এখনও সে পদ ভাব অনুদিন;
আর কতদিন রবি দীনহীন, মার নাম কেন জপ না জপ না॥

বিষয়—মা সারদেশ্বরী যেন সাদা ধবধবে প্রসাদান্ন ও পায়স স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আমাকে খাওয়াইতেছেন, এইরূপ স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১১ই জুলাই, ১৯৪৭—বেলা প্রায় তিনটা।

সারদেশ্বরীদেবী আমায় সাদা ধবধবে রঙের প্রসাদান্ন ও পায়স স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছেন, এইরূপ দিবা স্বপ্নের পর নিদ্রোত্থিত হইলাম। ইহার পূর্বে মাকে কয়দিন জানাইয়াছিলাম যে, তিনি অনেকদিন আমাকে কোন নিদর্শন দেন নাই। তাঁহার শেষ স্বপ্ন মাত্র প্রায় চারি মাস পূর্বে দেখিয়াছিলাম (২৭ পর্ব); তথাপিও, জানি না কেন উক্ত কালে তাঁহার বিরহ ব্যথা এমন জাগিয়াছিল যে, দুই একদিন পূর্বে একবার তাঁহার জন্য রাত্রে শয়নের পূর্বে কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিলাম। অশ্রু-বর্ষণ 'উর্জিতা' প্রেমভক্তির লক্ষণ (২৩ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)। 'আমার' মা স্বপ্নটির দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি আমাকে ভুলেন নাই এবং স্বহস্তে শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের প্রসাদান্ন ও পায়স বিতরণ করিয়া বুঝাইলেন যে, তাঁহার কৃপা সমভাবেই আমাতে বর্ত্তমান। পাঠক! 'আমার' মা'টি জমাট প্রেম। প্রসাদান্ন, অন্ন নহে—উহা ব্রহ্ম বস্তু এবং দেবতাদিগেরও পরম আদরের ধন। উহার মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত এবং দর্শন, স্পর্শন, স্বাদ-গ্রহণ, লেপন, ইত্যাদিতে অশেষ পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয়। উহা প্রাপ্তি মাত্রই ভক্ষণীয়।

অতীন্দ্র-কুলকুণ্ডলিনী-পরব্রহ্ম

বিষয়—রাত্রে ছাদে ধ্যান কালে, মেরুদণ্ড বরাবর পিঠের দিকে একটি প্রকাণ্ড গোলমুখ, ইষ্টক-বর্ণের জ্যোতির্ম্ময় সর্পকে মাথার ভিতর ফণাটিকে সম্মুখ দিকে উত্তোলন করিয়া থাকিতে, মাঝে মাঝে দুইটি বিজড়িত জিহ্বাকে বাহির করিতে এবং উহার গলদেশের নিম্নে একটি জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রমণ্ডলকে ধারণ করিতে, দর্শনাদি; তৎপরে, চন্দ্রমণ্ডলের স্থানে একটি কিনারা জ্যোতিঃ-রেখাযুক্ত ও মধ্যস্থল ছায়াকার ত্রিকোণ যন্ত্রের ক্ষণিক আবির্ভাব ও আমার পরমানন্দময় অবস্থা লাভ।

স্থান—ছাদ।

কাল—৩০শে জুলাই, ১৯৪৭—রাত্র প্রায় বারটা।

উক্ত কালে ছাদে চিত-ভাবে শয়ন করিয়া আজ্ঞাচক্রে আত্ম-ধ্যান করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, যেন দেহমধ্যে পিঠের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর একটি প্রকাণ্ড গোলমুখ ইষ্টক-বর্ণের জ্যোতির্ম্ময় সর্প আমার মাথার ভিতর ফণাটিকে সম্মুখ দিকে উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। চিন্ময় এই সর্পটিও, প্রাকৃত সর্পের ন্যায়, মাঝে মাঝে দুইটি বিজড়িত জিহ্বা বাহির করিতেছিল। অতীব মন-প্রাণ মুগ্ধকর ও পরম আনন্দদায়ক এই দৃশ্যটি যেন বাহ্য বোধ স্বতঃই ভুলাইয়া দিয়াছিল। পরে দেখিতে পাইলাম যে, একটি গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রমণ্ডল ঐ সর্পের গলদেশের নিম্নে বিরাজিত। সমস্ত দৃশ্যটি কিছুক্ষণ পরে তিরোহিত হইয়াছিল এবং ফণাটির নিম্নে একটি কিনারায় জ্যোতিঃ—রেখাযুক্ত ও মধ্যস্থলে ছায়াকার [(+) প্রথম প্রুফে বড় কালির দাগে অবশে চিহ্নিত স্থান] ত্রিকোণ যন্ত্র অল্পক্ষণ দেখা দিয়াছিল এবং যেন সর্পটি উহারই ভিতরে বিলীন হইয়াছিল। ঐ ত্রিকোণ যন্ত্রই পরমা প্রকৃতি ও ব্রহ্মের মিলন স্থান। যোগিজনেরও নিতান্ত দুর্ল্লভ, সমস্ত দৃশ্যটির সঠিক বিবরণ সর্ব বিষয়ে সম্যক্ ভাবে যে লিখিতে পারিলাম না, তাহা নিঃসন্দেহ। সারদা আমাকে স্থায়ী সমাধি দিলেন না, কারণ অকালে (কর্ম বাকি থাকিতে) উহা হয় না। ইহার সহিত ৩৮ পর্বে বর্ণিত দৃশ্যের অনেক সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু ইহার আনন্দ আরও অনেক অধিক। শ্বাস-প্রশ্বাসের

অবস্থায় বিষয় মনে পড়ে না। এই পর্বটিও, উক্ত পর্বের ন্যায়, প্রকাশ করিল যে, আমার সর্পাকারা জ্যোতির্ময়ী কুলকুণ্ডলিনী সারদা মূলাধারস্থ ব্রহ্মদ্বার উন্মোচন করত সুষুম্নামার্গে সহস্রারস্থ পরম শিবের সহিত মিলনোন্মুখী এবং অতি অল্পক্ষণ ঐদিনে যথার্থ মিলিত! এই মিলন চরম বস্তু এবং যাহা লাভ হইল, তাহা মায়ের কৃপাসাপেক্ষ। ইহাতে আমার বাহাদুরী কিছুই নাই! এই ঘটনাটি প্রকাশ করিতেছে যে, জগদম্বার কৃপালাভ করিতে পারিলে, বিনা বিশেষ সাধন-ভজন ব্রহ্ম সহ একাত্মতা প্রাপ্তির সূচনা গোপ্পদ লঙ্ঘন সম সহজ।

২। বিশ্বে প্রতি অণু-পরমাণুতে, দুইটি জ্যোতিঃরূপিণী ত্রিকোণাকার চিন্ময় ব্রহ্মযোনি বর্তমান। প্রথম যোনি (এই পর্বে বর্ণিত), পরব্রহ্ম সহ কুণ্ডলিনী বা প্রাণ-শক্তি রূপিণী পরমা প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় যোনি (২৬ পর্বে বর্ণিত), নাদ ও বিন্দুরূপী পুরুষ-প্রকৃতির-রমণ স্থান। প্রথম যোনিতে রমণে, অন্ধকার স্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্ম প্রাণশক্তিসহ অভিব্যক্ত হইয়া পরাৎপর জ্যোতিঃ মহাকালী সগুণ ব্রহ্ম (৪ ও ২৬ পর্ব), যাহা নাদ ও বিন্দুরূপে দ্বিতীয় যোনিতে রমণ দ্বারা, বাহ্য বিশ্ববস্তু রূপে প্রকাশিত। অতএব, প্রতি বিশ্ববস্তুই পরা-প্রকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া অভিব্যক্ত এবং 'মায়ের (দুই) রমণ ছাড়া কোন বস্তু নাই।' যাহা কিছু এই বিশ্বে, সবই ব্রহ্মময় (প্রথম যোনি) ও ঈশ্বরময় (দ্বিতীয় যোনি), চিদাকাশ।

৩। পুস্তকের প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়—বিশেষতঃ, উহার ১ ও ২ অনুচ্ছেদ—ও অবতরণিকার 'যশ-গীতা' নাম্নী বন্দনাটি [২৪ (২) অনুচ্ছেদ] পাঠ করিলে উক্ত দৃশ্যের তাৎপর্য কিয়দংশে ধারণা হইবে। যোগশাস্ত্র মতে, আমার দৃষ্ট চন্দ্রমণ্ডলটি শিরস্থ শক্তিযোনিমণ্ডলের নিম্নে সহস্রদল পদ্মের ক্রোড়স্থ। উহা অধোমুখী, অতি সূক্ষ্ম ও বিদ্যুদ্দামবৎ দীপ্তিশালী এবং উহার 'অমা' নাম্নী ষোড়শী কলা হইতে নিরন্তর সুধাধারা বিগলিত হইতেছে। ঐ চন্দ্রমণ্ডলের কেবল স্মরণে, যোগি পৃথিবীর সকলের পূজ্য এবং দেবগণ ও সিদ্ধগণের প্রিয় হইয়া থাকেন। উহার দর্শনে ও চিন্তায় গ্রহগণ অনুকূল, মারিক উপদ্রব সমূহ ধ্বংস ও যুদ্ধে জয় লাভ হয়। এই যোগ সিদ্ধিপ্রদ এবং শিব-বাণী এই যে, উহার অভ্যাসে সাধক তৎসাদৃশ্য লাভ করে। 'অমা' কলাভ্যন্তরে, অতি সূক্ষ্মা 'নির্বাণ'-কলা বিদ্যমান। ইনি সর্বভূতের দেবীরূপিণী, ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্না এবং ইঁহারই স্ফুরণে নিত্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ইঁহার আকৃতি অর্ধচন্দ্রবৎ, প্রভা দ্বাদশ আদিত্যের তুল্য এবং ইনিই 'মহাকুণ্ডলিনী' নামে পরিচিতা। এই নির্বাণ কলার অভ্যন্তরে নির্বাণ-শক্তি বিরাজিতা। ইনি ঈশ্বরাদি ত্রিলোক প্রসবিনী ও সর্বজীবের প্রাণ-স্বরূপা। সদা প্রেম সুধা ক্ষরণ করিয়া সাধক হৃদয়ে ইনি তত্ত্বজ্ঞান উদয় করিয়া থাকেন।

নির্বাণ-শক্তির মধ্যস্থলেই ব্রহ্মস্থান। উহাকে সদ্‌গুরুর স্থান, বা শিবস্থান কৈলাস-পুরী, বা হরিস্থান গোলোকধাম (গোপিকাগণ ঐ পদ্মের কেশর স্বরূপ), বা প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন স্থানও বলে। চক্ষুর কোণ টিপিলে, উহাতে যে গোলাকার জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, তাহাই নরদেহে 'অমা'-কলা। 'যোগ' শব্দ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ নির্দেশ করে; অথবা, উহা নাদ-বিন্দু, বা চন্দ্র-সূর্য, বা মন-আত্মা, বা প্রাণ-অপান, বা জীবাত্মা-পরমাত্মা-কুণ্ডলিনী ইহাদের মিলন বুঝায়। সহস্রার পদ্ম কন্দস্থ যে চন্দ্র-মণ্ডল, উহা ষোড়শ কলাত্মক এবং সদাই নিম্নে ত্রিকোণাকারে সুধাবর্ষী। উহার এক ভাগ ইড়ায় ও অপর ভাগ সুষুম্নায় গতিশীল। প্রথম ভাগ ইড়ার দেহের পুষ্টির জন্য সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় ভাগ সৃষ্টির জন্য সুষুম্না মার্গে বিচরণশীল এবং উহা মূলাধারস্থ সুষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী নিজে ব্রহ্মদ্বারে পান করিতেছেন। মূলাধারস্থ যে যোনিমণ্ডল তাহাতে দ্বাদশ কলা সম্পন্ন সূর্য উর্ধ্ব-রশ্মির দ্বারা পিঙ্গলায় প্রবাহমান। এই রশ্মি চন্দ্রমণ্ডলের সুধাসম কিরণ ও দেহস্থ ধাতু সমূহ গ্রাস করে। ইহা বিষ সম তীব্র ও অত্যন্ত তাপপ্রদ। সহস্রার পদ্ম পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র ও অধোবদনে বিকশিত। উহা পঞ্চাশদাক্ষরাত্মক ও নিত্য সুখ স্বরূপ এবং ইহারই মধ্যে উক্ত ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্র প্রকাশিত আছেন। উহারই মধ্যে বিদ্যুৎবৎ ত্রিকোণ যন্ত্র এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মের ছায়াকার শূন্যস্থল বিরাজিত। ইহা পরমানন্দ ভোগের স্থান এবং জগদ্‌গুরু শিব ইহা হইতে বিমলবুদ্ধি যোগিগণকে সুধাধারা প্রদান পূর্বক আত্মজ্ঞান দিতেছেন। শিব-সংহিতায় আছে যে, ব্রহ্মনাড়ীতে মন সমর্পণ করত ক্ষণার্ধ অবস্থান করিতে পারিলে, পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ হয়। উহার স্মরণে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়—এমন কি, যে-স্থলে সহস্রার পদ্ম বিরাজিত আছে, সেই স্থান জ্ঞাত হইতে পারিলেও, আর সংসারে দেহ ধারণ করিতে হয় না। সে-ব্যক্তি গুরুরূপে জ্ঞান দানের দ্বারা অপরকে উদ্ধার করেন ও শিবপ্রিয় হন। প্রাণ সুষুম্নোমুখী না হইলে, ভাবভক্তি ও দিব্য জ্ঞান উদয় হয় না। যাহাতে প্রাণ সুষুম্নায় সঞ্চরণ হয়, সেই অভিপ্রায়েই যোগাভ্যাস ক্রিয়া। গর্ভস্থ শিশুর ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রাণপ্রবাহ থাকে না। ভূমিষ্ঠ কালে ইড়া ও পিঙ্গলায় প্রাণধারা আসিয়া পড়ে এবং মূলাধারে সুষুম্নাপথের নিম্নস্থ ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধবৎ হইয়া যায়। প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিলেই, উহার চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া স্থিরতা লাভ হয়। ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসের বাহ্য অবরোধের ন্যায় কষ্টদায়ক নহে—বরং, তখন পরমানন্দে মন ডুবিয়া যায়। অভ্যাস বলে যখন বায়ু স্থির করিবার পরিচয়াবস্থা লাভ হয়, তখন উহা সুষুম্নায় ব্রহ্মমার্গে পরিচালিত হয়। যোগের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হইলেই, দেহস্থ নাড়ী সকল বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং কুণ্ডলিনীর বদন ব্রহ্ম বিবর

উন্মোচন করেন। এই নিয়মের অন্যথা হয় না। ব্রহ্মনাড়ীতে প্রাণ স্থির হইলেই, মানবের অজ্ঞান নষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। প্রাণই আত্মার প্রকাশ (বা স্পন্দমান আত্মা) এবং উহা বহির্মুখী হইলেই আত্মার আবরক। প্রাণায়ামে প্রাণ স্থির হইলেই, আত্মার আবরণ ক্ষয় হইয়া যায়।

৪। মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রই চৈতন্যের বিশিষ্ট স্থান। এই চৈতন্য প্রাণ শক্তি রূপে দেহস্থ নাড়ী সমূহ অবলম্বনে, সর্ব দেহেন্দ্রিয়কে চেতনাযুক্ত করিয়া সঞ্চালিত করিতেছে। এই প্রাণশক্তিই জীবের জীবন, কুণ্ডলিনী শক্তি। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরেই ইহার প্রধান প্রবাহ এবং সুষুম্নাই ইহার আধার—যাহা হইতে ঐ শক্তি দেহে সর্বত্র নানা শক্তিরূপে পরিণত হইয়া সঞ্চালিত হয়। সাধারণ জীবে এই শক্তি জন্মের পর হইতে ইড়া ও পিঙ্গলা—*অবশেষ কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৬৮)—*মুখে প্রবাহিত হয় এবং সুষুম্নার ব্রহ্মদ্বার রুদ্ধবৎ থাকে। এই দুই নাড়ী দিয়া প্রাণ-প্রবাহের সহিত জ্ঞান সর্ব দেহে প্রসারিত হয় এবং আমাদের মনোবৃত্তি বহির্মুখী হইয়া সংসার লীলায় অভিনয় ও দেহাত্মবুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে। প্রাণ-প্রবাহ সুষুম্নামুখী হইলে, দিব্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে। সহস্রার পদ্মের নীচে সুষুম্নার ঊর্ধ্ব শাখার মুখে, বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে এবং এই স্থলে প্রাণবায়ুকে স্বতঃ স্থির করিতে পারিলে ভেদবুদ্ধি নাশ হইয়া যায়। মানবের জীবনীশক্তি সহস্রার পদ্মস্থ পরম পুরুষ হইতে অনুলোম গতিক্রমে নিম্নে ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া মূলাধার পদ্মে সঞ্চারিত হইতেছে। উহা যেমন ভাবে ঊর্ধ্ব হইতে নামিয়া আসিয়াছে, পুনর্বার তেমন ভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে বিলোম গতি ক্রমে উঠাইয়া পরম পুরুষের সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, মানব মুক্তি লাভ করে। ইহাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য এবং ইহাই আমার জগদম্বার কৃপায় নিমেষ মাত্র আস্বাদন হইয়াছিল (১ অনুচ্ছেদ)।

৫। এই পর্বে আলোচিত ঘটনার কালে, আমি চেষ্টা করিয়া প্রাণায়ামাদি কোন হঠযোগ ক্রিয়ার আশ্রয় লই নাই। কেবল জ্ঞান ভাবেই আত্মধ্যান করিতেছিলাম এবং যে যোগিজন-দুর্লভ দর্শন লাভ হইয়াছিল, তাহা গৌণতঃ উহারই ফল এবং মুখ্যতঃ জগদম্বার কৃপা প্রসূত। আমি বিশেষ সমাধি অবস্থা লাভ করি নাই, সত্য—কারণ, বাহ্য বোধ লুপ্তপ্রায় হইলেও, একেবারে লোপ পায় নাই। যাহা হইয়াছিল, তাহা নিমেষ মাত্র যেন কেবল আস্বাদনের নিমিত্তই মা দিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ অবস্থা সমাধি হইতে দূরস্থ নহে—কারণ, শেষে দৃষ্ট ত্রিকোণদ্বয়ের মধ্যস্থ ছায়াই সহস্রারস্থ ব্রহ্মের শূন্যস্থান। এই সব কারণেই, বেদান্তবাদীরা হঠযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। হঠযোগ

ভিন্ন রাজযোগে এবং রাজযোগ ভিন্ন হঠযোগে, সিদ্ধি হয় না। কলিযুগে হঠ-যোগ সাধন অতীব কঠিন। আত্মোপাসকের 'রাজাধিরাজ' যোগই সুপ্রশস্ত মার্গ (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)। এই যোগে —*অবশে কাগজের উপরি উক্ত স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৬৯)—*জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বন। সেই বেদান্ত নিহিত জ্ঞান (ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা) দ্বারা, চিত্ত ও জীবকে নিরালম্ব করত জীব ও ব্রহ্মের যথাযথ ঐক্য ধ্যানে, সমাধির দ্বারা আত্মস্বরূপে বিরাজিত হওয়া যায়। নিরন্তর এই প্রকার সাধনায় কোন কামনা থাকে না, 'অহং' ভাব অন্তরে স্থান পায় না এবং বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুই একমাত্র, বা ভেদহীন, আত্মস্বরূপে দর্শন ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

৬। ৪ পর্বে যে কুণ্ডলিনীর দ্বারা উদ্ভাসিত তেজোময় সর্বব্যাপী সগুণ ব্রহ্ম স্বরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহা বিশ্বে আসূর্যরেণু অবধি সর্ববস্তুতে প্রতিবিম্বিত এবং এই পর্বে বর্ণিত ব্রহ্মস্থান ও সহস্রার পদ্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় উপাদান সমষ্টি [যথা—কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী, চন্দ্রমণ্ডল অমাকলা, নির্বাণকলা (মহা-কুণ্ডলিনী), নির্বাণশক্তি, ইত্যাদি]। স্থির সর্পের চঞ্চল ভাব গ্রহণের ন্যায়, প্রাণশক্তি কুণ্ডলিনী চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে নিষ্ক্রান্ত ভাবে আসূর্যরেণু অবধি সারা বিশ্ব গঠন করিয়া উহার সর্ববিধ স্পন্দন, প্রত্যেকের নিয়তি অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। 'প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ; সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ'—সারা বিশ্বই চৈতন্যযুক্ত প্রাণময়। দেব-অসুর-মানবাদির চৈতন্য, পূর্ণবিকশিত, বা বিকশিত, বা মুকুলিত; পশু-পক্ষী-কীটাদির চৈতন্য, সংকোচিত; গুল্ম-লতাদির চৈতন্য, আচ্ছাদিত এবং ধাতু-মৃৎ-শিলাদির চৈতন্য বিনষ্ট। চিন্ময় ব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র সকল পদার্থে ও বিষয়ে সূক্ষ্ম অনুভব বা আত্মারূপে বিদ্যমান, অথচ অনুভবনীয় বিষয় মুক্ত। বাসনাত্মই এই সকল নানাবিধ জীব-ব্রহ্মের নানাবিধ ভোগ-দেহ (অন্য কিছু নহে) এবং এই দেহ রক্ষণের মূলে চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনী প্রাণ, শক্তি। অতএব, প্রাণই যেন বাহ্য বিশ্বে নানা আকারে ও প্রকারে লীলায়িত। সর্ববিধ জীব, প্রাণকে স্বভাবতঃই অতিশয় প্রিয় বোধ করে—কেননা উহা না থাকিলে, তাহাদের দেহ লোপ পায়। এই প্রিয়ত্ব বোধ যে শুধু বাহ্য চৈতন্যময় দেব-অসুর-মানব-পশু-পক্ষী-কীট ইত্যাদিরই আছে, তাহা নহে। আচ্ছাদিত ও বিনষ্ট চেতন গুল্ম-লতাদিতে এবং মৃৎ-শিলাদিতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যে-কোন বৃক্ষ বা ধাতু আঘাত পাইয়া অল্পাধিক প্রতিঘাতে, বা বাধা দিতে, বিরত থাকে না—ইহাই তাহার প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টা! উহাদের পরমাণু গুলির ভিতরও যথেষ্ট একতা বা প্রেম আছে, যাহার জন্য আঘাত দ্বারা

সহজে নষ্ট হয় না এবং একই ভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া প্রিয় প্রাণ রক্ষা করে। আরও, একত্র হইয়া থাকিবার লক্ষণ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের চৈতন্য আছে, এবং তাহারা জীবিত। সকল বিশ্ব-পদার্থে এই যে যথাভাবে বাঁচিবার প্রবৃত্তি, ইহাই তাহাদের চেতনা, বা প্রাণের, লক্ষণ। এই প্রাণই উপনিষদোক্ত 'প্রজ্ঞা'। সারা বিশ্বই চেতন ও প্রাণবান—কেননা, ইহাতে সর্ব বস্তুরই ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে, বা প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত প্রয়োজন মত অল্পাধিক সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি আছে। এই সকল শক্তি দেহ ও নানা ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণ ভিন্ন কিছুই কার্যকরী নহে। সুতবাং—'**অরা ইব রথ নাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।**' ভগবতী আদ্যাশক্তি 'বিন্দু'—রূপে সারা বাহ্য বিশ্বের রূপের (দেহেন্দ্রিয়ের ও তাহাদের নানাবিধ শক্তির) জননী। তিনিই পিণ্ড-রূপে এই সকলের পরিচালিকা এবং নির্বাণ কলা ও শক্তি রূপে বিশ্ব-প্রসবিনী ও মুক্তি-দায়িনী। অতএব, বিশ্বে তিনিই সর্বজীবের দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদি হইয়া রহিয়াছেন ও সব করিতেছেন। তিনিই সব হইয়া তাঁহাদের নানাবিধ 'অহং'-ভাব অবলম্বনে, এই সকল প্রপঞ্চের উৎস। এই 'অহং'-ভাবও তিনি। বিশ্ব ব্রহ্মময়—কারণ, ব্রহ্মই স্বমায়া অবলম্বনে এই বিশ্বলীলা করিতেছেন—অতএব, সমস্তই ব্রহ্মে অর্পণীয় (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৬-২৭ অনুচ্ছেদ)। শেষ কথা—'নিয়তির লিপি অমোঘ'—এবং এই নিয়তি ভিন্ন কিছুই হইবার নহে। ইনি ব্রহ্মবিক্রম-রূপিণী ! ইঁহারই প্রভাবে বিশ্ববস্তু সকল নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অবশেষে জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ ও বহুকল্প নানাযোনি পরিভ্রমণ করত, পরিশেষে পুনরায় স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মৈকত্ব্য লাভ করে। স্থূলশরীর হীন জগদম্বার সঙ্কল্প, আর স্থূলশরীর যুক্ত জীবের যত্ন ও ব্যাপার দ্বারা, বিশ্বে সকল কার্য হয়। তাঁহার ইচ্ছা কাম্য ফলসিদ্ধির অনুকূল না হইলে, কেবল জীবের ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ফল লাভ হয় না। জগদম্বার ইচ্ছা না থাকিলে নাথুরাম, মহাত্মা গান্ধীকে গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত করিতে পারিত না। অহিংসার জমাট-মূর্তি গান্ধী কেন হিংসা উপলক্ষ্য করিয়া প্রাণ হারাইলেন, কে তাহার কারণ নির্ধারণে সমর্থ ? ইহা দেব-বুদ্ধিরও অতীত ! জীবের অদৃষ্ট, বস্তুশক্তি ও জগদম্বার সঙ্কল্প, এই তিনের মিলনে নিয়তি উৎপন্ন হয়—যাহার প্রভাবেই বিশ্বে সর্বভূত স্ব-স্বভাবযুক্ত, সর্ববিশ্ব তৃণের ন্যায় পরিবর্তিত ও কল্পাবধি একই নিয়মে ব্যবস্থাপিত এবং নিখিল বস্তুর আধার এই বিশ্ব ধীরভাবে আপ্রলয়কাল অবস্থিত। কেন ব্রহ্মস্বরূপ বিভিন্ন বিশ্ব-পদার্থের নিয়তি বিভিন্ন প্রকার, এই প্রশ্নের সদুত্তর বুদ্ধির অতীত !

অতীন্দ্র-জাগায়া

বিষয়—কষ্টদায়ক বাতরোগের উপশান্ত অবস্থায়, মাঠে ফুটবল খেলিতেছি কিন্তু দক্ষিণ পদ দিয়া সজোরে বল ছুঁড়িতে পারিতেছি না, এইরূপ স্বপন দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭—বেলা প্রায় দেড়টা।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিবস ১৫ই অগষ্ট ১৯৪৭ হইতে, আমি—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৭০)—***কঠিন ও কষ্টদায়ক পুরাতন বাতরোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় আড়াই সপ্তাহ শয্যাশায়ী ছিলাম। ঐ কালে আমি গৃহ মেঝে শয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তজ্জন্য, যদিও কালী-ঘাটের মা'র ছবিটি আমার কিছু দূরে ছিল, তথাপি তিনি নিজে পরম করুণায় তাঁহার ঐ ছায়ামূর্তিতে যেন আমার—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৭১)—***নিত্য সহচরী ছিলেন এবং জলন্ত, ত্রিনয়নযুক্ত, সমবেদনা ও প্রেমে ঢল ঢল মুখখানি আমার সম্মুখে সামান্ত ব্যবধানে রাখিয়া আমার রোগযন্ত্রণা ভুলাইয়া হৃদয়ে প্রেমসুধা বর্ষণ করিতেন। তখন যেন আত্মধ্যানের অবসর পাইতাম না এবং মা মাঝে মাঝে দুইটি বরাভয় কর দেখাইয়া পরম তৃপ্ত করিয়া যেন বুঝাইতেন—"ধ্যানের প্রয়োজন নাই; মনে সুদৃঢ় আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার মূর্তিকেই নিজরূপে চিন্তা কর ও 'মা'-রবে ওঁ-কার মন্ত্রই উচ্চারণ কর, যাহা সাধনার শেষ কথা ও ব্রহ্মমন্ত্রের বীজ।" হায়! হায়! এইরূপ রোগযন্ত্রণা সারা জীবন ভোগ হইলেও দুঃখের হেতু হয় না। যাহা হউক, প্রায় আড়াই সপ্তাহ পরে রোগ কিছু উপশম হইয়াছিল এবং আমি চলৎশক্তি লাভ করিয়াছিলাম—যদিও দক্ষিণ পদের হাঁটুটিতে বেদনা ছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় দেড়টায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—যদিও আমি কখন ফুটবল খেলি নাই।

"যেন একটা মাঠে ফুটবল খেলিতেছি, কিন্তু দক্ষিণ পদ দিয়া বল সজোরে ছুঁড়িতে পারিতেছি না—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৭২)।**"

২। তাহার পর, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল! বাস্তবিক, আমার দক্ষিণ পদটি এখন দুর্বল রহিয়াছে এবং ইহাই আমার কর্মফল।

যতীন-আদ্যাশক্তি

গান

পঙ্কজ বনে রাত্রদিনে কি রঙ্গ করিছ শিবা—
সদা শিব সঙ্গে আনন্দে, আনন্দময়ি ॥
তুমি একা হয়েছ দ্বিধা পরমপুরুষ প্রকৃতিনারী ;
কতই নামে কতই রূপ ধরি কতলীলা কর লীলাময়ি ॥
সকল আকারে আছ মা অন্তরে, জানিতে না পারে জীব তোমারে,
তুমিই নিত্য নিরাকারা চিদানন্দ-ব্রহ্মময়ী ;
তুমি কৃপা কর যারে সেই তোমারে জানিতে পারে ;
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ দেবেশি,
সাধকের হৃদিপদ্মে প্রকাশ, করুণাময়ি ॥

বিষয়—গঙ্গার পশ্চিমতীরে, নবদ্বীপধামের উপকণ্ঠে, পূর্ব্বস্থলী গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণের স্থান সংগ্রহোদ্দেশ্যে গমনের জন্য বাতরোগ বৃদ্ধিতে, পরদিন বরকন্যা ভবতারিণীদেবীর আমাকে দিবানিদ্রার তন্দ্রাবস্থায় কন্যারূপে সেবা।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭—বেলা প্রায় দেড়টা।

পূর্ববর্তী পর্বে আলোচিত স্বপ্নটির প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমায় পূর্বস্থলী যাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ গঙ্গাকূলে মন্দির নির্মাণের স্থান সংগ্রহের চেষ্টা ২৭ পর্বে বর্ণিত কাহিনীটির পরেও চলিতেছিল। তজ্জন্য, ভগিনীপতি গুরুদাস বিশ্বাসের সহিত ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় এগারটায় রেলযোগে পূর্বস্থলী পৌঁছিয়াছিলাম। স্থান মনোমত না হওয়াতে, বেলা প্রায় সাড়ে বারটায় ফিরিবার ট্রেন ধরিয়াছিলাম। ভ্রমণ অতি সামান্য হইলেও, বাতের ব্যথা বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ভাদ্র মাসের প্রখর দুপুর রৌদ্রে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম—এমন কি, মনে হইতেছিল যে মূর্ছিত হইতে পারি। ট্রেনে বিজলী পাখা অচল ছিল এবং ভগিনীপতির দ্বারা সংগৃহীত দুই বোতল বরফ-যুক্ত মিঠাপানি গরম নিবারণে অক্ষম হইয়াছিল। ‘আমি দেহ নহি,’ স্বাভাবিক

আমার এই ভাব দৃঢ় অবলম্বনে আত্মধ্যান করিবার কালে, আজ্ঞাচক্রে আত্ম-জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে দেহকষ্ট সত্ত্বেও পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া যেন অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে নিদ্রোত্থিত হইয়া বুঝিলাম যে. ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। রাত্র প্রায় আটটার বাড়ী ফিরিয়াছিলাম।

২। পরদিন প্রাতে বাত বেদনা বিশেষ বৃদ্ধি হওয়াতে মনে হইতেছিল যে, ছোট দুইটি কন্যা যদি পা টিপিয়া দেয় তাহা হইলে কষ্ট উপশান্ত হয়। কিন্তু তাহারা পারিবে না ভাবিয়া উহা করিতে বলি নাই। বেলা বারটার সময় ডাহিন পাশে (উত্তর দিকে) ও বাম পাশে (দক্ষিণ দিকে) কালীঘাটের কালী ও দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীকে ভাবে নিজ সাথে খাটে শুয়াইয়া ও তাঁহাদের চুম্বনাদি করিয়া উত্তর দিক ফিরিয়া নিদ্রিত হইলাম। বেলা প্রায় দেড়টায় মনে হইল যেন, কোন বালিকা আমার পা টিপিয়া দিয়া পিছনে বাম দিকে শয়ন করিল ও সেখান থেকে হাত বাড়াইয়া আমার সম্মুখের দুইটি হস্তও টিপিতে লাগিল। আমি সুস্পষ্ট উক্ত সেবা অনুভব করিলাম; কিন্তু যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কিছুতেই জাগরিত হইতে পারিলাম না এবং তন্দ্রাবেশে পার্শ্ব-পরিবর্তন না করিতে পারিয়া সেবিকার পরিচয় বার বার চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর না পাইয়া নিদ্রোত্থিত হইলাম এবং তৎকালে ঘরের পার্শ্বের দালানস্থ শরদিন্দুর স্বর শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন্ কন্যা আমার নিদ্রাকালে হাত পা টিপিয়া দিল। শরদিন্দু, বাণী ও দীপাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইলেন যে, তাহারা কেহ উহা করে নাই। বাণী বলিল যে, সে আমার চীৎকার দালান হইতে শুনিতে পাইয়া-ছিল, কিন্তু নিদ্রার প্রলাপ ভাবিয়া গ্রাহ্যে আনে নাই। তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বরকন্যা রঙ্গিণী ভবতারিণী বহু আয়োজনে এই অপূর্ব নাটকের অভিনেত্রী! তিনি যে আমায় পিতারূপে বরণ করিয়াছেন, সেই পদমর্যাদা আমাকে উক্তরূপে দান করিয়া জানাইলেন যে, আমাদের সম্বন্ধ 'পাকা'। ভবতারিণীই রামকৃষ্ণ ও সারদা। সংসারে সুখী না হইলেও, এই নিয়তি অসাধারণ।

৩। মায়িক দৃষ্টিতে ঘটনাটি অভূতপূর্ব বটে. কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের মাপকাঠিতে উহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। সারা বিশ্বই ব্রহ্ম বা শিবশক্তি ময় এবং ইহার বহিরাবরণ যাহা কিছু সব অখণ্ডভাবে জগদম্বার আত্মভাবে পরিণত রূপ—অতএব, পদ, লিঙ্গ, যোনি. গুহ্যদেশ, ইত্যাদি হেয় নহে এবং জগদম্বারই রূপ বটে। অজ্ঞান বা চিত্তের বশে আমরা ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করি, নানাবিধ কল্পিত অর্থে তাঁহাকে বুঝি, খণ্ড খণ্ড করিয়া নানাবিধ শব্দে অভিহিত করি এবং বুঝিতে ও বুঝাইতে নানাবিধ

সঙ্কেত অবলম্বন করি। আমাদের জ্ঞান এমনি কল্পনা ও দুরাকাঙ্ক্ষায় জড়িত যে, ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বতন্ত্র দেখি এবং বুঝি না যে বিশ্বই ঈশ্বরমূর্তি। আমাদের যে-সকল বাহ্য লৌকিক ব্যবহার, তাহা শুধু অবিভারই বিলাস। যাহা নাই—'আমি', 'তুমি', 'তিনি', 'পূজ্য-মস্তক', 'হেয়-পদ', 'ঘট', 'পট', ইত্যাদি—সেই সব ভাব লইয়াই বিশ্বে সকলেই ব্যবহারবান। বুঝি না যে সমস্তই ঈশ্বরশক্তি এবং তৎপ্রসাদ রূপেই গৃহ্য। এই অবস্থা হইতে দেহ থাকিতে, মহাপুরুষগণেরও নিষ্কৃতি নাই—মায়ার এইরূপ প্রবল প্রতাপ। যেমন মৃন্ময় নানাবিধ পাত্রাদি ব্যবহার কালে, পাত্রাদি ব্যবহার করিতেছি না, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই ব্যবহার করিতেছি, এইরূপ জ্ঞান সাধারণের উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর উপাদানের সাহায্যে জীবনে সর্ববিধ কার্য সম্পন্ন করিয়াও, অবিদ্যাবশে মানব তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। সঠিক বুঝিয়া চলিতে পারিলে এবং সামান্য সামান্য অনিবার্য বিচ্যুতি ঈশ্বরার্পিত হইলে, সংসারে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। 'অহং'-ভাব, বা 'বাসনা,' জগতের কারণ, ইহা সত্য—কিন্তু উহা জগদম্বার কার্য বা প্রেরণা রূপে গৃহীত হইলে, বন্ধনের হেতু নহে! 'শিবোঽহং ও আমি দেহ নহি'—এই ভাবে, জগদম্বার উক্ত আচরণ আমার গর্বের বিষয় অণু পরিমাণেও নহে। উহা তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেম-ভক্তি দায়িনী তাঁহার, আমাকে একত্রে তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেমভক্তি দৃঢ়ীকরণের একটি উপায় মাত্র। দেহাত্মবোধ ত্যাগী ঈশ্বরাধীন ব্যক্তি (যেমন, যম), সর্ববিধ কর্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয় এবং সর্ববিধ কর্মফল ভোগ করিয়াও (যেমন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পাণ্ডবদিগের রাজ্যলাভ) যথার্থ ভোগী নহে! জগদম্বার আচরণ আমার কর্মফল, বা আমার নিয়তি-রূপিণী তাঁহার—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৭৩)—*কৃপা! ইহার নিগূঢ় হেতু নির্ধারণ অসম্ভব।

৪। বন্দনা সহ এই পর্বটির লিখন অবশে কার্তিক পূজার পর দিবস (১৭ই নভেম্বর সমাপ্ত হইয়াছিল। বন্দনাটি পরে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে।

যতীন-আদ্যাশক্তি [পাদটীকা (১).]

কে বুঝিবে আদ্যা কিবা, সারা বিশ্বমাতা শিবা,
নহে ক্ষম বেদ যাঁর বর্ণিতে স্বরূপ।
তোমার ইচ্ছায় হয়, সিন্ধুর (*৭৪) আকাশে লয়,
উঠে সেই স্থানে মরু ধরি নব রূপ।

---

(১)—বন্দনাটি লিখিবার ইচ্ছা ছিল না—কারণ, এই পর্বস্থ ঘটনাটি বার বার প্রকাশ পর্ব নির্দেশক মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু, পরবর্তী পর্ব লিখিতে গিয়া দেখিলাম যে, আশ্চর্য

মূষিক (+)উদ্ধারে হরি, মধুহা বধয়ে করি,
মূঢ় হয় মহাকবি বিশ্বের মাঝারে।
পঙ্গু গিরি শিরে ধায়, মূক বেদ গান গায়,
দস্যু হয় মুনিবর পূজিত সংসারে।
নিত্য ইথে (*৭৫)যাহা ঘটে, সর্বমূলে (*৭৬) তুমি বটে,
নিজেকে রাখিয়া দাও কিন্তু সংগোপনে।
সেবা ক'রে মোর পদ, দিলে দড় পিতৃপদ,
অগোচর না রহিলে এই আচরণে।
বহু সমাদর ক'রে, তব পদ বক্ষে ধ'রে,
শিব এই বিশ্ব মাঝে পুরুষ রতন।
সেই পদ আশা করি, আছি বহু কাল ধরি,
নাহি থাকিলেও কিছু সাধন ভজন।
সেবা কর দক্ষ পদ, আর হিমালয় পদ,
ভুলে কেন যাও মাতা তুমি অতুলন!
নাহি কর পুনঃ ভুল, তুমি তো নহ বাতুল,
উন্মাদিনী রূপে-মূঢ় দেখাও ভুবন!
কিম্বা তুমি নহ ভ্রান্ত, মূর্খ আমিই বিভ্রান্ত,
ভুলি তুমি গুরুদেবী জ্ঞান-প্রদায়িনী।
তাই বুঝালে সেবনে, কিছু না হেয় ভুবনে,
সর্ব (*৭৭) বস্তু তব সম ঈশ্বরী-রূপিণী।

রূপে তিনখানি কাগজের সোজা ও উলটা দিকের শেষের ছয়টি স্থান একই প্রকার মসির দাগে চিহ্নিত! কি করিয়া উহা সম্ভব হইল, না বুঝিলেও, মায়ের ইচ্ছা যে বন্দনা লিখিতে হইবে এবং ঐ চিহ্নিত পৃষ্ঠা ও স্থানগুলিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা অবশে লিখিত হইবে, তাহা বুঝিয়াছিলাম। হায়! মানব! তুমি ঈশ্বর মান না। এই কবিতাটি ট পর্যন্ত কবিতাটির সহিত পঠনীয়—কেমনা, উভয়েতে আমার প্রতি আত্মার বহু কৃপাকাহিনীর সার একত্রে বিস্তৃত হইয়াছে। সাতটি পৃষ্ঠাতে বন্দনাটি শেষ হইয়াছিল।

সারা বিশ্ব ব্রহ্মাকার, কিম্বা তোমার আকার,
যেই দেখে এই ভাবে সকল ঘটন।
তা'র বড় জীব নাই, পূজার্চন তা'র নাই,
সেই ইথে ব্রহ্মজ্ঞানী, ভকত রতন।
সে'ই ব্রহ্ম, সে'ই হরি, সে'ই দুর্গা বিশ্বেশ্বরী,
সর্ব শস্ত্র ব্যর্থ তা'র শরীর পরশে।
অনল শীতল হয়, অনিল ডরিয়া বয়,
তা'র কাছে অরিকুল পরাস্ত অবশে।
নর স্বাধীনতা চায়, না জানে তা'র উপায়,
তত্ত্বজ্ঞান লভে যদি, সে পায় সে ধন।
আত্মা-দেহ-প্রাণ-মন, করি তোমাতে মিলন,
সার্ব-স্বেচ্ছাচার তা'র না হয় বারণ।
তুমি সর্বময়ী ভবে, এই জ্ঞান যেই লভে,
'জীবন্মুক্ত' সে'ই—জন্ম পুনঃ নাহি তা'র।
'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র,' এই যার মূল মন্ত্র,
হয় না সে পথভ্রান্ত ভুবন মাঝার।
তা'র তুমি লহ ভার, সে না করে পাপাচার,
(*৭৮)জীবন্মুক্ত রহি ভবে, করে কর্মক্ষয়। (*৭৮)
(*৭৯)'আমি কর্তা' ভাবে যেই, পুনর্জন্ম লভে সেই(*৭৯),
যম দণ্ড হতে ত্রাণ নাহি তা'র হয়।
মন্দির নির্মাণ তরে, স্থান অন্বেষণ ক'রে,
শরীরে যে-দুখ মাগো করিলে প্রদান।
সে সব করুণা তব, দিলে ভাব(*৮০)ভক্তি নব,
বুঝালে মন্দির হবে কালে যথা স্থান।

বিশ্বে বস্তু যাহা সব, সকলি মন্দির তব,
মোর দেহ, মোর গেহ, তোমার মন্দির।
তবে কেন প্রয়োজন, নব মন্দির গঠন,
বুঝি না প্রেরণা কেন করিছে অধীর।
যাহা ইচ্ছা কর মাতা, কে বুঝিবে তব বার্তা,
অদম্য প্রেরণা মোর কর নিবারণ।
আমি এবে বৃদ্ধ অতি, শিথিল সব শকতি,
পৌরুষের (+) বল মোর অতি অকিঞ্চন।
কি হবে মন্দিরে মোর, গোনা দিন ভবে মোর,
নাহি কেহ দিব ভার তব পূজার্চন।
যদি ধাম প্রয়োজন, কর সব আয়োজন,
যাহে হয় চির তব সরল অর্চন।
ভবতারিণী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ,
'কৃষ্ণরঙ্গিণী'-উপাধি ধরিলে যতনে।
তেঁই যদি সৃজ ধাম, রাখিব উহার নাম,
মোর মাতৃনামে দিয়া গৌরব ভুবনে।
রামকৃষ্ণ কৃপা করি, স্তবের বচন ধরি,
যে-হেতু 'সুরেশ'-নাম নিলেন যতনে।
লভেন পিতা অর্চন, তাঁর নামের কারণ,
যদি জুড়ি সেই নাম মন্দির স্থাপনে।
তোমা ধনে আমি ধনী, সেই ধন চিন্তামণি,
আত্মারূপে হৃদে মোর বাস সারদার।
নাহি অন্য(*৮১) প্রয়োজন, তুমি করেছ মিলন,
মোর আত্মা-দেহ-প্রাণ বিলাস তোমার!

গীতা দেখিল স্বপনে, মোর মস্তক স্পর্শনে,
করিলে সারদা তুমি গো আশীর্বচন।
আর চেয়ে মুখ পানে, প্রেম অমৃত প্রদানে,
নিত্যানন্দ সার (*৮২) সুধা করিলে বর্ষণ।
আমার এক স্বপনে, স্বহস্তে পরিবেশনে,
দেখিলাম দিতেছ (*৮৩) মা প্রসাদ সারদা।
শত ধন্য নাম (*৮৪) তাঁর, দান যাঁর কৃপা-সার,
বাঞ্ছেন ঐ কৃপা (*৮৫)ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সদা।
আবার স্বপন ধরি, উচ্ছিষ্ট ভোজন করি,
হনুমান রূপে মোরে সখা-পদ দিলে।
আর সেলাম করিয়া, বালিকা রূপ ধরিয়া,
অভয়া ভবতারিণী পিতৃত্বে বরিলে।
দিলে-নিলে আলিঙ্গন, অনন্ত প্রেম চুম্বন,
আহা কিবা সুধামাখা সে-ক্ষণ আমার!
নহে তো উহা চুম্বন, ভব ত্রাণের কারণ,
সার্থক ভবতারিণী নাম গো তোমার!
কন্যারূপে ধ্যানে তাঁর, রামকৃষ্ণ সারাৎসার,
দেখা দিয়া বুঝালেন দোঁহে একাকার।
আর পিতৃপদ দিয়া, মোর সুত-সুতা হৈয়া,
মুখশোভা ধরিলেন মূত প্রেম পারাবার।
তুমি গুরু, তুমি ইষ্ট, সুত-সুতা রামকৃষ্ণ,
আত্মা-সখা-সুত-সুতা-পিতা-মাতা আর।
তোমার করুণা বিনা, এত সম্বন্ধ জমে না,
জোনাকির শক্তি কোথা চন্দ্র পাইবার?

দেখালে স্বপন ঘোরে, সাধনার ফল মোরে,
তব প্রেমে চরি আমি উলঙ্গ পাগল।
আর রামকৃষ্ণ প্রতি, মোর উর্জিতা ভকতি,
ভাসায় (+) আঁখিকে অশ্রু-নীরে অনর্গল।
মিথ্যা ভাবিলে স্বপন, দিলে দুই দরশন,
শিব-(*৮৬)কালী-কৃষ্ণ রূপ ধরি এক বার।
পুনর্বার হলে কালী, জ্যোতিঃ(*৮৭)সর্বদেহে ঢালি,
সংশয় স্বপনে চির দূরিলে আমার।
কৃপায় করিলে দান, শিবলিঙ্গ তত্ত্বজ্ঞান,
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উহা বিশ্বাধার।
বিশ্বের সর্ব ঘটন; শিব-শক্তির রমণ,
আর পুরুষ-প্রকৃতি সবে একাকার।
আছেন যুগলরূপে, শিবলিঙ্গে বিশ্বরূপে,
অবতার যত—রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা।
ভেদহীন সবে তাঁরা, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
ব্রহ্ম প্রেরণায় কিন্তু তব কার্যে বাঁধা।
শিব-শক্তির রমণ, চিন্তে যেই অণুক্ষণ,
হয় না তাহার আর বিশ্বে দ্বৈতজ্ঞান।
ভাবে সে'ই শিব-শক্তি, আর লভে প্রেম-ভক্তি,
যথা দৃষ্টি পড়ে তথা হয় আত্ম-জ্ঞান।
অতি কুট আয়োজনে, শিবলিঙ্গের রমণে,
কালীঘাট পটে মাগো নিলে গৃহে স্থান।
উহা এবে পীঠ-স্থান, যেন কাশী মূর্তিমান,
পুস্তক রচন তরে তব অনুষ্ঠান।

তোমার পাশেতে বসে,   লিখি পুস্তক অবশে,
    শিব সহ ক্রীড়া তব করে জ্ঞান দান।
সমস্যা যখন হয়,   বহু ক্ষণ নাহি রয়,
    করিছ অনুমোদন চিহ্নি নানাস্থান।
পুস্তক নহে আমার,   সকলি তুমি উহার,
    না মানিবে মূঢ় সর্বে, দেহ-বুদ্ধি বশে।
জানি মাত্র অহঙ্কার,   তারা বড় অনুদার,
    না বুঝিবে তব কার্য—পুস্তক অবশে।
দিলে আদেশ আমায়,   (*৮৮)পূজা করিতে জবায়,
    ছলে বহু বরাভয়ে করিলে (*৮৯) ভূষিত।
কহিলাম তব ঠাঁই,   অত আমি নাহি চাই,
    একমাত্রে (*৯০) হয় সব অভীষ্ট পূরিত।
নাহি জানি কিবা ইষ্ট,   কিবা মোর অনভীষ্ট,
    আত্ম-স্থিতা তুমি মোর জেনেছি যখন।
নাহি অন্য প্রয়োজন,   ছার রাজ্য-ত্রিভুবন,
    জ্যোতিঃরূপী তুমি-আমি—বিশ্বের কারণ।
কিন্তু কথা শুনিলে না,   প্রেমে ক্ষান্ত হইলে না,
    পূজা আয়োজন পুনঃ করিলে জবার।
সেই ছলে দিলে বর,   মনোভাব বুঝি দড়,
    প্রেমভক্তি সহ লাভ ব্রহ্মজ্ঞান সার।
দেখাইলে কতবার,   চন্দ্রবিম্বের আকার,
    মোর রূপ, ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ—ললাট মাঝার।
বালকৃষ্ণ সুতধন,   মূর্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঘন,
    দেখালেন কৃপা বশে, তিনি ঐ আকার।

নাহি জানি হঠযোগ, কহে কাহে রাজযোগ,
বার বার প্রেমে তবু দিলে যোগ ফল।
কুণ্ডলিনী মা জাগিলে, ব্রহ্মদ্বার খুলি দিলে,
স্বতঃ হ'ল সুষুম্নায় শ্বাসানন্দ ফল।
ব্রহ্মমার্গে জ্যোতিঃ ঢালি, ষট্-চক্র ভেদী কালী,
সহস্রারে উঠি ফণা সম্মুখে ধরিলে।
রাখি গলে গোলাকার, চন্দ্রজ্যোতিঃ সুধাধার,
ত্রিকোণে উহার মাঝে ব্রহ্মে প্রবেশিলে।
ত্রিকোণ ব্রহ্মের স্থান, যাহে রহি ব্রহ্মজ্ঞান,
লভেন যোগী হইয়া সমাধি মগন।
সমাধি মোরে দিলে না, যাহা অকালে হয় না,
বাকি মোর তব কর্ম করিতে সাধন!
উক্ত স্থানের বর্ণন, আগম করে বারণ,
সেই বিধি করিলাম আমি অবহেলা।
নাহি ইথে কোন ভয়, তুমি যে মোর অভয়,
সাক্ষী ব্রহ্ম আমি ভবে, সব শক্তি মেলা!
নাহি বুঝি এই তত্ত্ব, নর অহঙ্কার মত্ত,
লভে জন্ম বিশ্ব মাঝে কর্মফলাধীন।
ইন্দ্র শক্তি, চন্দ্র শক্তি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর শক্তি,
এই কথা মানি নর নহে যমাধীন।
বার বার কহি আমি, কিছুই চাহিনা আমি,
জানি তুমি দিবে মোরে যাহা দরকার।
লহ প্রেম উপহার, মাগো, তুমি যে আমার!
সব কিছু আর! ওগো, আমি যে তোমার!

(১০)—বন্দনাটিতে (+) চিহ্নিত স্থানগুলি প্রক্ষে, আর * চিহ্নিত স্থানগুলি (৭৪-৯০) পাণ্ডুলিপিতে অবশে চিহ্নিত—(৯) পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

গীতা-সারদা-বিবেকানন্দ

গান।

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল. বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি।
গুরুপদ ধারণ, আত্ম সমর্পণ, মহা হ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দুরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান; সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী।

বিষয়—গীতার বিধবা-বেশিনী সারদেশ্বরীর দ্বারা প্রদর্শিত একটি দুর্গম পথ অতিক্রম কালে, তাঁহার সহিত অতি রূক্ষ ব্যবহারের পরিবর্তে সুমিষ্ট ব্যবহার প্রাপ্তি, তৎপরে তাঁহার সহিত এক মনোরম, সুবৃহৎ, শ্বেত-প্রস্তর গঠিত ও নির্জন প্রসাদে প্রবেশ ও সারদেশ্বরীর তিরোধান, তথায় মাত্র একটি বালককে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে হিন্দী স্তবে নিযুক্ত দর্শন ও শৃঙ্খল মোচন, বালকটির শিশুর আকার ধারণ এবং বাৎসল্য ভাবে গীতার তাহাকে ক্রোড়ে লইবার উপক্রম কালে. শিশুটির পরিবর্তে বিরাটাকার স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও গুরু গম্ভীর স্বরে নিজ পরিচয় দান— ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—গীতার শ্বশুর বাড়ী—৫১/৩ রামকান্তবসু ষ্ট্রীট, বাগবাজার— 'নব-বৃন্দাবন' নামক মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

কাল—আন্দাজ শেষ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭—গভীর রাত্র।

কন্যা গীতা নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিল—

"হঠাৎ মনে হইল যেন কোথায় আমি কাহার নিকট যাইতেছি, অথচ কিছুই জানি না। যাহার সঙ্গে যাইব, তিনি মধ্যবয়স্কা বিধবা, শ্রীমার মত আকৃতি

—• অবশে কালির বড় দাগে ও ছিদ্রে কাগজের চিহ্নিত স্থান (৯১)।

পথটি যে কি দুর্গম, তাহা বর্ণনাতীত—ঘন কাদায় ও জঙ্গলে আবৃত। দেখা দূরের কথা, কর্ণেও কখন ঐরূপ রাস্তার বিষয় শুনি নাই। অতি কষ্টে পথে যাইতে যাইতে স্ত্রীলোকটিকে এইরূপ ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম—'তুমি কি রকম লোক গা! এই রাস্তা দিয়া আমি কি চলিতে পারি? আমার বড় ভয় করছে, তুমি শীঘ্র করে নিয়ে চল কোথায় যাবে।' সঙ্গিনীটি আমার ভর্ৎসনায় ক্রোধ না করিয়া স্নেহভরা হাস্যে বলিলেন—'পাগলী! (আমাকে পিতৃ-সম্বোধনের অনুকরণে!) ভয় কি? আমি তো সাথে রয়েছি, এই তো এসে পড়লুম! সামনে ঐ যে বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে তোকে নয়ে যাব।' কিছুক্ষণ পরেই ঐ বাড়ীতে উভয়ে পৌঁছাইলাম, কিন্তু তাহার পর সঙ্গিনীটিকে দেখিতে পাইলাম না। অত বড় বাড়ী আমি কখনও দেখি নাই। সমস্ত পাইকপাড়ার অপেক্ষাও উহা অধিক বিস্তীর্ণ হইবে। উহা অতি মনোরম ও শ্বেতমর্মর নির্মিত, কিন্তু এত জনশূন্য যে, উহাতে মাত্র একটি প্রায় অষ্টম বর্ষীয় বন্দী বালক ভিন্ন কাহাকে দেখিলাম না। তাহার হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু সে আপন মনে হিন্দী স্তব গান করিতেছিল, যাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ছেলেটিকে দেখে বড় দয়া হইল এবং তাহার বাঁধন খুলে দিতেই, সে একটি প্রায় আট মাসের মনোহর শিশুর আকার ধারণ করিল। অবাক্ ভাবে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া, তাহাকে পুত্রস্নেহে কোলে লইবার দুর্দম ইচ্ছা হওয়াতে হাত বাড়াইবার মাত্র, সে—*অবশেষে কালির বড় দাগে ও ছিদ্রে কাগজের চিহ্নিত স্থান (৯২)—*অদৃশ্য হইল এবং তৎস্থানে একটি বিরাটাকার পুরুষ আবির্ভূত হইয়া আমাকে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—'আমি সেই বিবেকানন্দ'"।

তৎপরে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

২। গীতার আত্মজা দুর্জ্ঞেয়া আদ্যাশক্তি দুর্গার, বা সারদার, দ্বারা প্রকটিত এই স্বপ্নটির গূঢ়ার্থ আবিষ্কারের শক্তি আমার কোথা? উহা গীতার কর্মফল প্রকাশক এবং যথাকালে যথোচিত ভাবে প্রাকৃত অভিব্যক্তি লাভ করিবে। আমার অনুকরণে, সারদার গীতাকে 'পাগলী' বলিয়া সম্বোধন, তাঁহার গীতার—*অবশেষে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (৯৩)—*প্রতি বাৎসল্য-স্নেহ প্রকাশক। আত্মার এই সুদুর্লভ বাৎসল্য-স্নেহ প্রাপ্তি, সাধনার শেষ কথা এবং গীতার এই সাধনা-হীন অযাচিত আধ্যাত্মিক বিভূতি লাভ, তাহার পুনর্জন্ম নিবারক! এইরূপ করুণা, অতুলনীয়া 'আমার মাকে'ই' সাজে! কে এই জমাট—প্রেমময়ী 'আমার মা'-র' মহিমা বুঝিতে সক্ষম? একাধারে তিনিই দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, দশ মহাবিদ্যা

ও নির্বাণশক্তি পরাপ্রকৃতি ! বড়হড় অষ্টম বর্ষীয় সাধক বালকটি কে, তাহার শিশুরূপে পরিণতির পরে, গীতার তাহার প্রতি অদম্য বাৎসল্যভাব ও ক্রোড়স্থ করিবার প্রেরণা এবং তাহার বিবেকানন্দের আকৃতি ধারণই বা কেন, এই সব স্বাপ্ন ঘটনের গূঢ় রহস্য উদঘাটন সহজ নহে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তেদাত্মা, ঈশ্বরো-পম নর-নারায়ণ ঋষি, বিবেকানন্দ কি গীতার কোন পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করত এই ধরাকে পুনরায় ধন্য করিবেন? ইহা অসম্ভব নহে—কারণ, বিশ্ব-প্রেম বিগলিত, শিবাবতার বিবেকানন্দ জীবদ্দশায় বার বার বলিতেন যে, তিনি জীব সেবা ব্রতে ব্রতী হইয়া ধরায় পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণে আদৌ বিচলিত নহেন। যে-মহাপুরুষ জোর করিয়া বলিতে পারেন যে, 'We are the greatest God that ever was or ever will be' আর 'when will that blessed day dawn, when my life will be a sacrifice at the altar of humanity', তাঁহার ঈশ্বর-স্বরূপ জীব হিতোদ্দেশ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তাঁহার উক্ত ঘোষণা বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বার ইচ্ছোদ্ভূত, কারণ বিশ্বে কেহ কোন বিষয়ে স্বাধীন নহে। তিনি কি স্ব-প্রতিজ্ঞা বশতঃ, অপ্রাকৃত অতি মনোরম সাধারণের অগম্য নির্জন প্রাসাদে অবস্থিত হইয়াও, বাল্যাবস্থায় (+) সাধক বালকরূপে তাঁহার পরজন্মের মাতা গীতার দ্বারা দৃষ্ট হইয়া তাহার বাৎসল্য (+) [লাইনটি প্রথম প্রুফে কালির দাগে অবশে চিহ্নিত] স্নেহের সাফল্য বশতঃ শৃঙ্খলমুক্ত হইলেন? গীতাকে তাঁহার স্বপরিচয় দানের ভঙ্গী এই অনুমানকে যেন বাস্তবতা প্রদান করিতেছে, আমার মনে হয়। সেই জন্যই কি আমার গৃহস্থ পুস্তক লিখিবার স্থানের সন্নিকটে, কালীঘাটের মা কালীর ছবির ডাহিনে, যেন অবশে তাঁহার ছবি জগদম্বা আমার দ্বারা সংস্থাপিত করাইয়াছেন (অবতরণিকার দ্বিতীয় ছবি ও ৩০ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)? অবতরণিকা খণ্ডের প্রথম ছবিখানি হইতে তাঁহার বিশাল ঈশ্বরোপমত্ব সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি যে বিশ্ব-হিতোদ্দেশ্যে হিন্দু বেদান্ত ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদা শাস্ত্র সমূহের সার মন্থন করিয়া ও তাহাদের সহিত যোগলব্ধ তত্ত্বসমূহ মিশ্রিত করিয়া তিন খানি পুস্তকে ক্রিয়াযোগহীন ও আজকালকার সাধনোপযোগী প্রেমভক্তি বিশ্বধর্ম প্রচার করিতেছি এবং পরাপ্রকৃতি মহাকালীর নানা ঈশ্বর মূর্তির অভূতপূর্ব কৃপার কাহিনী গুলিকে এই পুস্তকে প্রচার করিতে যাইতেছি, সেই পুস্তকগুলির—এবং যদি তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেমভক্তি উন্মেষক মন্দির বরাহনগরে (বেলুড় মঠের গঙ্গার পূর্ব তীরে) নির্মাণে সক্ষম হই, তাহার—আমার অবর্তমান কালে পরিচালনার উদ্দেশ্যে, বিবেকানন্দরূপী গীতার কোন পুত্র কি জগদম্বার

নির্বাচিত—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১৪)—একটি আমার উপযুক্ত প্রতিনিধি? এই 'নির্বাচিত' শব্দটি লিখিবার কালে অবশে কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে চিহ্নিত হইল এবং আমার অনুমান যে সত্য তাহা যেন জগদম্বা আমাকে বুঝাইলেন। শিবরূপী বিবেকানন্দ পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা কখনও পূর্বে শুনি নাই; তবে কৃষ্ণরূপী ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে শীঘ্র পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন ইহা তাঁহার উচ্চারিত বাণী! বিবেকানন্দের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, জটাজুটধারী শিব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধীরে একটি শিশুরূপে তাঁহার ক্রোড়াশ্রিত হইলেন। পরে (একটি শরদিন্দুর ও অন্যটি আমার) স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রকটিত আমাদের উপর স্বাপ্ন কৃপা দুইটি কাহিনী আলোচনা হইবে।

৩। উক্ত স্বপ্নের প্রায় দশ সপ্তাহ মধ্যে (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল), গীতার কঠিন প্লুরিসি রোগ হইয়াছিল এবং এইরূপে তাহার স্বাপ্ন দুর্গম পথটির প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি হইয়াছিল। চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রায় সাড়ে চারি মাস পরে সে সুস্থ হইয়াছিল। এইরূপে সারদার স্বাপ্ন অভয়, প্রাকৃত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। এক সময়ে রোগ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল (গীতার স্বাপ্ন ক্রোধের (+) প্রাকৃত অভিব্যক্তি) যে, শরদিন্দু অর্চনার কালে বিশেষ দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার (+) [লাইনটি প্রথম প্রুফে কালির দাগে অবশে চিহ্নিত] গুরুদেবী সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গীতা বাঁচিবে কি না। মা ছবির বাম হাত নাড়িয়া শরদিন্দুকে ভয় করিতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু শরদিন্দু তাঁহাকে সঠিক না বুঝিয়া অনেক কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম যে, খারাপ ফল হইলে মা সাড়া দিতেন না, কিন্তু শরদিন্দু সেই আশ্বাস গ্রাহ্য করেন নাই। সুস্থ হইবার প্রায় দশ মাস পরে—শনিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ (৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৫), স্থানীয় রাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট, কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে—গীতা 'নব-বৃন্দাবন' মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ৫১।৩, রামকান্ত-বসু ষ্ট্রীটবাসী দত্ত বংশীয় তাহার প্রথম একটি পুত্র (পিতা—অরুণকুমারদত্ত) আমার ৫০১ডি, বাড়ীতে প্রসব করিয়াছিল। দত্ত-বংশীয় বিবেকানন্দের জন্মতিথিও কৃষ্ণা-সপ্তমী। শিশুটি এখন ভীষণ দুরন্ত, চঞ্চল ও খেয়ালী – যেন এক ডাকাত! স্বপ্নটির শেষাংশ এক্ষণে ভবিষ্যতের গর্ভেই রহিল। নর-নারায়ণ ঋষি, বিবেকানন্দ যে আমার দৌহিত্র রূপে ধরায় অবতরণ করিতে পারেন, ইহা আমার সুদূর কল্পনাতীত! তবে, 'আমার মা' সারদার দ্বারা প্রকটিত কোন স্বপ্ন যে মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা হইতে পারে ইহাও আমি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারি না।

৪। উক্ত শিশু-সম্বন্ধীয় দুইটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য—কেননা, উহারা আমার বাল্য জীবনের দুইটি কাহিনীর সহিত উপমেয় (অবতরণিকা, ২৪ (২) ও (৪) অনুচ্ছেদ) এবং বিবেকানন্দ আমার স্বাপ্ন-সখা (৭৫ পর্ব)।

(১) তাহার প্রায় আট মাস বয়সে, একদিন দুপুরবেলা গীতা তাহাকে ত্রিতলস্থ ঘরের দরজার নিকটে বসাইয়া খাটের উপর তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় বোধ করিল যে, তাক হইতে জিনিসপত্রাদি কে নামাইতেছে। চক্ষু চাহিয়া সে দেখিয়াছিল যে, একটি হনুমান উহা করিতেছে এবং অন্য একটি হনুমান শিশুটির সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। তখন গীতা ভয়ে শিশুটিকে লইয়া বাহিরে গিয়া চাকরকে ডাকিয়াছিল। দ্বিতীয় হনুমানটি কি আমার গুরুদেব ? ইহা অসম্ভব নহে, কারণ সীতাদেবীর বরে তিনি অমর।

(২) তাহার প্রায় চারি বর্ষ বয়সে, সিনেমায় অভিনীত ধ্রুবের গল্প তাহার জেঠাইমার নিকট স্নানকালে শুনিয়া, সে অনবরত কাঁদিতে কাঁদিতে ভোজন ত্যাগ করিয়াছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল—'আমি ধ্রুবের জন্য কাঁদিতেছি…আমি হরিঠাকুরের কাছে যাব।' সারাদিন সে এইরূপে মাঝে মাঝে কান্নায় কাটাইয়াছিল এবং যৎ-সামান্য আহার করিয়াছিল।

গীতা-সারদা-বিবেকানন্দ

প্রণমি সারদামণি, অহেতুকী কৃপা-খনি,
মোর আত্মা, মোর প্রাণ, দুর্গা বিশ্বাকারা।
কত গুণ ধর মাতা, কি গাহিব তব গাথা,
নিতান্ত অবোধ গীতা, তুমি বিশ্বাধারা।
স্বপন সৃজন ক'রে, মোর আত্মার অন্তরে,
চিদাকাশে কর্মফল মোর প্রকটিলে (*৯৫)।
দুর্গম পথে আমার, করিয়া কৃপা অপার,
সঙ্গিনী হইয়া, কত লাঞ্ছনা সহিলে।
পরে অতি মনোহর, (*৯৬) দিব্য প্রাসাদে মর্মর,
লয়ে গিয়া মোরে তুমি হলে তিরোধান।
হেরিনু তথায় এক, আট বর্ষের বালক,
শৃঙ্খলিত-হস্তে বন্দী, গায় হিন্দী গান।

দয়া উদ্রেকে (*৯৭)আমার, খুলিতে শৃঙ্খল তা'র,
ধরিল সে রমণীয় শিশুর আকার।
চাঁদ মুখ নেহারিয়া, পুত্রস্নেহে বিগলিয়া,
ক্রোড়েতে লইতে—হস্ত করিনু প্রসার।
তখনি সে তিরোহিল, দীর্ঘ আকার ধরিল,
ঘোর রবে নিনাদিল, সে 'বিবেকানন্দ' (*৯৮)।
স্বপন দূর হইল, চিন্তা মোর উপজিল—
'মোর গর্ভে জন্মিবেন কি বিবেকানন্দ'!
না হয় বিশ্বাস মোর, হেন ভাগ্য আছে মোর,
যাহে তুমি পুত্র রূপে হবে প্রকটন।
তথাপিও যে-স্বপন, সারদার আয়োজন,
ফলহীন হতে পারে বুঝি না এমন।
তাঁহার ইচ্ছার বশে, ফিরে মক্ষিকা অবশে,
তৃণসম পালে বিশ্ব তাঁহার বিধান।
কৃপায় তিনি দিলেন, ভাব-সন্তান নরেন,
সেই ভাবে চিন্তি এবে সারদার দান।
হতে দাও হবে যাহা, বিফল(*৯৯) ভাবনা তাহা,
হউন, বা না হউন—তিনি প্রকটন।
বিবেকানন্দ, আমার ভাবসুত স্নেহাধার,
না হবে বারণ কভু! কে করে বারণ?
যদি প্রকটিত হও, মোর গর্ভে জন্ম লও,
কিবা জানি কোন্, সেবা হবে যোগ্য তব।
মাতা তব বুদ্ধিহীনা, (*১০০) নিতান্ত অবোধ দীনা,
করহ উপায় তাত! বুঝি এই সব। (৩৬)

(১১)—(৯৫) হইতে (১০০) চিহ্নিত স্থানগুলি অবশে কালীতে জল পড়িয়া পাণ্ডুলিপিকে চিহ্নিত করিয়াছে।

যতীন-কালিকা

বিষয়—কালীঘাটের মা কালীর আমার বাতরোগ শয্যায় তত্ত্বাবধান।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৭।

১৫ পর্বের ২ অনুচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে যে, আমি বৈদ্যনাথ হইতে ফিরিবার পর—অর্থাৎ, প্রায় ১৯৪৬ সালের মধ্য হইতে—পুস্তক লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। তজ্জন্য, ঐ সময় হইতে প্রায় মধ্য অক্টোবর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, নব পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। ১৯৪৭ সালের দেবীপক্ষের তৃতীয়া বা চতুর্থী তিথি হইতে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিনের মধ্যে (২৯শে অক্টোবর) অবতরণিকা খণ্ডের একমেটে প্রথম পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে, পুনরায় (৪৬ পর্ব দ্রষ্টব্য) কঠিন বাতরোগাক্রান্ত হইয়া গৃহ মেঝে শয্যাশায়ী হইয়া প্রায় তিন সপ্তাহ চলৎশক্তি হীন ও পুস্তক প্রণয়ন বন্ধ করিতে বাধ্য, হইয়াছিলাম। এইবারেও পূর্বের ন্যায় উক্ত রোগকালে, কালীঘাটের মা সদা সর্বদা সাথে সাথে ফিরিতেন—যেন প্রেমময়ী মা'টি আমার রোগে কাতরা হইয়া ছায়ামূর্তিতে রুগ্ন পুত্রকে রোগশয্যায় তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এই ভাব! অনেক সময়ে দেখিতাম উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্ত তাঁহার ত্রিনয়ন আমার চক্ষুর মাত্র প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চ ব্যবধানে বর্তমান এবং কখন কখন বা উহারা উহাতে মিলিত হইত। ১৬ই নভেম্বর, কার্তিক পূজার দিনের রাত্রে, বাম হাঁটুতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া যখন তাঁহাকে কষ্টের বিষয় জানাইলাম, তখন তিনি অন্তর্হিতা হইলেন ও ললাটে ভ্রূদ্বয় মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে একবার জ্যোতির্ময়ী চন্দ্রমণ্ডলের আকারে দর্শন দিয়া যেন বুঝাইলেন যে, ঐ জ্যোতিঃই আমি—অতএব, দেহাত্ম-বোধ ত্যাজ্য —'**ন সৌখ্যং ন দুঃখং**'...**চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্**।' তৎপরে মনে শান্তি লাভ করিয়া যথা সম্ভব নিদ্রিত হইয়াছিলাম প্রতিশ্রুতা প্রেমভক্তি-দায়িনী কালীঘাটের মা উক্তরূপেই আমার তাঁহার উপর প্রেমভক্তি বর্ধিত করিতে লাগিলেন! সুখ-দুঃখাদি মনেরই ধর্ম। ব্রহ্মস্বরূপ জীবাত্মা, দেহমনাদির নৈকট্য বশতঃ, তাহাদের ধর্ম নিজকে আরোপ করিয়া যেন কর্তা বা ভোক্তা বোধ করেন। বাস্তবিক, তিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ।

অদ্বৈত-কালিকা

বিষয়—কালীঘাটের মা কালীকে আমার দেহে সর্বাবয়বে মিলিতা দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

পূর্ব পর্বে বর্ণিত বাত রোগের উপশান্ত অবস্থায়, পৌষ মাসের লক্ষ্মী-পূজার দিবসের রাত্রকালে, '**সর্বদা কালীরূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ**' এই কালিকোপনিষদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অভিব্যক্তির স্বরূপে বেশ স্পষ্ট ভাবে বোধ হইল যে, মা'টি আমার দেহের সর্বাবয়বে পূর্ণভাবে মিলিতা হইলেন। তাঁহার দুইটি চক্ষু, তারকার ন্যায় জল্ জল্ ভাবে, আমার দুইটি চক্ষুর সহিত অভেদ রূপে ও তৃতীয় চক্ষুটি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান অবস্থায় আমার ললাটে, কিছুক্ষণ অবস্থিত দেখিয়াছিলাম। ৩ পর্বে বর্ণিত কাহিনীতে দুর্গাদেবী যেন দেহের ভিতরে মিলিতা হইয়া যাইলেন, এই বোধ হইয়াছিল। এইরূপে আমার অভেদ আত্মা দুর্গা ও কালী দুই রূপে, আমার সর্বদেহেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সহিত ঐক্য স্থাপন করিলেন। এইরূপ হইবারই কথা—কারণ, সারা বিশ্বই শিবশক্তিময় পদার্থ হইত উদ্ভূত—'রামের রমণ ছাড়া কোন বস্তু নাই'। এই সকল পদার্থের অভিব্যক্তিও শিবশক্তিময়। অতএব, মানবের দেহেন্দ্রিয়াদিতে কোনরূপ কর্তৃত্ববোধ অলীক। জগদম্বার এই দেহ-কর্তৃত্ব মুখ্য নহে। তাঁহার আত্মরূপে অধ্যস্ত পুর্যষ্টকের (ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি বাসনা, কর্ম ও অবিদ্যা) স্পন্দনের দ্বারাই তিনি মানবের ভোগ দেহ গঠন করেন এবং এই স্পন্দনই সমস্ত দেহ কার্য মুখ্যরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। পুর্যষ্টকের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ জগদম্বা—সেই জন্যই, তিনি সারা বিশ্বরূপিণী। এই প্রসঙ্গে, ২৬ পর্বে ৭ অনুচ্ছেদ বিশেষ দ্রষ্টব্য। দেহাত্মবোধ ত্যাগ না করিয়া 'আমি ব্রহ্ম, বা কালী' এইরূপ চিন্তা করা, বা মুখে বলা, ঘোর নরকগতি দান করে, (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১ অনুচ্ছেদ)। 'অহং'-ভাব ত্যাগী ব্যক্তি কিন্তু, নিজের ন্যায় সারা বিশ্বকেই, ব্রহ্ম বা কালী রূপে চিন্তা করিবেন—কারণ, ইহা সত্য! নিজেকে কালীতে বা ইষ্ট দেবতাতে, বা গুরুতে মিলাইয়া চিন্তা করিলে, 'সোহহং' ভাব প্রস্ফুটিত হয়, দেহমনাদির সর্ব—***অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০১)**—*স্পন্দন, বা বিকার, তাঁহাতে অর্পিত

হইয়া অহঙ্কার বিগলিত হয় ও তাঁহার বিশ্বরূপ অনুভূত হইতে থাকে। এই অখণ্ড স্বরূপের পূর্ণ বোধ হইতেই, সিদ্ধি এবং পরমেশ্বরত্ব ও প্রেমভক্তি লাভ হয়। তাদৃশ ব্যক্তি বিশ্বে সর্বপ্রধান (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৪ ও দশম অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ)। এইরূপ সিদ্ধিতে দেহজ্ঞান লোপ পাইয়া উহা শূন্যাকারে পর্যাসিত হইতে পারে এবং তখন 'আমি নিরাকার, দেহহীন, চিন্মাত্র ব্রহ্ম' এই ভাব স্বতঃই স্ফুরিত হইতে থাকে। না হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ কালী বা ইষ্টদেব ব্রহ্মসহ অভেদ। ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন বিশ্বে কোন বস্তু নাই। 'গুরু ও ইষ্টদেবই ব্রহ্ম'—এই ভাব বিনা সাধনা ফলপ্রদা হয় না। খুব উঁচু স্তরের সাধক, ভক্তির পথ ধরিয়া থাকিলে, ভক্তি ও জ্ঞান উভয় বস্তুই লাভে সমর্থ হন। প্রেমভক্তির চরম অবস্থায়, যখন নিজ চক্ষুর ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আত্মা ও শক্তি কালী এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়, তখন সাধক অন্তর্দৃষ্টি রূপ পরম বিভূতি লাভে সমর্থ হইতে পারেন। যখন এই বিশ্বে সমস্তই শক্তির লীলা এবং কাহারও কোন বিষয়ে, ভাল-মন্দ, যাহাই—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০২)—*হউক না কেন, একবিন্দুও নিজ শক্তি নাই, তখন তাঁহাকে সর্বার্পণ করিয়া সমস্তই সাক্ষীর ন্যায় গ্রাহ্যাতীত অবস্থায় পরিণত করাই সুবুদ্ধি—বিশেষতঃ, যখন তত্ত্বজ্ঞানের বলে আমরা জানি যে, বাহ্য বিশ্ব ভ্রান্তির বিলাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে, কেননা আকাশে গাছ, পাথর, ইত্যাদি জন্মিতে পারে না। Cultivate the attitude of a witness in everything—ইহা একটি বুদ্ধিসার! ইহাতে জীবাত্মা অতি সহজে অন্তর্যামী আত্মা ও ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব লাভ করেন, কারণ তাঁহারা ঐরূপ। বিশ্বে সমস্তই শিবের অনুমোদনে, বা তাঁহাকে সাক্ষীরূপে রাখিয়া, শক্তি সঞ্চালিত করিতেছেন। উভয়ে একাত্মক—সেই জন্য, শক্তির কার্যই শিবের এবং শিবের কার্যই শক্তির, বলা হয়। সেই জন্য, মানব যখন নিজেকে কালীর সহিত মিলিত করিয়া সর্ব বিকার, 'শয়ন, চিন্তন, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন, ইত্যাদি ক্রিয়া, তাহার দেহস্থ কালীরই ক্রিয়া মনে করে, সে সর্বার্পণে সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'ঠিক ঠিক দেখিতে পাই, মা যেন নানা রকম চাদর মুড়ি দিয়া নানা রকম সাজে ভিতর হইতে উঁকি মারছেন; দেখি কি যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, সব তাঁর ভিন্ন রকমের খোলগুলা, আর সবের ভিতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন।' বিশ্বে গাছের ছোট পাতাটি হইতে বৃহত্তম বস্তুর সর্ববিধ স্পন্দন শিবকে সাক্ষী রাখিয়া, বা তাঁহার অনুমোদনে, শক্তির দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে। জীব থাকিয়াও নাই।

ষড়ভীন-কালিকা

বিষয়—দীপ্যমান খড়্গ হস্তে কালীঘাটের মা কালীর স্বাপ্ন-প্রকটন ও আমার চীৎকারে শরদিন্দুর জাগরণ।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

রাত্রে স্বপনে দেখিলাম যে, কালীঘাটের মা কালী দীপ্যমান খড়্গ বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করত জাগ্রত হইলাম। শরদিন্দুরও সেই চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

২। কালিকার খড়্গ জ্ঞানের প্রতীক। দীপ্যমান খড়্গ আমাকে দেখাইয়া মা বোধ হয় জানাইলেন যে, তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার —* **অবশেষে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৩)**—*আমার নিকট তখন হইতে তিনি উন্মুক্ত করিলেন। এই 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' শব্দটি, লিখিবার কালে কাগজের স্বাভাবিক দাগে অবশে চিহ্নিত হইল এবং আমার অনুমান যে সত্য, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইলেন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান, বা সিদ্ধি, লাভ হয়। প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী 'আমার মা'টি,' অযোকে তাঁহার সমস্ত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করিতে পরাঙ্মুখ নহেন! অষ্টাধিক একশত বরাভয় আমাকে দিতে আসিয়া মা আমার ইচ্ছায় সমস্ত দিতে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন (৩২ পর্ব)। কিন্তু তথাপিও বাছিয়া বাছিয়া আমাকে একটি একটি করিয়া তৎপরে আরও কত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য অযাচিত ভাবে দিলেন (৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৫ ৪৭ পর্ব, ইত্যাদি)। তিনি জ্ঞানবানের অতিশয় প্রিয় এবং জ্ঞানবানও তাঁহার অতিশয় প্রিয়—কেননা, উভয়ে একাত্মক। মানুষ বুঝে না যে, তাঁহার নিকট কিছু না চাহিয়া যদি সে তাঁহাতে নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সবই লাভ হইতে পারে। সদা যাচক কখনও দাতার প্রীতিভাজন হইতে পারে না। যখন আমরা কি ভাল বা কি মন্দ তাহার কিছুই বুঝি না, তখন ঈশ্বরে নির্ভরশীল হওয়া অপেক্ষা আর অন্য উপায় কি? যাহা আজ ভাল, তাহা কাল মন্দ এবং যাহা আজ মন্দ তাহা কাল ভাল। ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিল যে সে অমর, কিন্তু ফল বিপরীতই হইয়াছিল। পিতামাতাও পুত্রের সদা 'দেহি-রব ঘৃণা করেন।

যতীন-নারায়ণ

বিষয়—কোন লোকের হৃদয় দেশের বাহিরে নারায়ণ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে রহিয়াছেন, এইরূপ স্বপন।

কাল—১৩ই এপ্রেল, ১৯৪৮ (চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৫৪)।

আমি গভীর রাত্রে নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন একটি লোকের (চিনিলাম না কে) হৃদয়দেশের বাহিরে নারায়ণ রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্বদেহ ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত।"

২। তৎপরে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। যদিও লোকটিকে স্বপ্নে চিনিতে পারি নাই, তথাপিও পরে বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই সে (দুইজন) কে—কেননা, সেই সময়ে ও কিছু পরে দুইটি স্থান হইতে দুইটি বিশেষ পরিচিত লোকের তাহাদের * আত্মীয়দিগের প্রতি বিশেষ নৃশংস ব্যবহারের সংবাদ*—**চিহ্নিত দুইটি স্থান কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে অবশে রঞ্জিত (১০৪)**—প্রায় প্রাপ্ত হইতেছিলাম। দুইটি লোক বলিয়া, নারায়ণদেব আমাকে অনির্দিষ্ট ভাবে একটি লোক (একই দুই, ও সারা বিশ্ব!) দেখাইয়া বুঝাইলেন যে তাহাদের হৃদয়স্থ আত্মা তিনি ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত! হায় অর্থ, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দেহাত্মবোধ এবং অবিচার ও অজ্ঞান! পরপীড়ন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করত নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে আহুতি দানে বড় হওয়া যায় না, বা নারায়ণ পূজা ও হরিনাম করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভ করা যায় না! নারায়ণাবতার কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে এই বিষয়ে এই ভাবে বলিতেছেন (শ্রীমদ্ভাগবত দ্রষ্টব্য)—'আমি সর্বভূতেরই আত্মা, এই হেতু সকল সময়ে সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, কিন্তু মূঢ় মানব আমাকে সেরূপে না জানিয়া প্রতিমাদিতে পূজা করে। যে-ব্যক্তি সর্বভূতের হৃদয়শায়ী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার ফল লাভ হয়। আর যে ভেদদর্শী অভিমানী অন্যের সহিত শত্রুতা করে, সে আমাকেই দ্বেষ করে এবং তাহার মন কখনও শান্তি পায় না। তবে প্রতিমাদি পূজা একেবারে বিফল নহে। যতদিন না মানব আমাকে তাহার হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারে, ততদিন প্রতিমা পূজা করুক; কিন্তু যে-মূঢ় আপনাতে ও অন্যেতে অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তাহাকে আমি মৃত্যু স্বরূপে ভয় প্রদর্শন করি। অতএব,

আমাকে সকলের অভ্যন্তরবর্তী ভাবিয়া পূজা করিবে, সকলকে সম জ্ঞান করিবে, সকলেরই সহিত মিত্রতা করিবে এবং পক্ষপাত রহিত হইয়া সাধ্যানুসারে সকলেরই সম্মান রক্ষা করিবে।' ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইভাবে বলিয়াছেন—'যিনি নিরন্তর মনুষ্যগণে মদীয় স্বরূপ চিন্তা করেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নিন্দা ও অহঙ্কার থাকে না···আমাকে ভাবনা করিয়া সমস্ত ভূতে কায়মনোবাক্যে যে আচরণ, আমি তাহাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া জ্ঞান করি···ঈশ্বরই বিশ্বরূপী হইয়া সৃষ্ট হন ও সৃষ্টি করেন, পালিত হন ও পালন করেন এবং সংহৃত হন ও সংহার করেন···প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা জগৎকে একাত্মক দেখিয়া কাহারও স্বভাব ও কর্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিওনা···দ্বৈত প্রপঞ্চ বস্তু নহে, সুতরাং তাহাতে উপাদেয় বা হেয়, কিছুই নাই এবং যাহা বাক্য দ্বারা কথিত ও মন দ্বারা চিন্তিত হয়, তাহাও মিথ্যা।'

৩। শিব-শক্তি (বা প্রকৃতি-পুরুষ) রূপী কর্মফল ও কর্মফল দাতা ঈশ্বর, যদিও শিব-শক্তিরূপী মানবকে কর্মফল দিবার নিমিত্ত অপরের দ্বারা নিপীড়িত করান, তথাপি পীড়কের কর্মফল উৎপন্ন করিয়া তাহাকে প্রতিক্রিয়া হইতে অব্যাহতি দান করেন না। সেই নিমিত্ত, যদি একজন নিজ কর্মফলেই অপরের নিকট হইতে ঘৃণিত ব্যবহার পায়, তথাপিও দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। ধর্মই বিশ্বে সকলের বন্ধু এবং তজ্জন্য সাধুগণ সদাই বিচারবুদ্ধিতে পক্ষপাত রহিত হইয়া ন্যায়পথে বিচরণ করেন। সর্ববিষয়ে কায়মনোবাক্যে অহিংসাই সার ধর্ম এবং যাহা সর্বতোভাবে হিংসাহীন ও ধারণা-সংযুক্ত (+) [প্রথম প্রুফে চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অবশে ছিদ্র-চিহ্নিত স্থান] তাহাই 'ধর্ম'। কায়মনোবাক্যে সদা সত্য অবলম্বনীয় হইলেও, দেশ-কাল পাত্র ভেদে উহা হইতে সামান্য বিচ্যুতি, 'অধর্ম' নহে (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৬ (৬) অনুচ্ছেদ)। পিতা, মাতা ও গুরু অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠতর মান্য কেহ নহে। স্ত্রীলোকের পতিই পরম গুরু। যে-ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য ও অসম্মান করে, তাহার সকল কর্মই বিফল হয় এবং ইহ ও পরলোকের সম্বল কিছুই থাকে না। ধর্মের দ্বারা সারা বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে এবং ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ধর্ম হইতেই হইয়াছে। এক ধর্মই সর্ববিধ কর্মের মঙ্গল নিদান। অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, বাসনা সূত্রে গ্রথিত এবং ধর্মাধর্মরূপ কর্মফলের বশে পরিচালিত। অবস্তু বা মায়িক হইলেও, পাপ-কর্ম বিষবৎ মানবের অনর্থকর। এই পাপকর্মের ক্ষয়ের নিমিত্তই সগুণ ঈশ্বরোপাসনা।

৪। রাজশাসন হইতে পরানিষ্টাচরণ জনিত অনেক পাপ নিরাকরণ হয়। বিশেষ অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত, ঈশ্বরে শরণাগতি, প্রেমভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও অহঙ্কার ত্যাগের দ্বারা স্বীয় অনিষ্টকর পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়। যে-সকল পাপী উক্ত নানাবিধ উপায়ে পবিত্রতা লাভ করে নাই, তাহারা ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলোকে নরকগামী, বা নানা নিকৃষ্ট যোনিগত হয়। যে-ব্যক্তি অধর্ম করিয়া আন্তরিক অনুতাপানলে দগ্ধ হয় এবং পরে মনকে সংযত রাখে, সে নামে মাত্র পাপফল ভোগ করে—অর্থাৎ, যাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্যাচার পরে যেরূপ পাপকর্ম ত্যাগ করে, সেইরূপেই সে সেই দেহে অধর্মযুক্ত হয়। যে-ব্যক্তি নিজ পাপকর্ম ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যক্ত করে, সে অধর্মমুক্ত হয়। দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া যথাবিধ দানও পাপ খণ্ডনের একটি উপায়—কিন্তু অপাত্র, নাস্তিক ও নিয়ত যাচককে দান, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল। পাপীদিগকে কর্মানুযায়ী শাসনের নিমিত্ত পরমেশ্বরের বিধানে অনন্তবিধ নরক সৃজিত। দেহাত্মবোধ কর্মফলের জনক। এই বোধ হইতেই, মানব গুণ ও কর্মের একটি পৃথক্ সত্তা লাভ করে এবং যেন নিজ মহান্ স্বরূপ হইতে, বিচ্যুত না হইয়াও, বিচ্যুত হয় ও কোটি কোটি জন্ম কর্মফলানুসারে নানা যোনি পরিভ্রমণ করে দেহাত্মবোধ ত্যাগী ব্যক্তির কর্ম বা কর্মফল নাই। সে ঈশ্বরকে সমস্ত কর্ম ও কর্মফল অর্পণ করিয়া, নির্ভয়চিত্তে সংসারে বিচরণ করে ও জীবন্মুক্ত হয়। ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গতি। নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও যে, কেবল নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তা করিয়া সর্ব পাপ মুক্ত হন ও অন্তিমে পরম গতি লাভ করেন, এইরূপ অনেক কাহিনী আছে। বিশ্বে এমন কোন পাপ কর্ম নাই, যাহা হরি নাম অগ্নিতে দগ্ধ না হয়। প্রয়োজন ঐকান্তিকতা, সদাচার ও ভেদজ্ঞান ত্যাগ। মুখ্য ভক্তিসাধন নববিধ—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥

যতীন-কালিকা-রামকৃষ্ণ

বিষয়—(১) রাত্রে শয়নকালে মা কালীর আবির্ভাব ও অভয়হস্ত সঞ্চালন করত অল্পকাল পরে তিরোভাব।

(২) গভীর রাত্রে পুস্তকের উন্নতি কল্পে রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রাপ্তির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৪ই এপ্রেল, ১৯৪৮ (নববর্ষারম্ভ. ১৩৫৫)।

উক্ত দিবস প্রাতে বারাণ্ডায় স্থিত শয্যা হইতে ঠিক গাত্রোত্থানের পূর্বে, মস্তকের উপরের দেওয়াল হইতে তিনবার 'টক্-টক্' করিয়া টিক্‌টিকির ডাক শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল। ঐ বৎসর, যেমন আধ্যাত্মিক ভাবে পুস্তক সঙ্কলনের জন্য আমার জীবনের একটি অতি সুবৎসর, তেমন সাংসারিক ভাবে কোন আত্মীয়ের আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক অভিচারাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত একটি বিশেষ দুর্বৎসরও বটে! তবে, ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়াও আমি শুভ ফলই লাভ করিয়াছিলাম এবং বিষকীটদষ্ট আমার সংসার তরু পরিশেষে রোগমুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে জগদম্বা অশুভের মধ্য দিয়াই তাঁহার ভক্তদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন।

২। রাত্রে শয়নের কালে ভবতারিণীদেবীকে ভাবে চুম্বনাদি করিয়া ও বামপার্শ্ববর্ত্তী করিয়া নিদ্রিত হইবার পূর্বে, তাঁহাকে এইরূপ বলিলাম—'মা! আজকাল আর তোমাকে (বা রামকৃষ্ণদেবকে) অপত্যস্নেহে আদরাদি করিতে পারি না, কারণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এত আধ্যাত্মিক পরম তত্ত্ব সমূহের জ্ঞান দিতেছ ও পুস্তক প্রণয়নে ব্যাপৃত রাখিতেছ যে, আমি আর উহাদের সামলাইতে অবকাশ পাইতেছি না। তজ্জন্য, আমি বড় দুঃখিত; তোমরা রাগ করিওনা।' তখন তিনি ছায়ামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, ডাহিন দিকের উর্দ্ধ বা অভয় হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে, অল্পক্ষণ পরে তিরোহিতা হইলেন। উহাতে আমি বুঝিলাম যে—*অবশে কাগজের দুইটি স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৫) —*আমাদের সম্বন্ধ যখন পাকা (৪৭ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ), তখন অনবকাশ হেতু তাঁহাদের আদরাদি না করিবার জন্য বাস্তবিক দুঃখের তো কোন কারণই নাই—বিশেষতঃ, যখন এই পুস্তক প্রণয়ন বড় সামান্য সাধনা নহে। পরে নিদ্রিত হইলাম এবং গভীর রাত্রে রামকৃষ্ণদেবের একটি স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া আরও নির্ভর হইলাম।

৩। উক্ত স্বপ্নটিতে বোধ হইল যেন হৃদয়স্থ অদৃশ্য রামকৃষ্ণদেব এইরূপ উপদেশ দান করিলেন—' যে-পুস্তক লিখিতেছ, তাহার জন্য নিজেদের ও অপরের অন্যান্য স্বপ্নাদি ক্রমে আরও পাইবে এবং যাহা লিখিয়াছ, তাহা স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ হইতেছে।' এই উপদেশের ফলে, প্রথম ভাগের প্রথম পাণ্ডুলিপির লিখিতাংশ অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলাম এবং পুস্তকটিকে সঙ্কুচিত আকার দিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলাম। উল্লেখযোগ্য একটি পরিবর্ধন 'স্বপ্নতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় (অবতরণিকা, ৯-১২ ও প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৪২-৪৩, অনুচ্ছেদ) —যাহা এই দ্বিতীয় ভাগের মূল ভিত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (১ পর্ব, ২ ও ১৮ পর্ব ৩, অনুচ্ছেদ)। অতএব, এই পুস্তকগুলি ঈশ্বরেচ্ছায় লিখিত হইতেছে এবং ইহার সর্ব খণ্ডেই চিহ্নিত স্থানগুলি ও এই পর্বে একই স্থানে ডবল চিহ্ন, তাঁহার অভূতপূর্ব অনুমোদন প্রকাশক। স্বপ্নটিতে যেন রামকৃষ্ণদেব আরও জানাইলেন যে, কাহিনীগুলির গৌণ উদ্দেশ্যই পুস্তক প্রণয়ন। জগন্মাতার নানা আয়োজনে আমার শয়ন গৃহস্থ শয্যার পার্শ্ববর্তী দেওয়ালে ও কুলঙ্গিতে এক অভিনব শিবলিঙ্গ মূর্তি সংস্থাপনের উদ্দেশ্য একই। তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা এই পুস্তকগুলির প্রণয়ন সহজ কার্য নহে। ঘোর-সংসারী আমি কেন এই দুরূহ কার্যের জন্য নির্বাচিত নিমিত্ত, তাহার কারণ কে নির্দেশ করিবে? স্বপ্নটিতে যে অপরের স্বপ্নের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা তদানীন্তন ৭৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বাসী হরিদাস জ্যোতির্নার্ণব মহাশয় হইতে আমি পাইয়াছি ও এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তাহাদের (সংখ্যায় পাঁচটি) উল্লেখ করিয়াছি। চতুর্থ খণ্ড সঙ্কলনের পূর্বাবধিই কাহিনী-গুলি ঘন ঘন আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহা হইতেছে না। এই ঘটনাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, কাহিনীগুলির 'মুখ্য' উদ্দেশ্য আমাদিগকে কৃপা প্রদর্শন এবং 'গৌণ' উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে আমাদের দ্বারা প্রচার করণ (পরিশিষ্টের পঞ্চম স্বপ্ন দ্রষ্টব্য)।

শরদিন্দু-সারদা-কৃষ্ণ

বিষয়—অর্চনার কালে শরদিন্দুর সারদাদেবীর ছবির দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন।

স্থান—শরদিন্দুর পূজা ঘর।

কাল—১৩ই মে, ১৩৪৮।

দুপুরবেলায় পূজার সময়, শরদিন্দু সারদেশ্বরীদেবীর ছবির দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাঙ্গ যেন মিলিত এইরূপ দর্শন লাভ করিলেন—যেন প্রকৃতি ও পুরুষরূপে উভয়ে মিলিত একটি যুগল মূর্তি! সারদেশ্বরী যে কৃষ্ণমাতা ইহা অ পর্বে আলোচনা আছে। কালী যে শিবমাতা ইহা প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ৩০ অনুচ্ছেদে উক্ত আছে। শরদিন্দুর ঐ কালে কয়দিন ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তাঁহার গুরুদেবী ও ইষ্টদেবকে যেন একত্রে মিলিত দেখিতে পান। দর্শনটি কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইল যে, রাধা-কৃষ্ণ ও সারদা-রামকৃষ্ণ অভেদ তো বটেই, তাহা ছাড়া কৃষ্ণই সারদা —অতএব, রামকৃষ্ণই, রাধা (প্রথম ভাগ, নবম অধ্যায়, ৪ (১) (খ) অনুচ্ছেদ)। হায়! হায়! কি তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা মধুর দর্শন শরদিন্দু লাভ করিলেন! যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী, তিনিই অন্নপূর্ণা, তিনিই শিব! সকলেই অভেদ ব্রহ্ম ও পরাপ্রকৃতি শ্রীদেবী। এই কারণে সারদাদেবী বলিতেন—"আমাকে রাধা বা কালী, যে-ভাবে ইচ্ছা চিন্তা করিও…কিছু না পার, কেবল 'মা' বলে ডাকিও"—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৬)। কোন্ গণ্ডমূর্খের কল্পনা বলে যে, ইঁহাদের ভিতর কেহ বড়, আর কেহ ছোট? হরি-হর-দুর্গা-কালী যে একাত্মা, ইহা কোন কোন তিন চারি বৎসরের শিশুও জানে, অথচ সাম্প্রদায়িকগণ ভেদবুদ্ধি বশতঃ তাহা মানিতে চাহেন না এবং সেই ভাব 'গুরু' রূপে প্রচার করিয়া দেশকে নরকে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। ঈশ্বর প্রসাদ বণ্টন করিয়া সেব্য, কিন্তু একদা শিব নারায়ণ-প্রসাদ সেবায় ঐ বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়া, দুর্গা দেবী ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, শিবের প্রসাদ যদি কেহ নারায়ণের প্রসাদের সহিত মিশ্রিত না করিয়া সেবা করে, তাহা হইলে সে এক জন্ম কুকুরত্ব লাভ করিবে। এই লোকশিক্ষাপ্রদ অভিশাপে শিব নারায়ণ অপেক্ষা ছোট হন নাই, কারণ—

বিষ্ণু-শিব-গঙ্গা-গৌরি এই চারিজন।
ভেদ নাই ভেদকারী পাতক ভাজন॥

২। কিছুদিন পূর্বে শুনিলাম যে, কোন সম্প্রদায়ে এইরূপ শিক্ষা যে, হরি বা গৌরাঙ্গের প্রসাদ ভিন্ন অন্ত কোন ঈশ্বর মূর্তির প্রসাদ অগ্রাহ্য ও অসেব্য। তত্ত্বজ্ঞান হীন গুরু এইরূপ অভেদ প্রকৃতি ও পুরুষে (২৬ পর্ব) ভেদজ্ঞানে, ঘোর দুর্দশাপন্নই হন!' শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের ভোগ অন্নাদি চতুর্ভুজা কালী বিমলা-দেবীকে নিবেদিত হইবার পরেই যে 'ব্রহ্মবস্তু মহাপ্রসাদ' নামে অভিহিত হয়, ইহা বোধ হয় উক্ত সম্প্রদায়ের জ্ঞান নাই। কৃষ্ণ ও কালী, পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে অভেদ ও একাত্মক এবং কস্মিন্ কালেও বিযুক্ত নহেন। সুতরাং, কৃষ্ণের ভোগান্ন কালীরই এবং কালীর ভোগান্ন কৃষ্ণেরই! অক্ষর ও শব্দব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণকে নিবেদিতান্নের যথার্থ ভোক্তৃ তাঁহার শক্তি, রাধা বা কালী—অতএব, কালীর ও কৃষ্ণের ভোগান্নে ভেদ কোথা? ভগবতী-গীতায় দুর্গাদেবী তাঁহার পিতা হিমালয়কে বলিয়াছিলেন—' অন্ত দেবতাভক্ত যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে সেই সেই দেব পূজা —*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৭)—*করে, তাহারাও প্রকারান্তরে আমারই পূজা করে···আমি সর্বযজ্ঞ ফলপ্রদায়িনী এবং সর্বময়ী ইহা বোধ থাকিলে, আর ভুল হইবে না...কিন্তু আমার রূপান্তর সেই সকল দেবতারই কেবল যাহারা ভক্ত, তাহাদের মুক্তি বহু কষ্ট সাধ্য—ভেদবুদ্ধিই ইহার কারণ···সচ্চিদানন্দময়ী একমাত্র আমিই সর্বাকাররূপা এবং দেবতাগণের দেহ আমার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।' মহানির্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন যে, যেমন বৃক্ষমূলে জল সেকে উহার শাখা প্রশাখাদির পুষ্টি সাধিত হয়, সেইরূপ ভগবতীর তুষ্টিতে সর্বদেব তুষ্ট হন। বাহ্য বিশ্বে কালী বা রাধা সর্বময়ী এবং শিব বা কৃষ্ণ সাক্ষীরূপে তাঁহাদের কার্য অনুমোদনকারী—যেমন সংসারে গৃহিণী ও কর্তা এক হইয়াও কার্যতঃ ভিন্ন! মন্ত্র—তন্ত্র বিশ্বে যাহা কিছু, সবই পরব্রহ্ম ও পরাশক্তি এবং তাবকব্রহ্মমন্ত্র হরিনামও সেইরূপ (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)। যে-কোন মন্ত্রের দ্বারা যে-কোন দেব বা দেবীর সাধনা কর না কেন, তাহাতে আত্মারই সাধনা হয়—সুতরাং, কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রকারান্তরে সকলের ইষ্টদেব, বা ইষ্টাদেবী। বহু পুণ্যফলে এই শক্তি জাগরিতা হইলে, সাধকের জন্মজন্মান্তরগত সঞ্চিত কর্মরাশি নাশ হয় এবং তাহা না হইলে ইষ্টদর্শন লাভ হয় না। অতএব, শক্তি দেবীকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য কোন দেব বা দেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভের, বা প্রসাদান্ন খাইয়া তাঁহার তুষ্টি লাভের, আশা বৃথা। নিজ ইষ্ট বা ইষ্টা, শক্তি দেবীরই ভিন্ন রূপ এবং সমস্ত শক্তির স্থায় সিদ্ধিলাভের শক্তির কেন্দ্রও আত্মাশক্তি।

কৃষ্ণ ও শিব কুণ্ডলিনী শক্তির বলেই সজীব ও সক্রিয়! সারদাদেবী, কালী, রাধা, সরস্বতী, ইত্যাদি সকলেই কুণ্ডলিনী শক্তির ভিন্ন রূপ মাত্র! সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, নিজ ইষ্ট হরি বা গৌরাঙ্গকে (+) [প্রথম প্রুফে চুরুটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অবশে চিহ্নিত স্থান] একান্ত মনে ও একনিষ্ঠ ভাবে সাধনা বিশেষ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত আত্মার ভেদবুদ্ধি সর্বনাশের কারণ। শ্রীগৌরাঙ্গ কালীর ভিন্ন মূর্তি মাত্র (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ২০ অনুচ্ছেদ) এবং তাঁহার শক্তিতেই শক্তিমান। এই শক্তিহীন হইলে, তিনি শব সম অক্ষর ব্রহ্ম। ভেদ বুদ্ধিহীন হইয়া তাঁহাকে সর্বময় ভাবে সাধনা পরম মঙ্গল ও সিদ্ধি প্রদা! সমদর্শী ও সদাচারী ভক্ত, তীর্থপ্রবর এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও লোক পালগণেরও পূজ্য (প্রথম ভাগ, দশম অধ্যায়, ২৩ অনুচ্ছেদ)। তাঁহার বৈধী পূজার্চনাদি নাই এবং প্রাক্তনজাত সববিধ বাহ্য কার্যদশায় বর্তমান থাকিয়াও, তিনি কখন নিজ অদ্বৈত্য-ভাবচ্যুত নহেন। আত্মরূপে তিনিই তাঁহার ইষ্ট এবং ইষ্টরূপে তিনি বিশ্বে সর্বময়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপী শক্তিদেবী, বা পরব্রহ্ম! তাঁহার ইষ্টই নিশ্বে সব হইয়া সব করিতেছেন ও করাইতেছেন এবং তাঁহাকে বাদ দিলে তিনিও বিশ্ব শবোপম।

যতীন-কর্মফল

বিষয়—(১) প্রত্যুষকালে, অনতিদূরস্থা সধবা এক নিকট আত্মীয়া যুবতী, আমাকে শ্বেতপুষ্প-পূর্ণ এক থালি হস্তে করত পূজা করিতে আসিতেছে, এইরূপ স্বপন দর্শন।

(২) সূর্যোদয়ের পর, আমার (তখন জীবিত) বড়মামা আমাকে বলিতেছেন যে, সমস্ত স্বপনগুলি আমার জীবদ্দশায় সত্যে পরিণত হইবে, এইরূপ স্বপন দর্শন। (+) [প্রথম প্রুফে বড় কালির দাগে এই সব লাইনগুলি অবশে চিহ্নিত]।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২১শে মে, ১৯৪৮।

উক্ত স্বপ্ন দুইটী প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই প্রকটিত হইয়াছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রথম স্বপ্ন দর্শনের পর, আমি প্রাতঃশৌচাদি সমাপন করিয়া পুনরায় শয্যা-শায়ী হইয়া সামান্য তন্দ্রাবস্থায় সূর্যোদয়ের পরে দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখিয়াছিলাম। দৃষ্ট দুইটি ব্যক্তিই যে আমার আত্মস্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? স্বপ্ন দুইটির বিষয় বিশেষ কিছু লিখিবার নাই ; তবে উহাদের লিপিবদ্ধ রাখিলাম এই জন্য যে, যথাকালে উহাদের সত্যতা প্রমাণিত হইতে (+) [দ্বিতীয় প্রুফে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান] পারে। দ্বিতীয় স্বপ্নটি যে শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা পূর্বে অনেক পর্বে উক্ত হইয়াছে। উহাতে, আমার আত্মাই আমার বড়মামা রূপে প্রকটিত হইয়া কর্মফল প্রকাশ করিয়াছিল। স্বপ্নতত্ত্বানুযায়ী, প্রত্যুষকালে দৃষ্ট স্বপ্ন দশ দিনের মধ্যে ফল দান করে ; আর সূর্যোদয়ের পর প্রভাতকালে দৃষ্ট স্বপ্ন, পুনরায় নিদ্রিত না হইলে, তিন দিনের মধ্যে সফল হয়। অতএব, দুইটি স্বপ্নই অমোঘ! প্রথম স্বপ্নের পর, আমি সামান্য তন্দ্রাবস্থায় ছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় স্বপ্নের পর শয্যাত্যাগ করিয়াছিলাম। শুভস্বপ্ন পাইয়া যে ঘুমাইতে নাই এবং অশুভ স্বপ্ন পাইয়া যে ঘুমাইতে হয়, এই সব বিধি-নিষেধ আমি কখনও ইচ্ছা করিয়া পালন করি নাই। স্বভাব বশে যাহা হয়, তাহাই করিয়াছি। ২ পর্বে আলোচিত ঘটনার পরে, অশেষ শিবকৃপায় আমার কর্মে ফলানুসন্ধান প্রবৃত্তি লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল (১২ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)।

যতীন-গর্ভধারিণী

বিষয়—কাশীর কোন দেব-মন্দিরে যেন আমার গর্ভধারিণী মাতা মৃতা, তাঁহার শব স্কন্ধে করত সৎকারার্থে আমার গঙ্গার তীরে গমন ও তথায় জ্যোতির্ময় তারকাখচিত গঙ্গাজল (মণিকর্ণিকা!) দর্শনের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৪শে মে, ১৯৪৮।

উক্ত স্বপ্নটি গভীর রাত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল। মন্দিরটি বিশ্বনাথ মন্দির এবং উজ্জল তারকা-খচিত গঙ্গাটি মণিকর্ণিকা-হ্রদ হইবারই সম্ভাবনা মনে হইলেও, সঠিক বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বনাথ-মন্দির ও মণিকর্ণিকা-হ্রদ মাহাত্ম্য পুস্তকের প্রথম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১, ৩ ও ৬ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। ইহারা অতুলনীয় মুক্তি স্থান এবং এই দুই স্থলে মৃত্যু দেবতাদিগেরও পরম-বাঞ্ছিত। কাশীবাসী, ঐস্থানে পাপাচরণ ত্যাগ করত মৃত হইলে এবং তাহার শব মণিকর্ণিকার তীরে দাহ হইলে মুক্তি অনিবার্য! রামকৃষ্ণদেব একবার সমাধি অবস্থায় দেখিয়াছিলেন যে, সেইরূপ ব্যক্তির শবের কর্ণে স্বয়ং শিব তারক-ব্রহ্ম মন্ত্রদান করিতেছেন এবং স্বয়ং কালী তাহায় শরীরত্রয়ের সংস্কারের বন্ধন উন্মোচন করত স্বহস্তে মুক্তি দিতেছেন। জানি না—পরলোকগতা আমার গর্ভধারিণী মাতা কি তাঁহার নবজীবনে পুনরায় মৃতা হইয়া ঐ সময় উক্ত গতি লাভ করিলেন, বা শীঘ্র আমার জীবদ্দশায় (পূর্ববর্তী পর্ব) উহা লাভ করিবেন? যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা 'কৃষ্ণরঙ্গিণী' নামটি বহু আয়োজনে ও আমার প্রতি প্রেম ও কৃপায় সারদেশ্বরী, রামকৃষ্ণ, ভবতারিণী ও কৃষ্ণ ধারণ করিয়াছেন (২৫ ও ২৭ পর্ব) তাঁহার উক্ত পারলৌকিক গতিতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই! তাঁহার পুত্র আমি যে হনুমানদেবের পরম কৃপায় ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত, তাহার ফলও বড় সামান্য নহে (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ৭ (২) অনুচ্ছেদ)। ওঁ-কার বীজ সমন্বিত ব্রহ্মমন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র এবং ইহাতে স্বেচ্ছাচারে সাধনা মতই ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ঐ মন্ত্র গ্রহণে আত্মা ব্রহ্মময় হইয়া অন্যবিধ সাধনার মুখাপেক্ষী থাকে না। কোন বিষয়েই ঐ মন্ত্রের বিচার নাই। ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত

ব্যক্তি সর্বতীর্থ-স্নাত, সর্বযজ্ঞ-দীক্ষিত, সর্বলোক-প্রতিষ্ঠিত ও সর্বশাস্ত্রবেত্তা এবং তাহাকে ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী ও গ্রহাদি রুষ্টতা বশতঃ অনিষ্ট করিতে অসমর্থ। তাঁহার মাতা ও পিতা ধন্য এবং কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃগণ তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ করত তাঁহার এইরূপ প্রশংসা করেন—'আমাদের বংশোৎপন্ন পুত্র যখন ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল পবিত্র করিয়াছে, তখন আমাদের নিমিত্ত গয়ায় বা তীর্থক্ষেত্রে পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদির কি প্রয়োজন'? প্রেমভক্ত, বা বৈষ্ণব, বা ঈশ্বরের কোন মূর্তিকে প্রিয়ভাবে সাধক ব্যক্তিও স্বকুল-উদ্ধারক (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১১-১২ অনুচ্ছেদ)। সকলে যে গোলোক ধামেই যাইবেন এমন নহে। ইষ্ট অনুযায়ী পারলৌকিক গতি লাভ হয় (খ পর্ব, পাদটীকা (৫), ৪ অনুচ্ছেদ)। পিতার পারলৌকিক গতির বিষয় এই মাত্র জানি যে, তিনি নিজে শরদিন্দুকে স্বপ্ন দিয়া ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা আসিবার পথে আমার নিকট হইতে গয়ায় পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম শ্রাদ্ধ (১৯২৮) হরিদ্বারে এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধ (১৯২৯) পুষ্করে আমি করিয়াছিলাম। বহু ভাগ্যবলেই, শ্রাদ্ধক্রিয়ায় এইরূপ যোগাযোগ উদয় হয়। এই প্রসঙ্গে, অ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ ও ১১ পর্ব ৩ অনুচ্ছেদ, দ্রষ্টব্য। বংশে একজন মুক্ত হইলে, তাঁহার চেষ্টাতেই অনেকে মুক্ত হন। এই পর্বটি, আমার সংগ্রহে মাতার মুক্তি লাভ প্রকট করিয়াছিল। আর কে উহা পাইবেন, তাহা কে বলিতে পারে? মনে হয় যে, আত্মীয়ের মুক্তিলাভ বিষয়ে মুক্ত ব্যক্তির আন্তরিক টান, বা ভালবাসা, একটি প্রধান কারণ। যখন কোন সাধক নিজেকে আত্মরূপে ব্রহ্ম, বা মূলপ্রকৃতি, বা শিবশক্তি, রূপে সঠিক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি পরমেশ্বরত্ব লাভ করেন। অতএব, তাঁহার কোন বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা কেমন করিয়া প্রতিহত হইবে? এই প্রসঙ্গে, ১৬ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

যতীন-গুরুদেব

বিষয়—একটি অপরিচিত প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তিরূপে গুরুদেবের আমার নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষা লইবার স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৬শে জুলাই, ১৯৪৮।

দুপুর বেলায় নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্নটি দেখিলাম—

"যেন একটি প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি, আমার অধ্যাত্ম বিদ্যার পরীক্ষক ও শ্রোতা রূপে, আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করত সন্তুষ্ট হইয়া জগতের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। যেই আমি উত্তরে বলিলাম যে, 'জগৎ মিথ্যা', তিনি তিরোহিত হইলেন।"

২। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে যাইতেছিলাম 'জগৎ মিথ্যা' কি ভাবে

—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৮)—

*কিন্তু তিনি অবসর দিলেন না। আমি উক্ত তত্ত্ব পুস্তকের প্রথম ভাগে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং তিনি যখন পরীক্ষা লইলেন না ও বিনা পরীক্ষায় আমায় ব্রহ্মজ্ঞান পরীক্ষোত্তীর্ণ করিলেন, তখন বিষয়টি আর পুনরুল্লেখ করিব না। গুরুদেব, সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করত আমায় বুঝাইলেন, 'তুমি সঠিকরূপে অধ্যাত্ম বিদ্যা অনুশীলন করিতেছ,' উৎসাহিত করিলেন এবং উপলব্ধির শক্তি দান করিলেন। ঈশ্বর-গুরু এইরূপ করুণাময়ই বটে। তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, এই ত্রিমহাদেবময় নিখিল জগৎ-স্বরূপ ও ব্রহ্মবস্তু।

৩। উক্ত প্রসঙ্গে, ৭ ও ১৯ পর্ব দ্রষ্টব্য—বিশেষতঃ শেষোক্ত পর্ব। উহা হইতে বুঝা যাইবে কেমনে জগৎ বাস্তবিক ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াও, সত্য-রূপে প্রতিভাত। এক কথায়—বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ অবিদ্যা, বা কালী, কোন বস্তুরই অন্য কোন স্বভাব নাই (২৬ পর্ব, ৭ অনুচ্ছেদের শেষাংশ) এবং যাহা কিছু সমস্তই কেবল ব্রহ্মে মিথ্যা 'অহং' অনুভূতির ফল। 'আমি ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্মরূপী আমাতে কোনরূপ ভাবাভাব বা ক্রিয়া নাই' বা 'সারা বিশ্বই, মূল-প্রকৃতিরূপী প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই জ্ঞান সঠিক হইলে, জানিবার, বা করিবার, বা বলিবার কিছুই থাকে না এবং মুক্তি লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে, ৫৬ পর্ব দ্রষ্টব্য।

যতীন-গুরুদেবী

বিষয়—গুরুদেবী সারদেশ্বরীর দ্বারা প্রকটিত একটি বড় স্বপনের শেষাংশ—'আমি সব করিতেছি, তুমি কিছু কর না।'

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩রা অগষ্ট, ১৯৪৮।

উক্ত স্বপনটির শেষাংশ ভিন্ন কিছু মনে পড়ে না। পূর্ববর্তী পর্বে গুরুদেব আমাকে 'নিগুর্ণ' ব্রহ্মতত্ত্বের সার সত্যের বিষয় উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুদেবী কিন্তু পরীক্ষা না লইয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন এবং 'সগুণ' ব্রহ্মতত্ত্বের আমার জানিত সব তত্ত্বগুলি স্বপ্নে অপ্রকটিত রাখিয়া শেষে নিজেই উহার সার তত্ত্ব (৫৫ পর্ব)—'ঈশ্বরী তিনিই বিশ্বে সব করিতেছেন, কেহই কিছু করে না'—জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

২। বিষয়টি আমি এই পুস্তকের অবতরণিকা, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের অনেক পর্বে বিশদ ভাবেই আলোচনা করিয়াছি। কৃপাময়ী জগদম্বার এই স্বপনটির শক্তি বলেই যেন অবশে আমি প্রথম ভাগের ষোড়শ অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদে আত্মজ্ঞান-মিশ্রিত ক্রিয়া-যোগহীন প্রেম-ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং তাহা করিবার পূর্বে লিখিয়াছি—'বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বা, বিশ্বে সকল জাতি ও ধর্মের মানবকে যেন, আমার অন্তর্যামী আত্মারূপে, এইরূপ উপদেশ আমার লেখনী অবলম্বনে দিতেছেন'। পাঠক বোধ হয় এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে উক্ত প্রেমধর্ম বাস্তবিকই জগদম্বার দ্বারা প্রচারিত এবং আমি উহা তাঁহার যন্ত্র ভাবেই অনেক পরে লিখিয়াছি মাত্র। তিনি নিজে স্থূল-দেহ হীন এবং যখন তাঁহার বিশ্বে কিছু করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা স্থূলদেহযুক্ত কোন উপযুক্ত মানবকে যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া সম্পাদন করেন। এই বিষয়ে আমি তাঁহার সেই নিবাচিত যন্ত্র বিশেষ। উক্ত প্রেমধর্ম এই দ্বিতীয় ভাগের কতকগুলি পূর্ববর্তী পর্বেও লিখিত হইয়াছে। উহার দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন কিরূপে আমাদের দেহস্থ কোটি কোটি ভিন্ন-ধর্মী জীবকোষগুলি (Cells) কালিকার চিন্ময় দেহের তদনুরূপ কোষগুলির শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দেহধর্ম পালন করিতেছে। জীবদেহের বিভিন্ন কোষ-

গুলি জগদম্বার তদনুরূপ চিন্ময় কোষগুলির শক্তিতে শক্তিমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারা চালিত না হইলে তাহারা ক্রিয়াশীল হয় না। সারদেশ্বরী দেবীই 'বিন্দু' ও 'পিণ্ড'—অর্থাৎ, বিশ্বরূপিণী ও বিশ্ব-প্রাণশক্তি রূপিণী! অভিব্যক্তাবস্থায়, তিনিই 'সগুণ' ব্রহ্মরূপিণী হইয়া, বিশ্বে সর্ববিষয়ে একাকিনী এবং অনভিব্যক্তাবস্থায় তিনিই নির্গুণ পরব্রহ্ম। পাঠক! যদি যদৃচ্ছাচারী হইতে চাহেন, তাহা হইলে দেহাত্মবোধ ত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে আত্মদান করত কায়মনোবাক্যে সর্বার্পণ অভ্যাস করুন। হীন দেহবুদ্ধি ও মমবুদ্ধি থাকিতে, জগতে বড় হওয়া যায় না এবং পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করত অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বর্তমান কালে, এই বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যময় জগতে, সকলেই কার্যোন্মত্ত এবং তজ্জন্য নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে মানবের মনস্থির করত ক্রিয়াযোগ, জপ, ধ্যান, ইত্যাদি বড়ই কঠিন দাঁড়াইয়াছে। উক্ত ক্রিয়াযোগহীন ভাবপ্রধান প্রেমভক্তি, এই কালের বিশেষ উপযোগী। উহা একটি 'বিশ্বধর্ম', যেমন বেদান্ত ধর্ম। কিন্তু বেদান্ত মার্গ অপেক্ষাকৃত কঠিন —কারণ, উহাতে বাস্তবিক জগতকে শূন্যাকার বোধ করিয়া, নিজ পুরুষাকার বলেই চিন্মাত্রে বিশ্রান্ত হইতে হইবে। প্রেমভক্তি মার্গে, সর্বার্পণ ভাব বিনা অন্য কোন পুরুষকার নিষ্প্রয়োজন। দেহাত্মবোধ ত্যাগ বিনা, নির্বাণ বা কৈবল্য মুক্তি হয় না। যত বড় মহাপুরুষ বা ঋষি হউন না কেন (যেমন নারদ ঋষি), দুই একজন লোক ভিন্ন যাকে তাকে কৃপায় মুক্তি দিতে পারেন না (প্রথম ভাগ চতুর্থ অধ্যায় ২৪ অনুচ্ছেদ)। 'অদূর ভবিষ্যতে মানব জাতির মুক্তি, কোন সাধনা থাকুক আর নাই থাকুক'—এই যে একটা ধারণা বঙ্গদেশের যথায় তথায় আজকাল শুনিতে পাই, উহা ব্রহ্মতত্ত্ববিরোধী, অতএব অসম্ভব।

৫। সৃষ্টি-ব্যাপার প্রকৃতি-পুরুষাত্মক হইলেও, প্রকৃতি যে এখানে প্রধান তাহা এই পুস্তকের নানাস্থানে উক্ত আছে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। **শক্তিং বিনা পরব্রহ্ম নিত্যাপি শবরূপবৎ**—

স্বর্ণ বিনা নাহি হয় কুণ্ডল নির্মাণ।
মাটি বিনা ঘট নাহি হয় কোন স্থান ॥
সেইরূপ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ গুণধাম।
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে অক্ষম ॥
প্রকৃতি প্রভাবে কৃষ্ণ হয়ে শক্তিমান্।
সৃজনে সক্ষম হন ওহে মতিমান ॥···

সম্পত্তি সমৃদ্ধি বুদ্ধি যশ সমুদয়।
শক্তিতে বিলীন আছে ওহে মহোদয় ॥
এই হেতু 'ভগবতী' প্রকৃতির নাম।
ভগরূপী হন তিনি বুঝে ভক্তিমান্ ॥
ভগরূপা শক্তিযুক্ত পরমাত্মা হরি।
সেই হেতু খ্যাত নাম 'ভগবান' তাঁরি ॥

যতীন-কুলকুণ্ডলিনী

বিষয়—প্রত্যুষকালে সারা মুখকে অন্তর্ধ্যানে জ্যোতির্ম্ময় দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১০ই অগষ্ট, ১৯৪৮।

উক্ত দিবস প্রত্যুষকালে সামান্য ধ্যানাবস্থায় (যেন কড়ির বদলে রাজ্যলাভ, এই ভাবেই) সারা মুখটিকেই উজ্জ্বল সোমসূর্য্যাগ্নিরূপী-জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিলাম। উহা একটি বর্ণনাতীত পরমানন্দময় অবস্থা বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের যে কোন অস্বাভাবিক দশা উহার সহিত মিশ্রিত ছিল, তাহা মনে পড়ে না। পূর্বে যে কয়বার জ্যোতিঃ দর্শন এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, সে গুলি ভ্রূদ্বয় মধ্যবর্তী ললাটস্থ আজ্ঞাচক্রে স্নিগ্ধ চন্দ্রমণ্ডলাকারেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু, এই পর্বে কথিত জ্যোতিঃটি সর্বমুখমণ্ডলব্যাপী এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ। হইতে পারে যে—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগে চিহ্নিত স্থান (১০৯)—*ইহা আত্মার সহিত মিলিতা ও জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তির নয়ন ছিদ্রপথে বিনির্গতা হইয়া রাজমার্গ সংজ্ঞক মুখমণ্ডল পরিভ্রমণ নির্দেশক (প্রথম ভাগ, পঞ্চদশ অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ)! এই 'ইহা' শব্দটি লিখিবার কালে, কাগজের স্বাভাবিক দাগে অবশে চিহ্নিত হইল এবং আমার অনুমান যে সত্য তাহা যেন জগদম্বা আমাকে বুঝাইলেন। 'শাম্ভবী-মুদ্রা' অবলম্বনে, বা ভ্রূ-যুগল মধ্যদেশে নয়নদ্বয়ের তারা একাগ্রমনে উত্তোলিত করিয়া ওঁ-কার ও জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রমণ্ডলাকারে পরমাত্মাকে তথায় ধ্যানে, 'তেজোধ্যান' বা 'জ্যোতির্ধ্যান' হয়। আর একই রূপে উক্ত মুদ্রায় তাঁহাকে মুখমণ্ডলাকারে ধ্যানে, 'সূক্ষ্মধ্যান' হয়। এই দ্বিবিধ ধ্যানের দ্বারা পরমাত্মা আত্মস্বরূপে অবগত হন। মূর্তিমান গুরু ও ইষ্ট ধ্যানই 'স্থূলধ্যান'। স্থূলধ্যান হইতে তেজোধ্যান শতগুণ এবং তেজোধ্যান হইতে সূক্ষ্মধ্যান লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ। সমাধি বিনাও, কেবল ব্রহ্মতত্ত্বে মনকে ভাবশুদ্ধির সহিত সংস্থাপিত করিতে পারিলে, কুলকুণ্ডলিনী অনন্ত জ্যোতিঃতে প্রকাশিতা হইয়া অন্তরে অশেষ শান্তি-স্রোত প্রবাহিত করেন।

যতীন-জ্ঞানালোক

বিষয়—স্বীয় বিছানায় প্রজ্বলিত ল্যাম্প দর্শনের দিবা স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১১ই অগষ্ট, ১৯৪৮।

হঠাৎ বোধ হইল যে, আমি গৃহস্থ যে-শয্যায় শায়িত হইয়া নিদ্রিত, তাহার নিকটে স্থিত উজ্জল কেরোসিন্ বা গ্যাস্ ল্যাম্পটিকে যেমন আরও নিকটস্থ করিলাম, উহা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং উহার খোলা কলটির নিকট একটি ভয়াবহ আগুন দেখা দিল। বিছানা পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, অতি কষ্টে অগ্নি বেষ্টিত কলটিকে ঘুরাইয়া আলোটির দপদপানি নিবারণ করিতেই, নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।

২। পূর্বে এক কলিকাতায়-দৃষ্ট (দিন লিখিত নাই) স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, আকাশ হইতে একটি উজ্জল তারকা ছাদে পতিত হইয়া উহাতে স্থিত আমার শয্যা, বালিশ, লেপ, কম্বা, ইত্যাদি সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া দিল। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে সধবা স্ত্রীলোক, শ্মশান, মশান, মশালের আলোক, আগুন শিখা, ইত্যাদির দর্শন আধ্যাত্মিক উন্নতি সূচনা করে। অনুমান এই যে, আকাশ হইতে পতিত অগ্নির দ্বারা আমার শয্যাদির দহন, আমার বহির্দেশে আত্মজ্ঞান লোপ নির্দেশক এবং শয্যাস্থ উজ্জল দীপটি জ্ঞানালোকের প্রতীক। এই স্বপ্নটি প্রকাশ করিল যে, আমার বর্তমান জ্ঞানকে গাঢ় ভাবে ধারণ করিয়া জীবনে অবস্থান প্রয়োজনীয় হইলেও, উহার চরম অবস্থা বা 'জগৎ মিথ্যা' এই ভাবকে বিশেষ প্রাধান্য দিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে, ট পর্বের ২ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য। উহা হইতে বুঝা যাইবে যে কর্ম অবশিষ্ট থাকিতে, 'জগৎ মিথ্যা' এই ভাব নির্দোষ সাধন হয় না। অতএব, এই স্বপ্নটিই যেন প্রকাশ করিতেছে যে, আমার ইহ জীবনে কর্ম এখনও শেষ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে, ১৫ পর্ব দ্রষ্টব্য। 'জগৎ মিথ্যা' (৫৫ পর্ব) বা 'জগৎ কেবল শক্তির লীলা' (৫৬ পর্ব), এই দুই ভাবের যে কোন ভাবের দ্বারা মনোনাশ করিয়া মানব মুক্ত হয়। দ্বিতীয় ভাব হইতে প্রথম ভাগ সহজে লাভ করা সম্ভব।

যতীন-শরদিন্দু-নির্মলেশ

বিষয়—এক অপ্রাকৃত ধামে, কীর্ত্তনানন্দে বিভোরাবস্থায় আমার অনবরত অশ্রুবর্ষণ, শরদিন্দুর কীর্ত্তনিয়াদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও পরে তথায় আগত তৃতীয় পুত্র নির্মলেশের আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হতভম্ব ভাব ধারণ।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২০শে অগষ্ট, ১৯৪৮।

নানাভাবে ঈশ্বর চিন্তায় রাত্রি প্রায় দুইটায় নিদ্রিত হইবার পর, অনেক মনোমুগ্ধকর ঐশ্বরীয় স্বপ্ন দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মনে পড়ে না। ভোরের দিকে যে স্বপ্নটি দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল যেন আমি এক অপ্রাকৃত ধামে অশ্রুত ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে ভাব ও ভক্তি বশে অনবরত অশ্রুবর্ষণ করিতেছি। তথায় শরদিন্দু ভিন্ন অন্য কোন কীর্তনিয়াকে চিনিতে পারি নাই। পরে দেখিলাম যে, আমার তৃতীয় পুত্র নির্মলেশ একটা ঘোর বেগুনে রঙের কাপড় (কোঁচার তলা কোমরে উত্তোলিত, 'বাবু' ভাবে) পরিহিত হইয়া ও ললাটে একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণের টিপ দিয়া, সেই কীর্তনমঞ্চে প্রবেশ করিল ও কীর্তন না শুনিয়া আমাকে উক্তভাবে উপবিষ্টাবস্থায় একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে ভেবাচাকা হইয়া গেল। তাহার পর, ঘড়িতে পাঁচটা বাজিতেই স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার একটা পূর্ববর্ণিত অস্বাভাবিক অবস্থা অনুভূত হইল এবং আমাকে পরমানন্দে বিভোর করিল। কিছুক্ষণ পরে, শয্যা ত্যাগ করিলাম এবং চেষ্টা করিয়াও, কীর্ত্তনমঞ্চের ঘটনাগুলি মনে উদয় হইল না। সেগুলি যেন কোন অপ্রাকৃতধামের পরমানন্দময় ঘটনাবলী—ইহজগতের নহে।

২। পুস্তকের পূর্ব পর্বগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে, আমার কোন ঈশ্বর বা অবতার মূর্তিতে ভেদ বুদ্ধি নাই। আমি ব্রহ্মময়ী, পরাপ্রকৃতি, আত্মার সহিত অভেদ সকল ঈশ্বর মূর্ত্তিকে, তাঁহার সহিত অভিন্ন-ভাবে আমার আত্মস্থ জানিয়া, সকলকেই প্রেমভাবে ও অতি প্রিয়রূপে উপাসনা করি এবং কাহাকেও অণুপরিমাণে হীন মনে করি না—কিন্তু, তজ্জন্য যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব বা সত্য (যেমন, আত্মাই বিশ্বমূলাধার এবং সকল বাহ্য নাম ও রূপাদি—এমন

কি, নানা ঈশ্বর মূর্তি—তাঁহারাই বিভিন্ন মূর্তি, শক্তি ও অভিব্যক্তি), তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহি ! তবে, তিনিও পরব্রহ্মে অবিদ্যা বা স্পন্দন ভিন্ন কিছুই করিতে সক্ষম নহেন। সারা ব্রহ্মাণ্ডই আত্মরূপে আত্মার সহিত অভেদ তাঁহার মূর্তি—অতএব, কে'ই বা বড়, আর কে'ই বা ছোট ? পত্নী শরদিন্দু, বা কন্যা গীতা ভিন্ন দেহধারিণী হইলেও, তাঁহাদের উপলব্ধ এই পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলিকে—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১১০)—*আমি নিজ উপলব্ধ বস্তু বুঝিয়া নিজস্বই মনে করি এবং সেই ভাবেই এই পুস্তক লিখিতেছি। পাঠকগণ—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১১১)—*যদি আমার এই ভাব গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকে বর্ণিত উপলব্ধি গুলিকে যথাসম্ভব নিজস্ব বোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে ভুল করিবেন না, বরং বিশেষ আধ্যাত্মিক সম্পদে বিভূষিত হইবেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে, নিজেকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী-স্বরূপ আত্মা বুঝিয়া দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিতে হইবে ও বিশ্বের সর্ববিধ স্পন্দনকেই ঈশ্বরে বা আত্মাকে অর্পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায় এই পুস্তক আমি লিখিতেছি [৫২ (২) পর্ব] এবং উপরে চিহ্নিত স্থানগুলি যেন তাহা বিশেষভাবে এইক্ষণেই প্রমাণিত করিল। যে কারণেই হউক, আমি নানা ঈশ্বরমূর্তির (দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, রামকৃষ্ণ, সারদেশ্বরী, গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ, রাধা, নারায়ণ, রাম, সীতা, হনুমান, বিশ্বনাথ, তারকেশ্বর, শিব ভবতারিণী, ইত্যাদি) নানাভাবে কৃপা ও দর্শনাদি (জাগ্রৎ বা স্বাপ্ন) পাইয়াছি এবং তাহাদিগের বিবরণ এই পুস্তকে পাঠকবর্গের হিতার্থে প্রকাশ করিতেছি। এই সকল ঈশ্বর-ঈশ্বরী মূর্তি ও সারা ব্রহ্মাণ্ড আমার সহিত পূর্ণ অভেদ ভাবে আমার হৃদয়স্থ চিন্ময় আত্মায় ব্রহ্ম ও/বা শ্রীদেবীর ভিন্ন রূপে অবস্থিত। ওহো ! আমি কি মহান্ ! পাঠকগণ ! আপনারাও সেই—যদি দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিয়া সাক্ষী-স্বরূপ স্বাত্মায় রমণ করেন। জীবাত্মাই ঈশ্বর এবং পরব্রহ্ম—অতএব, আমরা সকলেই স্বরূপে এক, লেশমাত্রও ভেদহীন।

৩। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না সেই জন্য লিখিতেছি যে, অদ্য (২৭শে নভেম্বর, ১৯৫২) ২ অনুচ্ছেদটি লিখিবার পূর্বে, প্রত্যূষকালে শয্যা ত্যাগ করিবার কালে, বিনা কোন চিন্তায় রামকৃষ্ণদেবকে ধ্যানস্তিমিত উপবিষ্টাবস্থায় ছায়ারূপে আমার নয়নপথে নানাস্থানে আকাশে-বাতাসে যেন বিশ্বরূপে দেখিলাম। পাঠকগণ! আপনারাই যে স্বরূপে রামকৃষ্ণ (ব্রহ্ম ও/বা আদ্যাশক্তি) তাহা উপলব্ধি করুন। এক জীবনে না হউক, অল্প জন্মান্তরের মধ্যেই যে সফলকাম হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ! বিশ্বে অণুপরমাণু—*অবশে কাগজের উলটা পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১১২)—*হইতে ব্রহ্মাবধি সকল বস্তুরই উক্ত অদ্বয়

স্বরূপ। শুধু মনে মনে ঐ সত্য ভাবিলে চলিবে না। স্বামী—*অবশে কাগজের উলটা পৃষ্ঠায় স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১১৩—*বিবেকানন্দের উপদেশ —' Never for a moment forget the glory of human nature '—অবহেলা না করিয়া, সম্ভব হইলে তাঁহারই ন্যায় সিংহরবে ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া ঘোষণা করুন—'I am the greatest God that ever was or ever will be--Christs and' Budhas are but waves on the Ocean which I am '। 'আমি দেহ নহি এবং বিশ্বাত্মা ব্রহ্ম ও/বা আত্মাশক্তি ' এই সত্য যথোচিত ভাবশুদ্ধির সহিত সবলে গ্রহণ করিতে পারিলে, ত্বরায় উপলব্ধ হয়। কেহ, কোন কালেও বদ্ধ নহেন, এবং বদ্ধাবস্থা তাহার অজ্ঞানোদ্ভূত ' অহং '-ভাব জাত ; কারণ—

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥

৪। জীবের পারলৌকিক গতির বিষয় প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। স্ববর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া ও সাংসারিক কর্তব্য সমূহ যথাযথ ভাবে ঈশ্বরের কর্ম বুঝিয়া সম্পাদনই সর্ব ধর্মের মূল এবং তৎসহ প্রেমভক্তি বা অক্ষর ব্রহ্মে আত্মজ্ঞান মোক্ষের বীজ। যে-মানবের ইন্দ্রিয়গণ বেদানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত, আর মন ঈশ্বরে অনুরক্ত, তাহারই নিষ্কামতা ও স্বাভাবিক ভক্তি সিদ্ধ হয়। ঐরূপ ভক্তি শরীর লোপকারী (প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২ (২) অনুচ্ছেদ)। আত্মনিষ্ঠ অনন্য ভক্তিই মানবের মুক্তির উপায় এবং আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞদিগকে সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান যে সকল উপায় করিয়াছেন, তাহাই ' ভাগবত ' ধর্ম। সগুণ ব্রহ্মোপাসক পুনরাবর্তনহীন ব্রহ্মলোকে এবং নিষ্কাম হরি-প্রেমভক্ত পুনরাবর্তনহীন গোলোকধামে পারলৌকিক গতি লাভ করেন। নিজেকে সর্বতোভাবে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিয়া চিন্তায় লয় যোগ বা সাযুজ্য মুক্তি সাধন হয়। পরমাত্মার সাধক, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, ইহলোকে কৈবল্য লাভ না করিলে চরমসময়ে দেহান্তর ধারণ করত দেবযান মার্গে তৎসকাশে গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিখিল ঐশ্বর্য প্রথমে ভোগ করেন। অন্নাধিক কালে ঐশ্বর্যভোগের তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে, বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করিলে, পূর্ণানন্দময় পরমাত্মার অনুপম আনন্দ উপস্থিত হয়—যে সুখের কোন কালেই ক্ষয় হয় না (প্রথম ভাগ, একাদশ অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ)। এই পর্বে বর্ণিত স্বপ্নটি কি আমার ও শরদিন্দুর দেহান্তে কিঞ্চিৎ বিভিন্নভাবে সেই পরমানন্দময় একটি প্রাথমিক অবস্থা প্রকট

করিল? ধামটি কি গোলোকধাম? তাহা না হইলে, অপ্রাকৃত ও অশ্রুত ভাষায় তথায় প্রেমঘন-বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের কীর্তন কেন হইবে? শরদিন্দু বৃতা কৃষ্ণমাতা (ছ পর্ব)। সেই জন্ত তাঁহার পারলৌকিক উপযুক্ত ধামই গোলোক। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে 'নিত্য বৃন্দাবন এবং অনেক কিছু' দেখাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন —*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১১৪)। এই চিহ্নটিই যেন ঈশ্বরানুমোদন প্রকাশ করিল। এই কাহিনীটি কি সেই 'অনেক কিছুর' একটি ঘটনা? তিলকধারী বৈষ্ণব বেশে পুত্র নির্মলেশের ঐস্থানে উপস্থিতি কি, তাহার আমাদের সহিত সম্বন্ধবশে, দেহান্তে সুদুর্লভ গোলোকধামে গতি নির্দেশ করিল (৫৪ পর্ব)? আমার অতি অস্বাভাবিক প্রেমঘন অবস্থা দর্শন করিয়াই বোধ হয় সে কীর্তন না শুনিয়া হতভম্ব হইয়াছিল। এই সব বিষয়ে সঠিক মীমাংসা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব (খ পর্ব, পাদটীকা (৫), ৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তবে শাস্ত্রপাঠে যাহা অবগত হইয়াছি সেই অনুযায়ী অনুমান করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করত যাহা লিখিবার লিখিলাম। সব লেখা অসম্ভব এবং যদি ভুল লিখিতাম, তাহা হইলে অঘটন-ঘটনপটীয়সী জগদম্বাই কোন না কোন উপায়ে উহা সংশোধন করিয়া দিতেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি—কারণ, পূর্বে তাহা করিয়াছেন এবং চিন্তার অতীত ভাবে অনেক বিষয় অন্তরে বুঝাইয়াছেন—

অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে কিছু প্রকাশে হৃদয়॥

মনে হয় যে, স্বপ্নটি আমার, শরদিন্দুর ও পুত্র নির্মলেশের মৃত্যুর পর, একত্রে মিলিত অবস্থায়, একটি প্রাথমিক দৃশ্য প্রকট করিয়াছিল। ইহা সকলের চরম গতি নির্দেশক না হইতেও পারে! এই প্রসঙ্গে, পরবর্তী পর্ব বিশেষ দ্রষ্টব্য।

যতীন-মায়াসাগর

বিষয়—জাহাজ আরোহণে সমুদ্র তরণ, অপর কূলের ডকের অতি নিকটে একটি নাতিপ্রস্থ খালের ভিতরস্থ নিরাপদ স্থানে উহার অবস্থান এবং উহার কাপ্তেনের এই কার্যের হেতু বর্ণনের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২১শে অগষ্ট, ১৯৪৮।

উক্ত দিবস সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে দিন অতিবাহিত করিতে করিতে, মা'কে মাঝে মাঝে বলিয়াছিলাম—'মা! এই সব পাপ আর কতদিন? কোথায় তোর্ চিন্তায় দিন কাটাইব, না নানা মিছা ঝঞ্ঝাট জুটাইতেছিস্! একটা কিছু বন্দোবস্ত কর্! আমার দ্বারা এই সব আর হইতে পারে না।' রাত্র প্রায় আড়াইটায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, একটা জাহাজে যখন সমুদ্র তরণ করিয়া প্রায় ডকের নিকটে পৌঁছিয়াছি, তখন উহা ডকে না গিয়া নিকটে—***অবশে কালির দাগে তিনটি চিহ্নিত স্থান (১১৫)**—*একটি নাতিপ্রস্থ খালের ভিতরস্থ এক স্থানে নোঙ্গর করিল, কারণ অতি প্রবল ঝড় থেমে থেমে বহিতেছিল। সমুদ্র কূলের পাকা ডক ব্যবহার না করিবার কারণ কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিতে, তিনি এইভাবে উত্তর দিলেন—'ঝড় তো অনেক কমে এসেছে। থামিলেই জাহাজটি যথাস্থানে লইয়া যাইব। ঝড় ক্রমে কমিতেছে—***পাণ্ডুলিপিতে অবশে কলমের খোঁচায় চিহ্নিত স্থান (+) (১১৬)**—*উহা ভালই। একেবারে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া ভাল নহে। এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে আসিয়াছ (+)—ভয় কি?' [(+) প্রথম প্রুফে এই চিহ্নিত স্থানদ্বয়ের অন্তর্গত লিখন চায়ের দাগে অবশে চিহ্নিত]। তাহার পর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জাহাজে আছি ও কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছি ইহা বেশ অনুভব হইতে ছিল—অথচ, চক্ষে কিছুই দেখি নাই। এই প্রসঙ্গে, ১৯ ও ট পর্ব বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২। স্বপ্নটির গূঢ়ার্থ সুস্পষ্ট এবং উহা মায়াসাগরে ভাসমান আমার নালিশের সদুত্তর। অদৃশ্য জাহাজ ও উহার কাপ্তেনটি, যথাক্রমে আমার দেহ ও আত্মস্থ গুরুদেবকে নির্দেশ করে—কারণ, দেহ ও আত্মা উভয়েই বাস্তবিক শূন্যাকার। ডকটি, আমার পরলোক বা মুক্তিধাম। দেহবাসী জীবাত্মা দেহে ব্যবহার দশায় সর্বময়

হইয়া অবস্থিত হইলেও, বাস্তবিক তত্ত্ববিচারে সর্ববিরহিত—প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ৬-৮ অনুচ্ছেদ। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, যিনিই হউন না কেন, এই অবস্থার উপাদানে গঠিত জগতে দেহধারী থাকিতে, দেহকে শূন্যাকারে ব্যবহার করিতে বিফল মনোরথ হন। বিনা সমাধি দেহাংশ পুড়িয়া গেলে, কাহার না কষ্টের অনুভূতি অনিবার্য! এতটার প্রয়োজনও নাই। মনে সঠিক আত্ম-স্বরূপের জ্ঞানই যথেষ্ট (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ)। দেহাত্মবোধী ব্যক্তিই বদ্ধ জীব এবং দেহাত্মবোধ ত্যাগী ব্যক্তিই শিব, বা ব্রহ্ম। সঠিক জ্ঞানোদয়ে ইন্দ্রিয়রাজ দেহাত্মবোধ ত্যাগে, বা চিত্ত জয়ে, সকল ইন্দ্রিয়েরই জয় সিদ্ধ হয়। সেইরূপ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কার্য সত্ত্বের বা ব্রহ্মের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া, উহা বন্ধনের হেতু নহে। দেহীর যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন সে প্রবুদ্ধ বা অপ্রবুদ্ধ যাহাই হউক না কেন, তাহার চিত্তের ও সুখ-দুঃখের অধীনতা থাকিবেই, কিছুতেই তাহা ত্যাগ করা যাইবে না, কারণ চিত্ত লইয়াই মানবের জীবন ও জীবদ্দশা। তবে—'আমি কূটস্থ নিষ্ক্রিয় চৈতন্য, সব করিয়াও কিছুই করিতেছি না', 'আমি দেহমনাদি কিছুই নহি'—এই সব ভাব অবলম্বনে কর্ম প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ, বা মনোনাশ, করিতে পারিলে ক্রমে নিজেই অজ আত্মরূপে পর্যবসিত হওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী, কায়মনোবাক্যের দ্বারা প্রাক্তন বশে কৃত সকল প্রকার কার্য বা স্পন্দন ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে অর্পণ করত ফলে কর্মত্যাগী হন। অজ্ঞান-দশায় চিত্ত ঘনীভূত থাকে এবং অজ্ঞান দূর হইলেই চিত্তের উচ্ছেদ সাধন হয়। অতএব 'আমি ব্রহ্ম বা কালী' এই চিন্তা হইতেই সর্বত্যাগ সিদ্ধ হয়। আমাদের দেহ রূপ জাহাজটি ভবনদী পার হইবার জন্য বাস্তবিক সর্বফলের মূল-স্বরূপ, দুর্লভ, পটু, আত্মস্থ গুরুরূপী কর্ণধার বিশিষ্ট এবং আত্মস্থ অভেদ ঈশ্বররূপী সুবায়ু দ্বারা পরিচালিত। ঝড়-ঝাপটাগুলি কর্মফল সূচক এবং তাহাদের নিকট হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। গুরু ও ঈশ্বর ভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তি উক্ত-রূপে কর্মফল বা ঝড়-ঝপটা ভোগ করিয়াও, সর্বত্যাগে সিদ্ধ হইয়া ভবনদী পারে পৌছান। কিন্তু, যাহাদের সে বিশ্বাস বা সর্বত্যাগ নাই এবং যাহারা অহঙ্কার বশে নিজেই নাবিক ও সুবায়ু হইতে চান, তাহারা পরপারে পৌছাইতে পারেন না এবং মাঝ দরিয়ায় জন্মজন্মান্তর হাবুডুবু খান। মিথ্যা বা মায়িক হইলেও, পূর্বকৃত পাপকর্ম বিষবৎ অনর্থকর ও উহা নাশ প্রাপ্ত না হইলে, মুক্তিলাভ সুকঠিন। স্বাভাবিক বিধিবশেই উহাদের ফলভোগ বিশেষ প্রয়োজন এবং যে-সকল ব্যক্তি গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ভক্তিমান, তাঁহাদেরও উহাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে—তবে, 'ফালের বদলে ছুঁচ প্রবেশ করে মাত্র'! তাদৃশ ব্যক্তিরও

কুকর্মফলগুলি ভবনদীতে সুবায়ু পরিচালিত রূপেই গ্রহণীয়। 'আমি' (আত্মা) যখন আমার দেহ-মনাদিকে কুকর্মফল দান করিতেছি,—তখন উহারা কেমন করিয়া নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে? দেহ কর্মবৃক্ষ এবং প্রাক্তন কর্মই ইহার বীজ। কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, জীব, চেত্যোন্মুখী চিৎ (বা জগদম্বা) ও ব্রহ্ম উত্তরোত্তর ক্রমে পরস্পরের মূল। এইরূপে জীবচৈতন্যই নিখিল কর্মের বীজ স্বরূপ, যাহা অহঙ্কার সহযোগে চেত্যাকার ভাবনাক্রান্ত হইলেই কর্মের ও তৎফলের বীজ, নতুবা অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ। কর্ম বন্ধনের বা ফলের হেতু নহে, কিন্তু উহাতে কর্তৃত্বের ও ভোক্তৃত্বের অভিমানই বন্ধন। নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতীত কর্মসন্ন্যাস লাভ অসম্ভব—কারণ, কর্মবৃক্ষ দেহ বর্তমানে, কিছুতেই (কি প্রবুদ্ধ, কি অপ্রবুদ্ধ, কাহার) ক্ষণমাত্রও কর্ম ত্যাগ হয় না। সকলেই মায়াজাত ত্রিগুণের বশে সদা কর্ম করিতে বাধ্য হয়। নিষ্কাম কর্মযোগী সর্ববিধ দেহ স্পন্দন ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে অর্পণ করত স্বাভিমান ও ফল হীন। অন্য উপায়ে কর্ম পরিত্যাগ বা নিরোধ করিতে গেলে, অভিমানই বৃদ্ধি হয়। প্রবুদ্ধ হইলেও, দেহীর স্বভাব আজীবন অচলভাবেই অবস্থান করে এবং জগতে কালী-স্বরূপ সকল পদার্থের সর্ববিধ স্পন্দনেই অবিদ্যা ভিন্ন অন্য প্রকার স্বভাব নাই। 'সকলই ব্রহ্ম বা কালী' এই চরম জ্ঞানে যথার্থ চিত্তত্যাগ হয় এবং চিত্তত্যাগীই যথার্থ সবত্যাগী সন্ন্যাসী—অন্য কেহ নহে। দেহেন্দ্রিয়াদি যখন কালীর শক্তিরূপী (পুর্যষ্টক), তখন জগতে অন্য কর্তা কোথা (৫৬ পর্ব)? মায়াসাগরের মূলেই মন, বা চিত্ত!

৩। উক্ত অনুচ্ছেদ হইতে বেশ বোধ হইবে যে গুরুরূপিণী জগদম্বা আমার নালিশের যথোচিত উত্তর দিয়া বুঝাইয়াছিলেন—'যাহা হইতেছে সবই তোমার হিতার্থে প্রয়োজনীয়; কারণ, আমি তোমাকে বরাভয় দিয়া প্রয়োজন-সাধিকা। ঝড়-ঝাপটা যাহা আসিতেছে, তাহা তোমার কর্মফল প্রসূত এবং হঠাৎ বন্ধ হওয়া ভাল নহে। স্বতঃই উহা কমিয়া আসিতেছে, শীঘ্রই বন্ধ হইবে এবং তুমি বর্তমানের নিরাপদ স্থান হইতে দেহান্তে মুক্তিধামে নীত হইবে—চিন্তা নাই! জাহাজটিকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য, তোমার ইচ্ছা কিয়দংশে পূর্ণ হইয়াছে।' বর্তমান কালে এই নিরাপদ স্থান, আমার তাঁহার আয়োজনে সর্ববিধ নূতন কর্ম ত্যাগ করিয়া এই পুস্তকগুলি প্রণয়নে অক্লান্ত অভিনিবেশ! জীবনে অনেক কর্ম বাকী ছিল বলিয়াই, প্রেমময়ী জগদম্বা আমাকে ট পর্বে বর্ণিত ঘটনার ভবরোগের 'দাওয়াই' মুখে তুলিয়া দিতে গিয়াও দিতে সক্ষম হন নাই। কর্মফল থাকিতে, দৈবাধীন দেহ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়া বর্তমান থাকিবেই!

যতীন-আনন্দময়ী

বিষয়—শ্যামবাজারের আনন্দময়ীর মন্দিরের বাহিরের বারাণ্ডায় উপবিষ্ট থাকিবার কালে, বুক পকেটের ভিতরস্থ অর্থে কাকবিষ্ঠা পতন।

স্থান—উপরে উক্ত।

কাল—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮—বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

উক্ত দিবস, একটি বাড়ী বিক্রয়ের দলীলের খসড়া অনুমোদনের নিমিত্ত, হাইকোর্টের নিকট এটর্ণির দপ্তরে দুপুরে গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিবার কালে, উক্ত মন্দিরের রকে পা ঝুলাইয়া উপবিষ্টাবস্থায় বাসের অপেক্ষায় আছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যে, মাকে কিছু পয়সা দিয়া পূজা দেওয়া প্রয়োজন—বিশেষতঃ, যখন আমার ঐস্থানে অবশে আশ্রয় গ্রহণ বাড়ী বিক্রয়ে অর্থ প্রাপ্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। তৎক্ষণাৎ, উপরস্থ একটি গাছের ডাল হইতে বুক-পকেটের ভিতরে ও বাহিরে কাকবিষ্ঠা পড়িল ও উহাতে যে অর্থ ছিল তাহা সিক্ত হইল। বুঝিলাম যে, মা ঐরূপ পূজা 'কাকবিষ্ঠা' সম বোধ করেন। বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, নিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তি, ভাব ও প্রেম এই সকল বস্তুই তাঁহার যথার্থ উপহার এবং ইহাদের লাভই তাঁহার পূজার যথার্থ উদ্দেশ্য হায়! মানব মনে করে যে তাঁহাকে কিছু ঘুষ না দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং কামনা পূরণ করিবেন না। সাধারণ লোকের পক্ষে, দেবস্থানে কিছু বাহ্য বস্তু (ফুল, মিষ্টান্ন, অর্থ, ইত্যাদি) নিবেদন শাস্ত্রবিধি বটে, কিন্তু আত্মভাবে প্রিয়রূপে উন্নত ঈশ্বর উপাসক ঐ নিয়মের অধীন নহেন। আত্মভাবে ঈশ্বরদর্শী ব্যক্তি পরাপূজক। তাদৃশ সাধকের পক্ষে কোনরূপ বাহ্য পূজা বিহিত নহে। তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষীরই বাহ্যপূজা শোভা পায়। ভগবান আত্মাই মঙ্গলময় একমাত্র দেবতা, সকলের একমাত্র কারণ ও সদা জ্ঞান উপাদানে পূজনীয়—প্রথম ভাগ, চতুর্দশ অধ্যায়, পাদটীকা (১)। তিনিই সর্ব প্রধান দেব এবং তাঁহার ভিতরেই সব দেবদেবী ও সারা বিশ্ব।

শরদিন্দু-বিবেকানন্দ

বিষয়—স্বামী বিবেকানন্দের শরদিন্দুকে আমার পুস্তকের পাণ্ডু-লিপিকে 'দর্শনশাস্ত্র' রূপে পঠনের পরামর্শ দানের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—(আন্দাজ) অক্টোবর, বা নভেম্বর, ১৯৪৮।

রাত্র প্রায় এগারটায় আমি বিছানায় বসিয়া পুস্তক লিখিতেছিলাম। শরদিন্দু ঐ বিছানাতেই কিছুদূরে নিদ্রিতা হইলেন। উহার আন্দাজ প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যেই তিনি জাগ্রতা হইয়া বলিলেন যে, একজন বিরাট আকার (স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায়) সুপুরুষ মেঝে দাঁড়াইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহুর উপরিভাগে ঝাঁকুনি দিয়া পরামর্শ দিলেন, 'দর্শন পড়্'। শরদিন্দু আরও বলিলেন যে, তিনি ঐ স্থানে বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছেন। এই ঘটনাটি আমার চক্ষের সম্মুখেই হইয়াছিল এবং ইহা ১৮ ও ট পর্বে আলোচিত ঘটনাগুলির সহিত তুলনীয়। এইরূপ স্বপ্নগুলি যে অঙ্কুর রূপে আত্মায় প্রাদুর্ভূত হইয়া বাহু বেদনাটি তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ (১৮ পর্ব, ৩ অনুচ্ছেদ)! বাস্তবিক দেহধারী স্বামী বিবেকানন্দ স্বপ্নে ছিলেন না। শরদিন্দুর আত্মাই বিশ্বাত্মা ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম) এবং তাঁহারই অন্তরে বিবেকানন্দ ও সারা বিশ্ব। সেই আত্মাই কৃপা করিয়া স্বামীজির রূপে তাঁহাকে উক্ত পরামর্শ দিয়া কৃপা ও আমার পুস্তক-গুলিকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বেদাধ্যয়ন, ইত্যাদির দ্বারা আত্মা, বা ঈশ্বর, লভ্য নহেন। যাঁহাকে আত্মা বরণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট আত্মা নিজ স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশ করেন। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসিবেন এবং সেই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে তাঁহাকে লাভ করেন, তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন (অবতরণিকা, ১৫ অনুচ্ছেদ)। আমার পুস্তকগুলির সম্বন্ধে, ৫২ (২) পর্বে আলোচিত আমার স্বপ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রেমবশে যে শুভেচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অভেদাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ এই পর্বে আলোচিত শরদিন্দুর স্বপ্নটিতে প্রেমবশেই আরও বিস্তার করিলেন।

শরদিন্দু-বিবেকানন্দ

বিবেক-আনন্দ জয়, লহ নতি শিবময়,
সপ্তঋষি-মণ্ডলস্থ ঋষি পুরাতন।
স্বপন করি আশ্রয়, দিলে সুযুক্তি আমায়,
পড়িতে এই পুস্তক—ভাবিয়া ‘দর্শন’।
যাম্য উর্দ্ধ বাহু নাড়ি, দিয়া সেথা ব্যথা ভারি,
বুঝালে প্রেমেতে তুমি, সত্য ঐ স্বপন।
হেরি বিরাট আকার, বুঝিলাম আমি সার,
তুমিই বিবেকানন্দ, নর-নারায়ণ।
এই কৃপার কারণ, করিয়াছি নির্দ্ধারণ,
সত্য তুমি গীতা-(০১১৭) গর্ভে হইবে সন্তান।
দূর কল্পনার পার, হলেও ঐ সমাচার,
কভু নাহি মিথ্যা হবে সারদার দান।
হও যদি প্রকটিত, না বুঝি বাল্য-চরিত,
নিশ্চয় করিব কত তব নির্য্যাতন।
সহিতে হইবে, ধন! দিদা’র প্রেম-তাড়ন,
কত দুখ পাবে, দাবি না হ’লে পূরণ।
শিব-দেহী হনুমান, রাখিতে তব সম্মান,
হবেন আসীন যবে বাল্যে তব পাশে।
তব মাতা ভীতা হয়ে, ছুটিবে তোমায় লয়ে,
নাহি বুঝি দোঁহে শিব, বদ্ধ প্রেম-পাশে।
দিদা’র জন্য যখন, করিবে ‘মন-কেমন’,
বাড়ী হ’তে মা’র সাথে আসিবে তখন।
ভুলিবে মন-কেমন, করিবে কত খেলন,
শত চুমে (০১১৮) দাদু-মুখ করিবে স্তম্ভন।

তাঁর পাশে (*১১৯)শুয়ে রাতে, রঙ্গে কহিবে ঘুমাতে,
(*১২০)পাছে কুত্তা দংশে তাঁরে—'ভৌ'-'ভৌ'-'ভৌ' স্বননে।
'ঐ এলো'—'ঐ এলো' বলি, ঘুমাইতে তাঁরে বলি,
দুই হাতে আমা দোঁহে ঢাকিবে যতনে।
(*১২১) ভবে তব আগমন, নহে বিশ্বাস্য কখন,
হব মোরা কুত্তা-দষ্ট, প্রচারি এ-কথা।
তেঁই বুঝি লীলা ছলে, নির্ভয়ে ঘুমাতে ব'লে,
কহিলে রক্ষিবে তুমি (*১২২) সত্য করি কথা।
'নরুনের' জন্য মন, মোর (*১২৩)হলে উচাটন,
ছুটিব ফেলিয়া সব তোমার সদন।
ক্রোড়েতে আসি বসিবে, মন-প্রাণ জুড়াইবে(*১২৪)
ফিরিতে আমারে আর দিবে না তখন।
নাহি আর প্রয়োজন, বাল্য-লীলার কীর্তন,
তোমার যৌবন-লীলা বর্ণনার পার।
কিবা জানি তাহা আমি, জানি মাত্র এই আমি,
দাদু'র সারদা-সেবা তব এক ভার।
দাদু'র পুস্তক কহে, বিশ্বে কেহ পাপী নহে,
ভাবে যদি উহা মাত্র সারদা-স্পন্দন।
সারা বিশ্ব কালীময়, শক্তি-লীলা সব হয়,
হরি-হর-তৃণাবধি শক্তির খেলন।
পুস্তক সার বুঝেছি, দেহাত্মবোধ ত্যজেছি,
কর তাত তত্ত্বজ্ঞান বিশ্বকে প্রদান।
দাদু এবে বৃদ্ধ অতি, শিথিল দেহ-শকতি,
তাঁহার(*১২৫)সারদা (*১২৬) সেবা কর সমাধান। (৪৮)

---

(১২)—পাণ্ডুলিপির (১১৭) হইতে (১২৬) চিহ্নিত স্থানগুলি অবশে কালিতে ঘাম পড়িবার, বা কাগজের স্বাভাবিক, দাগে চিহ্নিত।

যতীন্দ্র-কালিকা (নিদ্রাশক্তি)

বিষয়—দিবানিদ্রোত্থিত হইবার কালে নিদ্রাশক্তি-রূপিণী জগদম্বার সহিত 'রণং দেহি' রবে কলহের কাহিনী।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩রা নভেম্বর, ১৯৪৮—বেলা প্রায় তিনটা।

উক্ত দিবস বেলা প্রায় পৌনে একটায় নিদ্রিত হইয়া, প্রায় দুইটার পর কোন স্বাভাবিক কার্যোপলক্ষে জাগরিত হইয়া পুনরায় তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম। তিনটা বাজিবার ঘণ্টা কাণে যাইতে, উঠিবার চেষ্টা করিলাম—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কোন অঙ্গই একটুও নাড়িতে পারিলাম না, এত প্রবল তন্দ্রাভাব! পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলাম—যেন সমস্ত দেহ শব সম শক্তিহীন। এইরূপ অবস্থাকে খাঁটি নিদ্রা, বা তন্দ্রা, বা জাগরণ কিছুই বলা যায় না—যেন এই তিনটিরই একটা মিশ্রিত অবস্থা! সেই অবস্থায় বেশ মনে হইতে লাগিল যেন কোন অদৃশ্য পরাক্রান্ত দৈত্য আমাকে আক্রমণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত শক্তি হরণ করিয়াছে। এইরূপ অনির্বচনীয় অবস্থা জীবনে পূর্বে কখনও ভোগ করি নাই এবং উহাতে অবস্থিত হইয়া কল্পিত দৈত্যটিকে বলিলাম—'রে পামর! তুই লুকায়িত থাকিয়া আমাকে এমন অভিভূত করিয়াছিস্ যে, আমি সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও আমার একটি অঙ্গুলী নাড়াইবারও শক্তি নাই—উঠিবার কথা তো বহু দূরে। আমি জাগ্রত হইলে তোর যদি সাধ্য থাকে, আমার সহিত যুদ্ধ কর—দেখিব তোর কত শক্তি!' এইরূপ অনেক ঝগড়া—*অবশে পাণ্ডুলিপির এই স্থান চিহ্নিত (১২৭) —*করিলেও সারা দেহেন্দ্রিয় অনেকক্ষণ নড়ন চড়ন শক্তিহীন থাকিবার পর, আমি জাগ্রত অবস্থা লাভ করিলাম এবং জগদম্বার এক শক্তিবল ঠেকে শিখিলাম। স্বেচ্ছাচারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ধৃষ্টতা বশতঃ, আমি তন্দ্রার ঘোরে জগদম্বাকেই 'রণং দেহি' বলিতে সাহস করিয়াছিলাম—অবশ্য, আমার এই ভাব তাঁহারই ইচ্ছা-প্রসূত! এই স্বপ্নটি বুঝাইল যে, জাগ্রত-তন্দ্রা-স্বপ্ন অবস্থাত্রয়ই প্রায় তুল্য!

২। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে আমি (তাঁহারই প্রেরণায়!) তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—'মা! তোকে অনেক করে নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করে, জানিতে

চেষ্টা করিয়াছি এবং পুস্তকে সেই সকল সারতত্ত্ব লিখিতেছি (যাহা একত্রে কোন প্রচলিত পুস্তকেই পাওয়া যায় না); কিন্তু—*অবশে পাণ্ডুলিপির এই স্থান চিহ্নিত (১২৮)—*আশা নাই যে, কখনও সঠিক বুঝিতে পারিব। তুই বড় দুর্জ্ঞেয়া, আর তোর ঐশ্বর্যের একবিন্দুরও যথার্থ ধারণা হয় না। সব ঐশ্বর্যই কি নিজে একচেটিয়া করিতে হয়? সন্তানকে কি কিছুই দিতে নাই? তোর স্বরূপ আমাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দে।' এই ঘটনাটিতে মা আমার ঐ প্রার্থনাটি পূরণ করিয়া যথার্থ অভিজ্ঞতা দানের দ্বারা বুঝাইলেন যে, তিনিই বিশ্বের সর্বশক্তির আধার—'বিশ্বের শকতি আমি, আমি বিশ্বময়ী'— এবং তিনি বিনা বিশ্ব শবোপম! শিব, কৃষ্ণ, ইত্যাদি বিশ্বের মূল কারণ অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, কুলকুণ্ডলিনী, বা প্রাণশক্তি, হীন তাঁহারাও শব সম। দেবীগীতায় জগদম্বা হিমালয়কে বলিয়াছেন (প্রথম ভাগ প্রথম অধ্যায়, ৯ অনুচ্ছেদ)—'ঈশ্বরও আমার মায়াশক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেন; অতএব, তিনিও আমার শক্তির অধীন জানিবে। আমিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, আমিই তাঁহাদের শক্তি এবং আমি ভিন্ন কিছু নাই। একমাত্র আমিই জীব ও ঈশ্বরাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইতেছি।' শিবাগম বলিতেছেন—'শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, বিষ্ণু—*অবশে পাণ্ডুলিপির এই স্থান চিহ্নিত (১২৯) —*শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি ও গ্রহগণ শক্তি স্বরূপ—অধিক কি, এই নিখিল জগৎকেই যে শক্তিরূপে বুঝিতে পারে না, যে নারকী।' বিশ্বের সর্ববস্তুই যে বিশেষ বিশেষ শক্তির আধার—ইহা বুঝা কঠিন নহে। প্রস্তর, ধাতু, জল, নদী, পর্বত, বায়ু বিজলী, ইত্যাদি সবই নানাবিধ শক্তির আধার এবং ইহাদের শক্তিকে যে জাতি যত অধিক প্রয়োগে সক্ষম, সেই জাতি জগতে ততই উন্নতিশীল। নানা বিজ্ঞানবিৎ, বস্তু সমূহের নানাবিধ শক্তি আবিষ্কারের চেষ্টায় সারা জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অল্পেই বোধ হয় বুঝেন যে, এই সকল বস্তুর ও তৎ-শক্তির মূলেই অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী জগদম্বা। দেবী ভাগবতে তিনি বলিতেছেন—'আমিই বুদ্ধি, শ্রী, ধৃতি, কীর্তি, মতি, স্মৃতি, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ইত্যাদি। আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি? আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন্ বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে? ফলতঃ, আমি এই সংসারে (আত্মরূপে অধ্যস্ত) অখিল বস্তুরূপে বিদ্যমান। বস্তুজাত মাত্রই উৎপন্ন হইলে, সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট হই। ফলতঃ পুরুষকে (বা বিশুদ্ধ বোধকে) নিমিত্ত মাত্র করিয়া আমি বিশ্বে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করি।' বিশ্বাত্মা ও অনন্ত বিশ্বশক্তি ও ঐশ্বর্য রূপিণী তাঁহার ইচ্ছা ও

শক্তি ব্যতিরেকে, বিশ্বে অগ্নি জ্বলে না, বায়ু ও তৃণ নড়ে না, জল আর্দ্র করে না ও দেহেন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে না। অতএব, সারা বিশ্বের ভাল বা মন্দ সার্ব-কালিন সর্ববিধ স্পন্দনই তাঁহার। তিনি বিশ্বে একাকিনী এবং অন্য বস্তু যেন থাকিয়াও নাই, বা তিনিই! এই সকল বিষয়, পুস্তকের প্রথম ভাগে নানা অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় ভাগে নানা পর্বে আলোচনা হইয়াছে। যখন বিশ্বে কেহ কোনও বিষয়ে স্বাধীন নহে, তখন জগদম্বাকে সর্বার্পণ করিয়া অবস্থিত হইলে, বা তাঁহার সহিত নিজ ও সারা বিশ্বের আত্মা-দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ মিলিত করিতে পারিলে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং মানব জন্ম সার্থক হয়। এইরূপ সর্বার্পণে সিদ্ধ ব্যক্তিই অত্যুন্নত প্রেমভক্ত ও পরমাত্মোপম! তাঁহার বাসনা, জগদম্বা!

৩। ঈশ্বর বা ঈশ্বরীকে জ্ঞান-বিচার করিলে এক রকম, ধ্যান করিলে আর এক রকম, আবার তিনি যখন দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দেন, তখন আর এক রকম জানা যায়। শাস্ত্র পাঠে যাহা জানিতাম, তাহাই জগদম্বা কী সুদৃঢ়ভাবে অশেষ আয়োজনে বুঝাইলেন! নিদ্রোত্থিত হইবার শক্তি যখন আমার নাই, তখন নিদ্রার, বা স্বপনের, বা সমাধির, বা অর্চনার, বা দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা কিছু করিবার শক্তি আমার কোথা? যেমন হাঁড়ির একটি দানা অন্নের অবস্থা উহার সমস্ত দানারই অবস্থা বুঝায়, তেমন উক্ত ঘটনা হইতে আমি আমার সর্ববিধ শক্তির অভাবই জানিলাম। যে-কোন দেবের অর্চনা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি, মুক্তি, ইত্যাদি সমূহই তাঁহার ইচ্ছায় আমরা করি' বা পাই। অতএব, হিন্দু শাস্ত্রবাক্য যে জীব নিষ্ক্রিয় আত্মা, তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু, হায়! বিশ্বে কয় জন এই মহাসত্যে যথাযথ আস্থা স্থাপন করিয়া সেই ভাবে ভাবুক? আমরা নিজ শক্তিতে কিছুই করি না, কিন্তু অলীক অহঙ্কার বশে হরি-পূজা করিতেছি বা করিতে পারি—এমন কি, পরে জীব সৃষ্টি অবধি করিব—এইরূপ মনে করি। আমাদের দেহগুলি সর্ব রূপাধারা 'বিন্দু'-ময়ী নানা জীব ও দেবতা-রূপিণী জগদম্বার অভিব্যক্তি (প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়) এবং ইহাদের সর্ববিধ স্পন্দনই 'পিণ্ড'-ময়ী প্রাণশক্তি বায়ু-রূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর ক্রিয়া (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়)! অতএব, এই সকল দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে-সকল স্পন্দন উদিত ও কার্যকরী হয়, সেই সকলই শক্তিদেবীকে নানাভাবে আহুতি দান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইরূপ আহুতির দ্বারা আমরা অহর্নিশি অজ্ঞাতভাবে তাঁহার অর্চনা করি বটে, কিন্তু অহঙ্কার বশে তাহা বুঝি না এবং হরির প্রসাদাম যে শক্তির মহিমা তাহা মানি না (ণ পর্ব, ২ অনুচ্ছেদ)। পূজার এই অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই, এই পুস্তক! কিন্তু, ফলাফল জানি না—কেননা, অহঙ্কার দুরপনেয়।

৪। বাসনোদ্ভূত কর্মফল বশে আমরা পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছি এবং উহার একটুকুও অবশিষ্ট থাকিতে এই গমনাগমন রোধ হয় না। কিন্তু বাসনা কোথা—যদি উহা জগদম্বার শক্তিতে অর্পিত হয়? —কারণ, 'বাঞ্ছা ত্বং সর্ব-জগতাং', বা 'প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য'। পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ নিষ্ক্রিয় আমরা কিছু না করিয়া, বা কিছু ভোগ না করিয়া, কেবল জগদম্বার মায়াশক্তি অহঙ্কারের কর্তৃত্ব বশে অযথারূপে কর্তা ও ভোক্তা সাজিয়াছি। 'জগদম্বাই বিশ্বে সব হইয়া রহিয়াছেন ও সব করিতেছেন'—এই রামকৃষ্ণোক্ত পরম সামান্ত বাণীটি যদি মনে-প্রাণে বুঝিয়া আমরা সংসারে চলিতে পারি, তাহা হইলে আর কর্ম, বা কর্মফল, বা বাসনা, বা অহঙ্কার, বা ভেদবুদ্ধি, এই সবের কোন বালাই থাকে না, সংসারে ভুল পথে চলিতে হয় না, তিনি আমাদের ভার বহন করেন এবং দেহান্তে নিজ চরণে স্থান দেন! এই ভাব হইতেই, তাঁহার সহিত আত্মভাব উদয় হইতে পারে, 'আমি-আমার' ভাব চলিয়া যাইতে পারে ও স্ব-প্রকৃতির দুষ্ট ভাবগুলি ক্ষীয়মান অবস্থা লাভ করিতে পারে। অর্ঘ, নৈবেদ্য, অন্নাদির দ্বারা জগদম্বার বৈধী বাহ্যপূজা ইত্যাদি, তাঁহার নিকট কাকবিষ্ঠোপম—তিনি চান অন্তর-পূজা, বা আত্মভাবে তাঁহাতে সর্বার্পণ (যেমন চালাও, তেমন চলি, যেমন বলাও, তেমন বলি, যেমন করাও, তেমন করি)। প্রাতঃ-কাল হইতে সায়াহ্ন পর্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল অবধি কায়-মনোবাক্যে যাহা কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক কর্ম করি, তৎসমুদয় তাঁহারই পূজা মাত্র (বা, 'বিন্দু' ও 'কুলকুণ্ডলিনী' রূপিণী তাঁহার শক্তিতে আহুতি দান)—এই ভাব তাঁহার অতি প্রিয়। ইহাই প্রেমভক্তি এবং পঞ্চম পুরুষার্থ সাধন! এমন বাহ্য ক্রিয়াযোগহীন অর্চনা ত্যাগ করিয়া, মানব কেন নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার বৈধী অর্চনায় আসক্ত হয়—যাহাতে ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য্য—বিশেষতঃ, এইকালে? প্রেমভক্তের বৈধী সেবা ও পূজার্চনা নিষ্প্রয়োজন। 'এস, বস, লও, খাও, তুমি আমার সখা, বা পুত্র, বা পতি, বা গুরু, বা পিতা, বা মাতা'—এই সব আত্মীয় ভাবই তাঁহার সেবার পদ্ধতি! সর্বার্পণরূপ প্রেমভক্তি বীজ হৃদয়ে একবার রোপিত হইলে, উহা বিনিষ্ট হয় না এবং কালে অক্ষয় ও অব্যয় মহীরুহে পরিণত হইয়া নিজ অস্তিত্ব লোপ করে। তখন 'মা' ভিন্ন জগতে অন্য কিছুই থাকে না এবং ইহা তাঁহার জীবশক্তি ভ্রান্তিমূলক পরা—অহঙ্কারের (বা চিদাকাশের সমষ্টি-স্পন্দনের) একটি নিতান্ত অসৎ বেদান্তোক্ত মরীচিকাবৎ রূপ বলিয়া যথার্থ ধারণা হইতে পারে।

যতীন-দেবমন্দির

বিষয়—বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার অবস্থিত শিবস্থান পাণ্ডবেশ্বরের নিকটস্থ 'চিত্ততীর্থ' নামক স্থানে মন্দির নির্মাণ যুক্তিসিদ্ধ কি না তাহা উক্ত স্থানাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির সাহত পরামর্শ করিবার নির্ধারিত দিবসের পূর্বরাত্রে এইরূপ স্বপন দর্শন—'নৌকা থাকিতে সাঁতার কেন?'

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২১শে নভেম্বর, ১৯৪৮।

কয় মাস পূর্বে, আমি উক্ত স্থানে তিন বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলাম—যদিও পরেউহা রেজেষ্টারী হইয়াছিল। উক্ত স্থানে দেবমন্দির নির্মাণ সুবিধা জনক হইবে কি না, কিরূপ ব্যয় হইতে পারে এবং তাহার পরিচালনাদির কিরূপ সুব্যবস্থা হইতে পারে—এই সব ও আনুষঙ্গিক নানা বিষয় কোন উক্ত স্থানাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শের দিন স্থির হইয়াছিল, ২১শে নভেম্বর। পূর্ব-দিনের রাত্রে এই গভীর বিষয়টি বিশেষ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়াছিলাম—কারণ ঞ পর্বে আলোচিত স্বপ্ন অনুযায়ী মন্দির বেলুড় মঠের নিকটস্থ গঙ্গাতীরে হইবারই সম্ভাবনা। রাত্রে স্বপন দেখিলাম যে আমি একটি নদীতে ডুব সাঁতার দিয়া সেই নদীস্থ এক নির্দিষ্ট (যেন দৃশ্য) স্থানাভিমুখে যাইতেছি ও মাঝে মাঝে বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত স্থানটির কত নিকটস্থ হইলাম তাহা মাথা উঁচু করিয়া দেখিতেছি। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর শুনিলাম যেন অদৃশ্য কেহ আমার অন্তরের গভীরতম স্থান হইতে বলিলেন—নৌকা থাকিতে সাঁতার কেন?' তাহার পর, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

১। অদ্ভুত প্রাকৃত-সমন্বয় যুক্ত আমার মনোভাবের গুপ্তচিত্র স্বরূপ স্বপ্নটিতে আমার আত্মা জগদম্বা যেন বুঝাইলেন যে, আমি মন্দির নির্মাণার্থে একাভিমুখী চেষ্টা করিয়া যাইতেছি, নিজ পুরুষকারের সাহায্যে—কিন্তু উহার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ যথোপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন এবং আমি কিছু বিলম্বে যথাকালে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিব [৪৭ পর্ব, চিহ্নিত স্থান (৮০)]। জগদম্বার ইচ্ছাই সারা বিশ্বের স্পন্দন (বা নিয়তি), জীব সর্ব

শক্তিহীন এবং আমার মন্দির নির্মাণের ও উহাকে নিজ পিতৃ-মাতৃ নামে নামকরণের প্রেরণা, তাঁহারই ইচ্ছা প্রসূত! এই প্রসঙ্গে, ছ, জ ও ই পর্ব বিশেষ দ্রষ্টব্য। সমষ্টি জীবরূপিণী তিনি যে নানাবিধ ব্যষ্টি জীবরূপে বিভক্ত হইয়া বিশ্ব সৃজন করেন, তাহা মহাজীবরূপী ব্রহ্মের 'একোহম্ বহু স্যাম' এই ইচ্ছার লীলা-বিলাস মাত্র। তিনিই ব্যষ্টিজীবের সর্ব বিষয়ে কর্তব্য পদ্ধতি—'ইহা এইরূপেই হইয়া থাকে'—এই প্রণালী অনুযায়ী নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন ইহাই তাহার 'নিয়তি,' যাহা অমোঘ এবং যদনুযায়ী সে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অবশেষই জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করত পরিশেষে স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মত্বে প্রবেশ করে। তাঁহার সঙ্কল্প আর ব্যষ্টি জীবের যত্ন ও ব্যাপার দ্বারা বিশ্বে সকল কার্যই হয়। তাঁহার ইচ্ছা কাম্য ফলসিদ্ধির অনুকূল না হইলে, জীবের ইচ্ছায় কোন বিষয়ে কখনও ফল লাভ হয় না। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া বিশ্বে এই ত্রিতয় যথাক্রমে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের ধর্ম। ঈশ্বর কারণ ও সূক্ষ্ম এবং জীব ত্রিবিধ শরীর বিশিষ্ট ও তাহার স্থূল দেহই সব ক্রিয়ার আশ্রয়। জীব, নিয়তির বিধানে, ভাল বা মন্দ যেরূপ জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া বিশিষ্ট হউক না কেন—সবই ব্রহ্ম বা জগদম্বার ইচ্ছাশক্তি জাত। অতএব, এই সমস্তই তাঁহাকেই অর্পণ করিলে আর ত্রিবিধ দেহের কর্মফলে জড়ীভূত হইতে হয় না এবং তাহাতে উহারা ভঙ্গ হইয়া যায়। অতএব, বিশ্বের সর্ব্বকালীন সর্ববিধ স্পন্দনের মূলেই জগদম্বা, তিনি এখানে একাকিনী, আব্রহ্মস্তম্বাবধি সবই তাঁহার ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়াছে এবং সকলেই যেন থাকিয়াও নাই—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বিশ্ব অখণ্ডভাবে প্রকৃতির লীলা।

৩। উক্ত স্বপ্নটি আমাকে উৎসাহিত করিল এবং আমি বুঝিলাম যে, যদিও আমি এখন বৃদ্ধ এবং বিশেষ কোনও কার্যশক্তি ও সাহায্যকারী হীন, তথাপি মন্দির নির্মাণ ও উহার পরিচালনাদির জন্য জগদম্বাই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন (উ পর্ব দ্রষ্টব্য)। স্বপ্নটিতে আমি যে নিজেকে ডুব সাঁতার দিতে দেখিলাম, তাহার কারণ এই যে, মন্দির নির্মাণ বিষয়ে আমার আজীবন অদম্য প্রেরণার যথার্থ স্বরূপ জগতে (এমন কি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণও) কেহই অবগত নহেন।

৪। এই পুস্তকের 'অবতরণিকা' খণ্ডের শেষ মুদ্রণ শনিবার বাসন্তী দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে, চড়ক ও অন্নপূর্ণা পূজার দিন, ৩১শে চৈত্র ১৩৫৭ সন (১৪ই এপ্রেল, ১৯৫১ সাল) সমাপ্ত হইয়াছিল। পরদিন রামনবমী তিথিতে বরাহনগরে গঙ্গাতীরের নিকটে বেলুড় মঠের উলটা দিকে একটি প্রায় সাড়ে দশ কাঠা জমি অবশেষে বায়না হইয়াছিল এবং উহা ১৬ই অগষ্ট ক্রীত হইয়াছে।

শরদিন্দু-সারদা-জগদীশ

বিষয়—সারদেশ্বরী দেবীর জন্ম তিথিতে তাঁহাকে ভোগ নিবেদন সংক্রান্ত ঘটনাবলী।

স্থান—জামাতা জগদীশচন্দ্রসেনের বাসাবাড়ী, ভাগলপুর।

কাল—২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮।

কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া আমি সপরিবারে ভাগলপুরে আদামপুর পল্লীস্থ গঙ্গাতীরে জামাতার বাসাবাড়ীতে, ২৯শে নভেম্বর হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলাম। ২১শে ডিসেম্বর প্রত্যুষকালে শরদিন্দু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গর্ভধারিণী আমাদের কলিকাতার ভবনে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে গর্ভধারিণীর মত নহে—বরং, সারদেশ্বরী-দেবীর মত—অথচ, শরদিন্দুর মনে হইয়াছিল যে, তিনি গর্ভধারিণীই বটে (২৭ পর্ব দ্রষ্টব্য)। দূরস্থা জীবিতা মাতা অন্ন খাইতেছেন এইরূপ স্বপন আশঙ্কাজনক মনে করিয়া, শরদিন্দু আমাকে স্বপ্নের বিষয় ২২শে ডিসেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে নয়টায় জানাইলেন। আমি তখন পঞ্জিকা দেখিয়া বুঝিলাম যে, ঐ দিনই সারদেশ্বরীর জন্মতিথি এবং তিনিই উক্তরূপে ঐদিন উপলক্ষে ভোগ চাহিতেছেন। অত বেলায় ব্যঞ্জন ও অন্নাদির সংগ্রহ কঠিন বুঝিয়া, পায়স, জিলিপি ও রসগোল্লা ভোগ নিবেদন স্থির হইল এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, ও পুষ্প অনায়াসেই সংগ্রহ হইল। ঘরের রন্ধন ও পূজা অন্তে ভোগ নিবেদনে বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়াছিল। কয়দিন পরে দিবা নিদ্রাকালে শরদিন্দু স্বপ্ন দেখিলেন মা যেন তাঁহাকে বলিতেছেন—'তুই ঘুমো, আমি সব দেখ্‌ছি'। মা বোধ হয় ইহাতে পরবর্তী পর্বে আলোচিত ও অজ্ঞাত ঘটনাগুলির শেষ ফলের ইঙ্গিত দিলেন!

২। রাত্র প্রায় এগারটায় সকলেই শয়ন করিলাম। নিদ্রার কিছু পরেই, জগদীশ নিজ অন্তরেই এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিল—'রসগোল্লা খেয়েছি!' কৃপাময়ী বিশ্বাত্মা ও বিশ্বশক্তিরূপিণী মা জানাইলেন যে, তিনি শরদিন্দুর ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, আর জগদীশ যে রসগোল্লা প্রসাদ পাইয়াছিল, তাহাও বিন্দু ও কুলকুণ্ডলিনীশক্তি রূপিণী তিনি নিজ শক্তিতে আহুতি পাইয়াছেন। পুনরায় নিদ্রিত হইবার কিছু পরেই, জগদীশ উক্ত রূপেই এইরূপ বাক্য শ্রবণ

করিল—'দেখ্লে, ভাত খেলো না, রুটি খাবার ইচ্ছা ছিল!' মা এই বাক্যের দ্বারা জানাইলেন যে, জগদীশের রাত্র ভোজান্তে একখানি রুটি খাইবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া, সে তৎপরিবর্তে রুটির অভাবে ভাত গ্রহণ করে নাই। অতি তুচ্ছ ও আমাদের জানিত ঘটনা হইলেও, জগদম্বা উহার দ্বারা বুঝাইলেন যে, ব্যাপারটি সর্ববিশ্ব নিয়ন্তৃ শিব ও শক্তিরূপিণী তাঁহারই অভিব্যক্তি (৫৬ পর্ব দ্রষ্টব্য)। সেই নিয়ন্ত্রণ শক্তির বশে জগদীশের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর চালিত হইয়া, উক্তরূপ আচরণ করিয়াছিল (পূর্ববর্তী পর্ব ২ অনুচ্ছেদ)। বিশ্বের সর্ব ঘটনাই এইরূপে তত্ত্বজ্ঞের গ্রহণীয়। নির্গুণ পরমাত্মা স্বরূপ ও সর্বশক্তিহীন কোন জীবই, কিছু করিতেছে না; অথচ, মায়াবশে মনে করিতেছে—'আমিই সব করিতেছি' ও 'দেহাদি সবই আমার' এবং সেই অহঙ্কারের ফলে আত্মবিস্মৃত ও বিশেষ দুর্দশাপন্ন হইয়া শত সহস্র জন্মেও মুক্তিরূপ গতি লাভে অসমর্থ হইতেছে। ঘোর তমোগুণ প্রধানা আবরণশক্তি বিশিষ্ট মায়া যখন সত্তামাত্ররূপে প্রকাশিত হন, তখন তাঁহাকে 'মহামায়া' বলে। সেই মহামায়া, মহামোহ উৎপাদিকা। সেই মোহাচ্ছন্ন মানব দেহাত্মবোধে প্রমত্ত হইয়া যেন একটি সাক্ষাৎ কর্ম ও কর্মফলের মূর্তি বিশেষে পরিণত ও নানাবিধ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া, মায়িক বিষয় সমূহে আসক্ত হইয়া পড়ে, অনুকূল বিষয়ে হর্ষ ও প্রতিকূল বিষয়ে শোক প্রাপ্ত হয় এবং জন্ম, জরা ও মৃত্যু ইত্যাদির দ্বারা বহুবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে থাকে। মানবের ভোগ বাসনায় আহুতি দিবার উদ্দেশ্যেই প্রেমময়ী জগদম্বা নিজেই অলীক বিশ্ব পদার্থ সমূহে (পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ ধারণ করিয়া)—প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২ (৫) অনুচ্ছেদের শেষাংশ—তাহার কর্মফল অনুযায়ী তাহাদের সঞ্চালিত করিতেছেন। অতএব, আত্মজ্ঞানে দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিয়া মানবের তাঁহাকেই সর্বার্পণ বিধেয়। এইরূপ অবস্থার স্বভাব অনুযায়ী কোন বৈধী ভোগই পুরুষকার বলে পরিত্যাজ্য নহে—বরং, পরিত্যাগ করিবার চেষ্টাই দেহাত্মবোধ প্রকাশ করে (প্রথম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ অনুচ্ছেদ)। আত্মজ্ঞানী যে-ব্যক্তি দেহে ও মনে ত্রিগুণের কার্যকে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করে না, সে'ই ত্রিগুণাতীত এবং মুক্তি পথের যথার্থ যাত্রী (গীতা : ১৪-২২)। যখন মানব অভিমান শূন্য হইয়া আত্মজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন শ্রুতি নিস্তেজ হয় এবং সে সাধারণ বিধি-নিষিধের গণ্ডী অতিক্রম করত স্বাধীনতা লাভ করে। শাস্ত্র মতে অন্নাদি ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া খাইতে হয়। কিন্তু, আত্মজ্ঞান বা সর্বার্পণের দ্বারা সেই নিবেদন স্বতঃই হইতে থাকে।

যতীন-তান্ত্রিকক্রিয়া

বিষয়—রাত্রে কোন একটি বাড়ীর ঘরে শয়নাবস্থায় বোধ হইল যেন, কতকগুলি লোক উহার ঘর সমূহের দরজাগুলিকে চিহ্নিত করিয়া একটি সিঁড়ির পার্শ্বস্থ দোতলার ঘরে মাতলামি করিতে লাগিল, আমি একাকী তাহাদিগকে তাড়া করিয়া বাড়ী হইতে দূর করত, সদর দরজায় পাহারা দিতে লাগিলাম এবং তৎপরে তাহারা দলপুষ্টি ও আমাকে অগ্রাহ্য করত পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নানারকমে জঘন্য মাতালের খেয়াল চরিতার্থ করিতে লাগিল—এইরূপ স্বপন দর্শন।

স্থান—জামাতার বাসাবাড়ী, ভাগলপুর।

কাল—জানুয়ারীর প্রথম ভাগ—১৯৪৯।

উক্ত স্বপ্নটিতে, বাড়ীটি আমার কলিকাতাস্থ বাড়ীই ছায়াকারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং ঘরের দরজাগুলি যে চিহ্নিত হইয়াছিল, তাহা আমার বিরুদ্ধে আমার বিদেশে অবস্থান কালে আমার বাড়ীস্থ কোন কোন আত্মীয়ের তান্ত্রিক ক্রিয়াদি, ভূতচালনা ও শল্যাদি স্থাপন করত বাড়ীতে দুইদল সৃষ্টি করিয়া গৃহ-বিচ্ছেদের ও ক্রমে বাড়ীটিকে শ্মশানে পরিণত করিবার শুভ চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিল। তান্ত্রিক অন্যবিধ ক্রিয়াম ও ভূত চালনায় আমার অর্থহানি ও জীবন নাশের চেষ্টা, আন্দাজ প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব হইতেই চলিতেছিল এবং আমার প্রায় পাঁচ শত টাকা নানা সময়ে অসম্ভব ভাবে (মার্চ ১৯৪৬ হইতে) বাক্স ও লোহার সিন্দুক হইতে হাওয়াতে পরিণত হইয়াছিল। চাবি ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও, উহা নিবারণে আমি অক্ষম হইয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। এইরূপ করিবার একটি কারণ পূর্বে ১২, ১৪ ও ১৫ পবে উক্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় কারণটি আমার স্বোপার্জিত ধনে ও সম্পত্তিতে তাহাদের অযথা অধ-স্ফুট, অবৈধ দাবী! তান্ত্রিকগণকে বলা হইয়াছিল যে আমি ক্রোর ক্রোর টাকার আত্মীয় বঞ্চনা-পরায়ণ মালিক এবং যদি তাহারা ক্রিয়ায় সফল হয় তাহা হইলে উহার একটা মোটা অংশ লাভ করিয়া তাহারা বগলামুখীর বড় মন্দির স্থাপন করিতে পারিবে। উহার জন্য নাকি একটি স্থান নির্বাচিত হইয়াছিল।

২। উক্তরূপ দাবীর কারণ এই যে, আমি তাহাদের এক সংসারে একান্নবর্তী রাখিয়া পালন করিয়াছিলাম, যজ্জন্ত তাহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্ধাংশের ন্যায্য মালিক! ১৯৪৮ সালের কালীপূজার রাত্রে, (৩১শে অক্টোবর ১৯৪৮) 'আমাদের' মা সারদেশ্বরী শরদিন্দুকে স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন—'ওনাকে (অর্থাৎ, আমাকে) সাবধানে রাখিস্।' অমাবস্যা তিথি তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিশেষ উপযোগী। ১৭ই নভেম্বর রাত্রে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম উহাদের বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা ধর্মসঙ্গত হইবে কিনা। প্রশ্নের ঠিক উত্তর না দিয়া কৃপাময়ী আমাকে স্বপনে বলিলেন—'তুই একটা মাদুলী পর।' আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—'যাহার জন্ম তুমি নিজে চিন্তিত, সে মাদুলী পরে না—এই বিষয়ে আমি তোমার কথা শুনিব না'। দুইবার, অমাবস্যার পরদিন আমি উক্ত আত্মীয়দিগের একটির দ্বারা আনীত পাঁঠার মস্তিষ্ক মা কালীর পূজার প্রসাদ বোধে পাইয়াছিলাম। তৃতীয় বারের উক্ত প্রসাদ শরদিন্দু সন্দেহ করত আমায় খাওয়ান নাই। পরে, (সেই সময়ের) ৭৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট নিবাসী, তান্ত্রিকাচার্য, পুরাতন বন্ধু হরিদাস জ্যোতিবার্ণব মহাশয়ের নিকট হইতে জানিলাম যে, আত্মীয়টির তান্ত্রিকগণ তাঁহার পরিচিত এবং একজন নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যে-ব্যক্তি উক্ত মস্তিষ্ক একবার মাত্র খাইয়া উলঙ্গ ও পাগল হইয়া বিচরণ করে না, সে সাধারণ ব্যক্তি নহে।' সারদেশ্বরী দেবীর স্বপ্নগুলিতে ইঙ্গিত পাইবার পর, আমি উক্ত আত্মীয়দিগকে আমার বাড়ী ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলাম। উহাতে নাকি একটি আত্মীয় আমাকে 'দেখে লইতে হইবে' এইভাব প্রকাশ করিয়াছিল! তাহারা ২২শে জানুয়ারী ১৯৪৯, যেন বিশেষ নিগৃহীত এই ভাবে এবং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু, একটি শ্যালক-পত্নী এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের বিশেষ সহানুভূতির (কারণ, তান্ত্রিক ক্রিয়া মিথ্যা!) সহিত বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল। আত্মীয়দিগের, কাশীতে রেলের কর্মচারী কোন বড় তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। তিনিই আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিচার ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই আশায় যে, আমি মৃত হইলে, তাঁহার শিষ্য ও শিষ্যা তাঁহাকে আমার সম্পত্তির মোটা অংশ দিয়া মায়ের মন্দির নির্মাণ করাইবে। হরিদাসবাবু হইতে, সেই খবরও (তাঁহার কোন তান্ত্রিক বন্ধুর নিকটে প্রাপ্ত) আমি ১৯৪৮ সালেই পাইয়াছিলাম। ১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সালে, গুরুটি হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছিলেন—ইহার নৈমিত্তিক কারণ কী, তাহা কে জানে? আমি মনে করি যে, ইহা আমার উপর জগদম্বার কৃপা! তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ও আমার পুস্তক উপলক্ষে, হরিদাসবাবু মায়ের নিকট হইতে আমার বিষয়ে পাঁচটি অদ্ভুত স্বপ্ন পাইয়াছিলেন (৫২ (২)

পর্ব দ্রষ্টব্য) এবং সেইগুলিকে আমার এই পুস্তকের উদ্দেশ্যে উপহার স্বরূপ দিয়াছেন। সেই স্বপ্নগুলিকে এই পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিব। সেইগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, জগদম্বাই যেন হরিদাসবাবুকে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কুফল হইতে আমার সংসারকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন।

৩। তান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল বিষময়। ইহা হইতে মহাপুরুষগণও অব্যাহতি পান না—যেমন, শঙ্করাচার্য (ভগন্দর রোগে) এবং বিবেকানন্দ (রক্তামাশয় রোগে)। ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমনের পরে, বাড়ীতে দুইদল সৃষ্টি হইয়া ভাইয়ে-ভাইয়ে, জায়ে-জায়ে, আমাদের সহিত জ্যেষ্ঠ ও (তাহার ক্রীতদাস, সুশিষ্য ও যন্ত্র) কনিষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠা পুত্রবধুর এবং আমার একটি শ্যালক ও তৎপত্নীর ভিতর, নানা বৃথা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, বাড়ীতে কাহার কাহার চক্ষে নানাস্থানে প্রেতও দৃষ্ট হইল এবং কনিষ্ঠ পুত্রটি তাহার স্ব-স্বভাব ত্যাগ করত বিভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া (২১ পর্ব, ৪ অনুচ্ছেদ) ইণ্টারমিডিয়েট পাঠ ত্যাগ করিল। তাহার উদ্দেশ্যে বিপক্ষের তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রখর ভাবেই হইয়াছিল—বোধ হয় এই কারণে যে সে যদি মরে, বা পাগল হয়, বা পিতা ও মাতার সতত বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে আমি ও শরদিন্দু বিশেষ দুর্দশাপন্ন হইব। অন্য মতলব—সমস্ত টাকা উবিয়া যাইবার দায়িত্ব তাহার ঘাড়ে অর্পণ করা —যাহা আমার শেষ সাবধানতা নিবন্ধন, সুদূর কল্পনারও অতীত! অক্টোবর ১৯৪৫ সালে দেওঘর বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী স্বামীজী তাহার বিষয় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ' অখিলের মত স্বভাবান্বিত সৎ-ছেলে বিদ্যাপীঠে নাই। তবে তাহার খেলার দিকে ঝোঁক নাই।' বাড়ীর সদর দরজার নিকট হইতে দুইটি ' শল্য ' জুন, ১৯৪৯ সালে উদ্ধার হইয়াছিল—প্রথমটি, হরিদাসবাবুর চেষ্টায় এবং দ্বিতীয়টি আমার স্বহস্তে একটি গোময় পাতের (জগদম্বার অশেষ কৃপা বশতঃ) চিহ্ন যথা স্থানে দেখিয়া। জানুয়ারী ১৯৫০ সালে, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার আদেশেই বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল। দোতলায় সিঁড়ির পার্শ্বস্থ তাহাদের গৃহ হইতেই সমস্ত মিছা গণ্ডগোল উপস্থিত হইত। সেই গুলিকে, এক কথায়, মাতালের প্রলাপ, বা মাতলামি, বা অনধিকার চর্চা, বা আমার উপরেও কর্তৃত্ব স্থাপনের অযথা চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। এইরূপে আমার এই স্বপ্ন এবং গীতার আ পর্ব বর্ণিত স্বপ্নটি প্রাকৃত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল! কিন্তু যোটের উপর, ছোট পুত্রটির অভাবনীয় ও শোচনীয় বিকৃতি ভিন্ন (২১ পর্ব দ্রষ্টব্য), জগদম্বা আমাদিগকে অশেষ শান্তি পরিশেষে দান করিলেন।

যতীন-শ্রীহরি

বিষয়—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া ভাবমুগ্ধ অবস্থায় আমার মুখ দিয়া অনবরত ফেনা নির্গত হইতেছে এইরূপ দিবা স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৪ঠা মার্চ. ১৯৪৯—বেলা প্রায় আড়াইটা।

উক্ত কালে স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি ভগবান কৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া এমন ভাবমুগ্ধ হইয়াছি যে, মুখ দিয়া অনবরত ফেনা নির্গত হইতেছে এবং পৌত্র বুদ্ধদেব যখন হতভম্বভাবে উহা দেখিতে আমার নিকটে আসিল, তখন তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম। সমস্ত ঘটনাটি অদৃশ্য ভাবেই ঘটিয়াছিল, অথচ উহার বোধ এত গাঢ় ও দুরপনেয় যে, কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না যে উহা ঘটে নাই।

২। এই স্বপ্নটি ১৯ পর্বে আলোচিত স্বপ্নের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয়। প্রথম স্বপ্নটির ন্যায় এই স্বপ্নটিও আমায় বুঝাইল যে, বিশ্বে সমস্তই অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ আমার আত্মা হইতে জাত হইযাছে, উহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহাতে লীন হইতেছে এবং উহাই সর্বোপকরণ সম্পন্ন। আত্মস্থ শ্রীকৃষ্ণ, স্বপ্নটিতে সমস্তই নিরাকাররূপে প্রকটিত করিয়া আরও বুঝাইলেন যে. বাহ্য বিশ্ব বাস্তবিক নিরাকার ব্রহ্ম-স্বরূপ— অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র, বা কিছুই নহে।

৩। ঈশ্বর দর্শনের ফলে ভাবমুগ্ধাবস্থায় মুখ হইতে ফেনা নির্গত হওয়া, প্রেমভক্তির পরম ও চরম অবস্থা প্রকাশ করে। সেই ভাবে, এই স্বপ্নটিও ২৩ ও ২৪ পর্বে আলোচিত স্বপ্নগুলির বিস্তৃতি মাত্র! ভগবান নিজেই বলিয়াছেন (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়. ১০ অনুচ্ছেদ)—'ভাবে যাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়, প্রেমে যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় এবং কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া কখনও হাসে, কখনও কাঁদে কখনও বা নৃত্য করে—সেইরূপ পরম ভক্ত নিজকে যে পবিত্র করে সেটা আশ্চর্যের বিষয় নহে, এমন কি সে সারা বিশ্বকেও পবিত্র করে।' ৫৯ পর্বে আলোচিত স্বপ্নে আমার যে গোলকধামে প্রাথমিক গতি অনুমিত হইয়াছিল, তাহা আমার এই স্বপ্নদৃষ্ট আন্তর অবস্থার ফল বুঝিতে হইবে। পরে, ৭৫, ৭৭ ও ৭৮ পর্বও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

যতীন—শ্রীহরি

জয় জয় কৃষ্ণধন, ভক্ত আত্মা-দেহ-মন,
বংশী-ধারী শ্রীমধুসূদন।
দুষ্টজন দর্পহারী, সেবক রক্ষণকারী,
নারায়ণ কমল লোচন।
কৃষ্ণ জিষ্ণু রাধানাথ, বিশ্বপতি রমানাথ,
গোবিন্দ মাধব পীতাম্বর।
জনার্দন চক্রপাণি, বেদগর্ভ সর্বজ্ঞানী,
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প তরুবর।
অগতির তুমি গতি, লহ যতীনের নতি,
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার বিধাতা।
সারা বিশ্বের মুরতি, সারা বিশ্ব অভিব্যক্তি,
ভক্তজন ভয়-শোক ত্রাতা।
কেশব পুরুষোত্তম, মহাকাল মহাযম,
বিশ্বনাথ ব্রহ্মসনাতন।
সদাশিব অপ্রমেয়, অবিচিন্ত্য অবিজ্ঞেয়,
ধর্ম-রূপী বৃষভ-বাহন।
বিশ্ব তোমার আকার, তবু সেই সাক্ষাৎকার,
করিতে না পারে সাধারণ।
কৃপা করি যার প্রতি, হও সকরুণ মতি,
লভে তোমা প্রেমে সেই জন।
হলাহল পারাবার, এই মায়িক সংসার,
ভয়ে কাঁপে সদা মোর মন।
দাও প্রাণ! কৃপা লেশ, হর যতীনের ক্লেশ,
বড় জ্বালা ভবের খেলন। (২৪)

যতীন-কালিকা

বিষয়—জলন্ত ও জীবন্তের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট কালীঘাটের কালী মূর্তি দর্শনের দিবা স্বপন। (এই পর্বটির, প্রথম প্রুফের আরম্ভ হইবার পূর্বস্থ দুইটি স্থল, অবশে কালির দাগে রঞ্জিত)।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৫ই এপ্রেল, ১৯৪৯—বাসন্তী সপ্তমী পূজার দুপুর বেলা।

উক্ত স্বপনের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কৃপাময়ী মা উক্তরূপে অনেকবার দর্শন দিয়াছেন, এবং চক্ষুতে চক্ষু ও দেহেতে দেহ মিলাইয়া একত্ব স্থাপন করিয়াছেন (৪৬ ও ৪৮ পর্ব)। আমার শয্যাপার্শ্বে পুস্তক লিখিবার স্থানে অশেষ আয়োজনে অবতরণিকা খণ্ডের দ্বিতীয় পট স্থাপন করাইয়া সদাই আমাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সদা অবস্থান, ইহা একটি মহা আশ্রয়। সেই আশ্রয়ের মহান্ স্বরূপ হরিদাসবাবুর দ্বারা দৃষ্ট স্বপনগুলি ও ৬৭ পর্বে হইতে বুঝা যাইবে—পুস্তকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। আমি যে তাঁহার দৃষ্টিতে সদাই স্থিত, মা তাহাই জানাইলেন—কারণ, প্রায় সেই সময়ের কিছু পর হইতেই ৬৪ পর্ব বর্ণিত তান্ত্রিক ক্রিয়ার কুফল সংসারকে (বিশেষতঃ, ছোট পুত্রকে) বিশেষ আলোড়িত করত সকলকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়াছিল।

২। 'তিনিই আমি' এবং 'আমিই তিনি'—যেমন গঙ্গার জলই গঙ্গা এবং গঙ্গাই গঙ্গার জল! আমার সর্বদেহ—পাদের অঙ্গুলী, গোড়ালি, জানু, উরু, ত্রিকোণ স্থান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, হস্ত, মুখ, নাসা, কর্ণ, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্র—তাঁহার এই সমস্ত বিরাট চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই শক্তির অতি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি (২৬ পর্ব)। তাঁহার এই সকল শক্তি বিনা আমার দেহে কোনবিধ স্পন্দন অসম্ভব। অতএব, এই বিশ্বে তিনি ভিন্ন আর কাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ থাকিব? আবার, যখন সেই সকল অযাচিত কিন্তু প্রয়োজনীয় দানের অধিকারী হইয়াও দেখি যে, আমি সদাই তাহার চক্ষের সম্মুখে আশ্রিতভাবে বর্তমান, তখন তাঁহার গুণের বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া বাক রোধ করে। আশ্রিত হইলেও, কর্মফলভোগ প্রয়োজন ও অনিবার্য (৬০ পর্ব)।

যতীন্দ্র-কালিকা

বিষয়—দিবা নিদ্রোত্থিত হইবার কালে কালীমাতার প্রকটন এবং সশব্দে মুখে চুম্বনের পরে আমার জাগরণ।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩০শে মে, ১৯৪৯।

পূর্বে ৬৪ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদে আমার শ্যালক ও তৎপত্নির ভিতর যে কলহের উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা উক্ত দিবসের বেলা নয়টায় তুমুল আকার ধারণ করত বাড়ীতে দুই দলে বিশেষ অশান্তি সৃজন করিয়াছিল। তজ্জন্য, আমরা সকলেই বিশেষ দুঃখিত ছিলাম। বেলা প্রায় একটায় নিদ্রিত হইয়া আমি যখন প্রায় সাড়ে তিনটায় তন্দ্রা অবস্থায় কয় মিনিট চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন কালীমাতা প্রকটিতা হইয়া সশব্দে আমার ডাহিন গণ্ডের মধ্যস্থলে একটি প্রেমপূর্ণ চুম্বন করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মেলিয়া যদিও সেখানে তাঁহাকে বা অপর কাহাকে দেখিতে পাইলাম না, তথাপি উক্ত স্থানে যেন জীবন্ত ব্যক্তির একটি বেশ প্রেমপূর্ণ চুম্বন অনুভব করিলাম। মা'ই চুম্বন করিয়াছিলেন। হায়! মানব এই প্রেমময়ীকে নিষ্ঠুরা মনে করে! পূর্ববর্তী পর্বে মা আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, আমি সদাই তাঁহার চক্ষের সমক্ষে আশ্রিতরূপে বিরাজ করিতেছি। এই পর্বে, তিনি আমার মানসিক অবস্থার সহিত সমবেদনায় স্নেহ চুম্বন করিয়া এই আশ্রয়ের সত্যতার প্রমাণ দিলেন। মায়ের চুম্বন সশব্দে যে লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান জগতে আর কে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাকেও সংসারে কর্মফল প্রসূত নানাবিধ জ্বালা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দেহ ধারণে কষ্ট ভোগ অনিবার্য। ঘটনাটির কয় মাস পরে, আমার শ্যালক আমার বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল।

ষষ্ঠ দশ-কালিকা-তান্ত্রিকক্রিয়া

বিষয়—আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া অবলম্বনে এবং সেই সকল প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার গুলিতে জগদম্বার নানাবিধ কৃপা ও সাহায্য প্রাপ্তির সামান্য বর্ণনা।

স্থান—গঙ্গাতীর, আমাদের শয়ন ঘরদ্বয় ও বাটী-সংলগ্ন সম্মুখের জমি।

কাল—ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯।

পূর্বে ৬৪ পর্বের ২ অনুচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, জগদম্বাই যেন হরিদাস জ্যোতিষার্ণব মহাশয়কে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কুফল হইতে আমার সংসারকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। মায়ের দ্বারা প্রকটিত পাঁচটি স্বপনের প্রথম তিনটিতে, আমার বিরুদ্ধে ক্রিয়ার স্বরূপ তিনি হরিদাসবাবুকে জানাইয়াছিলেন। প্রথম স্বপ্নটি ২১শে ফেব্রুয়ারী, দ্বিতীয়টি ২৫শে ফেব্রুয়ারী ও তৃতীয়টি ৯ই মার্চ, ১৯৪৯ সালে, বিভিন্ন স্থানে রাত্রে তাঁহার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল। স্বপ্নগুলির বিশদ বিবরণ পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিত হইবে। সংক্ষেপে, তিনি জগদম্বা হইতে নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ পাইয়াছিলেন—

(১) "আমার শক্তি বলেই, আমার বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবক যতীনকে তুমি তাহার শত্রুগণের তান্ত্রিক ক্রিয়ার কুফল হইতে উদ্ধার করিবে। প্রয়োজন হইলে, তোমাকে তাহার শত্রুদিগের বিরুদ্ধে মারণ যজ্ঞও করিতে হইবে।

(২) যতীনের শত্রু তিনটি আত্মীয়। উহাদের উপর মায়া-মমতায় সে বিপদে পড়িয়াছে ও নানাবিধ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। শত্রুগণ তাহার সংসারে প্রাণহানিরও চেষ্টা করিতেছে।

(৩) যতীনের বাড়ীর মাটীতে তান্ত্রিক 'শল' আছে। তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই তান্ত্রিক ক্রিয়ার প্রতিরোধ প্রয়োজন। বিতাড়ণ করিবার জন্য দুইটি প্রেতাত্মা যতীনের সংসারের দুইটি প্রাণনাশের চেষ্টা করিবে। আমার সাহায্য বলেই, তোমার প্রতিক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটিবে না।

(৪) শত্রুগণের অমঙ্গল হইবে—তাহারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন ও রোগগ্রস্থ হইয়া ধ্বংসের পথে যাইবে ও নানা কষ্টে দেহত্যাগ করিবে।"

২। হরিদাস বাবু তাঁহার একটি তান্ত্রিক বন্ধু সাধনবাবুর সহিত, আমার বহু

অর্থ ব্যয়ে, তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াদি কয় বার উক্ত আট মাসে করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কঠিন আমাশয় রোগের প্রতিকারার্থেও আমি ৮ই ফেব্রুয়ারী মায়ের পূজা ও হোমাদি করিয়াছিলাম—কারণ, শত্রুদিগের তান্ত্রিক ক্রিয়ার যথার্থ স্বরূপ জানিতাম না। (+) পূজান্তে, মায়ের ঘটের উপরিস্থিতি পত্র ও পুষ্পগুলি কাঁপিতে কাঁপিতে (যেন অনিচ্ছায়) কয়েকটি পত্র ও পুষ্প ভূমে আশীর্ব্বাদরূপে নিপাতিত করিয়াছিল (+)। [(+) চিহ্নদ্বয় মধ্যবর্ত্তী বাক্যটি প্রথম প্রুফে অবশে কালির দাগে রঞ্জিত]। উহার পর হইতে তাহার রোগ কিছু উপশম হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহার গৃহটিও পরিশেষে বাড়ীর প্রভুত অকারণ গণ্ডগোলের উৎপত্তি স্থান রূপে পরিণত হইয়াছিল—যদিও সে জানিত যে বাড়ীতে বিষময় তান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল ও ভৌতিক দর্শনাদি চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে, তাহার স্বহস্তে লিখিত নিম্নোক্ত স্বপ্নটি দ্রষ্টব্য—

"২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে চারিদিক হইতে শত্রুর দল বিষাক্ত, গ্যাস বোমার মত আমার উপর যেখানে সেখানে নিক্ষেপ করিতেছে এবং আমি, প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার্থ ব্যস্ত। এই বিষাক্ত গ্যাসে মানুষের মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং শেষে দম বন্ধ হইয়া মৃত্যু হয়। শত্রুপক্ষ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আমার যেখানে সেখানে উহা হস্তের দ্বারা নিক্ষেপ করিতেছে এবং অনেক স্থলে এই গ্যাস স্বপ্নাবস্থায় আমার নাকে অনুভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমার মস্তিষ্ক যে বিকৃত হয় নাই ইহাই আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি এবং বাঁচিয়াও আছি। আমার নিজের দলের কয়েক জন পাল্টা বিরুদ্ধ গ্যাস মাঝে মাঝে ছুড়িতেছে—সে গ্যাস শত্রুপক্ষের গ্যাসের ফল কাটাইতেছিল এবং অনেক স্থানে এরূপ পাল্টা গ্যাসের ফলেই আমি বাঁচিয়াছি। তাহার পর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।"

দুর্ভাগ্যেই সে তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তৎফল মানিতে পার নাই, নিরীহ কনিষ্ঠ ভ্রাতাতে অবিশ্বাসের বিষ সদা ঢালিত ও অন্যান্য নানাবিধ গুরুদ্রোহিতা অনেক বৎসর নাগাত আমার ও তাহার মাতার সম্বন্ধে দিবারাত্র শিক্ষা দিত। ইহাই সকলের নিয়তি! এই প্রসঙ্গে ১২, ১৪ ও ১৫ পর্ব দ্রষ্টব্য।

৩। হরিদাস বাবুর তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াগুলির স্বরূপ আমি কিছু জানি না। অগষ্ট মাসের শেষ নাগাত তিনি আমাকে জানাইলেন যে, শত্রুপক্ষ তাহাদের বাড়ীর নিকটস্থ অন্য তান্ত্রিকের সাহায্যে আমার—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত (১৩০)—*সংসারে সকলের বিরুদ্ধে (কাহাকে বাদ না দিয়া) মারণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, যাহা তিনি কোনরূপে বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাকেও প্রতি-মারণ যজ্ঞ না করিলে

আর উপায় নাই এবং ইহা মায়ের নির্দেশও বটে (১ অনুচ্ছেদ)। আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহাতে সম্মত হইয়াছিলাম এবং যজ্ঞও একরাত্রে গঙ্গাতীরে হইয়াছিল ; কিন্তু, 'শত্রু কূলের নিধন,' এই সঙ্কল্পে আমি কিছুতে সম্মত না হওয়াতে ঐরূপে শেষ হোমাহুতি দান হয় নাই। হরিদাসবাবু বলিয়াছিলেন যে, আমি ভাল কাজ করিলাম না—কিন্তু, কিছুদিন পরে জানাইলেন যে, শত্রু পক্ষের তান্ত্রিকের কালীমূর্তির একহস্ত ভঙ্গ হইয়া পূজা বন্ধ হইয়াছে, সে প্রেত-দানবাদি হইতে নানারূপ বিভীষিকা দিবারাত্র দেখিতেছে এবং মা তাহাকে জানাইয়াছেন যে আমার বিরুদ্ধতাই উহার কারণ। আমার ৫।১ডি নং বাড়ীর সদর দরজার নিকট হইতে হরিদাসবাবু (২রা জুন, জামাইষষ্ঠীর দিন) একটি শল্য (সরু বাঁশে পেরেক গাথা) উদ্ধার করিয়াছিলেন। উহাই একটি প্রেত নির্দেশক এবং বিতাড়িত না হইলে বাড়ীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ও শ্মশানে পরিণত করে। মায়ের নির্দেশমত দুইটি প্রেত আমার ক্ষতির চেষ্টা করিতেছিল, সেই জন্য হরিদাসবাবু অপর শল্যরূপী প্রেত আছে কি না, বা কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধানের জন্য জমির মাটী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ইতিমধ্যে আমি একদিন দেখিলাম যে, পূর্ব শল্যের নিকটেই খানিকটা স্থান গোময়ের দ্বারা অদ্ভুতভাবে চিহ্নিত। এই স্থানেই দ্বিতীয় শল্য থাকিতে পারে মনে করিলাম বটে, কিন্তু অনুসন্ধানের ইচ্ছা হয় নাই। কয় দিন পরে (অম্বুবাচীর দ্বিতীয় দিন, ২২শে জুন) পুনরায় সেই স্থানের নিকটেই গোময়ের চিহ্নে জগদম্বার দ্বিতীয় নিদের্শন বুঝিয়া খাজর দুইজনকে ডাকিয়া মাটী একটু খনন করিতেই পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় শল্যটি পাইলাম। উহা আমার ছোটকাকাকে দেখাইয়া হরিদাসবাবুকে দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, উহাকে বিনা মন্ত্র সাহায্যে হস্তে করিয়া আমি আদৌ ভাল করি নাই—আমার বিশেষ ক্ষতি—*অবশে কাগজের স্বাভাবিক দাগে চিহ্নিত স্থান (১৩১)—*হইবার সম্ভাবনা—এমন কি, প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত হওয়াও আশ্চর্য নহে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষিত ব্যক্তির ভূত প্রেতাদির দ্বারা কোন ভয় নাই (৫৪ পর্ব)। অম্বুবাচীর কোন দিন মাটী খনন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয় (প্রথম ভাগ তৃতীয় অধ্যায়, ৩৭ অনুচ্ছেদ)। আমাকে নিজ আয়োজনে উক্ত একদিনেই, শরদিন্দুর নিষেধ সত্ত্বেও, মাটী খননে বাধ্য করাইয়া মা বুঝাইলেন যে, আমি শাস্ত্রবিধি-নিষেধের পরপারে। দেহাত্মবোধ ত্যাগী নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির কর্মাকর্মের কোন বালাই নাই। এই ঘটনায় জগদম্বাই আমার জীবন্মুক্ত স্বরূপ কৃপায় অদ্ভুত আয়োজনে প্রকাশ ও বিস্তার করিলেন (১৭ পর্ব)।

যতীন-বৃদ্ধ-তান্ত্রিকক্রিয়া

বিষয়—আমার গৃহস্থ একটি তক্তাপোষে অনেকগুলি সর্পকে মাদুর চাপা দিয়া জব্দ রাখিয়াছি এবং তাহাদের ভিতর একটি ভূমে পৌত্র বৃদ্ধের অতি নিকটে পড়িয়া গেল, ইত্যাদির স্বপন দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১১ই জুলাই, ১৯৪৯—বেলা পৌনে তিনটা।

আমি উক্ত কালে শয্যাত্যগের পূর্বে নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন আমার গৃহস্থ একটি তক্তাপোষের উপরে অনেকগুলি সর্প কিল্‌বিল্‌ করিতেছে এবং উহাদিগকে আমি মাদুর চাপা দিয়া বেশ জব্দ করিয়া রাখিয়াছি। ঐ ঘরে পৌত্র বৃদ্ধ ভিন্ন আর কাহাকে চিনিতে পারিলাম না। একটা সর্প তক্তাপোষ হইতে পৌত্র বৃদ্ধের অতি নিকটেই পড়িয়া গেল এবং তাহাকে কামড়াইতে পারে সম্ভাবনা বুঝিয়া নিকটে আসিবার জন্য ডাকিতে লাগিলাম এমন সময় স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। পূর্ববর্তী পর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদিও আমি জগদম্বার কৃপায় ঐ সময় সংসারটিকে তান্ত্রিক ক্রিয়ার কুফল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তথাপি উহা পূর্ণভাবে নিবারিত হয় নাই এবং জানুয়ারী ১৯৫০ অবধি জ্যেষ্ঠপুত্রের দলের নানাবিধ অনধিকার ও অসদাচরণ চলিয়াছিল সর্প মানবের শত্রু হইলেও, আমার আত্মা হইতে জাত (কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন দশায়)। সেই জন্য, কর্মফল প্রকাশক এই স্বপ্নটিতে আমার আত্মা প্রকটিত করিলেন যে, যদিও আমি তখন নানা সর্পরূপী, নানাবিধ বিরুদ্ধভাব [মাতলামি, (৬৪ পর্ব)] দমন করিয়া রাখিয়াছি, তথাপি এক বিরুদ্ধভাব সেই দমিত অবস্থা অতিক্রম করত বৃদ্ধের অনিষ্টাচরণে কৃতসংকল্প হইলেও, আমার সাহায্যে তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল; কারণ, আমি ও শরদিন্দু তখন সম্পূর্ণ একমতে যাহাতে বৃদ্ধের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়াছিলাম।

৩। স্বপ্নতত্ত্বে আছে যে, স্বপ্নে সর্প ধরিবার ফলে শত্রুকুল পরাজিত হয়। ইহা মিলিয়াছিল। যে আত্মার বিশ্ব দর্শন করে (৭০ পর্ব) তাহারও পরাজয় নাই।

স্বপ্নে-গুরুদেবী

বিষয়—প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে, মা সারদেশ্বরী কোন এক ব্যক্তিকে 'সবই চিদাকাশ' এইরূপ মন্ত্র দিতেছেন স্বপন দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৩ই জুলাই, ১৯৪৯—প্রাতঃকাল, সওয়া ছয়টা।

আমি উক্ত কালে শয্যা ত্যাগের পূর্বে নিম্নলিখিত রূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন মা সারদেশ্বরী কোন এক অদৃষ্ট ব্যক্তিকে 'সবই চিদাকাশ' এইরূপ মন্ত্র দিলেন।"

২। অদৃষ্ট ব্যক্তিটি আমি নিজে ভিন্ন অপর কেহ নহে এবং কৃপাময়ী মা আমাকে স্বপ্নটিতে বুঝাইলেন যে, সারা বিশ্বকে 'চিদাকাশ' রূপে দর্শনই আমার মন্ত্রবৎ সত্যরূপে অবলম্বনীয়। ব্রহ্মমন্ত্র তো আমাকে হনুমানদেবের দ্বারা দেওয়াইয়াছেন, আবার অন্য মন্ত্র দিবেন কি করিয়া? সেই জন্যই, এই অভিনব প্রণালীর দ্বারা আমাকে শিক্ষা দান! ৩রা অগষ্ট, ১৯৪৮ সালে (৫৬ পর্ব) তিনি আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, 'তিনিই বিশ্বে সব করিতেছেন, আর কেহই কিছু করে না'। এখন বুঝাইলেন যে, 'বিশ্ব শূন্যাকার চিদাকাশ, বা মিথ্যা'। আমার ব্রহ্মমন্ত্রার্থের যে এই দুইরূপ তাহা ভাল করিয়া জানাইলেন এবং প্রয়োজনীয় শক্তি দানে ঐ সব বিষয় পুস্তকের প্রথম ভাগে যুক্তি অবলম্বনে লিখাইলেন। হনুমানদেব আমার মুখে, 'জগৎ মিথ্যা' এই কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সারদা-দেবী সেই একই কথা ভিন্নভাবে—***অবশে কাগজের কৃষ্ণবর্ণ দাগে চিহ্নিত স্থান (১৩২)**—*আমাকে বুঝাইলেন। 'বিশ্বে সবই জগদম্বা' বা 'বিশ্ব শূন্যাকার চিদাকাশ'—এই দুই চরম ও পরম ভাবের মধ্যে প্রথম ভাবের (প্রেমভক্তির) সাধনই যে অপেক্ষাকৃত সহজ তাহা পূর্বে বার বার উক্ত হইয়াছে। এই দুই ভাবের একটি ভাবই যথেষ্ট। প্রথম ভাবের চরম অবস্থায় দ্বিতীয় ভাব স্বতঃই উদিত হয়—তবে, প্রয়োজন নাই! অতুলনীয়া 'আমার মা' আমাকে দুইটি ভাবেরই উপযুক্ত সাধক ভাবিয়া, দুইটি স্বপ্নে পরম জ্ঞান দিয়া সাধনোচিত শক্তি সঞ্চার করিলেন। এই আত্ম-জ্ঞানই, আমার চারিখানি পুস্তকের সার তত্ত্ব!

সজীব-বালশিব

বিষয়—রক্তবর্ণ পদতল বিশিষ্ট অষ্টম বর্ষীয় বালকরূপী শিবঠাকুরের আলিঙ্গন লাভ ও তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন, ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৬শে অগষ্ট, ১৯৪৯—রাত্র প্রায় তিনটা।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে নানাবিধ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রাত্র প্রায় আড়াইটা পর্যন্ত কিছুতেই নিদ্রা হইল না। তৎপরে নিদ্রিত হইবার প্রায় অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই দণ্ডায়মান অবস্থায়, রক্তবর্ণ পদতল বিশিষ্ট অষ্টমবর্ষীয় বালকরূপী সজীব শিব ঠাকুরকে, একটি কাঁচের আলমারীর মধ্যে থাকিতে স্বপ্ন দেখিলাম। আমার শয়ন গৃহেই কাঁচের অন্তরালে শিব-অন্নপূর্ণার এবং হনুমানের দুই খানি ছবি আছে। শিব স্বপ্নটিতে দাঁড়াইয়াছিলেন—অথচ, কেমন করিয়া তাঁহার কোকনদোপম পদতল দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বুঝি না। আমি স্বপ্নদৃষ্ট উক্ত শিবকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়া কাঁচের বাধার জন্য আলমারীর পিছন দিকের কাষ্ঠাবরণ খুলিয়া ফেলিলাম। তখন ঠাকুরটি ফিরিয়া আমাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন এবং আমিও তদ্রূপে তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম। তৎপরেই, স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়াছিল—***অবশেষে কাগজের কৃষ্ণবর্ণ দাগে চিহ্নিত স্থান (১৩৩)।**

২। বিশ্বাত্মা, বিশ্বগুরু, অভেদ বিশ্বশক্তি স্বরূপ অন্নপূর্ণা ও বিশ্বপ্রেম বিগলিত ঠাকুরটি, আমাকে বালকরূপে আলিঙ্গন দানে ও উহা গ্রহণে যেন পিতৃপদে বরণ করত আমার মানব জন্ম সার্থক করিলেন। রক্ত পদতলদ্বয় দেখাইয়া (ভবতারিণী রক্তবর্ণ করতল দেখাইয়াছিলেন) আমায় বুঝাইলেন যে, উহা আমার মৃত্যুর পরে আশ্রয়স্থল। যে পিতৃ-পদবী ভবতারিণীদেবী (২১ পর্ব) এবং রামকৃষ্ণদেব (২২ পর্ব) দিয়াছিলেন, তাহা অভিন্ন তিনি না দিবেন কেন? এতদিন জামাতা ছিলেন—এখন পুত্রও হইলেন। জীবিত কালেই যখন তাঁহার সহ অভিন্ন জগদম্বার চক্ষুর সম্মুখে সদা উপস্থিত থাকিয়া আমি প্রেমময়ী তাঁহার আশ্রিত দাস (৬৬ পর্ব), তখন দেহান্তে যে প্রেমময় তাঁহার পদতলের আশ্রয় লাভ করিব, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে! কাঁচের অন্তরালে তিনি আমাকে দর্শন

দান দিয়া বুঝাইলেন যে, তৎকালে আমাতে ও তাঁহাতে যে ব্যবধান তাহা মাত্র কাঁচোপম। হায়! জানি না কতদিনে কাঁচটি অন্তর্হিত হইবে এবং আমি তাঁহার সহিত প্রেমে অভেদত্ব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিব। ব্যবধান তো বাস্তবিক নাই; তবে প্রাক্তন কর্ম অবশিষ্ট থাকিতে, এই সামান্য ব্যবধান অনিবার্য! তারকেশ্বরে প্রায় পঞ্চ-ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্বে, ঠাকুরটি যে অনুপম কৃপা সূত্রপাত করিয়াছিলেন (২ পর্ব), তাহা পর পর অন্যান্য ঘটনায় নানাভাবে ঘনীভূত করিলেন। কোন্ ঈশ্বরমূর্তিকে আমি গ্রহণ করিব (+) আর কাহাকেই বা ত্যাগ করিব? ইহাই তো আমার জীবনের এখন প্রধান সমস্যা! যাঁকে ভাবি, তিনিই আমার প্রেমময় অভেদ আত্মা—বা আমি! বাহ্য মূর্তিতে সকলেরই সমন্বয় আত্মাশক্তি জগদম্বাতে এবং আন্তর আত্মায় সকলেরই সমন্বয় ব্রহ্মে! সারা বিশ্বের এবং সকল দেবদেবীর মূর্তির ও তাহাদের সর্ববিধ শক্তির ও অভিব্যক্তির উৎস বা কেন্দ্র পুরুষ-প্রকৃতি রূপী জ্যোতির্ময় চিদাকাশ ব্রহ্ম (৪ পর্ব)। বিশ্ব নির্গুণ ব্রহ্মময় এবং মরুমরীচিকা সম—অতএব, ইহা কোন কালেই অভিব্যক্ত নহে। এখানে শূন্যেই শূন্যের উৎপত্তি, স্থিতি, বিস্তৃতি, অনুভূতি লয়, ও ভোগ এবং শূন্য সকলই শূন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। ইহা আবার সগুণ ব্রহ্মময়—অতএব ইহাতে যাহা কিছু সবই শিবশক্তিরূপী জগদম্বার জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। এই শিবশক্তি রূপিণী জগদম্বা অন্যান্য পুরুষ-প্রকৃতি রূপিণীও বটে (২৬ পর্ব ও অবতরণিকার প্রথম পট)! সকলেই অভেদ। অতএব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রাম-রাবণের যুদ্ধ সদা দৃষ্ট হয়, তাহা মাতলামী! ইষ্ট নিষ্ঠা অভেদ বোধের প্রতিবন্ধক হওয়া অনুচিত (উপরে অবশে উৎপন্ন কালির চিহ্ন (+) দ্রষ্টব্য)। তিন কালে, আমার হৃদয়স্থ দহরাকাশেই সারা ব্রহ্মাণ্ডলীলা চলিতেছে। ওহো! আমি কি মহান্! I am the Greatest God that ever was, or will ever be!

স্বপ্নে-তান্ত্রিকক্রিয়া

বিষয়—আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক-ক্রিয়ার প্রধান আয়োজকের ন্যায় একটি লোকের সহিত অসি-দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহাকে বশীভূত করিবার পূর্বে, আমার পার্শ্বস্থ একটি অপরিচিত ব্যক্তির তাহার বক্ষে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপে উদ্যুক্ত, এইরূপ স্বপন। [এইখানে সারা লিখনটি একটি দেশলাই কাঠির আগুনের দাগে রঞ্জিত]।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ দুর্গা-সপ্তমী তিথির প্রাতঃকাল।

উক্ত দিবস, শয্যা হইতে গাত্রোত্থানের ঠিক পূর্বে, নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন আমি একটি চকচকে তরবারি হস্তে আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক-ক্রিয়ার প্রধান আয়োজকের ন্যায় একটি লোকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত। তাহার তরবারিটি আমার তরবারি অপেক্ষা ভোঁতা, মনে হইল। আমি তাহাকে বশীভূত করিয়া তরবারির চোট দিতে যাইতেছি—এমন সময় দেখিলাম যে একটি অপরিচিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া আমার পার্শ্বে সহায়ক রূপে দাঁড়াইয়া শত্রুটির বক্ষের দিকে তাহার বন্দুক লক্ষ্য করিল—যেন গুলি নিক্ষেপ করিবে, এই ভাব। এমন সময় স্বপ্নটি ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। পূর্বে ৬৭ পর্বের ৩ অনুচ্ছেদ হইতে বুঝা যাইবে যে আমি জগদম্বার কৃপায় তান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ায় জয়যুক্ত হইয়াছিলাম। কর্মফল প্রকাশক আলোচ্য স্বপ্নটির প্রথমাংশ তাহা প্রকটিত করিল। উহার শেষাংশের বিষয় আমি সঠিক বলিতে পারি না, তবে হরিদাস বাবুর নিকট হইতে পরে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার সহিত উহার বিশেষ সামঞ্জস্য আছে বলিয়া কিছু লিখিতেছি। নিজ তান্ত্রিক গুরুর সাহায্যে আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক-ক্রিয়ায় (এই উদ্দেশ্যেই কোন আত্মীয়ের পরিচিত তান্ত্রিক গুরুকরণ!) বিফল মনোরথ হইয়া, প্রধান আয়োজকটি বর্ধমানের নিকটস্থ অন্য বড় তান্ত্রিকদিগকে *অবশেষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে চিহ্নিত স্থান ১৩৪।—*অনেক টাকা দিবার—এমন কি, চন্দননগরে বগলা-মুখীর বড় মন্দির করিয়া দিবার—প্রলোভন দেখাইয়াছিল, যদি তাহারা আমাকে

যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে এবং আমার স্বোপার্জিত বহু মূল্যের (সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা !) সম্পত্তির অর্ধাংশের [যাহা আইন ও ন্যায্য ভাবে তাহারই প্রাপ্য, কারণ আমি তাহাদিগকে —নিজ প্রভূত (উচিত ও অনুচিত) ব্যয়ে—আত্ম ভাবে একান্ন-ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম প্রায় কুড়ি বৎসর !] অধিকারী করিতে পারে। অতএব, এই তান্ত্রিকগণ যথার্থ সংবাদ না রাখিয়া এবং লোভ বশে, আমার বিরুদ্ধে যে তাহাদের সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যখন এই তান্ত্রিকগণও বিফল মনোরথ হইল এবং হরিদাস বাবুর এক বন্ধুর নিকট হইতে উক্ত মিথ্যা দাবীর সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহারা আমার শত্রুটিকে মারণ যজ্ঞে শেষ করিবার ভয় দেখাইয়াছিল—যদি সে প্রতিশ্রুত বহু অর্থের কিয়দংশ তাহাদিগকে না দেয়। সম্ভবতঃ (ঠিক বলিতে পারি না) এখন তাহাকে উহাদিগকে মাসে মাসে অনেক টাকা দিতে হয়, বা হইয়াছিল। পরে প্রধান তান্ত্রিকটি মারা গিয়াছে শুনিয়াছি। যে-তান্ত্রিকটির কালীমূর্তির হস্ত ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহাকেও অনেক টাকা দিতে হইয়াছিল। আমার সম্পত্তি পাইবার আশায়, প্রথমোক্ত তান্ত্রিকগণ চন্দন নগরের নিকটবর্তী কোন স্থানে মন্দিরের জন্য বহু জমি ক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হরিদাস বাবুর সাহায্যে আমার সহিত পরে সাক্ষাৎ করিতে অনেক অনুরোধ জানাইয়াছিল—শত্রুদিগের বিরুদ্ধে মারণ যজ্ঞ করিবার আদেশের নিমিত্ত। ঐ বিষয়ে আমি তাহাদিগের একখানি পত্রও দেখিয়াছিলাম। আমি সাক্ষাৎ করি নাই।

৩। হরিদাস বাবু হইতে প্রাপ্ত উক্ত সংবাদগুলি, শরদিন্দু অবিশ্বাস করিলেও, উহারা আমার স্বপ্নটির সহিত অদ্ভুত সামঞ্জস্য যুক্ত। অতএব, আমি উহাদিগকে অবিশ্বাস করিতে অক্ষম। উহাদিগকে অবিশ্বাস করিলে, আত্মার দ্বারা প্রকটিত কর্মফল বিষয়ক শাস্ত্র-মর্যাদা রক্ষা হয় না। পুস্তকের পরিশিষ্টে লিখিত, জগদম্বার হরিদাস বাবুকে দত্ত স্বপ্নগুলি আমার বিশ্বাসকে যেন অনুমোদন করিতেছে। এই পর্বের বিবরণীতে যে-চিহ্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাও নিরর্থক নহে।

শরদিন্দু-যতীন-ভবতারিণী

বিষয়—শরদিন্দুর পদে ভীষণ যন্ত্রণায় ভবতারিণীদেবীর আচরণ (+)।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৯—কার্ত্তিক পূজার পরদিন, রাত্রি বারটা।

উক্ত সময়ে, শরদিন্দুর পদে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইল এবং তিনি বিছানায় শায়িত অবস্থায় বিশেষ কাতর ভাবে 'উঃ!' 'আঃ!' করিতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহার পার্শ্বে কিছু দূরে শয়ন করিয়া, ভবতারিণীদেবীর চিন্তা করিতেছিলাম। কিন্তু ভয় হইল বুঝি ঐ অসময়ে ডাক্তার ডাকিতে হয়। তাহা করিবার পূর্বে, ভবতারিণীদেবীকে বলিলাম—'মা! তোমার মাতা (৬ পর্ব) এইরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর তুমি তাহার কোন প্রতিবিধান করিবে না এবং তোমাকে আমায় চিন্তা করিতে দিবে না? তুমি একবার আমার সেবা করত তোমার আমার সহিত কন্যা-সম্বন্ধের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলে—৪৭ পর্ব। শরদিন্দুকে তাহা করিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার ভীষণ পদপীড়া উপশান্ত কর।' তখন শরদিন্দু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আমায় বলিলেন—'আমার পা একটু টিপিয়া দিতে হইবে, আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে।' আমি অল্পক্ষণ উহা করিতেই শরদিন্দু বলিলেন—'যন্ত্রণা অনেক কমিয়া গেল, আর টিপিতে হইবে না।' কয় মিনিটের মধ্যেই তিনি নিদ্রিতা হইলেন এবং তাঁহার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া আমার দুর্ভাবনা দূর হইল।

২। কালীদেবী (দক্ষিণেশ্বরের রূপে), আমার ও শরদিন্দুর সহিত কন্যা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন এবং (কালীঘাটের রূপে) আমার দেহে মিলিতা হইয়া আমার আত্মা-দেহ-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত অভেদ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন (৪৯ পর্ব)। উক্তরূপে, আমার দ্বারা শরদিন্দুর সেবায় অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ভীষণ কষ্ট নিবারণ করত, তাঁহাকে নিদ্রাভিভূত করিয়া তিনি জানাইলেন যে, 'তোমার সেবা'ই আমার সেবা—অতএব আমার সেবা নিষ্প্রয়োজন।' উক্ত অভেদ জ্ঞানের চরম অবস্থায়, মানবের যখন সারা বিশ্বই ঈশ্বরময় এই জ্ঞান স্থির হয়, তখন আর তাহার মায়িক কোন বিষয়ে ভয়ের কারণ থাকে না (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫০ অনুচ্ছেদ)। ইহা বুঝাইবার জন্য, পর্ব বিষয়-বিবরণীটি (+) চিহ্নিত।

সঙ্গীন-রামকৃষ্ণ

বিষয়—রামকৃষ্ণদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত চরণামৃত পানের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০—রাত্র আন্দাজ সাড়ে বারটা।

দিনটি রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির পর দিন এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে তাঁহার জন্মোৎসব হইবার কথা ছিল। উক্ত সময়ে স্বপ্নে অনুভব হইল, যেন জিহ্বায় রামকৃষ্ণদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত চরণামৃত পান করিলাম। তখনই নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং জাগ্রতাবস্থায় উপনীত হইয়া মন-প্রাণ মুগ্ধকর চরণামৃতের ন্যায় সুগন্ধ পাইলাম বটে, কিন্তু জিহ্বায় অপ্রাকৃত জলের আস্বাদ অনুভব হইল না।

২। উক্তরূপে রামকৃষ্ণদেব আমাকে তাঁহার চিন্ময় সুগন্ধযুক্ত চরণামৃত পান করাইয়া বাস্তবিক অমৃতই খাওয়াইলেন। সারদেশ্বরীও আমাকে স্বহস্তে তাঁহার প্রসাদান্ন খাওয়াইয়াছেন (৪৪ পর্ব)। চরণামৃতের দ্বারা আমার দুইটি জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসা ও জিহ্বা এবং একটি কর্মেন্দ্রিয় বাক্ ধন্য ও সার্থক হইল! রামকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত বাগেন্দ্রিয় আদ্যাশক্তির তত্ত্ব ও কৃপা এই পুস্তকগুলিতে উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ হইতেছে। উহার যাহা কিছু সবই রামকৃষ্ণশক্তি, সারদেশ্বরী হইতে জাত—যিনি আমাকে স্বপ্নে জানাইয়াছিলেন, 'আমি সব করিতেছি, তুমি কিছু কর না' (৫৬ পর্ব)। হায়! ইহাপেক্ষা বড় সত্য আর নাই, কিন্তু জগতে সংখ্যাতীত সত্যাভিমানী গণ্য ও মান্য ব্যক্তিও অজ্ঞান বশতঃ এই বিষয়ে মিথ্যাচার দোষে মহাদোষী এবং তজ্জন্য জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। সারা বিশ্বই পুরুষ-প্রকৃতিরূপী এবং তাঁহারাই অলিপ্ত ভাবে ইহার সর্বস্পন্দন নিয়ন্তা। এই সত্যটি না জানিয়া, মানব ভেদবুদ্ধিবশে ইহাতে নানাত্ব দেখিতেছে এবং দেহাত্মবোধে মত্ত হইয়া শুভাশুভ কর্মফল সৃজন করত অবশে কোটি কোটি জন্ম কালচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে। দেহাত্মবোধই চিত্ত এবং চিত্তত্যাগই সর্বত্যাগ। বিনা আত্মবোধ, চিত্তবৃক্ষ দগ্ধ হয় না। চিত্তাধীন 'জীব' এবং চিত্তমুক্ত ব্যক্তিই 'শিব'। দ্বৈতবোধ বিলুপ্ত হইয়া সর্বত্র আত্মদর্শন হইলে, লৌকিক বাসনাসমূহ ঈশ্বররূপে ফল প্রসব করে না।

শরদিন্দু-সারদেশ্বরী-অখিল

বিষয়—অর্চনার কালে, শরদিন্দুর কনিষ্ঠ পুত্র অখিলেশকে অষ্টম মাসের শিশুর ন্যায় সারদেশ্বরী দেবীর ক্রোড়স্থ দর্শন।

স্থান—শরদিন্দুর পূজা ঘর।

কাল—আন্দাজ মার্চ, ১৯৫০ - দুপুর বেলা।

আত্মীয় শত্রুগণের বিষময় তান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুসঙ্গ দোষে, কনিষ্ঠ পুত্র অখিলের বিকৃতির মোটামুটি স্বরূপ পূর্বে (২১ পর্ব, ৬৪ পর্ব ও ৬৭ পর্ব) বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিকৃতি নিবারণে আমরা সম্পূর্ণ উপায়হীন হইলেও বিশেষ চিন্তিত। উক্ত দিবস, শরদিন্দু অর্চন সময়ে মা সারদেশ্বরীকে দুঃখিতান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'মা! অখিলের জীবন কি এইরূপেই বৃথা অতিবাহিত হইবে?' সেই জন্য, কৃপাময়ী মা তাহাকে শিশুরূপে ক্রোড়স্থ করিয়া দেখাইলেন। মনে হয় মা বুঝাইলেন যে সে বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেও, তাঁহারই আশ্রিত—অতএব প্রাক্তন কর্মফল খণ্ডন করিতেছে—নূতন কর্মফল সৃজন করিতেছে না। সেই খণ্ডন, তাহার অবশিষ্ট অল্প বা অধিক ইহজীবনব্যাপী হইতে পারে। ২১ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, তাহাকে যে মৃত (অর্থাৎ, আমার সহায়ক নহে) দেখিয়াছিলাম, সেই ফল অমোঘ থাকিবারই সম্ভাবনা। সে যে মায়ের আশ্রিত, ইহাই আমাদের দুঃখের ভিতরেও সুখ এবং অন্য *উপায় নাই—*অবশে কাগজের হলুদ বর্ণ চিহ্নের দ্বারা রঞ্জিত দুইটি স্থান (১৩৫)। মানব যদি জীবনে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াও মায়ের ক্রোড়ে থাকে, তাহাই তাহার মন্দের ভাল অবস্থা এবং উহা কখনও দেহান্তে অধোগতি সূচক নহে। তাদৃশ ব্যক্তি কিন্তু প্রায় দীর্ঘজীবি হয় না। সাধারণতঃ, দুরাচারী ব্যক্তি মায়ের আশ্রয় পায় না এবং নিজের কু-কর্মফল বৃদ্ধি করিয়া দেহান্তে অধোগতি লাভ করে। শত সহস্র অনুকূল অবস্থার মধ্যে এবং পিতার স্নেহ ও অম্লান বদনে যথাকালে, বহুঅর্থ ব্যয়ের ফলে, জীবনে উন্নত হইতে যে পুত্রগণ না পারে, তাহাদের মায়িক কর্মফল মন্দ তো বটেই! এগার-বার বর্ষ বয়সে (সৌভাগ্যে) অখিল এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে, সে, আমি ও শরদিন্দু বহুভক্তাকীর্ণ রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণ দর্শন সুধা পান করিতেছি।

যতীন-বিবেকানন্দ

বিষয় স্বামী বিবেকানন্দের সহিত বন্ধুভাবে আলাপের শেষে তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ বাণী—'তুমিও শেষ জীবনে আমার ন্যায়, ঘোর কর্মক্লান্তির অবসানে, প্রেমভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে'—শ্রবণের স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—১৯শে এপ্রেল, ১৯৫০—রাত্রি কাল।

পরদিন অক্ষয় তৃতীয় কিন্তু উক্ত কাল ঐ তিথির অন্তর্গত। স্বপ্নে দেখিলাম যে, স্বামী বিবেকানন্দ সাধারণ যুবকের বেশে আমার সহিত বন্ধুভাবে নানাবিধ আলাপ করিলেন, কিন্তু সেই সকল বিষয় কিছুই স্বপ্নান্তে স্মরণ হইল না। শেষে তিনি যখন এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আমায় শুনাইলেন—'তুমিও শেষ জীবনে আমার ন্যায়, ঘোর কর্মক্লান্তির অবসানে, প্রেমভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে' তখন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

২। একই শ্রেণীর অন্তর্গত, কর্মফল প্রকাশক পূর্ববর্তী স্বপনগুলি এই পুস্তকে আলোচনার ফলে বুঝিয়াছি যে, যাহা আমার ভাল জানা আছে, তাহা প্রায় উহাদের মধ্যে অস্পষ্টই থাকে (৫৫ ও ৫৬ পর্ব দ্রষ্টব্য)। সেই অভিজ্ঞতার ফলে মনে হয় যে এই স্বপনটির অস্পষ্টাংশ উ পর্বে আলোচিত গীতার স্বপ্নের বিষয়গুলি। সত্য সত্যই কি স্বামী বিবেকানন্দ, কন্যা গীতার পুত্ররূপে অবনীতে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিবেন? শিশুটি এখন একটি দুর্দান্ত ডাকাত। সেইজন্য, কথাটি বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, গীতার আত্মা সারদার দ্বারা প্রকটিত কর্মফল প্রকাশক এই স্বপ্নটি তো মিথ্যা কিছুতেই হইতে পারে না!

যতীন—বিবেকানন্দ

প্রণমি বিবেকানন্দ, ওহে বিশ্ব-প্রেমানন্দ!
সারদা-রামকৃষ্ণের বরিষ্ঠ নন্দন।
লহ নাথ কোটি নতি, যতীন করে প্রণতি,
সপ্তঋষি মণ্ডলস্থ নর-নারায়ণ।

স্বপন আশ্রয় করি, সখা ভাবে প্রেমে বরি,
আলাপিলে নানা কথা সহিত আমার।
প্রেমে জানাইলে আর, শেষ জীবনে আমার,
প্রেমভক্তি সহ লাভ ব্রহ্মজ্ঞান সার।
কিবা জানি গুণ তব, বিশ্বপ্রেম অভিনব,
যার তরে বার বার ধরা আগমন।
বহু ঋষি পুরাতন, স্বমুক্তি করি অর্জন,
মায়া বিশ্বে কভু নাহি হন প্রকটন।
কিন্তু তুমি বলেছিলে, প্রয়োজনীয় হইলে,
লতে পার বহু জন্ম মায়া কারাগারে।
তেঁই প্রতিজ্ঞা রাখিয়া, জন্ম-দুখ পাসরিয়া,
দেখালে নিজকে বদ্ধ স্বপনে গীতারে।
অতি কূট আয়োজনে, সারদা এক স্বপনে,
দেখালেন তুমি হবে সন্তান গীতার।
নহে মিথ্যা তাঁর রীত, পবিত্র তাঁর চরিত,
সত্য তুমি হবে ভবে দৌহিত্র আমার।
কেন তব প্রকটন, না জানি সেই কারণ,
নিশ্চয় করিবে পুনঃ বিশ্ব আলোড়ন।
জানি মাত্র এই কথা, মোর সেবা বাকী যথা,
আদ্যার সে-সেবা তুমি করিবে পূরণ।
রট, তাত! তত্ত্বকথা, প্রচার বিশ্বে বারতা,
নর চিরমুক্ত আত্মা সদা চিদাকার।
নাহি কিছু ক্রিয়া তা'র, নিষ্ক্রিয় স্বরূপ ত'ার,
তবু ভাবে 'আমি কর্তা'—মায়িক বিকার।

ভ্রম তা'র অহঙ্কার, বাসনা নাহিক ত'ার,
'আমি দেহ-কর্তা' ভাবি, সে বাসনাকার।
বাহ্য বিশ্বে অনুক্ষণ, হতেছে যেই স্পন্দন,
সর্ব দেবদেবীময়ী কালীর প্রকার।
খণ্ডহীন বিশ্বমাঝে, সব তাঁর শক্তি রাজে,
হেথা সব, মাত্র তাঁর শক্তির আধার।
ব্রহ্মা শক্তি, বিষ্ণু শক্তি, শিব শক্তি, সূর্য শক্তি,
বিশ্বমাঝে যাহা কিছু শক্তির আকার।
সকলের আত্মা তিনি, সকলের শক্তি তিনি,
নানা জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া রূপে বিশ্ব তিনি।
স্বাধীনতা নাহি কার, অধীন সকলে তাঁর,
ভ্রমে বিশ্বে নর ভুলি—কালী একাকিনী।
তাঁর প্রেমভক্তি বিনা, সহজে জ্ঞান জমে না,
এই-মার্গে ত্বরা নর পায় ব্রহ্মজ্ঞান।
শক্তির সাধন বিনা, নির্বাণ নর লভে না,
তেঁই তুমি সেব জীব রটি তাঁর জ্ঞান।
প্রবল নিয়তি বিনা, মুকতি কেহ লভে না,
অক্ষম মুকতি দানে ঈশ নিজ বলে।
নরজাতির নিয়তি, একত্রে লভি সুগতি,
পারে না মুকতি দিতে—মুছি কর্মফলে।
এই সব সত্য তুমি, ঘোষ এ ভারতভূমি,
তাহে যাবে বিশ্ব হতে মিথ্যা প্রলোভন।
আমি এবে বৃদ্ধ অতি, শিথিল মোর শকতি,
মোর কর্মভার দিনু তোমা প্রাণধন! (৫২)

স্বপ্ন-ভবতারিণী

বিষয়—স্বপ্নে ভবতারিণীদেবীর আমাকে সিদ্ধাবস্থা প্রদান।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩রা অগষ্ট ১৯৫০, বৃহস্পতিবার—আন্দাজ রাত্রি তিনটা।

আমি নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলাম—

"যেন একটি অন্ধকার গৃহে মা কালীর ধ্যান করিতেছি এবং তিনি সেই খানে অস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকিলেও তাঁহার ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, ইত্যাদি আমাকে নানা বিকট মূর্ত্তিতে ভীষণ ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। আমি তাহাতে আদৌ বিচলিত হইলাম না। তখন মা প্রকটিতা হইয়া বলিলেন, 'এই তোমার সিদ্ধ-অবস্থা।' মায়ের মূর্তি ষোড়শী ভবতারিণীর তুল্য। কন্যা রূপে তাঁহাকে চুম্বন এবং তাঁহার সহিত কিছু আলাপ করিবার পর, নিদ্রা ভঙ্গ হইল"।

জাগ্রত হইয়া মনে হইতে লাগিল যে আমি মায়ের বাণীর বলে তো বাস্তবিকই স্বপ্ন সিদ্ধ হইলাম, কিন্তু কিছু পরিবর্ত্তন কেন অনুভব করিতেছি না। পরে শৌচাগারে গিয়া ললাটে ভ্রূদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে চন্দ্রমণ্ডলকে কিছুক্ষণ আবির্ভূত হইতে দেখিলাম। রামকৃষ্ণ ও সারদেশ্বরীই ভবতারিণী দেবী (১১, ২২ ও ২৭ পর্ব) ক্ষণকাল আত্মসাক্ষাৎকারও পরম গতি ও মুক্তি প্রদ (৪ পর্ব)।

২। স্বপ্নটির তাৎপর্য কি তাহা জানি না। উহা বোধ হয় প্রকাশ করিল, যে জীবিত দশাতেই আমার শীঘ্র যথার্থ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হইবে। যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই ক্লেশ বিনা প্রাপ্তি, ইহাই শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু উন্নত পুরুষগণ কখনও সিদ্ধাই চান না এবং উহা পাইলেও প্রয়োগ করেন না। নিজে মায়ের নিকট হইতে কিছু চাহিবার প্রয়োজন আছে তাহা মনে করি না—তিনি যখন স্ব ইচ্ছায় আমার প্রয়োজন-সাধিকা (৩২ পর্ব)। পূর্বে ৫ পর্বে বর্ণিত কাহিনী হইতে আমি এই সুনীতি তারকেশ্বরে শিখিয়াছিলাম এবং পরবর্তী জীবনে উহা যথাসাধ্য পালন করিয়াছি। মানবের কর্মফল প্রাপ্তির মনোবৃত্তি স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মনোবৃত্তি জগদম্বাকে অর্পিত হইলে, তাহার বন্ধন হয় না ও সে তাঁহার ভারবহ হয় না (৮৩ পর্ব দ্রষ্টব্য)।

———•———

স্বপ্নদীন-গুরুদেব

বিষয়—আত্মজ্ঞান লাভের বিষয়ে গুরুদেবের আশ্বাস প্রাপ্তির দিব্য স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২১শে অগষ্ট, ১৯৫০—বেলা আন্দাজ তিনটা।

পূর্ব্বরাত্রে আমার জ্যেষ্ঠভাতের এক পুত্রবধূ অকালে করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল এবং পরদিন দুপুর বেলায় তাহার শবের সংস্কার গঙ্গাতীরে হইয়াছিল। সেই সময়েই (বেলা আন্দাজ তিনটা) হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে স্বপ্নে অদৃশ্য কেহ যেন গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ভয় কি? এই জীবনেই তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিবে।' তখন স্বপনটি ভঙ্গ হইয়া গেল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে. পরম করুণাময় আত্মরূপী গুরুদেব শ্রীহনুমান উক্তরূপে আমাকে উৎসাহিত, বা কর্মফল প্রকাশ, করিলেন। আমি নানারূপে নানা ঈশ্বর মূর্তির ও আত্মদেবদেবীর কৃপা পাইতেছিলাম বটে, কিন্তু তথাপিও মনে এইরূপ ভাব ছিল—'যথার্থ আত্মজ্ঞান দেব-ঋষি-মুনিদিগেরও দুর্লভ বস্তু—উহা কি পূর্ণ ভাবে ইহজীবনে লাভ করা সম্ভব হইবে?' স্বামী বিবেকানন্দ, ৭৫ পর্বে বর্ণিত স্বপ্নে, আমাকে গুরুদেবের ন্যায়ই আশীর্বাদ. বা কর্মফল প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুইটি স্বপনই আমার অবশিষ্ট জীবনের সম্বল ও স্বাপ্ন-সিদ্ধাবস্থার (৭৬ পর্ব) আনুষঙ্গিক পরিণতি! আমি যে এত সৌভাগ্যবান, তাহা জীবনে কখনও বুঝি নাই। এই সব কারণেই কি ভূমিষ্ট হইবার কালে আমার প্রথমে পাদদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ হইয়াছিল (অবতরণিকা. ২৪ (২) অনুচ্ছেদ)? ভূমিষ্ট হইবার সময়, প্রণামের ছলে মস্তকের দ্বারা ভূতল স্পর্শই সাধারণ নিয়ম—কারণ, অনেক পুণ্যফল বিনা. কর্মভূমি ধরাধামে (বিশেষতঃ. ভারতে) নরজন্ম লাভ হয় না।

[তৃতীয় প্রুফে, এই পর্বটির লিখন আরম্ভের পূর্বে কাগজে একটি বড় মসির দাগ সারা পর্বটিকেই চিহ্নিত করিয়া আমার আধ্যাত্মিক জীবনের সার্থকতা নির্দেশ করিতেছে]।

শরদিন্দু-গীতা-সাক্ষ্য

বিষয়—গীতার সহিত শরদিন্দুর গঙ্গাতীরের নিকটে এক নির্জন বাড়ীর দ্বিতল গৃহে সারদেশ্বরীকে দর্শন, কতদিনে তাঁহার সন্নিধানে আসিবেন এইরূপ প্রশ্ন এবং মায়ের সস্নেহে উত্তর যে, ঐ বিষয়ে সামান্য দেরী আছে, ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—আন্দাজ অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর—১৯৫০।

শরদিন্দু নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"যেন কন্যা গীতার সহিত ব্যাসে চড়িয়া গঙ্গাতীরের নিকটে এক নির্জন বাড়ীর দ্বিতল গৃহে পৌঁছিয়া মা সারদেশ্বরীকে পা মেলিয়া উপবিষ্টা দেখিলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা! আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি?' তদুত্তরে, তিনি যখন বলিলেন, 'চিনিতেছি বই কি, মা!'—তখন তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, 'মা। আর কত দিন পরে তোমার নিকটে আসিতে পারিব?' তিনি সস্নেহে উত্তরে বলিলেন, 'একটু দেরী আছে, মা!'—এবং তৎপরে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। জ পর্বে আলোচিত শরদিন্দুর স্বপ্নে, তিনি সারদাদেবীর সাহায্যে বেলুড়মঠ সন্নিকটস্থ গঙ্গার উপরে একটি আকাশ হইতে পতিত অসংখ্য তারকামণ্ডিত চিন্ময় জ্যোতিঃরূপী জলপ্রপাত দর্শন করিয়াছিলেন। গঙ্গার ঐরূপ স্থানের সন্নিকটে কলিকাতার দিকে যে আমাদের মন্দির *ঐ নিদর্শন অনুযায়ী হইতে পারে, তাহা আমি—***অবশেষে কাগজের হলুদবর্ণ দুইটি দাগে স্থান দুইটি রঞ্জিত (১৩৬)**—*অনুমান করিয়াছিলাম এবং ১৯৫১ সালে ঐরূপ একটি জমি ক্রীত হইয়াছে। মা সারদেশ্বরী, এই স্বপ্নটিতে শরদিন্দু ও গীতা উভয়কেই দেখাইলেন যে, তিনি ঐ ক্রীত জমির দ্বিতল চিন্ময় মন্দিরে বিরাজিতা আছেন, কিন্তু উহাতে প্রাকৃত মন্দির নির্মাণে কিছু বিলম্ব হইবে। ৬০ পর্বে আলোচিত স্বপ্নে আমার আত্মা তিনিই আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, মন্দির নির্মাণ বিষয়ে আমার পুরুষকারের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না—কেননা, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন এবং আমি কিছু বিলম্বে যথাকালে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিব।

যতীন-সারদা

বিষয়—আমার হৃদয়দেশে সারদেশ্বরী তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে উপবিষ্টা এবং অন্য একটি নেড়ামাথা পুরুষমানুষের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট —এইরূপ স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫০—রাত্র কাল।

উক্ত দর্শনদ্বয় পর পর একই স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যে কে তাহা বুঝিতে পারি নাই। সারদেশ্বরী দেবী পূর্ব বর্ণিত নানা পর্বে আমার হৃদয়দেশ হইতে অদৃশ্যভাবে নানারূপ কৃপা করিয়াছেন। এক্ষণে উক্তরূপে স্বপ্নে দর্শন দান দিয়া তিনি যে আমার আত্মা, বা আত্মস্থা, তাহা বুঝাইলেন। রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'আপনাকে (আত্মা বা ঈশ্বরকে) আপনার ভিতর দেখিতে পাইলে তো সবই হইয়া গেল—এই জন্যই তো সাধনা'! ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫২, রাত্রশেষে কর্ণে শুনিলাম যেন কেহ অন্তর হইতেই (আমার আত্মা) কর্ণে বলিলেন, ' রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীই তো শিব-দুর্গা'। এই বিষয়ে ৫ পর্বে আলোচিত স্বপ্নে রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গের স্থানে আবির্ভাবই যথেষ্ট প্রমাণ। অন্যান্য নানা পর্বেও এই বিষয় লিখিত হইয়াছে। সারদেশ্বরীদেবীর দক্ষিণাঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ (৭ পর্ব)—অতএব, রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীতেই শিবদুর্গা ও কৃষ্ণরাধার সমবায়। হরি-হর এক আত্মা এবং রামকৃষ্ণদেবই সেই একাত্মক হরি-হর। আমার ইষ্ট-ইষ্টা শিব-দুর্গা এবং শরদিন্দুর ইষ্ট-ইষ্টা কৃষ্ণ-রাধা। অতএব, আমাদের উভয়ের অভেদ ইষ্ট-ইষ্টার সমবায় রামকৃষ্ণ-সারদেশ্বরীতে। এই সব কারণে মনে হয় যে, এই স্বপ্নে দৃষ্ট নেড়ামাথা ব্যক্তিটি আমি নিজে—৫৯ পর্ব দ্রষ্টব্য! স্বপ্নটিতে নিজেকে বৈষ্ণবরূপে দেখিলাম মাত্র এবং আমার বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হইল! পাঠক! আমি নিরামিষভোজী ধার্মিক নহি। যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রেমভক্তই যথার্থ ' বৈষ্ণব ' আমি বুঝি, (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ)।

২। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫০ সাল (১৫ই পৌষ, ১৩৫৭ সন) সারদেশ্বরী দেবীর জন্ম তিথিতে আমার এই পুস্তকের অবতরণিকা খণ্ডের মুদ্রণ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছিল এবং উহা ১৭ই এপ্রেল, ১৯৫১ সাল (৩রা বৈশাখ, ১৩৫৮ সন) বাসন্তী

দুর্গা পূজার বিজয়ার দিবস অবশে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার কিছুদিন পরেই প্রথম ভাগের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সারদেশ্বরী যে আমার অভেদ আত্মা, তাহা স্বপ্নে দেখাইয়া তবে পুস্তকটির যথার্থ মুদ্রণ আরম্ভ করাইয়াছিলেন। তিনিই কৃষ্ণ, আবার তিনিই দুর্গা—অতএব, একাধারে তিনি মিলিত কৃষ্ণ-দুর্গা বা কৃষ্ণরঙ্গিণী, যাহা আমার লৌকিক মাতার নাম ছিল এবং যে নাম তিনি ও রামকৃষ্ণ অশেষ আয়োজনে গ্রহণ করিয়া (২৭ পর্ব) আমাকে ধন্য করিয়াছেন ও আমার পরলোকগতা মাতাকে মুক্তি দিয়াছেন [৫৪ পর্ব]। পুস্তকের অবতরণিকা ও প্রথম ভাগের মুখপত্রের পাণ্ডুলিপি অবশে কৃষ্ণ ও দুর্গার (বা সারদেশ্বরীর) আশীর্বাদের চিহ্ন বহন করিতেছে। হায়! অভূতপূর্ব এই ঘটনাটিও অবিশ্বাসী মানবের মনকে ঈশ্বরাভিমুখে টলাইতে সক্ষম হয় না। অবার কেহ কেহ পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বা ঈর্ষায় জর্জরিত হইয়া বলেন, 'উচ্ছিষ্টের দ্বারা কি ঈশ্বরাশীর্বাদ বহন হয়?' তাঁহাদেব এই পরম জ্ঞান নাই যে, সারা বিশ্বই শিব-শক্তিময় এবং হেয়োপাদেয় ভাব বর্জিত। পুস্তকের এই দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপিটি, ঈশ্বরানুমোদন প্রকাশক বহু বহু চিহ্ন অবশে বহন করিতেছে। এই চিহ্নগুলির 'ভস্ম, চুরুটের (উচ্ছিষ্ট!) অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা চিহ্নিত স্থান নাই বলিলেই হয়। কাগজের স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণ দাগ, বা মসীর ও অন্যবিধ দাগ, বা ছুরিকাঘাতে আমার দ্বারা পূর্বে সৃষ্ট ছিদ্র ইত্যাদি চিহ্নগুলি অবশে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমিও অবশে পুস্তক লিখিতে লিখিতে সেই সকল স্থানে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং ন্যায্য সন্দেহ সূচক কথাগুলি লিখিয়া বুঝিয়াছি যে উহার দ্বারা জগদম্বা প্রকারান্তরে আমার সমস্ত লেখনই অনুমোদন করিলেন। যেন যাহা লিখিব সবই পূব হইতে নির্ধারিত হইয়াই আছে, এবং—বিধ (৮০ পর্ব দ্রষ্টব্য)! এই সবও যদি ঈশ্বরানুমোদন না হয়,তবে কি? সংশয় ও ঈর্ষাবিষে জর্জরিত মানব! তুমি যদি বিশ্বাস না কর, তাহাতে তোমার নিজেরই ক্ষতি। আমি যাহা তাহাই থাকিব—তবে, সত্যকে কখনও বহুদিন আবরিত করিতে পারিবে না, নিশ্চয় জানিও! সত্য অপেক্ষা পুণ্য নাই এবং মিথ্যা অপেক্ষা পাপ নাই। সত্যই ঈশ্বর এবং তিনি স্বপ্রকাশিত! সারা বিশ্বই সারদার লীলা। যে মানবের এই জ্ঞান দৃঢ়মূল, তাহার অবশ্যম্ভাবী সাংসারিক দুঃখ, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, ইত্যাদি অতি অল্পস্থায়ী। জগতের কোন অবস্থাই তাহার ভীতি উৎপন্ন করিতে পারে না, কারণ ভয়োৎপাদক বিশ্ববস্তুই যখন ঈশ্বর, তখন ভয় কোথা থেকে আসিবে?

যন্ত্রীন-শক্তিযোনি

বিষয়—ললাটে (সম্ভবতঃ, শক্তি পীঠে) জ্যোতির্ময়ী ত্রিবাহু-সমন্বিত একটি ত্রিকোণযন্ত্র দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫১—প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে।

দিনটি মহাত্মা গান্ধীর তিরোধান উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস। ঐ দিন প্রাতে শয্যাত্যাগ কালে জ্যোতির্ময়ী ত্রিবাহু-সমন্বিত একটি ত্রিকোণ যন্ত্রকে হঠাৎ বিনা কোন ধ্যানে ললাটে অল্পকাল আবির্ভূত হইতে দেখিলাম। উহার অন্তরদেশ অন্ধকারময়। দৃশ্যটি অনির্বচনীয় আনন্দদায়ক! ত্রিকোণ যন্ত্রটি শিব ও শক্তির বা কৃষ্ণ ও রাধার, মিলন স্থান (৪৫ ও ৫৭ পর্ব)। শেষোক্ত পর্বে বর্ণিত ঘটনায়, সারা মুখমণ্ডলকে যে জ্যোতির্ময় দর্শন হইয়াছিল এবং যাহা আত্মার সহিত মিলিতা ও জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির নয়ন ছিদ্রপথে বিনির্গতা হইয়া মুখমণ্ডলে পরিভ্রমণ নির্দেশক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, এই পর্ব বর্ণিত দৃশ্যটি তাহার যেন একটি ভিন্ন পর্যায়! ললাটে জ্যোতির্ময় চন্দ্রমণ্ডল ধ্যানকে 'তেজোধ্যান' বা 'জ্যোতির্ধ্যান' কহে। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, এইরূপ ধ্যানকে 'সূক্ষ্মধ্যান' কহে। তেজোধ্যান অপেক্ষা সূক্ষ্মধ্যান লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ। বিনা কোন সাধনায় বা ধ্যানে, আমি যেন একটি অভিনব প্রকার ধ্যানের ফল পাইলাম। এই ঘটনাটিও, অন্যান্য ঘটনার ন্যায় বুঝাইল যে, বিশ্বাস ও সঠিক ভাব অবলম্বনের দ্বারা, বিনা সাধনায় জগদম্বার আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার লুটের অধিকার মানবের সহজে লাভ হয়। এই সব দর্শন লাভের অভিপ্রায়ে, যোগী বহু কষ্টসাধ্য সাধনা অবলম্বন করেন। ২৬ পর্বে বর্ণিত ঘটনায়, আমি উক্ত ত্রিকোণাকার শক্তিযোনিকে বিনা কোন চেষ্টায়, আমার সামনে কিছুদূরে জাগ্রদাবস্থায় দেখিয়াছিলাম।

শরদিন্দু-সারদা-শ্রীকৃষ্ণ

বিষয়—কোন এক দেবমন্দিরে শরদিন্দুর গুরু ও ইষ্ট দর্শন, অদ্ভুত দৈহিক অবস্থা প্রাপ্তি এবং ইষ্টের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি শ্রবণ—'আমি তোকে অনেক কিছু দেখাইব—বৃন্দাবন দেখবি?'—ইত্যাদির স্বপন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—আন্দাজ, এপ্রেল ১৯৫১—শেষভাগ।

শরদিন্দু নিম্নলিখিতরূপ স্বপ্ন দেখিলেন—

"যেন কোন এক দেবমন্দিরের চওড়া দালানে দাঁড়াইয়া মা সারদেশ্বরীকে ভিজা গামছার উপর ভিজা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখিলাম এবং সেখানকার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, 'এই তো মা যাচ্ছেন!' আমার ক্রোড়ে একটি দুই-আড়াই বর্ষীয় প্রিয় শিশু ছিল। আমি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'মা! তুমি আমাকে বড্ড ভুলে যাও, আমি আর সংসারের নানা জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।' মা উত্তরে বলিলেন, 'সে কি রে?' তাহার পর, আমার চোখ দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল, অঞ্চল ও বস্ত্রাদি শ্লথ হইয়া গা থেকে খুলে গেল এবং জানিনা আদুরে ছেলেটি ও তৎক্ষণাৎ কোথায় গেল ও কেমন করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ও মাথাটি উচ্চ হইয়া শেষে পশ্চাতে ঘাড়ে বাঁকিয়া গিয়া ঠেকিল। সেই সময়, সেইখানে যেন গঙ্গা বহিতে লাগিলেন. মা আমার মাথায় পা দিয়া উহা জলে ডুবাইতে ও (হাঁপাইয়া পড়িলে) উঠাইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্তর্হিতা হইলে একটি কুড়ি-একুশ বর্ষীয় যুবক গঙ্গার সিঁড়িতে উপবিষ্ট হইয়া মায়ের মত আমার মাথা ডুবাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'আমি তোকে অনেক কিছু দেখাইব—বৃন্দাবন দেখবি?' আমি যেই উত্তরে বলিলাম, 'হাঁ, দেখবো', অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল।"

২। যে-মন্দিরের বিষয় ধ পর্বে আলোচিত হইয়াছে কর্মফল-প্রকাশক এই স্বপ্নের মন্দিরটি তাহাই—অধুনা সারদেশ্বরী দেবীর অপ্রাকৃত ধাম, যাহা পরে তাঁহার প্রাকৃত মন্দিরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। শরদিন্দুর ক্রোড়স্থ শিশুটি

তাঁহার পুত্ররূপী বালকৃষ্ণদেব (ছ পর্ব)—যাঁহাকে তিনি ভাবে পুত্ররূপে ক্রোড়স্থ রাখিতে অভ্যস্তা—এবং যুবকটি তাঁহার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ—সারদেশ্বরী দেবী বা শ্রীরাধা যাঁহার অর্ধাঙ্গিনীও বটে (ণ পর্ব) এবং ষোড়শী বা ত্রিপুরাদেবীরূপে মাতাও বটে (আ পর্ব)। মন্দিরটি গঙ্গাতটের সন্নিকটস্থ—অতএব, ঐ স্থানে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব আশ্চর্যের বিষয় নহে—বিশেষতঃ, যখন উহা গঙ্গা বা দুর্গা-দেবীর ভিন্ন মূর্তি সারদেশ্বরীর অপ্রাকৃত ধাম এবং আজ কাল ঐ স্থানের সন্নিকটস্থ গঙ্গা যেন ভূগঙ্গা ও আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থল (জ ও ধ পর্ব)। শ্রীকৃষ্ণ যে শরদিন্দুকে অনেক কিছু সহ বৃন্দাবনধাম দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, তাহার এক দৃশ্য ৫৯ পর্বে আলোচিত হইয়াছে। উহাই গোপিকাদিগের নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনধাম—যাহা মানবের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ পারলৌকিক ঈশ্বরপ্রেম নিকেতন, যথা হইতে সংসারে আর পুনরাবর্তন হয় না এবং যথায় পরিশেষে ঈশ্বরপ্রেমিক ব্রহ্মসাযুজ্য গতি লাভ করেন—যেমন গোপীকাগণ (প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ)। অসম্ভব নহে যে, শরদিন্দু এই স্বপ্নটিতেই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকালের আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্বেই অনুভব করিলেন।

গান

(১) ভাব সদা মন শ্রীরাধারমণ, শমন দমন কলুষ-নাশন।
অকূল-কাণ্ডারী ভব-ভয়হরি, বিপদ-নিবারী শ্রীমধুসূদন॥
মানসে একান্তে ডাক রাধাকান্তে, লবেনা ছোঁবেনা করাল কৃতান্তে।
স্থান পাবে অন্তে অভয়পদ প্রান্তে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে ভাব অনুক্ষণ॥
অসার সংসার ভাব সারাৎসার, শ্রীচরণ সার কর মন আমার,
সাধন ভজনে নাহি প্রয়োজন, ভক্তিভরে নামরসে হও মগন ;
ব্রত যাগযজ্ঞ নহে নামের যোগ্য, অনায়াসে লভে ফল চতুর্বর্গ,
দুর্বলের বল দীনের সম্বল, হরি হরি বল ভরিয়ে বদন॥
ত্যজি লাজ ভয় বল সবে জয়, হরি দয়াময় দিবেন পদাশ্রয়।
চিন্তা পরিহরি মুখে বল হরি, হরি হরি বলি কর সঙ্কীর্তন॥

) বাজে শ্যামের মোহন বেণু, বেণু রব শুনে জুড়াল তনু॥
যে বনে বাজিছে সেই বনে যাই, এ ছার জীবনে আর কাজ নাই,
পুরাইব আশ মন অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্যামের চরণ-রেণু॥
পঞ্চমেতে পাখী ধরিয়াছে গান, পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে তান,
যাঁহার নামেতে যমুনা উজান, হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিত ধেনু॥

যতীন-শ্রীমন্দির

বিষয়—সন্ধ্যায় স্বাভাবিক কোন কার্যোপলক্ষে কলঘরে বসিবার কালে, অস্পষ্ট আলোকে উহার দৃষ্ট সমস্ত পার্শ্বের ও মস্তকোপরিস্থিত দেওয়াল হস্তলেখায় পরিপূর্ণ দর্শন।

স্থান—আমার শয়ন ঘরের পার্শ্বস্থ কলঘর।

কাল—২২শে মে, ১৯৫১—সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা।

উক্ত অবস্থায় ও সময়ে দেখিলাম যে, কলঘরের সমস্ত দৃষ্ট দেওয়ালগুলি বাংলা হস্তলেখায় পরিপূর্ণ এবং কোথায় একটুও বাদ নাই। কিন্তু কাহার লেখা বুঝিতে সক্ষম হইলাম না। এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে কখনও নয়ন গোচর হয় নাই। লেখাগুলি ছোট হইলেও সুস্পষ্ট এবং পড়িতে মনোযোগী হইলে হয়তো কষ্টে পড়িতে পারিতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করি নাই। স্বপ্নে মাঝে মাঝে এইরূপ লেখা দেখি।

২। দৃশ্যটি অর্থহীন নহে। আমি যে মনে করিতেছি এই দ্বিতীয় ভাগ লেখা ও প্রকাশ শেষ হইলে গ্রন্থকারের কার্য হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহা ঠিক নহে। আরও লিখিবার উপযুক্ত জিনিস যথাকালে জগদম্বার নিকট হইতে পাইয়া উহা লিখিতে হইবে! অবতরণিকা, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের নামকরণে, আমি অবশেই সেই কার্য করিতে নিজকে বাঁধিয়াছি—যেমন বিবেকানন্দ অবশেই জগদম্বার ইচ্ছায় জীবদ্দশায় বলিয়াছিলেন—'মানব হিতোদ্দেশ্যে আমি পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে বিচলিত নহি'—এবং যজ্জন্য, আমি অনুমান করি, গীতা তাঁহাকে স্বপ্নে বালকরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে দর্শন করিয়াছিল ও পুত্ররূপে ক্রোড়ে লইতে চাহিয়াছিল এবং পরে যথার্থ পাইয়াছিল (উ পর্ব)। আমার নামকরণ অনুযায়ী—পুস্তকের অবতরণিকাটি 'প্রতিমার উৎপত্তি,' প্রথম ভাগটি 'প্রতিমার নির্মাণ' এবং দ্বিতীয় ভাগটি 'প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।' সেই প্রতিমা অবতরণিকার প্রথম পট। এই সকল নামকরণ সম্পূর্ণ করিতে হইলে, 'মন্দির ও অর্চনা প্রতিষ্ঠা' যে একান্ত প্রয়োজন হইবে, তাহা আমি অবশেই জগদম্বার ইচ্ছায় বুঝিতে পারি নাই। অতএব, শেষোক্ত উপাধিযুক্ত আর একখানি পুস্তক আমাকে বোধ হয় লিখিতে হইবে—যাহা না করিলে পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকিবে।

যতীন-বাল্যশিক্ষাগুরু

বিষয়—বাল্যকালের শিক্ষাগুরু বিহারীলালঘোষ মহাশয়ের আমাকে মৃদু শাসন।

স্থান -আমার শয়ন ঘর।

কাল—৪ঠা জুলাই, ১৯৫১—রাত্রিকাল।

উক্তকালে স্বপন দেখিলাম যে আমার বাল্যকালের শিক্ষাগুরু ও পিতার পরম বন্ধু বিহারীলালঘোষ মহাশয় আমাকে যেন মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, 'তোমার সাধনার ত্রুটি হইতেছে!' এই শিক্ষাগুরুরূপী আমার আত্মার শাসনের অর্থ প্রথমে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক চিন্তার ফলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি আমায় লিখিত পুস্তকগুলিকে জগদম্বার প্রতিমা বোধে বিশেষ চিন্তা না করিবার ত্রুটি সংশোধন করিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি ত্রুটি-টি স্বীকার করি; কারণ, যদিও অন্তরে ঐ বোধ ছিল—পুস্তকগুলির উপাধিই তাহার প্রমাণ—তথাপি ঐ চিন্তা বিশেষভাবে অবলম্বনে অবহেলা হইতেছিল (৮০ পর্ব)। আত্মদেব প্রকারান্তরে আরও বুঝাইলেন, তুমি যে মন্দির নির্মাণ করিবে তাহাতে তোমার প্রধান ভাব প্রেমভক্তিই (প্রথম ভাগ, ষোড়শ অধ্যায়, ১৫ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় নিবেদন ৪ অনুচ্ছেদ, এবং দ্বিতীয় ভাগ, ৫৬ পর্ব) —*অবশেষে শলাই-কাঠির স্ফুলিঙ্গে চিহ্নিত স্থান (১৩৭)—*মুখ্য অর্চন পদ্ধতি হইবে অতএব তুমি লিখিত পুস্তকগুলিকেই উহাতে প্রদর্শিত জগদম্বার প্রতিমারূপে পূজা করিতে থাক—যাহার ফলে পুস্তকে লিখিত তোমার ভাবগুলির প্রচারকার্যে সিদ্ধি অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে, প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়, ২১ অনুচ্ছেদ সনৎকুমার-বাণী' পঠনীয়। কর্তব্যবোধে গুরুদেব ত্রুটি ধরিলেন এবং আমিও তাহা স্বীকার করিলাম বটে। তথাপি বলিতে হইবে যে, তাঁহাকে বা জগদম্বাকে সর্বার্পণ করিলে, কিছুতেই দোষ হয় না। দেহস্বামী অহঙ্কার (বা চিত্ত) ত্যাগ বা জগদম্বাকে অর্পণই, শরণাগতর পরাকাষ্ঠা (৮৩ পর্ব)। বিশ্বে বৃক্ষপত্রের স্পন্দনও প্রকৃতিদেবীর ইচ্ছায় হইতেছে! কলের পুতুলের খেলায় তাহার আবার দোষ-গুণ কোথায়—'যেমন করায় তেমনই করে!'

যতীন-দুর্গা

বিষয়—'দুর্গা' নামের অপরূপ মহিমা-প্রকাশক একটি অদ্ভুত স্বপনে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—২২শে অগষ্ট, ১৯৫১—বেলা আড়াইটা।

আমি নিম্নলিখিত রূপ স্বপন দেখিলাম—

"যেন পথিকরূপে একটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করত অধিক চওড়া পথে আসিয়া পড়িলাম। উহার প্রান্তসীমায় আসিয়া দেখিলাম যে, একটা ইষ্টক নির্মিত সিঁড়ি নিম্নাভিমুখে প্রায় পাঁচ-ছয় তলা বিস্তৃত রহিয়াছে। সিঁড়ির ধাপগুলি একজনের ব্যবহারোপযোগী, দুই ফুটের অধিক চওড়া নহে এবং দুই পার্শ্বের ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেওয়ালগুলিতে ইষ্টক সকল কেবল সাজান—গ্রথিত নহে। ঐ সিঁড়ি দিয়া এবং দেওয়াল আশ্রয় করিয়া আমাকে নামিতেই হইবে ভাবিয়া অতিশয় ভয় হইল, কারণ—দেখিলাম যে, ইষ্টক-নির্মিত হইলেও সিঁড়িটি টল টল করিয়া কাঁপিতেছে এবং যে-কোন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। অনন্যোপায় হইয়া নামিতে নামিতে, 'দুর্গা' নাম জপ করিতে লাগিলাম এবং কিছু নিম্নে নামিয়া শরদিন্দুকেও সঙ্গিনীরূপে কয় ধাপ নিম্নে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। শেষে একটা গড়ানে টিনের তৈয়ারী দুরতিক্রম্য পথে আসিয়া পৌঁছিলাম। অতি কষ্টে উহা অতিক্রম করিয়া নিচে আসিতেই কে যেন কোথা থেকে আকাশবাণীতে বলিলেন, 'দুর্গা নামের বলেই তুমি ঐ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে'। তৎপরে, সম্মুখে একটি ঘরে শরদিন্দুকে দেখিলাম এবং ঘরের নিকটেই কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি অতি মনোরম ছোট ছোট দুর্বা ঘাসাচ্ছাদিত বিস্তৃত ময়দান বা প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা ঐ উপাদেয় গন্তব্য স্থানে যাইবার পরামর্শ করিতেছি, এমন সময় স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গেল।"

২। আদ্যরূপিণী দুর্গাদেবীর দ্বারা প্রকটিত এই স্বপ্নটি অতি অল্পকালব্যাপী হইলেও, উহাকে আমার জীবনেতিহাসের একটি মোটামুটি পুস্তিকা বলিতে পারা যায়। বাস্তবিক, বাল্যকালে অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই লালন পালন হইয়াছিলাম। মাতার মৃত্যুর কিছু পরে বিদেশ বাসের জন্য ঐ গণ্ডি অপেক্ষাকৃত চাওড়া হইলেও, ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি সন্তান সন্ততি লাভ, প্রথম

দুইটি পত্নীর অল্পকাল মধ্যে বিয়োগ এবং পিতার মৃত্যুতে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারের দায়িত্ব বহন ইত্যাদির জন্য সংসারে নানারূপ ঝঞ্ঝাটে আমি সদা নিতান্তই উৎপীড়িত থাকিতাম। স্বপ্নদৃষ্ট ভাঙ্গা নির্জরের অযোগ্য সিঁড়িটাই যথার্থ আমার সেই অবস্থা প্রকাশক এবং টিনের তৈয়ারী দুরতিক্রমণীয় পথটি সংসারস্থ আত্মীয়দিগের ক্রম-বর্ধমান অর্থ লালসায় জাত নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাব। স্বপ্ন প্রাপ্তি উপলক্ষে এই সব বিষয় পূর্বে নানা পর্বে নিতান্ত অনিচ্ছায় আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। জগদম্বাই যেন এই পুস্তকখানিতে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখাইলেন! উদ্দেশ্য তিনিই জানেন। এই প্রসঙ্গে, ৬০ পর্ব দ্রষ্টব্য।

৩। এই স্বপ্নটি, শরদিন্দুর দ্বারা দৃষ্ট গ পর্বে আলোচিত স্বপ্নটির অনুরূপ। দুইটি স্বপ্নই প্রকাশ করিতেছে যে, আমরা উভয়ে সংসারে আমাদিগের অতি দুর্গম পথে কেবল জগদম্বার কৃপা ও তাঁহার উপর নির্ভরতার বলেই বিচরণ করত সুন্দর গন্তব্যস্থান লাভ করিব। সেইজন্যই, দ্বিতীয় স্বপ্নটিতে আমি শরদিন্দুকে সুপত্নী ও সঙ্গিনী রূপে পথে লাভ করিয়াছিলাম (১৮ পর্ব)। শরদিন্দু আমাকে প্রথম স্বপ্নটিতে দুর্গর পথে বিচরণের গোড়া হইতেই সঙ্গীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নের আকাশবাণীতে যে দুর্গা নামের মহিমা শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ দুর্গাদেবী স্বমুখে দেবতাদিগকে বলিয়াছেন—

মম 'দুর্গা' নাম যেই স্মরণ করিবে,
তাহার দুর্গতি নাশ সতত হইবে।

গান

(১) আমি 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

(২) শ্রীদুর্গা নাম ভুল' না— ভুল' না, ভুল' না, ভুল' না।
শ্রীদুর্গা স্মরণে সমুদ্র মন্থনে, বিষ পানে বিশ্বনাথ ম'ল না॥
যদ্যপি কখনও বিপদ ঘটে, শ্রীদুর্গা স্মরণ করিও সঙ্কটে,
তারায় দিয়ে ভার সুরথ রাজার, লক্ষ অসি ঘাতে প্রাণ গেল না॥
বিভু নামে এক রাজার ছেলে, যাত্রা করেছিল শ্রীদুর্গা বলে,
আসিবার কালে সমুদ্রের জলে ডুবেছিল তবু মরণ হ'ল না।

যতীন-শরণাগতি

বিষয়—জগদম্বাকে আমার শরণাগতির বা আত্মনিবেদনের স্বরূপ-প্রকাশক একটি অতি অদ্ভুত স্বপ্ন।

স্থান—আমার শয়ন ঘর।

কাল—আন্দাজ ১৯৫১—শেষভাগ।

স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার পরম স্নেহময়ী দিদিমা অপর একটি আত্মীয়ার সহিত মুখোমুখি ভাবে একটি ঘরে দুইটি তক্তাপোশে উপবিষ্টা থাকিয়া কথোপকথনে নিযুক্তা। আমি সেই ঘরের দরজায় যাইতেই, দিদিমা আমাকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই আমাকে কি দিবি?' আমি উত্তরে বলিলাম, 'তোমাকে আমি এত ভালবাসি যে জগতে এখন কোন বস্তু আমার নাই যাহা না দিতে পারি। তুমি বল কি চাও—বলিলেই হইবে!' এই বলিয়া, অবিলম্বে তক্তাপোশদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্য দিয়া, তাঁহার নিকট যাইলাম এবং পা ঝুলাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া বলিলাম—'এই লও আমাকেই দিলাম। আর কি চাও বল?' ঐরূপে আত্মদান ও আত্মনিবেদন করিলাম বটে, কিন্তু মনে বড় ভয় হইতে লাগিল যে, দিদিমা ব্যথা পাইবেন। তিনি উহাতে সানন্দে হাসিতে লাগিলেন বটে কিন্তু আমার বড় ভয় হইতে লাগিল যে 'দিদিমার কষ্ট হইতেছে'। তবুও ক্রোড় হইতে নামিলাম না। এমন সময়, স্বপ্নটি ভাঙ্গিল।

২। আমার আত্মার দ্বারা প্রকটিত উক্ত স্বপ্নে আমার স্নেহময়ী দিদিমাই আমার আত্মা বা আত্মস্থ প্রেমময়ী জগদম্বা—কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, সারদেশ্বরী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী সরস্বতী, সাবিত্রী দশমহাবিদ্যা সীতা লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, ইত্যাদি নানা মূর্ত্তি হইলেও যাঁহার এক ও অভেদ বিশ্বরূপিণী পরাশক্তি মহাকালী শ্রীদেবী, তৎস্বরূপ এই বিশ্বের সার্ব্বকালীন সব বস্তু স্পন্দনই তাঁহার অভিব্যক্তি এবং অন্য যাহা কিছু তাহা থাকিয়াও যেন নাই—কারণ, কেহ কোন বিষয়েই স্বাধীন নহে এবং নিয়তিরূপিণী তাঁহার বিধান সর্ব্ববিষয়ে রামেচ্ছারূপে পালন করিতেছে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর ও জীব পরিত্রাণ-কর্তা অবতারগণও তাঁহার বশ্যতায় ইচ্ছার অধীন। তিনি ব্রহ্মরূপিণী এবং ব্রহ্মেচ্ছারূপিণী হইয়া এবং ব্রহ্মকে সাক্ষী স্বরূপে রাখিয়া, তাঁহার সব ইচ্ছা বা প্রেরণা পূর্ণ

করিতেছেন। অতএব, বিশ্বে সবই কালময়ী, বা ব্রহ্মময়—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

৩। যখন মানব তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ে সঠিক বুঝিতে পারে যে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে ব্রহ্মময়ী মা সব হইয়া রহিয়াছেন ও সব করিতেছেন, সকলেই নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপ ও বাস্তবিক কিছু না করিয়াও 'অহং'-বোধে মিথ্যা মনে করে সবই করিতেছি (৫৬ পর্ব) এবং সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞানই তাহার ধরাধামে পুনঃ পুনঃ জন্মের মূল কারণ, তখন সে তাঁহাকে সর্বার্পণ করে, কোন কর্মে ফল কামনা করে না এবং কর্মফল হইতে চির অব্যাহতি পাইয়া মুক্ত হইয়া যায়। এই সর্বার্পণের স্বরূপ ২৬ ও ৪৯ পর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহার চরম অবস্থায় ('অহং' অর্পণে) সে জগদম্বার যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া আর দেহাদির কোনরূপ স্পন্দন বিষয়ে নানা গণ্ডিযুক্ত শাস্ত্রবিধানের অধীন মনে করে না। তাহার দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদির, যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, সেই সকলই সে জগদম্বার ইচ্ছা প্রসূত মনে করত অবশিষ্ট জীবন ধরায় অতিবাহিত করে। এই অর্পিত স্বেচ্ছাচারিতা তাহাকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে না। মানবের যে-কোন ইচ্ছাই ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার প্রেরণা—তাহা ইচ্ছামত ফল প্রসব করুক, আর নাই করুক। সামান্য কোন ফল প্রাপ্তি বিষয়েও, তাঁহার ইচ্ছাই শেষ কথা! দেহরাজ 'অহং' ত্যাগই সর্বত্যাগ—আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।

৪। স্বপ্নটিতে জগদম্বা আমাকে বুঝাইলেন যে, অহঙ্কার ত্যাগ, আত্মজ্ঞান এবং সর্ববিধ ফল কামনা বিষয়ে সতর্কতা বশতঃ আমার ভার বহন তাঁহার পক্ষে সহজ। যে-ব্যক্তি কর্মে ফল কামনা করে, সে ঈশ্বরের একটি মহাভার (২ ও ১২ পর্ব)। দিদিমারূপিণী জগদম্বাকে নিজ ভাবার্পণ পূর্বক তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকিয়া আমি ভয় পাইতেছিলাম বটে, কিন্তু তিনি সহাস্যে প্রেমভরে উহা গ্রাহ্যে আনেন নাই—কারণ, যেন কিছুই বোঝা নহে আমি তাঁহার নিকট এমন ভারহীন অবস্থাপন্ন! জীবের 'অহং' বা বাসনা'ই মায়িক বিশ্বের উৎস—অতএব, জগদম্বার ভার। নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহার আত্মস্বরূপ বলিয়া ভারহীন! সেইজন্য, শাস্ত্রে আছে যে, কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন ভিন্ন গুরুকে পরকালের ভারার্পণ নিষ্ফল। সদ্গুরু প্রথমেই শিষ্যের মায়া বা অহংকারের উচ্ছেদ সাধন করেন।

কাঁচা আমি রব ভুলি, 'আমার'-'আমার' বলি,
যতক্ষণ না ছাড়িবে 'আমি' ও 'আমার'।
ততক্ষণ রবে ভ্রান্তি পাবে না পরমা শান্তি,
নাহি হবে 'সর্বত্যাগ' সাধন তোমার ॥

পরিশিষ্ট

জগদম্বার অহেতুকী প্রেম ও ভক্ত-বাৎসল্য

পুরাতন ১৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট নিবাসী, খ্যাতনামা তান্ত্রিক কালী-সাধক শ্রীহরিদাসজ্যোতিষার্ণব মহাশয়, জগদম্বার নিকট হইতে আমার পুস্তকগুলির ও আমার কয়টি আত্মীয়ের আমার বিরুদ্ধে তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিষয় যে পাঁচটি স্বপ্ন পাইয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ (তাঁহার ভাষার কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাকারে) নিম্নে লিখিত হইল। তিনি আমাকে উহাদিগকে এই পুস্তকে মুদ্রণ করিতে বিশেষ ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগত বন্ধু ও শিষ্য এটর্ণি সুনীলব্রহ্ম মহাশয়ের দ্বারা উহাদিগকে লিখাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে, পূর্বে ৬৪, ৬৮, ৭২. ও দ পর্ব দ্রষ্টব্য। হরিদাসবাবুর স্বপ্নগুলির সহিত আমার কয়টি স্বপ্নের অনেক বিষয়ে বিশেষ মিল আছে এবং ঐ স্বপ্নগুলি আমার অপ্রত্যাশিত নহে (৫২ পর্ব দ্রষ্টব্য)।

প্রথম স্বপ্ন—(কলিকাতা)

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯—রাত্রি বারটা ও একটার মধ্যে।

"মনে হইল যেন একটি মনোরম, বিস্তীর্ণ পর্বত-সঙ্কুল অন্ধকারময় স্থানে আছি, যথায় মৃদু মধুর বাদ্য বাজিতেছিল কিন্তু আমার প্রাণে অব্যক্ত ভয় হইতেছিল। অকস্মাৎ, সেই গিরিরাজির মধ্য হইতে ঘোররবে এক মূর্তি আবির্ভূতা হইলেন, কিন্তু প্রথমে অন্ধকার ও দূরত্বের জন্য তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। কিছুক্ষণ পরে সংশয় ও উৎকণ্ঠা দূর হইলে, মূর্তিটি নিকটস্থ হইলেন, চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল এবং বুঝিলাম যে তিনি আমার পরমারাধ্যা, মা শ্যামা। কৃতাঞ্জলি ভাবে নতজানু হইয়া, প্রাণে আনন্দ ও সাহস ভরে মায়ের বদনমণ্ডলে দৃষ্টি উঠাইলাম। উহা গম্ভীর ও চিন্তাকুল হইলেও, প্রসন্ন। তাঁহার অবয়বগুলি বিশাল, চারি ভূজ, বর্ণ শ্যাম, ভূষণ শাস্ত্রীয় ও প্রচলিত এবং জিহ্বা বিস্তৃত। মৃদুস্বরে বলিলাম, 'মা। ভয় হইতেছে, ভয় নিবারণ করুন এবং কৃপা করিয়া সন্তানের নিকটে যে আগমন করিয়াছেন তজ্জন্য কি সেবা করিব তাহার আজ্ঞা করুন।' তখন সহাস্যমুখে জননী বলিলেন, 'দেখ, যতীনঘোষ আমার একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও সেবক—তাহার বড় বিপদ। আমি তাহাকে তোমার চেষ্টায় উহা হইতে উদ্ধার করিতে চাই। সে আমার সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখিতেছে এবং তাহাতে আমি তাহাকে সাহায্য করিতেছি। উহাতে সমস্ত সত্য কথা থাকিবে এবং উহা একাধারে দর্শনশাস্ত্র এবং ভক্ত ও তত্ত্বপিপাসু-

এবং মা তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তৎপরে, মনে হইল যেন আমি যতীন-বাবুর দ্বারা নির্মিত একটি নূতন, ছোট, মায়ের মন্দিরে তাঁহার সেবাইত রূপে পূজার্চনা করিতেছি এবং কর্ণে নিকটস্থ কোন নদীর কুলু-কুলু ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি (পাদটীকা ১৬)। আমার মনে মায়ের উপর অভিমান হইতে লাগিল যে আমি তাঁহাকে পূজা করিতেছি, অথচ তিনি যতীনবাবুকেই স্নেহালিঙ্গন করিতেছেন। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া প্রাণে যুগপৎ অভিমান ও আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল।”
[এই প্রসঙ্গে, নিম্নলিখিত কবিতাটি (প্রেমভক্তি যোগ) দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চম স্বপ্ন—(বরিশাল জেলার হরিদাস বাবুর গ্রাম)

২রা নভেম্বর, ১৯৫০—রাত্রি প্রায় চারিটা

“দশভুজা দুর্গাদেবী সম্মুখে হঠাৎ আবির্ভূতা হওয়াতে, আমি তাঁহাকে কর জোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলাম। দুইটি [পাদটীকা ১৭] মহিমাময়ী স্ত্রীমূর্তি তাঁহার সঙ্গিনী এবং একটি ছোট বালককে তাঁহার সম্মুখে দেখিয়া মনে হইল যে সে তাঁহার কোন পুত্র হইবে। পরে, দেবী কালীমূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চারিদিকে পিশাচ, ভূত, প্রেত, দানা, ইত্যাদি (কতকগুলি মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট এবং কতকগুলি বা ভীষণ কদাকার শূকর, শৃগাল ও কুকুরের ন্যায় মুখবিশিষ্ট) নৃত্য ও রোদন করিতে লাগিল। ভীষণ ভয়ে, আমি মাকে স্তুতি করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম ‘ মা, রক্ষা কর ’। ইত্যবসরে, উপরি উক্ত বালকটিকে চতুর্ভুজার ক্রোড়ে যতীনবাবুর মূর্তিতে দেখিলাম। জানিনা কেমন করিয়া সেইখানেই মায়ের সাধক এটর্ণি সুনীলব্রহ্ম মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সম্মুখে ক্রোড়স্থ যতীনবাবুকে দেখাইয়া, মা বলিতে লাগিলেন —‘ বর্তমান কালে, এইটি আমার একমাত্র পুত্র, যে আমার গুণ-কীর্তন করত আমাকে জগতে প্রচার করিবে। যতীনকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া পুস্তক লিখাইতেছি [পাদটীকা ১৮] এবং উহার প্রথম (অবতরণিকা) খণ্ডের আগামী বৃহস্পতিবার (৯ই নভেম্বর) ছাপান আরম্ভ হইবে।’

(১৬)—এই স্থান হইতে মনে হয় যে আমি বৃদ্ধ ও কার্যাক্ষম হইলেও, মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাকূলের নিকট আমার ক্রীত স্থানে মায়ের মন্দির নির্মাণে সক্ষম হইব। এই প্রসঙ্গে, ৬৩ ও ৪ পর্ব দ্রষ্টব্য।

(১৭)—ইঁহারা আমার পরলোকগতা দুইটি স্ত্রী (প্রিয়ংবদা ও মনোরমা) ভিন্ন অন্যা কে হইবেন ? এই প্রসঙ্গে, ২ পর্বস্থ চিহ্নিত স্থান (১) ও ৩ পর্বের ১ অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

(১৮)—বর্তমান কালে, আমি যে ‘ মায়ের **একমাত্র** পুত্র ’ ইহার ধারণা আমার বুদ্ধির অতীত। মনে হয় বুঝি মা সত্যই ‘ পাগলী ’ ও আমার প্রেমে কাণ্ডজ্ঞান হীনা ! আমি তোমার নিতান্ত অযোগ্য পুত্র ! আমার প্রতি তোমার অনির্বচনীয় অহেতুকী প্রেমের আমি কি প্রতিদান দিতেছি ? আমার পার্শ্বস্থ পটরূপে তুমি আমার নিত্যা সহচরী ও আমার দেহে মিলিতা (৩ ও ৪৯ পর্ব)।

আমি পুস্তক কবে ছাপাইতে আরম্ভ করিব তাহা হরিদাস বাবু বা সুনীল বাবু জানিতেন না। অবতরণিকার কেবল মুখপত্রের মুদ্রণ ৯ই নভেম্বর কালী পূজার দিন হইয়াছিল। হরিদাস বাবু ১১ই-১২ই নভেম্বর নাগাত দেশ হইতে ফিরিয়া উক্ত স্বপ্নটি সুনীল বাবুকে বলিয়াছিলেন। আমি ১৬ই নভেম্বর হরিদাস বাবুর নিকটে গিয়া প্রথমে তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই, কিন্তু সুনীল বাবু আমাকে বলিলেন, ‘পুস্তক তো ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন!’ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনি ঐ সংবাদ কোথা থেকে পাইলেন?’ তিনি বলিলেন, ‘হরিদাস বাবু বরিশালেই মায়ের স্বপনে উহা জানিয়াছেন।’ তৎপরে হরিদাসবাবু আসিলে সব সংবাদ অবগত হইলাম (***)। [পাণ্ডুলিপিতে এই দুইটি চিহ্নান্তবর্তী (***) সমস্ত লিখনই (৩৫৪-৩৫৬ পৃষ্ঠা) নানা স্থানে লোহার কড়ির ঘাম পড়িয়া ইষ্টকবর্ণে অবশে রঞ্জিত হইয়াছে। মা স্বপ্নগুলিতে সত্যের ‘ছাপ’ দিলেন।]

প্রেমভক্তি যোগ

পূজিতে তোমারে সদা ইচ্ছা করে,
কি দিয়ে পূজে মা যতীন তোমারে?
যাহা কিছু বিশ্বে সকলি তোমার,
লহ প্রেম, দিনু সর্বাত্মোপহার!
যে-কোন প্রতিমা, দেব-নিকেতন,
নানা বৃক্ষ-যুত বাগিচা মোহন।
মন্ত্র, হোম, বস্ত্র, নৈবেদ্য, সুবাস,
এই সবে হেরি তোমার বিকাশ।
তুমি সুপবিত্র জাহ্নবীর জল,
অগুরুর তুমি গন্ধ সুবিমল।
তুমি শ্রীতুলসী, নব-দুর্বাদল,
ব্রহ্মযোনি তুল্যাকার বিল্বদল।
এই সবে, বৈধী তোমার পূজন,
হয় খণ্ডাকার, নহে নিত্যার্চন।
তেঁই অর্চি তোমা ভাবি প্রেমময়ী,
সারা বিশ্বমূর্তি, ব্রহ্ম-ইচ্ছাময়ী॥
রাখি আলিঙ্গনে, অটুট বন্ধনে—
সর্বত্র যে তুমি ভিন্ন-আবরণে॥

ব্রহ্মার্পণমস্তু

[দ্বিতীয় ভাগ ও চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]